১৫শ বর্ষ। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। ১ম ও ২য় সংখ্যা।

১৮[illegible], ১৩১[illegible]।

গ্রাহক মহাশয়গণ!

☞ বর্ত্তমান বর্ষের দেয় মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

☞ পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে, ঠিকানা ... জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য অবশ্য স্ব স্ব গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

১। মঙ্গলাচরণ—নববর্ষ-নিবেদন ১

২। 'তস্যৈবাহম্-তবৈবাহম্-ত্বমেবাহম্' ৫

৩। কৈলাস ৭

৪। খড়্গাবিধান সূত্র ৯

৫। শিক্ষা ১৯

৬। "গো-ব্রাহ্মণ" ২৮

৭। খৃষ্টধর্ম্ম ও আর্যদর্শন ৩৩

৮। অষ্টকর্ম্ম ও পঞ্চবর্গ ৩৬

৯। উপায় কি? ৪২

১০। হরি-সংকীর্ত্তন ৫৩

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৯।

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা ।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । | বৈশাখ । | ১৩১৪ সাল, ১৮২৯ শকাব্দা ।

মঙ্গলাচরণ ।

—•:•:•—

সিদ্ধিদাত্রে নমস্তুভ্যং বৃদ্ধিসমৃদ্ধি-
হেতবে ।
অপমে বিঘ্ননাশায় গণেশায়
নমোনমঃ ॥

গত বর্ষ ত্রয়োদশ হিন্দুধর্ম্ম-তত্ত্বরস
নিবেদনে নিরলস রহি যথাশক্তি,
ভগবংকৃপাভরে সাধু-ভক্ত সুধী নরে
বিতরিয়া ঘরে ঘরে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি ;
নব চতুর্দ্দশ বর্ষে, নবোল্লাসে—নবহর্ষে
কর্ম্মভূ ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-প্রচারিকা—
স্বদেশ-সেবিকা তথা,—স্বধর্ম্ম-স্বকর্ম্ম-কথা—
বহুক্ স্বপত্র-বক্ষে এ "হিন্দু-পত্রিকা" ।
হরি-কৃপা-জল-স্পর্শে নববলান্বিকা
হউক্ এ নববর্ষে এ "হিন্দু-পত্রিকা" ॥

নববর্ষ-নিবেদন ।

কৃপাময় শ্রীভগবানের কৃপায়, সাধু-ভক্ত-সহৃদয়—স্বদেশ ও স্বধর্ম্মানুরাগী গ্রাহক অনুগ্রাহক-পাঠক মহাশয়গণের সাগ্রহ সহানুভূতি ও সানুগ্রহ সহায়তায়, আমাদের "হিন্দুপত্রিকা" ত্রয়োদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশবর্ষে উপনীত। দ্বাদশবর্ষে এক নৈসর্গিক বা ব্যবহারিক যুগ হয় ; তাহার পরেও এক বৎসর অতীত ; এই সুদীর্ঘকাল "হিন্দু-পত্রিকা" হিন্দুসমাজের সাহিত্যিক পরিচারিকা রূপে যথাশক্তি ও যথাসম্ভব শাস্ত্র-ধর্ম্ম-তত্ত্বসার ও সত্ত্ব-সাহিত্য-সুধাধার পরম যত্নে পরিবেশন করিয়াছে। ভগবৎকৃপায় আ-হিমাচল আণ্ডামান্ ও আব্রহ্ম-বেলুচিস্থান,

যেখানেই বঙ্গভাষাভিজ্ঞ হিন্দুর স্থিতি, সেইখানেই "হিন্দুপত্রিকা"র গতি। যে সমস্ত সুধী সাধক লেখক মহোদয়গণের সুলিপি-সাহায্যে ইহার এই যে ভারতময় প্রসার ও প্রচার, নববর্ষারম্ভে তাঁহাদের উদ্দেশে আমাদের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। "হিন্দুপত্রিকা"কে হিন্দুধর্ম্মানুরাগী গ্রাহকগণ স্ব স্ব গৃহে গৃহে গ্রহণ ও পালন করিতেছেন এবং সুধী সুলেখকগণ ইহাকে সাহিত্যসমাজে সমাদর লাভের সুযোগারূপে বিবিধ প্রবন্ধরূপ গদ্য-বসনে ও পদ্য ভূষণে সাজাইয়া দিতেছেন; সুতরাং আমরা সংপূর্ণ তাঁহাদেরই সহায়তায় ইহাকে এ যাবত্ আমাদের প্রিয় পাঠকমণ্ডলীর পরিচর্য্যায় প্রেরণ করিতে পারিয়াছি। অতএব উপস্থিত নববর্ষ হইতেও তাঁহাদের তদ্রূপ ও ততোধিক সদয় সাহায্যের আশা হৃদয়ে ধরিয়া, এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বসর্বাঞ্ছাপূরণকারী শ্রীহরির শ্রীচরণকৃপাশ্রয় সার করিয়া, আমরা হিন্দুপত্রিকার পরিচালনে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম। আদি-অন্তে ভগবানই সর্ব্বময়। আদৌ নিয়োজন ভগবানের, আয়োজন আমাদের, প্রয়োজন গ্রাহক-পাঠকবর্গের। আবার চেষ্টা আমাদের, সহায়তা লেখকগণের ও সফলতা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় নির্ভর করিতেছে। পুরুষকার ও দৈবই জগতে সর্ব্বকর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও ফলদায়ক। আর "নচ দৈবাৎ পরং বলম্।" সুতরাং এ পক্ষে—সাফল্য-লক্ষ্যে দৈবই আমাদের সকল বল ও সার সম্বল, এবং আমাদের পুরুষকারও সেই পরমপুরুষেরই ইচ্ছা ও কৃপার ফল। ফলে তিনিই সর্ব্বময়; তাঁহাহতেই সর্ব্বোদয় ও তাঁহাতেই সর্ব্বলয়, এবং তন্নির্ভরতাতেই সর্ব্বজয়! কর্ম্ম-বিচারে, ধর্ম্ম-প্রচারে ও শাস্ত্র-সাহিত্য-তত্ত্ব সঞ্চারে, এই শিক্ষা—এই সত্যই যেন তাঁহারই কৃপায় তচ্চরণ-চিরাশ্রিতা "হিন্দু-পত্রিকা"র চিরলক্ষ্য হয়।

হরিনাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমাদের এই শরীরই নরক তুল্য।

মাংসাসৃক্ পূয়বিণ্মূত্রস্নায়ু মজ্জাস্থি সংহতৌ।
দেহেচেৎ প্রীতিমান্মূঢ়োনরকে ভবিতাপি সঃ॥
(বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ১৭।)

মাংস, রক্ত, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা, অস্থি-পরিপূর্ণ দেহে যদি লোকের প্রীতি হয়, নরকেও তাহাহইলে প্রীতি হউক্।

শ্রীভাগবতে, ব্রহ্মপুরাণে, গরুড়পুরাণাদিতে নরকের বর্ণনা আছে। উহা এ চক্ষুর অগোচর; সুতরাং তাহাতে যদি বিশ্বাস না হয়, দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব দেখিলেই নরক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

তজ্জন্যই শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে অবধূত কহিয়াছিলেন, সংসারে অনাস্থা হইবার কারণ আমার দেহ—

দেহো গুরুর্মম বিরক্তি-বিবেক-হেতু
বিভ্রৎস্ম সত্ত্বনিধনং সততার্ত্ত্যুদর্কম্।
১০ অধ্যায়ে ২৫।

দেহই আমার বিরক্তি ও বিবেকের কারণ; ইহা উৎপত্তি ও বিনাশশীল ও ইহার উত্তর ফল দুঃখময়।

মৎস্যকে বধ করিতে দর্শন করিয়া মহাত্মা সৌভরি মুনির প্রাণ কাঁদিয়াছিল ও তিনি কহিয়াছিলেন যে, যদি গরুড় এই যমুনার মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহাহইলে সে অন্ত মরিয়া যাইবে—

অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি।
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্॥

শ্রীভাগবতে ১০। ১৭। ১১।

শরীর সত্ত্বগুণপ্রধান না হইলে, জীবহিংসায় প্রাণ কাঁদে না; কারণ রজোগুণই মৎস্যাদি-ভক্ষণ-প্রবৃত্তির কারণ—

ক্রব্যাদান্ রাজসান্ বিদ্ধি জিহ্বারসপরায়ণান্।

অনুশাসনপর্ব্বণি ১১৫ অধ্যায়ে।

জিহ্বারসপরায়ণ মাংসাশীগণকে রাজসপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে।

হায়! মংসাশি! তোমার শরীর কি পাষাণে গঠিত? জীবের জীবনে কি একটুও মমতা হয় না? সে হৃদয়-শোণিত-শোষক দৃশ্য দেখিয়া কি পাষাণ-হৃদয় আর্দ্র হয় না? যে দেহ পরিপোষণের জন্য এত পাপ করিতেছ, সে দেহ কাহার, একবার চিন্তা হয় না? সে দেহ যে অগ্নির, মৃত্তিকার কিম্বা শৃগাল-কুকুরের, একবার তাহা ধারণাও হয় না? রাজদেহ হইলেও যে তাহার পরিণাম কৃমি, বিষ্ঠা (১) ও ভস্ম, এ চিন্তা কি হৃদয়ে উদয় হয় না? বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম, এক্ষণ প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করি—

পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীব বধের জন্যও মনুষ্য দায়ী—

আত্মবৎ সততং পশ্যেদপি কীট পিপীলিকম্॥

শুক্রনীতিঃ ৩ অধ্যায়ে ৯। অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ২। ২৩।

কীট পিপীলিকাকেও মনুষ্য আপনার ন্যায় দর্শন করিবেন। কর্ম্মফলে মনুষ্য তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। (২) এরূপও হইতে পারে, যে ভক্ষক যে জীব বধ করিতেছেন, তিনি তাহার পূর্ব্বপুরুষ! সুতরাং জীবহিংসা হইতে বিরত থাকা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

তথাচ সর্ব্বভূতেষু বর্ত্তিতব্যং যথাত্মনি॥

শান্তিপর্ব্বণি ১৬৭ অধ্যায়ে ৯।

যেরূপ নিজের প্রতি আচরণ করা যায়, তদ্রূপ সর্ব্বভূতের প্রতি আচরণ করা কর্ত্তব্য।

যস্ত্বিহবা উগ্রঃ পশূন্ পক্ষিণোবা প্রাণত উপরন্ধয়তি তমপকরুণং পুরুষাদৈরপি বিগর্হিতমুমুত্র যমানুচরাঃ কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে উপরন্ধয়তি॥

শ্রীভাগবতে ৫স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ১৬।

যে ব্যক্তি এ সংসারে উগ্রমূর্ত্তি হইয়া নিজের জন্য পশু অথবা পক্ষিকে রন্ধন করে, সে নরাধম নির্দ্দয়কে রাক্ষসেরাও নিন্দা করিয়া থাকে এবং পরকালে যমকিঙ্করগণ তাহাকে কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে রন্ধন করিয়া থাকে।

ইচ্ছা করিয়া কোন জীব বধ করিলে, প্রায়শ্চিত্তে তাহার পাপখণ্ডন হয় না; কারণ সেই পাপে পুনরায় তাহার মতি ধাবিত হয়—

যঃ সকৃৎ পাপকং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদেনৎ ততঃপরং নাপগাঃ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৭ পঞ্জিকায়াং ৩। ৫॥

(১) মৃতদেহ দগ্ধ না হইলে, কৃমি-শৃগালাদির ভক্ষণে শেষ পরিণাম বিষ্ঠা।

(২) ব্রহ্মপুরাণে ১০৭ অধ্যায়ে।

যঃ পুমান্ ধর্ম্মশাস্ত্রভীতিরহিতঃ সকৃৎ পাপকং কুর্য্যাৎ স পুমান্ ততঃপাপাদন্যৎ এনৎ পাপং তদভ্যাসবশাৎ কুর্য্যাদেব।

(ভাষ্যে সায়নাচার্য্যঃ।)

যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্র-ভীতি-রহিত হইয়া একবার পাপ করে, সে ব্যক্তি সে পাপ হইতে অন্য পাপ অভ্যাসবশতঃ করিয়া থাকে।

জ্ঞানকৃত পাপ যজ্ঞদ্বারাও খণ্ডন হয় না—

যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ সুরয়া বা সুরাকৃতম্।
ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং ন যজ্ঞৈর্মাষ্টু মর্হতি॥

শ্রীভাগবতে ১। ৮। ৫২।

যেরূপ পঙ্ক-জলদ্বারা পঙ্ক ধৌত হইতে পারে না, সুরাবিন্দুস্পৃষ্ট অপবিত্র বস্তু বহু সুরা দ্বারা পবিত্রীকৃত হইতে পারে না, তদ্রূপ একটী প্রাণী বধ প্রমাদবশতঃ হইলেও, বুদ্ধিপূর্ব্বক যে হিংসা, যজ্ঞাদি দ্বারা সে পাপের মোচন হয় না।

অজ্ঞানবশতঃ কীটাদি বধ করিলে, চিত্ত অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত পাপ-খণ্ডন হয় না—

অন্নে বাপ্যথ শোচেত———

শান্তিপর্ব্বণি ১৬৫ অধ্যায়ে ৫৭।

অজ্ঞানবশতঃ কীটাদি বধ করিলে, অনুতাপরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

ধর্ম্মের লক্ষণ পুনরায় মহাভারতে, যথা—

বাহুশ্রুত্যং (৩) তপস্ত্যাগঃশ্রদ্ধাযজ্ঞক্রিয়া ক্ষমা।
ভাবশুদ্ধির্দয়া সত্যং সংযমশ্চাত্মসম্পদঃ॥

শান্তিপর্ব্বণি ১৬৭ অধ্যায়ে।

এস্থানেও সেই দয়ার কথা। সুতরাং যতক্ষণ মনুষ্যের মৎস্য-মাংস ভক্ষণে লালসা থাকিবে, ততক্ষণ তিনি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারেন না। যতক্ষণ মনুষ্যের মনে জীবদ্রোহী হওয়া পাপ জ্ঞান না হইবে, ততক্ষণ তিনি ভাগবত ধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারিবেন না। যতক্ষণ মনুষ্যের মন জীবের জীবনে অনুকম্পা প্রদর্শন না করিবে ও তাহার জীবন নাশে চিত্ত না কাঁদিবে, ততক্ষণ মনুষ্য সেই দয়াময়ের অনুগ্রহভাজন হইতে পারিবেন না। হায়! যে দেশে দয়া নাই, মায়া নাই, জীবের জীবনে অনুকম্পা নাই, সে দেশে কত জন্মের পাপে যে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, বলিতে পারি না!

ধর্ম্মের আরও লক্ষণ—

যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।

বৈশেষিক দর্শনে ১ অধ্যায়ে ১ আহ্নিকে-২ সূত্রম্।

যাহাহইতে অভ্যুদয় (ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান) ও মঙ্গলসিদ্ধি হয়, উহাই ধর্ম্ম।

মনুষ্যের মঙ্গল কি? হরিনাম।

পুনরায় ধর্ম্মলক্ষণ বলিয়াছেন—

চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।

মীমাংসাদর্শনে ১ অধ্যায়ে ১ পাদে ২ সূত্রম্।

আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কর্ম্ম ও তদ্দ্বারা যে অর্থসিদ্ধি, উহাকে ধর্ম্ম বলে।

পরমেশ্বরই আচার্য্য।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।

শ্রীভাগবতে ১১। ১৭। ২২।

গুরুরূপী পরমেশ্বরের আদিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম কি? হরিনাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

(৩) বাহুশ্রুত্য=বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন।

যোগ-শাস্ত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

২৬। কর্ম্মযোগ। "এষা তেঽভিহিতা-সাংখ্যে" গীতার এই বচন হইতে কর্ম্মযোগ-আরম্ভ। তাহার উপক্রমে শঙ্করাচার্য্য গীতার শাস্ত্রমূলকত্ব স্থাপনার্থে শাস্ত্রের দুইটী বিভাগ দর্শাইয়াছেন। প্রথমতঃ সাংখ্য-জ্ঞান। ইহারই নামান্তর আত্মজ্ঞান। ইহা সাক্ষাৎ পরমার্থ বস্তুতত্ত্বস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশ, সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, মনো-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির অগম্য এবং সাধননিরপেক্ষ আত্মস্বরূপের জ্ঞান। * ইহাই সর্ব্বো-পনিষৎ-সম্মত শোক-মোহ-জন্ম-জরামরণাদি-জনিত ভবভয়ের সাক্ষাৎ নিবৃত্তির কারণ

২৭। স্বকীয় ও স্বজনবর্গের দেহাদিকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হওয়ায়, তাহাদিগের বধ ও বিচ্ছেদ আশঙ্কায় অর্জ্জুনের হৃদয়ে শোকমোহ জন্মিয়াছিল। ইহা ভগবান বুঝিতে পারিয়া, প্রথমেই তাঁহাকে সাংখ্য-জ্ঞান উপদেশ করিলেন। ইহাই বেদোক্ত দ্বিবিধ ধর্ম্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বিভাগ। ইহাই পরাবিদ্যা এবং 'ব্রহ্মাত্মজ্ঞান'—ব্রহ্মকে আত্মত্বে গ্রহণ।

২৮। শঙ্কর এই প্রথম বিভাগ প্রদর্শনা-নন্তর তাহার দ্বিতীয় বিভাগ বর্ণন করিয়া-ছেন। সেটী কি? না অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান কর্ত্তৃক কর্ম্মযোগের উপদেশ। সে উপদেশ এই—"হে পার্থ! উক্ত সাংখ্যজ্ঞান শ্রবণে যদি তোমার স্বতঃসিদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ না হইয়া থাকে, তবে সাধনসাপেক্ষ কর্ম্মযোগ ও সমাধিযোগ কহিতেছি. শ্রবণ কর। যাহাতে ঈশ্বরার্পিত বেদ-স্মৃতি-বিহিত বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া, গৌণপরম্পরা কর্ম্মবন্ধন (অবিদ্যাপাশ) হইতে মুক্ত হইবে।

২৯। ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ প্রভৃতি এই কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। এ সমস্তই সাধনসাপেক্ষ, মঙ্গলব্যয়ী ক্রিয়ালক্ষণ এবং ভগবানের রূপ-নাম-বিশেষণনিষ্ঠ। এই কর্ম্মযোগের বাহ্য আকার, বেদ স্মৃতি-আগম-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান; কিন্তু ইহার গুহ্য অবয়ব নিষ্কামভাব, কর্ম্মফল ভগবানের চরণকমলে অর্পণ এবং অহৈতুকী-ভক্তিলক্ষণা উপাসনা। শ্রীকৃষ্ণ আত্মজ্ঞানের ক্রম-পরম্পরা-সোপান স্বরূপে অর্জ্জুনকে ইহার উপদেশ দিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য দেখাইয়া দিলেন যে, ইহা বৈদিক ধর্ম্মের দ্বিতীয় (গৌণ) বিভাগ †। অতএব ইহার কোন-টীও গীতার স্বকপোলকল্পিত নহে।

৩০। যদিও বেদাদি-শাস্ত্রবিহিত উক্ত কর্ম্মযোগ বিভাগে সিদ্ধান্ত-বাক্য সকল গীতাতে বিস্তীর্ণরূপে প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু গীতায় বিবৃত সাংখ্যযোগ ও কর্ম্ম-যোগ, এ উভয় বেদভাগের মূলই উপনিষদ্ ও মন্বাদিস্মৃতিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ফলে উপ-নিষদে সাংখ্যযোগের—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের

---

* Direct or objective knowledge of God as animating and illuminating soul.

† This indicates subjective or indirect knowledge of God by performance of religious ceremonies and meditation.

উপদেশই অধিক এবং শ্রেষ্ঠকল্প। তাহা দর্শান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবল এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, গীতার সাংখ্যজ্ঞান-প্রকরণে, যে কতিপয় বচনে (২। ১১-৩০।) সাক্ষাৎ মোক্ষজনক আত্মজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা প্রায়ই শব্দতঃ ও অর্থতঃ কঠোপনিষদের বিবৃত আত্মতত্ত্ব। ফলে সমস্ত উপনিষদেই আত্মজ্ঞানের যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, গীতার কথিত আত্মজ্ঞানেও তাহাই বর্ত্তমান। বলা বাহুল্য যে, এই আত্মজ্ঞানেরই নামান্তর ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব, সাংখ্যজ্ঞান ইত্যাদি। ††

†† কেহ মনে করিতে পারেন যে, গীতার সাংখ্যজ্ঞানটী সম্ভবতঃ সাংখ্যদর্শন হইতে উদ্ধৃত। অতএব গীতা যখন কঠোপনিষৎ হইতে সেই জ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রুতি সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিশেষতঃ যখন "আত্মানং রথিনং" অবধি "সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ" পর্য্যন্ত এই নয়টী শ্রুতিতে প্রায় সাংখ্যদর্শনের ক্রম অবলম্বন পূর্ব্বক "পুরুষকে" (উপাধিমুক্ত আত্মাকে) চরমতত্ত্ব (The end) বলা হইয়াছে, তখন কঠোপনিষৎখানিকে সাংখ্যদর্শনের পরবর্ত্তী বলিতে হইবে। এরূপ সন্দেহ স্থলে আমাদের সিদ্ধান্ত উক্ত অনুমানের বিপরীত; কেন না, কঠ ও অন্যান্য উপনিষৎ সকল সনাতন। তৎসমূহে যেমন পুরুষবহুত্ববাচী শ্রুতি আছে, সেইরূপ পরমাত্মা-ব্রহ্মবাচী শ্রুতিও আছে। তন্মধ্যে সাংখ্যের দৃষ্টি বহুত্বে এবং বহুর কৈবল্যে; আর বেদান্তের দৃষ্টি এক মোক্ষমাত্রে।* তিনিই পরমাত্মা। এই দ্বিবিধ পুরুষই নিরুপাধিক অবস্থায় চরমতত্ত্ব (The end) এবং নামরূপবিশেষণবর্জ্জিত হিয়ায়, সাগর-সঙ্গত নদীগণের ন্যায় "এক-

৩১। আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি বেদ ও স্মৃত্যাদি মূলশাস্ত্রে কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে, এবং কুরু-পাণ্ডবীয় সমর-সময়েও অবশ্য বর্ত্তমান ছিল, তবে ভগবান অর্জ্জুনকে কেন কহিলেন যে, "এই যোগ দীর্ঘকাল বশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তুমি আমার ভক্ত বিধায় তাহা অদ্য তোমাকে কহিতেছি।" এ কথার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে থাকিলেও, "অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাৎ" (শঙ্কর) অনুষ্ঠাতৃ (যজমান) গণের মনেতে ফল-কামনার উদ্ভব হওয়াতে, তাঁহারা কেবল ফলার্থী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের আচরণ নিষ্কাম, ঈশ্বরার্পিত, ভগবদারাধনারূপী ছিলনা। অতএব কথিত হইয়াছে যে, যোগধর্ম্ম নষ্ট হইয়া

এব"। অতএব উপনিষৎ সকল উভয়-দর্শনেরই মূলধন।

Dr. Rajendra Lal Mitra in his—Introduction to the translation of the Chhandogya Upanishad, 1862, (Bibliotheca Indica) says at a foot note (page 24) "Dr. Roer argues the Katha upanishad to be posteror to the Sankhya, because its innumeration of the order of emanations for the absolute spirit accords, to some extent, not entirely, with the order followed by the latter. (But) The Katha has nothing of the scientific precision of the Sankhya, and it would, therefore, be much more natural to suppose that the latter (Sankhya) borrowed from the former (Katha)

গিয়াছে। ভগবান ঐ সকল শাস্ত্রমূলক যোগেরই উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই তাঁহার "ধর্ম্মসংস্থাপন"। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া তিনি তৎপ্রতি লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার এই উপদেশ সকল কেবল শাস্ত্র-শয্যাস্থ মৃত ব্যবস্থারাশির পুনরুদ্দীপন মাত্র। নতুবা শাস্ত্রের অভাব তাৎপর্য্য নহে।

৩২। মূলশাস্ত্র। এইক্ষণে আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপে, উপনিষদাদি কতিপয় শাস্ত্র হইতে—অধিকাংশতঃ কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে, কয়েকটী মূলবিধি প্রদর্শন করিতেছি।

৩৩। কঠোপনিষদে কহিলেন—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি।
তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি॥
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি।
তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি॥
ওমিত্যেতৎ। ২। ১৫

অর্থ। সকল বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করেন, সকল তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করে, সেই পদকে সংক্ষেপে কহি—তিনি ওঁ।

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥"
১। ১৬।

অর্থ। এই অক্ষরই অপরব্রহ্ম, এবং এই অক্ষরই পরব্রহ্ম। এই অক্ষরকেই জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাঁহার তাহাই হয়। (অপরব্রহ্মই হউন বা পরব্রহ্মই হউন।)

তাৎপর্য্য এই যে, ওঁ শব্দ, একই ব্রহ্মের দুই প্রকার ভাবকে বুঝায়। একটী অপর-ব্রহ্মভাব। অন্যটী পরব্রহ্মভাব। যেটী অপর-ব্রহ্মভাব, সেই ভাবে ব্রহ্ম সর্ব্ববেদ-বিহিত যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম্মের কীর্ত্তনীয়। সকল তপস্যা, সন্ধ্যাবন্দনা, যোগাচার এবং দেবার্চ্চনাদির উদ্দিষ্ট। কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ সকল সেই পদকে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সেই ভাবকে ইচ্ছা করিয়া সর্ব্ব প্রকার ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান হয়। এই দুইটী শ্রুতি, গীতার অষ্টম অধ্যায়ের একাদশ বচনের তুল্যার্থবাচী। এই শ্রুতিদ্বয়—সমস্ত যজ্ঞ, তপস্যা, দেবার্চ্চনা এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে ব্রহ্মের সহ সংযুক্ত করিয়াছেন। এই সংযোগই কর্ম্মযোগ। গীতার উক্ত বচনের শাঙ্করভাষ্যে ঐ শ্রুতিদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে।

অতঃপর যেটী পরব্রহ্মভাব, তাহাই বিজ্ঞেয়। উপরিউক্ত কর্ম্মযোগ সমূহ দ্বারা তাহাই কালান্তরে প্রাপণীয়। সেই আত্মজ্ঞান, পর শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। তাহাই মোক্ষ। যথা—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন-
বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে
হন্যমানে শরীরে"। ২। ১৮।

অর্থ। সেই আত্মা জন্মেন না, মরেন না, তিনি অপরিলুপ্তচৈতন্যস্বভাব; তিনি কোন কারণান্তর হইতে উৎপন্ন হন না এবং আপনিও কিছু হন না। অতএব ইনি জন্মবিহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কোন শরীর বিনাশে তিনি বিনষ্ট হন না। তিনি আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম

ও বিকারবিহীন। এই আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শ্রুতটী সামান্ত শব্দ-পরিবর্ত্তনের সহিত গীতার সাংখ্যজ্ঞান-প্রকরণে (১২০) দৃষ্ট হয়। কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের অন্তিম উদ্দিষ্ট যে পরব্রহ্মভাব, তাহাই এই আত্মজ্ঞান। *

৩৪। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ কহিলেন —

তেনোভৌ "কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানাতুবিদ্যাচাবিদ্যাচ। যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা। তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি। খল্বেত স্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি।" (১অঃ। ১ম খঃ ১০ শ্রুঃ।)

অর্থ। ওঁকারই পরাপর ব্রহ্ম। সমস্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, নিত্যনৈমিত্তিক ও যজ্ঞদেবার্চ্চনাদি অনুষ্ঠান এই অক্ষর-প্রতিপাদ্য। ঋত্বিক্ ও যজমান এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন। ফলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এই মন্ত্রে ব্যুৎপন্ন, অপর, যাঁহারা ইহার প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত নহেন, তাঁহারা উভয়েই সমভাবে ইহার দ্বারা ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা পরস্পর বিভিন্ন। ধর্ম্মক্রিয়া, যাহা বিদ্যা (জ্ঞান), শ্রদ্ধা (ভক্তি) এবং উপনিষদ্ (উপাসনা) যোগে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বীর্য্যবত্তর (অধিক ফলদায়ক) হয়। ইহাই ওঁকার রূপ অক্ষর, ব্রহ্মের নিশ্চিত উপব্যাখ্যান। *

এই ওঁকার কেবল মাত্র কর্ম্মাঙ্গ নহেন। ফলে পুরোহিত ও যজমানগণ তাহাই মনে

---

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বেদান্তের "তত্ত্ব সমন্বয়াৎ" সূত্রের এই তাৎপর্য্য লেখেন—"ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয়। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান। যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলে, ইতর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয় ; পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে"। মহাত্মা রাজার এই ব্যাখ্যা উপাদেয়। শাস্ত্রবিহিত যে সকল অনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির জনক, তাহারই নাম "কর্ম্মযোগ"। শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি "সর্ব্বে বেদা" বাক্যের অর্থস্থলে কেবল "সর্ব্ব-বেদান্ত" গ্রহণ করিয়াছেন। ("namely part of the Vedas, the Upanishads"—Bibliotheca Indica Katha Upanishad.)

* "Both, those who are versed in the letter (om) thus deseribed and those who are proficient in mere ritual performances, but know not its exact nature, perform ceremonies, (Question) Since both are entitled to fruition from their capability in ritual works, of what import then is a khowledge of the exact nature of this letter, it being evident that *the succession of cause and effect is invariable and altogather irrespective of the knowledge of such succesion* ; *thus*, the use of myrobolans causes purgation to all, whether apprized of its effects or otherwise ? (Answer) But that cannot apply here ; for "knowledge and ignorance are unlike each other" i e they are distinct in their natures *and cannot lead to a similar fruition* (Bibliotheca Indica, Chhandogya Upanishad, Chap I Sec I verse 10. Footnote by Dr. Rajendra Lal Mitra.)

করেন। এই অক্ষরের মহিমা তদপেক্ষাও অধিক। তাহাই পরব্রহ্মভাব। তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান রূপ উচ্চতম রস। অতএব যে সকল বৈদিক অনুষ্ঠান, এই অক্ষর-প্রতিপাদ্য সেই উদ্দেশ্যটী সহকারে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয়, তাদৃশ ক্রিয়াই অজ্ঞ কর্ম্মীর অনুষ্ঠিত ক্রিয়াপেক্ষা অধিক বীর্য্যবান। "অধিক" শব্দ হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অজ্ঞকর্ম্মীরও ক্রিয়া বীর্য্যবান বটে, যদিও তত নহে। কেননা, স্বেচ্ছাচারী বা ক্রিয়াহীন ব্যক্তি অপেক্ষা অজ্ঞ শাস্ত্রবিহিতকর্ম্মী শ্রেষ্ঠ। (এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র পশ্চাতে দ্রষ্টব্য।)

ছান্দোগ্যের এই শ্রুতি তারতম্যরূপে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মযোগের উপদেশ করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতির "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা" ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্মই এই যে, যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বিদ্যা, শ্রদ্ধা, ভগবদারাধনাদি উদ্দিষ্ট, তাহা সাধারণ লোকের ক্রিয়া হইতে অধিক বীর্য্যবত্তর, তাহা মহামোক্ষের অনুকূল কর্ম্মযোগ। তাহাই গীতার উপদেশ। "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং" প্রভৃতি গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের দশটী বচনে এই শ্রুতির মর্ম্ম বিদ্যমান।

৩৫। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে কহিলেন।—

"আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি।
ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ,
কর্ম্মক্ষয়ে যাতি সতত্ত্বতোঽন্যঃ
(৬ অঃ ৪ শ্রুতি)

যে ব্যক্তি বেদাগমবিহিত সত্ত্বগুণান্বিত ক্রিয়া সকল এবং তদধীভূত স্বকীয় (নিষ্কাম) মনোভাব সকল ঈশ্বরে যোজনা করেন, তাঁহার কোন ক্রিয়াতে স্বার্থ থাকে না; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কৃতকর্ম্মের ফল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মক্ষয়ে তিনি প্রাকৃতিক-পন্থা অতিক্রম করেন---অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ করেন। এই শ্রুতিতে ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মসমস্তকে ঈশ্বরে অর্পণ করিবার বিধি দিয়াছেন। অতএব ইহা কর্ম্মযোগ। গীতার কর্ম্মযোগ প্রতিপাদক বচনসমূহের তুল্যার্থবাচী। *

৩৬। তলবকার-উপনিষদে আছে—

"তস্যৈ তপোদমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনং" (৩৩ শ্রু)

সেই উপনিষৎ (অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) প্রাপ্তির উপায় 'তপঃ' মানসিক কামনা ও

"* তত্ত্বতোঽন্য" শ্বেতাশ্বতরীয় এই বাক্যটীর শঙ্করকৃত ভাষ্য এই, যথা—"কর্ম্মক্ষয়ে বিশুদ্ধসত্ত্বো যাতি ততোঽন্যস্তত্ত্বেভ্যঃ প্রকৃতিভূতেভ্যোঽন্যশ্চাবিদ্যাতৎকার্য্যবিনির্ম্মুক্তাশ্চিৎ সদানন্দাঽদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মত্বেনাবগচ্ছন্নিত্যর্থঃ"। কর্ম্মক্ষয় হইলে পর বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি প্রাকৃতিক তত্ত্বশ্রেণীর---অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিক্রান্ত—অবিদ্যার অতিক্রান্ত—সদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মভাব লাভ করেন। অথবা "তত্ত্বেভ্যো যদন্যদ্ব্রহ্ম তদ্যাতীতি"। তত্ত্বশ্রেণী হইতে অন্য যে ব্রহ্ম, তাঁহাতে গমন করেন। শ্বেতাশ্বতরের "আরভ্য কর্ম্মাণি" প্রভৃতি এই শ্রুতিটী যে সকল গীতাবচনের তুল্যার্থবাচী, তাহা শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা।—"যৎ করোষি যদশ্নাসি" ইত্যাদি ৯ অঃ। "শুভাশুভফলৈরেবং" ইত্যাদি ৯ অঃ। "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি" এবং "কায়েন মনসা" ইত্যাদি ৫মঃ অঃ। গীতাশাস্ত্রে ভাষ্যের সহিত এই সকল বচন পাঠ করিলেই তৎসমস্ত এই শ্রুতির সহ লগ্ন হইবেক।

ইন্দ্রিয়সংযমরূপ তপস্যা, 'দমঃ' বহিরিন্দ্রিয়ের দমনরূপ উপশম, 'কর্ম্ম' অগ্নিহোত্র ও নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ; অতঃপর 'বেদাঃ' বেদাঙ্গ সহিত চারিবেদ, ইহাঁর প্রতিষ্ঠা, এবং সত্য ইঁহার আধার। এই সমস্ত অনুষ্ঠান ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ কামনাশূন্য এবং ব্রহ্মোদ্দিষ্ট কর্ম্মযোগ। যাহা কিছু চিত্তশুদ্ধিকর, তাহা কর্ম্মযোগ।

৩৭। মুণ্ডকোপনিষদে কহিলেন—

"তদেতদৃচাভ্যুক্তং ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া-ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তুচীর্ণং ॥" ১০শ্রু।

এই পরাব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদানের বিধান বেদ-মন্ত্রেতে এইরূপ অভিপ্রকাশিত আছে। যাঁহারা ক্রিয়াবান শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ (অর্থাৎ অপরব্রহ্মেতে অভিযুক্ত এবং পরব্রহ্ম লাভার্থ সচেষ্ট) এবং যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগ্নিতে স্বয়ং হোম করেন, তাঁহাদিগকে এই ব্রহ্ম-বিদ্যা কহিবেক, যাঁহাদের দ্বারা অগ্নিধারণ লক্ষণরূপ বেদব্রত আচরিত হইয়াছে।

সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা ব্রহ্ম-নিষ্ঠার সহিত নিষ্কামভাবে ঈশ্বরারাধনার্থে অগ্নিহোত্র, পিতৃকর্ম্ম ও দেবার্চ্চনাদি কর্ম্মা-নুষ্ঠানে যোগ্য এবং 'শ্রোত্রিয়' (শ্রুতির মর্ম্মজ্ঞ) তাঁহারাই কর্ম্মযোগী। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবেক। তাঁহারা তাহার অধিকারী। এই বর্ত্তমান সময়ে অগ্নিহোত্র অতি বিরল। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নারা-য়ণের সেবা এবং দুর্গোৎসবাদি তাহার অনু-কল্প। তদনুষ্ঠাতৃগণ চিত্তশুদ্ধির যোগে ক্রমে ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন।

৩৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—শিক্ষাবল্লী, ১১শ অনুবাক।

"বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যান্ন প্রমদিতব্যং, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং, কুশলান্ন প্রমদিতব্যং, দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং।"

"প্রাগ্‌ব্রহ্মবিজ্ঞানান্নিয়মেন কর্ত্তব্যানি শ্রৌত স্মার্ত্তকর্ম্মাণীত্যেবমর্থঃ। পুরুষ সংস্কারার্থত্বাৎ। সংস্কৃতস্য হি বিশুদ্ধ সত্ত্বস্যাত্মজ্ঞান মঞ্জসৈ-বোৎপদ্যতে" ইত্যাদি ।১॥

ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে শ্রৌত (বেদ-বিহিত) এবং স্মার্ত্ত (স্মৃতিবিহিত) নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ও যজ্ঞদেবার্চ্চনাদি ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিবে। এখানে ঈশ্বরার্থ নিষ্কাম অনুষ্ঠানই উদ্দেশ্য। কেননা তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে শীঘ্রই ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অভিপ্রায়ে আচার্য্য শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন, যথা—

সত্য হইতে পতিত হইও না, ধর্ম্ম হইতে বিরত হইও না, আত্মরক্ষাদি কুশলকর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না, দেবার্চ্চনা ও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি অনুষ্ঠান হইতে স্খলিত হইও না।

এই সমস্ত বৈদিক উপদেশ নিত্য। এখানে আচার্য্য ও শিষ্যের উল্লেখ ব্যক্তি-পুরঃসর নহে। এই সকল উপদেশ চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত। তৎসমস্তই ঈশ্বরার্থ, সুতরাং নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ।

৩৯। স্মৃতি ও বেদান্তসূত্রেও যোগো-পদেশ আছে।

ভগবান্ মনু প্রথমেই আত্মজ্ঞানরূপ নিবৃত্তিধর্ম্মের উপদেশ করিয়া, পশ্চাৎ তাহার

অঙ্গীভূত সংস্কারাদিরূপ ধর্ম্মশাসন আরম্ভ করিয়াছেন, এবং তদুপক্রমেই নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের অবতারণা করিয়াছেন, যথা—

"কামাত্মতা ন প্রশস্তা নচৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যোহি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ॥"
২। ২॥ মনু।

যজমানের 'কামাত্মতা' অর্থাৎ ফল-কামনা পূর্ব্বক ক্রিয়ানুষ্ঠান করা প্রশস্ত নহে। নিষ্কাম হইয়া আত্মজ্ঞানোদ্দেশে বেদবোধিত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন রহিত হইয়া অন্তে মোক্ষ হয়।

"বৈদিকে কর্ম্মযোগেতু সর্ব্বাণ্যেতান্যশেষতঃ।
অন্তর্ভবন্তি ক্রমশস্তস্মিংস্তস্মিন্ ক্রিয়াবিধৌ॥"
মনু ১২। ৮৭।

বৈদিক কর্ম্মযোগ, পরমাত্ম-উপাসনারূপী। বেদাভ্যাসাদি তাবৎকর্ম্ম ঐ কর্ম্মযোগ—অর্থাৎ ঐ উপাসনার অন্তর্ভূত।

"প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকং॥"
ঐ ৮৮।

স্বর্গাদি সুখপ্রাপ্তিকর বৈদিক কর্ম্মের নাম প্রবৃত্তকর্ম্ম (কাম্যকর্ম্ম) আর মোক্ষ-প্রাপ্তিকর যে বৈদিক কর্ম্ম, তাহাই নিবৃত্ত-কর্ম্ম। গীতার কর্ম্মযোগও নিবৃত্ত কর্ম্ম। বৈদিক কর্ম্ম এই দ্বিবিধ।—

"ইহচামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে।"
ঐ ৮৯॥

ঐহিক-পারত্রিক ফলার্থ যে কাম্য কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাই প্রবৃত্তকর্ম্ম। আর দৃষ্টাদৃষ্ট ফল-কামনারহিত ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস পূর্ব্বক যে বৈদিককর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই নিবৃত্ত-কর্ম্ম।

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥"
মনু ১২। ৯১।

সর্ব্বভূতে পরমাত্মা এবং পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত, এইরূপ জ্ঞানে (ব্রহ্মার্পণন্যায়েন) যাঁহারা জ্যোতিষ্টোমাদি করেন, তাঁহারা আত্মরাজ্য লাভ করেন।

"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্"
ঐ ৯২॥

ব্রাহ্মণ যথোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয়সংযমে এবং প্রণব-উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে বিশেষ যত্নবান হইবেন। "এতচ্চৈষাং মোক্ষো-পায়ান্তরঙ্গোপায়ত্ব প্রদর্শনার্থং নত্বগ্নিহোত্রাদি পরিত্যাগ পরতয়েত্যুক্তং।" (কুল্লুকভট্ট)। এই শাসনটী মোক্ষের অন্তরঙ্গ উপায় প্রদর্শনার্থ উদিত হইয়াছে, নতুবা অগ্নিহো-ত্রাদি কর্ম্মের পরিত্যাগার্থ নহে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে এবং ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাভ্যাসে যত্ন স্থিরতর রাখিয়া, ব্রহ্মার্পণন্যায়ে অগ্নিহো-ত্রাদি বা দেবার্চ্চনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। এ সমস্তই কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগের বন্ধকত্ব নাহি।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও স্বীয় স্মৃতিতে নিম্ন-লিখিত বচনে কর্ম্মযোগের উপদেশ করি-য়াছেন—

"ইজ্যাচারোদমোঽহিংসাদানংস্বাধ্যায় কর্ম্মচ।
অয়ন্তু পরমোধর্ম্ম যদ্‌যোগেনাত্মদর্শম্॥"

যজ্ঞ, আচার, দম, অহিংসা, দান, স্বাধ্যায়, এই সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। কিন্তু এই সমস্তের যোগে যে আত্মদর্শন হয়, তাহাই পরম ধর্ম্ম।

অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ভগবদারাধনাতে উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া, নিষ্কাম ভাবে যখন ঐ সমস্ত অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তৎসমস্ত পরমধর্ম্ম সংজ্ঞা লাভ করে।

মহর্ষি ব্যাসদেবও নিম্নস্থ কতিপয় ব্রহ্মসূত্রে (বেদান্তসূত্রে) কর্ম্মযোগপর বেদবাক্যসমূহের মীমাংসা করিয়াছেন—

"সর্ব্বাপেক্ষাচ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ" (৩ অঃ ৪ পা ২৬)

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান অপেক্ষিত। ফলে তৎসমস্ত ঈশ্বরার্থে অনুষ্ঠিত হইলেই চিত্তশুদ্ধি জন্মে। যেমন গৃহপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অশ্বের প্রয়োজন থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণ পর্য্যন্ত ঐরূপ কর্ম্মের প্রয়োজন। বেদে তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানকে ব্রহ্মবিদ্যার হেতু কহিয়াছেন। শ্রুতিতে আছে "তমেতং (আত্মানং) বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন"। সেই যে এই আত্মা, তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং উপবাসের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াই এই সকল অনুষ্ঠান করেন; অন্য ফল ইচ্ছা করিয়া নহে। সুতরাং এ গুলি কর্ম্মযোগ।

"বিহিত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি।" ব্রহ্মসূত্র ৩। ৪। ৩২। "সহকারিত্বেনচ"। ৩৩। "সর্ব্বথাপিতএবোভয়লিঙ্গাৎ। ৩৪। "অনভিভবঞ্চদর্শয়তি" ॥৩৫॥

ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক দেবার্চ্চনাদি কর্ম্মকাণ্ড পালন করিবেক। তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের সহকারী। শুভকর্ম্মীর মুক্তি হয়, অশুভাচারীর হয় না, উভয় নিদর্শনই বেদে আছে। বিরোচন আর ইন্দ্র, উভয়কেই ব্রহ্মা আত্মজ্ঞান কহিয়াছিলেন। বিরোচন যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবে জ্ঞানপ্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু ইন্দ্র বহু বহু যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেজন্য সহজে জ্ঞান লাভ করিলেন। ধর্ম্মাদি শুভকর্ম্মানুষ্ঠানে মানবের স্বভাব শুদ্ধ হয়। বেদে তাহার 'অনভিভব' অর্থাৎ আদর দর্শাইয়াছেন। এই কয়েকটী ব্রহ্মসূত্র উপলক্ষে "অধিকরণমালা" গ্রন্থে লেখেন— "বিদ্যার্থমনুষ্ঠিতৈঃ কর্ম্মভিরাশ্রমধর্ম্মসিদ্ধাতু"। 'বিদ্যার্থ' ব্রহ্মোদ্দিষ্ট (ঈশ্বরার্থ) যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আশ্রমধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। এই সমস্ত মীমাংসা যে কর্ম্মযোগ-পর, তাহা বলা বাহুল্য।

"সদেব বিদ্যাহেতুঃহি" ৪। ১। ১৮ ব্রহ্মসূত্র।

যে সকল মন্ত্রোপাসনাদি বেদবিহিত কর্ম্ম, ব্রহ্মবিদ্যাকে উৎপন্ন করেন এবং ব্রহ্মবিদ্যাতে (বা ভগবচ্চরণে) উদ্দিষ্ট ও যুক্ত সে সকল কর্ম্মকে জ্ঞান-সাধন (বা চতুর্থী-ভক্তিসাধন) কর্ম্ম বলা যায়, তাহা কাম্য কর্ম্ম নহে; সুতরাং কর্ম্মযোগ। মহর্ষি ব্যাসদেব এই সূত্রটী দ্বারা ইতিপূর্ব্বের উক্ত "তেনোভৌ" প্রভৃতি ছান্দোগ্য শ্রুতির উল্লিখিত যোগধর্ম্মের মীমাংসা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে "অধিকরণমালা" গ্রন্থে এই বচনটী দৃষ্ট হয়।—"কেবলং বীর্য্যবিদ্যা সংযুক্তং বীর্য্যাসত্তরং। ইতিশ্রুতেস্তারতম্যাদুভয়ং জ্ঞানসাধনং"। ক্রিয়াবর্জ্জিত ব্যক্তিগণের অপেক্ষা অজ্ঞকর্ম্মী শ্রেষ্ঠ। তাহার অনুষ্ঠিত ক্রিয়া ঈশ্বরারাধনারূপী না হইলেও, বীর্য্যবান্, কেননা কালান্তরে তাহা শুভ ফল এবং

ক্রমে জ্ঞান উৎপন্ন করিবেই। কিন্তু যে ক্রিয়াগুলির বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) উদ্দেশ্য, সোপাসন-কর্ম্মরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অন্য কর্ম্মীর ক্রিয়া হইতে বীর্য্যবত্তর (অধিক ফলজনক); অতএব শ্রুতিতে নিরূপাসন ও সোপাসন উভয় প্রকার অনুষ্ঠানের জ্ঞান-সাধনত্ব তারতম্যরূপে উক্ত হইয়াছে। সোপাসন-কর্ম্মমাত্রই ঈশ্বরার্পিত বিধায় কর্ম্মযোগ শব্দের বাচ্য। গীতায় কথিত কর্ম্মযোগের ইহাই লক্ষণ।

৪০। সমাহার। এই বর্ত্তমান সময়ে অনেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের অনুসরণ পূর্ব্বক উপনিষৎ, স্মৃতি, বেদান্তের উৎপত্তি-কালের সহিত মহাভারত ও গীতার রচনা-কাল ধরিয়া, ঐ সকল শাস্ত্রের অগ্র-পশ্চাৎ কাল সম্বন্ধে তর্ক করিতে পারেন। কিন্তু আমরা তাদৃশ তর্ক ভালবাসি না। আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, উপনিষৎ সকল অপৌরুষের এবং স্বতঃসিদ্ধ। স্মৃতি সমস্ত বেদমূলক এবং বেদাঙ্গ। "বেদান্ত-দর্শন" উপনিষদের মীমাংসাস্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গীতাতে মনুর প্রাচীনত্ব (৪।১) এবং ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্তদর্শনের) অপরঞ্চ সাংখ্যদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তিতা (১৩।৪) ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং আমরা অন্য তর্ক মানি না। আমাদের মতে যোগোপদেশ সকল নিত্য।

৪১। অতএব ভগবদ্গীতা, অন্যান্য গীতা, মহাভারত, পুরাণশাস্ত্র, স্মৃতি সকল, বেদান্তসূত্র সকল, যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞান-যোগ, ধ্যানযোগ, সমাধিযোগ আদি সম্বন্ধে যত বিধি ও উপদেশ আছে, সে সমস্তই বেদমূলক ও সনাতন। তন্মধ্যে ভগবদ্-গীতার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ বিস্তীর্ণ যোগোপদেশ অন্য কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উক্ত শাস্ত্রসমূহে এবং গীতাতেও সে সকল যোগের কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি নাই।

৪২। এই বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মক্রিয়া সকল দুইভাগে বিভক্ত। বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। তাহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। তন্মধ্যে কোন কোন পদ্ধতি পৌরাণিক মন্ত্রে মিশ্রিত। সামান্যতঃ উভয় প্রকার ক্রিয়াই ব্রহ্মার্পণন্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। কর্ম্মফল শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে, অথবা ক্রিয়াবিশেষে শ্রীকালিকা দেবীর চরণকমলে অর্পণের নাম ব্রহ্মার্পণন্যায়। এই ব্রহ্মার্পণন্যায়টী যেমন বেদ, আগম ও পুরাণের বিধি, সেইরূপ ভগবদ্গীতারও বিধি। ফলে বেদই মূল।

৪৩। তন্ত্রশাস্ত্রে যে কর্ম্মযোগের পদ্ধতি মাত্রই আছে, তাহা নহে। তাহাতে তাহার বিধিও বিদ্যমান। তন্মধ্যে কর্ম্মানু-ষ্ঠানের সম্পূর্ণ প্রণালী, পাত্রসংস্কারাদি ক্রিয়া অতি বিস্তীর্ণরূপে বর্ত্তমান। তদ্ভিন্ন প্রাণায়ামাদি সমাধিযোগ, এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যকরণরূপ যোগের বিধান, তাৎপর্য্য এবং পদ্ধতি সকল ভূরিপরিমাণে আছে।

৪৪। পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বে সাধারণ ভদ্র-লোকদিগের মধ্যে অবশ্য এখনকার মতন গীতাশাস্ত্রের পাঠ ছিলনা বটে; কিন্তু পুরাণ-শ্রবণ, তন্ত্রশ্রবণ এবং ইষ্টদেবার্চ্চনা ও পৈত্র্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সকল ভদ্রগৃহেই দৃষ্ট হইত। অতএব গীতার কর্ম্মযোগ, ধ্যান-যোগ

ও ভক্তিযোগ সকল কার্য্যতঃ আচরিত হইত।

৪২। কিন্তু এই বর্ত্তমান কালে শাস্ত্রজ্ঞানহীন বর্ণাশ্রমাচারলঙ্ঘী নবীন গীতাপাঠীরা কর্ম্মযোগের অর্থস্থলে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে কেবল স্বাভাবিক পুরুষকারকে গ্রহণকরতঃ দেবার্চ্চনাদি কর্ম্মের মস্তকে কুঠারাঘাত করিতেছেন, এবং দেশদেশান্তরে ভ্রমণে ইংরাজিভাষায় বক্তৃতা করিয়া শাস্ত্রার্থবিমূঢ় স্বজাতীয় সভাসমাজে অযথা আদর লাভ করিতেছেন। আশ্চর্য্য কালের গতি! আশ্চর্য্য শিক্ষার ফল!! আশ্চর্য্য বিদ্যাভিমান!!! ইতি।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য।

(প্রথম প্রস্তাব।)

স্রোতস্বতীদিগের মধ্যে যেমন পতিতপাবনী গঙ্গা, তরুবর বৃন্দের মধ্যে যেমন মহামহীরুহ অশ্বত্থ, তেজোময় পদার্থ পুঞ্জের মধ্যে যেমন বৈশ্বানর অথবা গিরিমালা মধ্যে যেমন হিমাচল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সমগ্র পৃথিবী মধ্যে তেমনি পুণ্যময় ভারতবর্ষ মহাদেশ সমুদয় স্থানাপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে পুণ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম। বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন, ধন্য সেই মানব, যাঁহার পুণ্যধাম ভারতবর্ষে জন্ম; ভাগ্যবান সেই মনুষ্যকুলভূষণ পুরুষ, যিনি সুকৃতি-বলে পবিত্রতম ভারতভূমে জন্ম গ্রহণ করিয়া মানবসমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ মহাদেশে জন্মগ্রহণ করা অতীব শ্লাঘার বিষয় ও ঐকান্তিকী সুকৃতির ফল বলিতে হইবে। গরীয়সী ভারতমাতার সন্তান-সন্ততি রূপে জন্ম গ্রহণ করা নিতান্ত গৌরব ও সৌরভের বিষয় বটে, তৎসম্পর্কে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারতবর্ষ মহাদেশে হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করা অধিকতর গৌরব, অধিকতর পুণ্য এবং অধিকতর মহত্ত্বের পরিচয়, ইহা ধ্রুব সত্য। ধন্য সেই পবিত্র পুরুষপুঙ্গব, যাঁহার ভারতে জন্ম; ধন্যতর সেই পতিতপাবন পুরুষশ্রেষ্ঠ, যাঁহার হিন্দুকুলে জন্ম, এবং ধন্যতম সেই জগদ্ভূষণ ও জগৎ-পুরুষশ্রেষ্ঠ, যাঁহার ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম। বাস্তবিক বহুপুণ্যফলে ও নিতান্ত সৌভাগ্যবলে মনুষ্যেরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে অথবা ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবন চরিতার্থ করে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ পুরুষ সদাই পবিত্র ও সদাই পূজ্য, তিনি নরাকারে দেবতা এবং মহাপুরুষরূপে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

শাস্ত্রবেত্তা মহামহর্ষিগণ এই পুণ্যধাম ভারতবর্ষের বহু প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষিবৃন্দের অভিমতে জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, ক্রৌঞ্চ, কুশ, শাক এবং পুষ্কর, এই সপ্তদ্বীপপরিবেষ্টিতা বসুন্ধরা মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।* ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং

* সম্ভবতঃ জম্বুদ্বীপ প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্লক্ষদ্বীপ মিডিয়া দেশ, শাল্মদ্বীপ সিরিয়া, ক্রৌঞ্চদ্বীপ য়িহুদীদেশ (Asia Minor), কুশদ্বীপ চীনরাজ্য, শাকদ্বীপ সিদিয়া, পুষ্কর

সত্যলোক, এই সপ্তবর্গ মধ্যে, শাস্ত্রকর্ত্তা মহর্ষিগণ ভারতবর্ষকে অতি পবিত্র স্থানে সমাবিষ্ট করিয়াছেন এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও প্রতাল, এই সপ্তবিধ পাতালের কর্ত্তা বলিয়া ভারতভূমিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, ভারতবর্ষ সমগ্র জগৎ মধ্যে সম্পূর্ণ আদর্শ মহাদেশ। প্রকৃতির সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য কেবল ভারতবর্ষেই সম্পূর্ণভাবে আছে, এইজন্যই ভারতকে ভৌগোলিকেরা "Epitome of the whole world" (সমগ্র পৃথিবীর সারসংগ্রহ স্বরূপ) কহিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ প্রকৃতির সম্পূর্ণ লীলা-স্থল। অভ্রভেদী অত্যুচ্চ অটল অচল, বহুযোজনব্যাপী বিশাল অরণ্য, উর্ম্মিস্তিত বেলাকুলান্দোলিত মহানদ, কুলু কুলু বাহিনী নদী বা নির্ঝরিণী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরোবর, অত্যুচ্চ মহীরুহ, শোভাময়ী লতা-লতিকা, মন-প্রাণতৃপ্তিকর প্রসূনপুঞ্জ, রসমানন্দ-দায়ক ফল, বহু প্রকারের বিচিত্র ভাষা, বহুপ্রকারের নর-নারী, বহুবিধ বিদ্যা ও কৌশল, নানাবিধ আকৃতি ও প্রকৃতি, বিবিধ প্রকারের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, ভারত ভিন্ন আর কোথাও নাই। ভারতবর্ষ ভিন্ন ষড়ঋতু আর কোথাও ক্রমান্বয়ে নিয়মিতরূপে শোভা ও প্রভাব বিস্তার করে না। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য ঐহিক তত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত ভারতে সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হইয়া গিয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভারতই সম্পূর্ণ লীলাস্থল। শিক্ষার এমন স্থান আর কোথা পাইবে? দেখিবার, শিখিবার, জানিবার, বুঝিবার, পড়িবার, চিন্তা এবং আলোচনা করিবার এমন দেশ আর কোথায়? পৃথিবীর অনেক দেশ-প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিলাম, কিন্তু ভারতবর্ষে যাহা দেখিবার ও শিখিবার আছে, অন্যত্র তাহা কোথায়? সম্পূর্ণ আদর্শ—প্রকৃত মনুষ্য হইবার জন্য যে সব শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা ভারতেই একাধারে বর্ত্তমান। ভারতে যাহা আছে, অন্যত্র সম্পূর্ণভাবে তাহা নাই। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের পূর্ণতা সম্পাদিত হইলে আদর্শ দেহ হয়; হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্পূর্ণতার নাম মন; আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্ণতার নাম আত্মিক সম্পূর্ণতা; সুতরাং পাঠকেরা বুঝিতে পারিলেন, আদর্শ দেহ, আদর্শ মন ও আদর্শ আত্মা-বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম আদর্শ মনুষ্য (Ideal man)। এই সম্পূর্ণ আদর্শের মানব কেবল ভারতবর্ষেই

দ্বীপ মঙ্গোলীয়া হইতে মালয় উপসাগর। তৎকালে এই কয়েকটি দেশ লইয়াই সভ্য জগৎ বর্ত্তমান ছিল। অন্যান্য দেশ অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া প্রাচীনতম ভৌগোলিকেরা এই তালিকার মধ্যে সে গুলিকে ভুক্ত করেন নাই। পুরাকালে জম্বুদ্বীপ অর্থে ভারতবর্ষ বুঝাইত। বর্ত্তমান কালে যাহাকে (কাশ্মীর রাজ্যান্তর্গত) জম্বু কহা যায়, প্রাচীন সময়ে তাহার সঙ্গে আরও ছয়টি প্রদেশ একত্র করিয়া 'ভারতবর্ষ' নামকরণ করা হইয়াছিল। "দ্বীপ" অর্থে দেশ বা প্রদেশ বুঝিতে হইবে। প্রাচীনকালে জম্বুদ্বীপ বা জম্বুপ্রদেশ এই সপ্তস্থানের শ্রেষ্ঠতম ছিল বলিয়া, জম্বুদ্বীপ অর্থে এখনও ভারতবর্ষ বুঝায়। হিন্দুর ক্রিয়াকলাপে "সম্বৎ" কালে "জম্বুদ্বীপে" "ভারত খণ্ডে" এইরূপ শব্দ এখনও উচ্চারিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জন্মিয়াছেন। ভারতভূমি ভিন্ন আর কোথাও আদর্শ মানব জন্মগ্রহণ করেন নাই। রাজর্ষি জনক, রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র, মথুরাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, বীরাধিক বীর অর্জ্জুন, ধর্ম্মকল্পদ্রুম যুধিষ্ঠির, আদর্শ জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা ভীষ্মদেব, ক্ষত্রিয়াধিক ক্ষত্রিয় ঠাকুর লক্ষ্মণ প্রভৃতি অসামান্য পূর্ণাদর্শ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এই প্রাচীন মহাদেশকে পবিত্রতম ও শ্রেষ্ঠতম করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক আদর্শ মানব কেবল ভারতবর্ষেই জন্মিয়াছেন এবং কেবল ভারতেই জন্মিতে পারেন। সম্পূর্ণ আদর্শ উৎপন্ন করিবার জন্য যে গুণ, যে উপাদান ও যে সামর্থ্যের প্রয়োজন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাহা নাই।

ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া আদর্শ হইবার চেষ্টা করিলে, মনুষ্য সহজেই তাহাতে সিদ্ধকাম হইতে পারেন। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিলে ইহা আরও সহজ হইয়া উঠে। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মাপেক্ষা কেবল আদিমতম ধর্ম্ম নহে, পরন্তু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম এবং সম্পূর্ণ আদর্শ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে রীতিমত পালন করিতে শিক্ষা করিলে, মনুষ্য "আদর্শ মানব" হইতে পারেন। এই ধর্ম্ম বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্ম; ইহা মহাসমুদ্রের ন্যায় অসংখ্য রত্নে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর সমুদয় জ্ঞান, সমুদয় বিত্ত-বুদ্ধি, সম্পূর্ণ উন্নতির সম্পূর্ণ উপাদান, এক হিন্দুধর্ম্মেই একত্রভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এমন অপূর্ব্ব গুণশালী ও সামর্থ্যশালী ধর্ম্ম পৃথিবীর আর কোন জাতিতে বর্ত্তমান নাই। হিন্দুধর্ম্ম হইতেই শাখা বা উপশাখারূপে অন্যান্য ধর্ম্মসমূহ নিঃসৃত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম মানবীয় বুদ্ধির বা কল্পনার ধর্ম্ম নহে, ইহা ঐশ্বরিক; এইজন্য ইহা সনাতন ও শাশ্বত। প্রখ্যাতনাম্নী মাদাম ব্লাভাট্‌স্কী কহিতেন "Blessed be the man who calleth himself a Hindoo" ধন্য সেই মানব, যিনি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন।

অতীব পুণ্য বলে যেমন ভারতে জন্ম লাভ হয়, পুণ্যাধিক পুণ্য বলে যেমন হিন্দুকুলে জন্ম হয়, তেমনি জন্ম-জন্মান্তরীণ অগণ্য সুকৃতি-ফলে ভারতবর্ষবাসী এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের বংশে মনুষ্যের জন্ম হইয়া থাকে। প্রকৃত কথা এই, অতীব পুণ্য প্রভাব না থাকিলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করা অথবা ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। তপঃপ্রভাবে, পুণ্য-প্রভাবে ও সুকর্ম্ম-ফলে অ-ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন এবং কুকর্ম্ম-ফলে ব্রাহ্মণও জন্মান্তরে জঘন্য চণ্ডাল বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহার লক্ষ লক্ষ অকাট্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। কেবল জন্মান্তরে কেন, ইহ জন্মেই অনেক ব্রাহ্মণকুল-কলঙ্ক পাপাত্মা, চণ্ডাল অপেক্ষাও জঘন্যতর অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করা যায়। শাস্ত্রকর্ত্তারা এই জন্যেই কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ যাঁহাতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম বিশুদ্ধাকারে বর্ত্তমান, তিনিই পবিত্র ও পূজ্য এবং নমস্য। কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ কাহারও নমস্য নহে। ইহলোকে ইহাও দেখা যায়, অনেক অ-ব্রাহ্মণ পুণ্য-প্রভাবে ও ধর্ম্ম-বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া

সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণেরও নমস্ত হইয়া উঠিয়াছেন! পুরাকালেও বহুসংখ্যক অব্রাহ্মণ, তপোবলে, পুণ্য-বলে এবং সুকর্ম্ম-ফলে ব্রাহ্মণ জাতি-মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছিলেন, ইহারও শত সহস্র পৌরাণিক বৃত্তান্ত বর্ত্তমান আছে। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাপক মহোদয়েরা সর্ব্ব প্রথমে পরমহংসকে সর্ব্বোচ্চতম্ স্থান দান করেন। তাঁহাদের মতে, যিনি প্রকৃত পরমহংস, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। তিনি আদিতে যে কোন জাতি বা যে কোন বর্ণের লোক হউন না, প্রকৃত পরমহংস সকলেরই পূজ্য ও নমস্ত। তিনি আদিতে অব্রাহ্মণ থাকিলেও, ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত পুরুষ ও রমণীর পূজ্য এবং নমস্ত। পরমহংসের নিম্নে সন্ন্যাসীর স্থান; ইঁহারও পৈত্রিক জাতি বা বর্ণের বিচারের প্রয়োজন নাই; ইনিও গৃহী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পূজ্য এবং নমস্ত। তৃতীয়তঃ ব্রহ্মচারী ও যতি। অধুনা সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের প্রায় পার্থক্য নাই। যাহাহউক, এই তিন শ্রেণীর মহাপুরুষের নিম্নে (গৃহস্থ) ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; মহোত্তম, উত্তম, অধম এবং অধমাধম। যাঁহারা সদ্-ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সহিত শ্রদ্ধাচারে ব্রহ্মচর্য্যাদির বহু সুনিয়ম প্রতিপালন করেন এবং সচ্চরিত্রতার সহিত বিশুদ্ধরূপে হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করেন, এবম্প্রকার সাত্ত্বিক, সদাচারী, সাধুচেতা ও বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ মহোত্তম ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। যাঁহারা সদ্-ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ করিয়া, সাধারণ ভাবে বিদ্বান ও সাধারণ ভাবে শাস্ত্রাভিজ্ঞ, কিন্তু সদাচারী, সচ্চরিত্র ও সৎস্বভাবসম্পন্ন এবং ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের প্রতিপালক, তাঁহারা উত্তম ব্রাহ্মণ। যাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে ও ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছেন এবং উপবীত ধারণ করেন, অথচ কোন গুণ, কোন বিদ্যা বা কোন সামর্থ্য নাই, এমন ব্রাহ্মণগণ কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ; ইঁহারা অধম ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত। আর যাহারা ব্রাহ্মণ-বংশীয় হইয়া চৌর্য্য, হিংসা, সুরাপান, পরস্ত্রী-গমন, বেশ্যাগমন, প্রবঞ্চনা, অসত্য-কথন, মূর্খতা, ম্লেচ্ছতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট, এবম্প্রকার জঘন্য ব্রাহ্মণগণ অধমাধম ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য। ইহাদের অপেক্ষা অতি নিম্ন জাতীয় ধার্ম্মিক, সদাচারী ও সদ্‌জ্ঞানী পুরুষও শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠতর। অধম ও অধমাধম ব্রাহ্মণ বৃন্দকে নমস্কার বা প্রণাম না করিলেও, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের অপরাধ হয় না। জ্ঞান, ভক্তি ও শৌচহীন ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা উপেক্ষার যোগ্য। ভগবান কহিয়াছেন—

"ভক্তিহীনে আমি ব্রাহ্মণেরও নই।
ভক্তিতে ডাকিলে চণ্ডালেরও হই॥"

দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার নাম শৌচ। কেবল বস্ত্রের বা গাত্রের মলিনতা পরিহার করার নাম শৌচ নহে। শৌচাচার ও সাত্ত্বিক-ব্যবহার দ্বারা দেহের নির্ম্মলতা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা মনের নির্ম্মলতা এবং পূজা, তপ, জপ, সাধনা, পুণ্য-কর্ম্ম ও সচ্চরিত্রতা দ্বারা আত্মার নির্ম্মলতা সাধন করাই পূর্ণ শুচিতা। যিনি বলেন, "আমি শূদ্রের বাটীর জল পর্য্যন্ত পান করি না অথবা শূদ্রের হস্তের দান গ্রহণ করি না

কিম্বা ম্লেচ্ছাদির ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করি না এবং প্রতিদিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান করি" তিনি যদি মিথ্যা কথা, সুরাপান, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পাপে লিপ্ত থাকেন, তিনি কদাচ শুচি পুরুষ নহেন। শাস্ত্রে শৌচ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অসংখ্য উৎকৃষ্ট উপদেশ নিহিত আছে। একটি প্রাচীন বাঙ্গালা প্রবাদ-পত্র এই—

"শুচি হয়ে মুচী হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে।
মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে॥"

এস্থলে "শুচি" শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। "কৃষ্ণ ভজে" শব্দের লক্ষণার্থে সদাচার, সাত্ত্বিকতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, সচ্চরিত্রতা ও তত্ত্বজ্ঞান এবং ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তি। ইহার বিপরীত হইলেই "কৃষ্ণ ত্যজে" কহা যায়। ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থপর্য্যটন, দয়া, ঋজুতা, লোভ-ত্যাগ, যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, এই গুলি ব্রাহ্মণের সাধারণ ধর্ম্ম। বেদাভিজ্ঞতা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের বিশেষত্ব। যিনি সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিতে না পারেন, বেদের কিয়দংশও তাঁহার পক্ষে জানা আবশ্যক। যিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নহেন, তিনি অব্রাহ্মণ; তাঁহার কৃত ক্রিয়া-কলাপাদি অশুদ্ধ, অগ্রাহ্য ও অপ্রয়োজনীয়। ব্রহ্মচর্য্য পালন করা প্রত্যেক ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। যে কোন স্থানে বা যে কোন অবস্থায় ব্রাহ্মণ অবস্থান করুন, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেই হইবে; তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য। গৈরিক বসন ধারণ করা অথবা স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করার নামই ব্রহ্মচর্য্য নহে। স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করা ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান নিয়ম বটে, কিন্তু এস্থলে ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থে স্থূলতঃ শুদ্ধতা, সাত্ত্বিকতা ও সচ্চরিত্রতা বুঝাইতেছে। বৈধ স্বদারসেবা গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য-বিরোধী নহে। পদে পদে মনুষ্যকে পাপপঙ্কে নিপতিত হইতে হয়; যদ্দ্বারা নিশ্চয় পাপক্ষয় হয়, তাহারই নাম প্রায়শ্চিত্ত। যাবতীয় স্মৃতিশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বহুল ব্যবস্থা আছে; সেই সমস্ত ব্যবস্থারই মূল উদ্দেশ্য তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্য।

"দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥"

মনুষ্যের বীর্য্য মনুষ্যের দেহ-রাজ্যে অধিপতি। এক বিন্দু বিশুদ্ধ শুক্র সহস্র বিন্দু বিশুদ্ধ শোণিতের সমতুল্য। বীর্য্যক্ষয়ে দেহ, মন ও আত্মার অবনতি হয়; সুতরাং ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। শাস্ত্রমতে বিবাহিতা সহ-ধর্ম্মিণীতে যথানিয়মে উপগমন পাপ বা অপরাধ বা ব্রহ্মচর্য্যব্যাঘাতক নহে; তদ্ভিন্ন অষ্টবিধ স্ত্রীগমন মহাপাপ বলিয়াই গণ্য। কেবল যে স্ত্রীলোকে উপগত হইলেই 'মৈথুন' হয়, তাহা নহে; যুবতী রমণীর রূপ দর্শন করিবা মাত্র যদি বীর্য্যক্ষয় হয়, রমণীর রূপ-গুণাদির বর্ণন বা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে যদি বীর্য্যক্ষয় হয়, সুরত-সঙ্কল্পেও যদি শুক্রক্ষয় হয়, তাহাও মৈথুন এবং পাপ-জনিত মৈথুন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমেতদেবাষ্টলক্ষণম্॥"

শাস্ত্রকর্ত্তারা ব্রহ্মচর্য্যকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ন তপস্তপ উচ্যতে ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্"।

যাহাহউক, সর্ব্ববিধ অমঙ্গলজনক ও সর্ব্ববিধ পাপ ও অপরাধজনক কর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ; কিন্তু নিম্নলিখিত পাপগুলির জন্ত ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও পাপ হইতে মুক্ত হয়েন না। নিম্নলিখিত পাপে অভিযুক্ত হইয়া পাপী বলিয়া প্রমাণীত হইলে, তদ্দণ্ডে ব্রাহ্মণকে "পতিত" জ্ঞান করা উচিত এবং তাহার সহিত সর্ব্ববিধ সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। যে কেহ তাহা না করে, সে ব্যক্তিও অব্রাহ্মণ এবং পতিত বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ঐ সমস্ত দুরপনেয় পাপের তালিকা—গোহত্যা, গোহত্যার সহায়তা, গোমাংসভক্ষণ বা বিক্রয় অথবা জ্ঞানপূর্ব্বক স্পর্শ করা, অহিন্দুকে গাভী বা বলদ কিম্বা বৎস বিক্রয়, শূকরমাংস ভক্ষণ, গোখাদকের সহিত একত্রে আহার অথবা তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন, ম্লেচ্ছ-গৃহে অবস্থান এবং তাহার সহিত ভোজন, ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট স্পর্শন, ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্নাদি আহার, সুরা-বিক্রয়ের ব্যবসায়, চুরি বা ডাকাইতিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, বেশ্যা-গৃহে অবস্থান ও তাহার অন্নাহার, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নাস্তিকতা। শাস্ত্রকর্ত্তারা লিখিয়াছেন, চৌর্য্য, মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, ম্লেচ্ছাচার, বেশ্যাসক্তি, সুরাপান, শাস্ত্রনিন্দা, পরনিন্দা, ঈশ্বরে অবিশ্বাস এবং অ-হিন্দু ব্যবহার ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কঃ পন্থা ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

স্বাধীনতা-বিশ্বাস কৃত্রিম।

মানুষ অহঙ্কার-বশে যে স্বাধীনতার এত বড়াই করে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষ সেই স্বাধীনতায় তিল মাত্র বিশ্বাস করে না। জীব স্বাধীন, ইহা যদি হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে মানুষ বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে এই বিশ্বসংসার অচল হইত। কাহারও কার্য্যাকার্য্যে কাহারও বিশ্বাস স্থাপন করিবার স্থল না হওয়ায়, কোন বিষয়েই মানুষ নিশ্চলবুদ্ধি হইতে পারিত না। পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার স্নেহ-মমতার অনিশ্চয়তা জন্ত কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিত না। মানুষ মাত্রেই কার্য্যকারণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। বিনা কারণে কোন কার্য্য হইতে পারে, কিম্বা অবাধ কারণ বিদ্যমানে কার্য্য হইল না, ইহা কেহই বিশ্বাস করে না—করিতে পারে না। জেদের মুখে যে যাহাই বলুক, পক্ষপাতশূন্ত হইয়া স্থির মনে ধীরভাবে কেহই ইহা বিশ্বাস করে না যে, উপযুক্ত কারণ ব্যতীত যে সে যা তা একটা ইচ্ছা করিতে বা কার্য্য করিতে পারে। যিনি যে কোন কার্য্যই করুন, তিনি হয় ইচ্ছাপূর্ব্বক, না হয় অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে সে কার্য্য করেন। জ্বরের চমকে কিম্বা হিষ্টিরিয়ার ধমকে লোকে অজ্ঞানে যে হাত-পা ছোড়ে, বা প্রলাপ আলাপ করে, তাহা যে রোগীর স্বাধীনতার জ্ঞাপক নহে, তাহা বোধ করি

সকলেই বুঝে। তাহার পর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের হঠাৎ আক্রমণে লোকে জ্ঞানশূন্য হইয়া যে সকল কার্য্য করে, তাহাও কর্ত্তার ঠিক স্বাধীনতার পরিজ্ঞাপক নহে। মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া নেশার ঝোঁকে লোকে যে সকল কার্য্য করে, সে গুলিকেও কর্ত্তার স্বাধীনতার পরিচায়ক বলিয়া তোমরা স্বীকার কর না। কেবল শুটিকত স্থলে, তুমি সজ্ঞানে ও সজাগে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিয়া, পরে যে কার্য্য কর, সেই সকল কার্য্য তোমার স্বাধীনতার কতদূর পরিচয় দেয়, তাহার বিচার করা যাউক্।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারপূর্ব্বক কৃত কার্য্যকে যদি তুমি তোমার স্বাধীনতার প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত কর, তাহা হইলে তদ্দ্বারা বরং তোমার স্বাধীনতা পরাধীনতায় পরিণত হইবে। কারণ বিচারে কার্য্যাকার্য্যের যে পক্ষের জয় হইয়াছে, তোমার কার্য্য যে সেই পক্ষের অধীনতায় কৃত হইবে, বা হইয়াছে, তাহা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না। ফলকথা, বিনা উদ্দেশ্যে জ্ঞানপূর্ব্বক কেহ কোন কার্য্য করে না। আপনার শক্তি-সামর্থ্যের অভাবে, কার্য্য সম্পাদনে কৃতকার্য্য হউক বা নাই হউক, সকলেই একটা না একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য করিয়াই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, এবং সকলেরই ইচ্ছা যে উদ্দেশ্য দ্বারা শাসিত হয়, তাহাও স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোহপি প্রবর্ত্ততে।"

বিনা উদ্দেশ্যে কেহ আপনার অনিষ্টও করে না! আমাদের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা আবার দেশ-কাল-পাত্রগত শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, ধর্ম্ম কর্ম্মাদি বহু অবস্থা দ্বারা অনুশাসিত হয়। এতদূর যে, একজনের শিক্ষা-দীক্ষাদি বিষয় জানিতে পারিলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার কার্য্যাকার্য্যের একটা চলনসহী আভাস পূর্ব্বেই আঁচিয়া রাখিতে পারেন। তুমি গোঁড়া বৈষ্ণব, সুতরাং আমিষ ভক্ষণে তোমার রুচি সহজে হইবে না; তিনি প্রকৃত শাক্ত, সুতরাং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মদ্য-মাংসের উপরও কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়। মার্কিন মুলুকে মার্কিন সাহেবের সহিত রেলের এক কামরায় যাইতে বাঙ্গালির ভয় নাই, কিন্তু ভারতে ফিরিঙ্গির সহিত একই কামরায় যাওয়া বাঙ্গালির পক্ষে নিরাপদ নহে। আজ কাল 'স্বরাজ্য' কথাটা যথা তথা শুনা যাইতেছে, যে সে কাগজে পড়া যাইতেছে, কিন্তু কন্‌গ্রেসের দ্বাবিংশতিতম অধিবেশনের পূর্ব্বে অভিধান ভিন্ন একথাটার স্থান দেখা যায় নাই, কেন বল দেখি?

ফলতঃ বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না এবং কারণ উপস্থিত হইলে, তন্নিষ্পাদ্য কার্য্য হইবেই হইবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা কখনও স্বাধীন নহে। যাহারা দেখিবার—শুনিবার—বুঝিবার শক্তিহীনতা জন্য কারণকে দেখিতে শুনিতে জানিতে পারে না, তাহারা কর্ত্তার অন্তরগুহানিহিত—সুতরাং 'অদৃষ্ট' কারণকে দেখিতে না পাইয়া বাহ্যিক কর্ত্তাকে স্বাধীন মনে করিয়া থাকে। বস্তুতঃ বাহ্য কর্ত্তার হৃদয়গুহাস্থিত মহাপুরুষই প্রকৃত কর্ত্তা। তিনিই অধিষ্ঠান-পাত্রের দেহ-সন্নিবিষ্ট হইয়া, জন্মাবধি মৃত্যু

পর্য্যন্ত জীব দ্বারা তাঁহার আপনারই মত কার্য্য করাইয়া লইতেছেন ; অথচ—

"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"

দণ্ডবিধির সাক্ষ্য।

তুমি মনে করিতে পার যে, যদি জীবাত্মার কোন প্রকৃত স্বাধীনতা—স্বেচ্ছাচারিতা না থাকে, তবে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, এসকল কি জন্য? মানুষের স্বাধীনতা না থাকিলে, গবর্ণমেণ্টই বা দণ্ড বিধান করেন কেন? এ যে "রাবণ-অপরাধে জলধি-বন্ধন।" যে স্বেচ্ছায় করে বা করায়, তাহার কিছুই হয় না, যে বাধ্য হইয়া করে, তাহারই সকল কর্ম্মভোগ!

আশঙ্কা অমূলক। কারণ, স্বেচ্ছাচারিতা প্রকৃত হইলে, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক বা পুরস্কার-তিরস্কার নিরর্থক। গতানুশোচনা নিষ্ফল। লোকে দুষ্কার্য্য করিলে তাহার শাস্তি দিতে হইবে এবং সুকার্য্য করিলে তাহার পুরস্কার দিতে হইবে, স্বর্গ নরক-শাসনের লক্ষ্য তেমন গতানুশাসন নহে। পরন্তু ভবিষ্যকার্য্যানুশাসন। শাস্তির ভয়ে এবং পুরস্কারের লোভে লোক দুষ্কার্য্য না করিয়া সৎকার্য্য করিবে, এই উদ্দেশেই পাপ-পুণ্য, নিন্দা-স্তুতি, তিরস্কার-পুরস্কারের ব্যবস্থা। রাজবিধানেরও মূল উদ্দেশ্য ততটা অগতিকার্য্য অতীতের প্রতিকার নহে; পরন্তু নিবার্য্য ভবিষ্য বিশৃঙ্খলতার নিবারণ। খুনের বদলে খুন করিব কেন? যে খুন হইয়াছে, সে কি তাহাতে বাঁচিবে? না—খুনিকে প্রাণদণ্ড দিয়া, ভবিষ্যহননেচ্ছু গণকে নিরুৎসাহ করার জন্যই খুনের বদলে খুনের ব্যবস্থা।

রাজশাসনের ভয়ে মনুষ্যসমাজের দুর্দ্দমনীয় দুষ্প্রবৃত্তির দমন হইতে পারে, এই বিশ্বাসে দণ্ডবিধির ব্যবস্থা। পরলোকে দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এই ভয়েই মানুষ পাপ করিতে ইতস্ততঃ করিবে, এই উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রের শাসন। সুতরাং নর-নারীর স্বাধীনতার উপর ধর্ম্মশাস্ত্র বা রাজবিধানের ভিত্তি রচিত নহে; পরন্তু পরতন্ত্রতা দ্বারা সংগত দৃঢ় বিশ্বাসভূমির উপর ধর্ম্ম ও রাজশাসন সংস্থাপিত।

ব্যবসায়-বাণিজ্য-জগতের বিশ্বাস।

মনুষ্যসমাজের অন্য দু কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য কর। সুবিধা পাইলে লোকে এই পথেই গতায়াত করিতে প্রলোভিত হইবে এবং আমার যথেষ্ট অর্থ লাভ হইবে, এইরূপ হিসাব করিয়াই ধনী অকাতরে তাহার ধনরাশি ঢালিয়া দিয়া, স্থলে লৌহবর্ত্ম এবং জলে ধূমতরী রাখিয়াছে। শত মুদ্রা পাইলেও তুমি আমি যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই না, মাত্র একটী পয়সা লইয়া সুচতুর সেই কার্য্যটী করিতেছে। শত মুদ্রায় যে কার্য্য হয় না, তাহা এক পয়সায় হইতে দেখিলে, লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসিয়া আমার সাহায্যার্থী হইবে, আর "দশের লাঠী একের বোঝা" নীতিমূলে দেশের টাকা ঝাঁড়ু দিয়া লইতে পারিব; এই হিসাব করিয়াই গবর্ণমেণ্ট পত্র-প্রতি এক পয়সা লইবার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ডাক ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ফলতঃ এই জগতে কোথাও কাহারও স্বাধীনতা নাই। বৃক্ষশাখা হইতে পক্ক ফলটী মাটিতে পড়িল; অজ্ঞ শিশু যে, সে ভাবিতে

পারে যে, ফলটী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মাটিতে পড়িল! মাংসাবৃত বড়ীস গিলিয়া, যন্ত্রণায় মৎস্য ছটফট্ করিতেছে. অজ্ঞ বালক ভাবিল যে, মাছটী স্বেচ্ছায় কাঁটা গিলিয়া কার্য্যটা ভাল করে নাই। কিন্তু বিজ্ঞ শাস্ত্র যাঁহারা, তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, মাধ্যাকর্ষণ ফলটীকে টানিয়া পাড়িয়াছে, তাই ফলটী মাটিতে পড়িয়াছে। মাংস-গন্ধ মৎস্যকে মোহিত করাতেই মৎস্য সুধাভ্রমে গরল খাইয়াছে।

অদৃষ্টবাদ অলসের সহায় নহে।

তুমি হয়ত পুরুষকার হারাইবার আশঙ্কায় অদৃষ্ট মহাজনের নির্দ্দেশ মত কার্য্য করার বিশ্বাসকে অলস ব্যক্তির মানসিক বিকার মনে করিতেছ। তুমি অহঙ্কার বশতঃ অদৃষ্টবাদকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছ। তোমাকে অপরিণামদর্শী কতকগুলি ব্যক্তি বুঝাইয়াছে যে, অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করিলে, মানুষ ক্রমে অলস—উদ্যমহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য সত্যই অদৃষ্টবাদ বুঝে এবং বুঝিয়া সুঝিয়া অদৃষ্টবাদ মানে, সে কখনই অলস ও উদ্যোগহীন হয় না। বরং যে ব্যক্তি অদৃষ্ট মানে না, ভ্রান্ত পুরুষকারের সেবা করে, সেইই অলস উদ্যোগহীন হইয়া থাকে। আসল কথা এই যে, জগতে কেহই স্বাধীন নহে—তা সে অদৃষ্টবাদই মানুক আর স্বাধীন পুরুষকারই মানুক। যে ব্যক্তি অলস উদ্যোগহীন হয়, সে অদৃষ্ট-কারণাধীনতাতেই তেমন হয় ভিন্ন অদৃষ্ট মানে বলিয়া নহে। তেমনই উদ্যোগী পুরুষও—স্বেচ্ছাবশতঃ নহে, প্রত্যুত অদৃষ্টকার্য্যাধীনই নিরলস হয়। অদৃষ্টে সত্য সত্যই বিশ্বাস থাকিলে, লোক অলস না হইয়া বরং উদ্যোগী হয়; আর অদৃষ্টে বিশ্বাস হারাইয়াই লোক নিরুদ্যোগী হয়। আপাততঃ কথাটা অসম্ভব মনে হইতে পারে; কিন্তু তা নয়। ঘোর অদৃষ্টবাদী দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের জীবন ইহার দৃষ্টান্ত। উপযুক্ত কারণ বিনা কোন কার্য্য হয় না। সুতরাং যাহার M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সঙ্কল্প প্রবল হইয়াছে, তাহাকে M. A. পাস করিবার যোগ্যতা লাভের জন্য যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার সকলগুলি আয়ত্ত করিতে হয়। কারণ সে বুঝে যে, যোগ্যতা লাভ ব্যতীত, উপযুক্ত কারণ ব্যতীত, তাহার M. A. পাস্ করা ঘটিবে না। ফলতঃ M. A. পাস্ করার উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকিতে, অদৃষ্টবাদী কখনও অলস বা পাঠে উদাসীন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, স্বাধীনতায় যাহার পূর্ণ বিশ্বাস, ইচ্ছা মাত্রেই যে হাসিতে খেলিতে—যে সে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, সে কেন M. A. পাস্ করার জন্য বৃথা আয়াস স্বীকার করিবে? অদৃষ্টবাদী জানে, বিবাহ না করিলে পুত্র-মুখ দর্শনের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং পুত্র মুখ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে কখনও বিবাহে উদাসীন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, পুরুষকারে পূর্ণ বিশ্বাস যাহার, সে ইচ্ছা মাত্রই পুত্রপ্রাপ্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বিবাহে উদাসীন হইতে পারে!

ফলকথা, এই মায়াময় জগতে কোথাও কাহারও স্বাধীন পুরুষকার নাই। জগতে কোটী কোটী জড়াজড় পদার্থের মধ্যে তুমি-আমি-তিনি নগণ্য এক একটী। কোটী কোটীর সংশ্রবশূন্য হইয়া কি তোমার—

আমার—তাঁহার তিষ্ঠিবার সম্ভাবনা আছে? জগতে লৌকিক হিসাবে যে টুকুকে আমি 'আমার' বলি, তাহাও পরমার্থতঃ আমি বা আমার নহে। বুঝিবার ভুলে সেগুলিকে আমার বলি বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার সেই সর্ব্বস্বধন জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়-সম্পন্ন এই দেহটী, আদৌ আমার নিজের নহে। ইহার মালমসল্লার সংস্থাপন ও সংরচনার উপর আমার কোন কর্ত্তৃত্ব ত ছিলই না, পরন্তু আমার vote বা মতামতও কেহ লয় নাই। এ হেন গৃহে যে আমি বাস করিতে আসিয়াছি, ইহাও যে আমার ইচ্ছানুযায়ী, তাহাও নহে। কেহ ঘাড়ে ধরিয়া আমাকে এই পিঞ্জরে ভরিয়াছে, ইহা জোর করিয়া বলিতে না পারিলেও, ইহা নিশ্চয় যে, আমি ইচ্ছা বা সাধ করিয়া এ কারাগারে আবদ্ধ হই নাই। আমি এই গৃহে আবদ্ধ হইবার পর হইতে ইহার যে অপচয়-উপচয় হইয়াছে—হইতেছে, যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহা আমার স্বায়ত্ত শাসনাধীন নহে। এক কালে আমার দেহে দন্ত ছিল না, ক্রমে দন্ত উঠিয়াছে। আমার ইচ্ছানিচ্ছায় দন্তোদ্গমের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। এক সময়ে এরূপ দাড়ী-গোঁফ ছিল না, আমার ইচ্ছানিচ্ছার প্রতীক্ষা না করিয়া আপনা আপনি দাড়ী-গোঁফ হইয়াছে। মাথার কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল; এখন শাদা হইতে আরম্ভ করিয়াছে; কত নিষেধ করি, সে নিবারণ মানে না। তবু বলিতে ছাড়ি না যে, দেহ আমার! আমার দেহ আমার কথা রাখে না, দেহের কবে কোথায় কি করিয়া কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহারও সকল গুলির খোঁজ খবর রাখি না, তবু বলি যে দেহ আমার!

দেহকে ছাড়িয়া তোমার মনের কার্য্যাকার্য্যও একবার সমালোচনা কর দেখি। তোমার স্মৃতি-বিস্মৃতি কি তোমার ইচ্ছাধীন? তোমার মন সর্ব্বদাই সুখ চায়, কিন্তু কর্ম্মদোষে এত দুঃখের আমদানি হয় কেন? পুত্রের মৃত্যুসংবাদে তুমি কান্দিয়া আকুল হইতেছ কেন? তোমার মৃত পুত্র কান্দিতেছে না—তুমি কান্দিয়া আকুল হইতেছে কেন? তোমাকে কেহ মারে নাই, ধরে নাই, তুমি কান্দ কেন? পুত্রের মৃত্যুসংবাদে সুখী হইতে ইচ্ছা না করিয়া তুমি দুঃখিত হইতেছ, ইহা কি তোমার স্বাধীনতার প্রমাণ?

লাল ন্যাকড়া দেখিলে মহিষাসুর ক্ষেপিয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, তোমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলে তুমি মহিষের অধিক ক্ষেপিয়া যাও কেন? তোমার পদে আমার মাথাটা ঠেকাইলে তুমি বড় তুষ্ট হও, কিন্তু তোমার মাথায় আমার পাখানি ছোঁয়াইলে তুমি এত রুষ্ট হও কেন? তুমি দিগম্বর হইয়া জন্মিয়াছ, দিগম্বর হইয়া স্বর্গারোহণ করিবে, তবে আজ দিগম্বর হইয়া চলাফেরা করিতে পার না কেন? নির্দ্দয় নির্ম্মম দুরন্ত জগাই-মাধাই কি আপন খুসীতেই পরম বৈষ্ণব হইয়াছিল? তুমি তাহাদের এই শুভ পরিবর্ত্তনকে শতমুখে প্রশংসা করিয়াও কেন তাহাদের অনুকরণে উদ্যোগী নহ? কেন বল দেখি—তোমার মহাজন এখনও তোমাকে সে পথে লইতেছেন না?

মহাজনাধীনতা স্বেচ্ছাচার নয়।

তুমি হয়ত মহাজন-প্রদর্শিত পথে গমন করিতে বাধ্য থাকার বিধানকে একরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবে, এবং মনে মনে ভাবিবে যে বহুত্বাপবাদ জন্য যদি বেদ স্মৃতি সদাচার পথ অনিশ্চিত—সুতরাং অগম্য হয়, তাহা হইলে জনে জনে বহু মহাজন হওয়ায়, কে কোন্ মহাজনের নির্দ্দেশ মতে চলিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা থাকে না; অতএব কার্য্যক্ষেত্রে ঐরূপ মহাজন-নির্দ্দিষ্ট পথে গমন অসম্ভব ব্যাপার।

এ আশঙ্কা অমূলক এবং অজ্ঞান-সম্ভূত। বস্তুতঃ মহাজন-নির্দ্দিষ্ট পথই একমাত্র পথ—যাহার সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে না। বেদ-স্মৃতি ইত্যাদি বহুত্বাপবাদদুষ্ট, কিন্তু মহাজন স্বাধিষ্ঠান-পাত্র সম্বন্ধে একই। সেই জন্য শ্লোকের বেদাদি পদ বহু বচনান্ত এবং মহাজন পদটী এক বচনান্ত। যেমন সকলেই কর্ণে শুনে, চক্ষে দেখে, কিন্তু কেহই পরের চক্ষে দেখে না, পরের কর্ণে শুনে না, তেমনই সকলেই নিজ নিজ হৃদয়-গুহাস্থিত মহাজনের নির্দ্দেশ মতই কার্য্য করে ভিন্ন কেহই অপরের মহাজনের ইচ্ছামত চলে না—চলিতে পারে না।

তুমি হয়ত মহাজন-নির্দ্দিষ্ট পথে চলার বাধ্য-বাধকতাকে স্বেচ্ছাচার দোষে কলঙ্কিত মনে করিবে। তুমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে স্বাধীনতার প্রধান স্তাবক হইয়াছিলে, এখন তুমি স্বেচ্ছাচারিতার সূত্র ধরিয়া সেই স্বাধীনতার ভয়েই শিহরিয়া উঠিতেছ। মা ভৈঃ! মহাজন-পরাধীনতায় মায়িক স্বেচ্ছাচারিতা ভ্রম হইলেও, পরমার্থতঃ এই স্বেচ্ছাচার জীবের স্বেচ্ছাচার নহে, পরন্তু মহাজনের স্বেচ্ছাচার! তোমাকে যে পথে চালাইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তোমাকে তিনি সেই পথে চালাইতেছেন; আমাকেও আমার পথে চালাইতেছেন। অজ্ঞ যে, সেই মনে করে, তুমি-আমি-তিনি, সকলে নিজ নিজ স্বার্থসাধন করিতেছি; কিন্তু যে বুঝে সুঝে ও গোড়ার খবর রাখে, সে জানে যে—"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিস্তয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথাকরোমি।"

"নৈব কিঞ্চিৎকরোমীতি যুক্তো মন্যেত-তত্ত্ববিৎ। পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।" অতএব কোন্ পথে যাইব, কি করিব, সে সব কিছুরই ভাবনা চিন্তা করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। সে ভাবনা যাঁহার করিবার, তাহা তিনিই করিতেছেন। অর্জ্জুনের রথের সারথির মত তিনি—সেই মহাজনই তোমার দেহ-রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া, তোমার মনোরজ্জু ধরিয়া, রথাশ্ব সকলকে সংসার-যুদ্ধ-ক্ষেত্রের যথা তথা চালনা করিতেছেন। তুমি সর্ব্বথা তাঁহারই শরণাপন্ন হও—তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন মানব। তৎ-প্রসাদাৎ পরং শান্তিস্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

এ ভিন্ন আর উপায় নাই—পথ নাই। "নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" ইহাই নিত্য সত্য সনাতন শাশ্বত শান্তি-পন্থা।

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

একদেশদর্শী কে ?

গত অগ্রহায়ণ মাসের হিন্দু-পত্রিকায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "একদেশদর্শীর ভ্রম" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে মল্লিখিত "কাহার ভ্রম ?" শীর্ষক প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আমি হিন্দুপত্রিকার গ্রাহক নহি, সুতরাং এ পর্য্যন্ত ঐ প্রতিবাদ পাঠ করিতে পারি নাই ; সম্প্রতি যদৃচ্ছাক্রমে অবগত হইয়া, প্রতিবাদ-প্রবন্ধের ভ্রমপ্রদর্শন আবশ্যক মনে করিয়া, যাহাতে সত্য নির্ণয় হয়, সেই জন্যই লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কাল-বিলম্ব হইলেও, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় ইহার প্রকাশ প্রয়োজনীয় মনে করি।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধে আমার মত খণ্ডিত হয় নাই, নূতন তত্ত্বও আলোচিত হয় নাই। বিশ্বকোষের 'পুরাণ' শব্দ হইতে নিজের মতানুকূল অংশ উদ্ধৃত করিয়াই চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন ; পরন্তু আমার প্রবন্ধও তিনি বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। যতটুকু বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা একদেশ মাত্র। তাঁহার বিবেচনায় আমার "প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণত্ব খ্যাপন ও দেবীভাগবতকে পুরাণ হইতে বহিষ্করণ।" হিন্দু-পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট বিনীত নিবেদন, যোগীন্দ্র বাবুর এ কথায় সত্য নাই। আমি দেবীভাগবতকে মহাপুরাণ বলিতে অনিচ্ছুক, তবে উহাকে পুরাণ-শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহি না। আমি বলিয়াছি, অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে যে ভাগবত নাম আছে, তাহা দেবীভাগবত নহে, শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতকে যাঁহারা ঋষিপ্রণীত বলেন না, বোপদেব-রচিত বলেন, তাঁহাদের মতখণ্ডনই আমার প্রবন্ধের মূল সূত্র। আমার বিবেচনায় 'দেবীভাগবত' উপপুরাণ মাত্র। অমি পূর্ব্বাপর এই মতই প্রচার করিয়াছি।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতিবাদ পাঠে বুঝিলাম, তিনি কোনও সিদ্ধান্ত প্রচার করেন নাই। যখন যাহা ইচ্ছা, তাহাই লিখিয়াছেন। তিনি প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতকে অষ্টাদশ মহাপুরাণ-বহির্ভূত উপপুরাণরূপে বর্ণন করিয়াছেন। পরে "নহমূলাজন-শ্রুতি:"র বলে বোপদেব-প্রণীত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আবার সমাধান সন্দর্ভে বলিয়াছেন, "কোনও পুরাণের মতে দেবীভাগবত মহাপুরাণ, কোনও পুরাণের মতে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ।" অবশেষে এক হাস্যকর সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার নিজ মত জগতের কাছে রহস্যময় করিয়া রাখিয়াছেন।

সে মতটী এই—শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত, কোনখানিই আসল মহাপুরাণ নহে। আদিতে একখানি ভাগবত ছিল, তাহার কিয়দংশ লইয়া দেবীভাগবত ও কিয়দংশ লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইয়াছে। দেবীভাগবতের উত্তরার্দ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের পরে লিখিত ; দেবীভাগবতের পূর্ব্বার্দ্ধ প্রাচীন। ইহার কোনওখানি "সাবেক" ভাগবত মহাপুরাণ নয়।

পাঠক মহোদয়গণ! এ মতগুলির কোন্‌টী তাঁহার নিজস্ব, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আশা করি, আপনারা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। যদি সকলগুলিই সত্য হয়, তবে দুরদৃষ্ট। আমি দেখাইব, তাঁহার উক্ত রূপ বিরুদ্ধ কথন একদেশদর্শনেরই পরিচায়ক।

প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভাগবত উপপুরাণ নহে, মহাপুরাণ, ইহাই প্রদর্শন করিব। পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয়, "তত্র পদ্মপুরাণঞ্চ প্রথমংস প্রণীতবান্। ততোহন্যানি পুরাণানি কৃত্বা ষোড়শতু ক্রমাৎ। অষ্টাদশং ভাগবতং সারমাকৃষ্য সর্ব্বতঃ। কৃতবান্ ভগবান্ ব্যাসঃ শুকঞ্চাধ্যাপয়ৎ সুতং।" ইহা কি দেবীভাগবত? শুকদেব পিতৃসকাশে শ্রীমদ্ভাগবতই অধ্যয়ন করেন। পদ্মপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় আরও স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। "পুরাণেষুচ সর্ব্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কৃষ্ণেণ ভাবিতং। পরীক্ষিতঃ কথাং বক্তুং সভায়াং সংস্থিতে শুকে।" এই কৃষ্ণলীলা-গীতি শ্রীমদ্ভাগবতের নিজস্ব। নারদীয় পুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের বিশেষ পরিচয় দিয়া, তাহাকেই মহাপুরাণ বলিয়াছেন। এখন পাঠকমহোদয়গণ বিবেচনা করুন, শ্রীমদ্ভাগবত উপপুরাণ হওয়া সঙ্গত কি না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব-প্রণীত নহে; উহা আর্ষগ্রন্থ। চিৎসুখাচার্য্য 'পুরাণার্ণব, গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "স্কন্ধো দ্বাদশ এবাত্র কৃষ্ণেণ বিহিতাঃ শুভাঃ। দ্বাত্রিংশৎ ত্রিশতং পূর্ণং অধ্যায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।" চিৎসুখাচার্য্য যে ভাগবত দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে ৩৩২ অধ্যায় ও দ্বাদশ স্কন্ধ ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যায় ও স্কন্ধসংখ্যাও ঐরূপ। দেবীভাগবত দ্বাদশস্কন্ধ হইলেও, তাহাতে ৩১৮ অধ্যায় আছে; অতএব চিৎসুখ বর্ণিত ভাগবত দেবীভাগবত হইতে পারে না। দেবীভাগবত স্বয়ংই বলিয়াছেন, "পুরাণমুত্তমং পুণ্যং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধং। স্কন্ধো-দ্বাদশ এবাত্র কৃষ্ণেণ বিহিতাঃ শুভাঃ। ত্রিংশতং পূর্ণমধ্যায়াঃ অষ্টাদশযুতাঃ স্মৃতাঃ।" এই শ্লোকে বুঝা গেল, দেবীভাগবতে ৩১৮ অধ্যায় আছে। চিৎসুখাচার্য্য মুগ্ধবোধ-রচয়িতা বোপদেবের পূর্ব্বে আবির্ভূত হন, ইহা পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত। এরূপাবস্থায় চিৎসুখ যে শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় প্রদান ও প্রামাণ্য—প্রাধান্য স্বীকারে বদ্ধপরিকর, সে শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব-প্রণীত বলা উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। যদি প্রতিবাদী বলেন, অন্য বোপদেব ভাগবত-প্রণেতা, তবে তাহার প্রমাণ-প্রয়োগ উচিত ছিল না কি? যদি বোপদেব 'ভাগবত' নামে কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, ইহা প্রমাণিত হয়, তথাপি শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনযুক্ত এই চিরপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমদ্ভাগবত তাহা নহে। প্রত্যুত ইহা যে মহাপুরাণ, তাহা পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক প্রমাণ-পটল-সাহায্যে উজ্জ্বল দিবালোকে রাজবর্ত্মে করিকণ্ঠ-ঘণ্টা-রবে ঘোষণা করা যাইতে পারে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বোপদেব-প্রণীত ভাগবত কাব্যের উপক্রমভাগ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তাহা যে শ্রীমদ্ভাগবত নহে, ইহা সুনিশ্চিত।

তৃতীয়তঃ, সাম্প্রদায়িকতা বশতঃ শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত, উভয়কেই মহাপুরাণ বলা চলিতে পারে, কিন্তু তাত্ত্বিকের চক্ষু

তাহাতে ঢাকিতে পারে না। অবশ্য এক পক্ষের প্রমাণ-বচনাদি প্রক্ষিপ্ত হইবেই। আমরা ইহার আলোচনা করিব।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত যে মহাপুরাণ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার "বঙ্গবাসী" সংস্করণের পুঁথীখানি খুলিয়া দ্বাদশস্কন্ধ পাঠ করুন। "দশভির্লক্ষণৈ র্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ। কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মণ্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥" পুরাণ দশলক্ষণ, কাহারও মতে পঞ্চলক্ষণ, এই মতভেদের মীমাংসায় বলিতেছেন—"মহদল্প ব্যবস্থয়া।" মহাপুরাণ দশলক্ষণ ও অল্প বা উপপুরাণ পঞ্চলক্ষণ, ইহাই ব্যবস্থা। ভাগবতে দশলক্ষণ আছে, ইহা ভাগবত-পাঠক মাত্রেই জানেন। অতএব ভাগবত নিজকে মহাপুরাণ বলেন নাই, ইহা এক-দেশদর্শীর অমূলক সিদ্ধান্ত। স্বয়ং দেবী-ভাগবতই বলিতেছেন, "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ। বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।" দেবীভাগবতে পঞ্চ লক্ষণ বিদ্যমান। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ ও দেবীভাগবত উপপুরাণ। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে লিখিত আছে,—"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ। বংশানু-চরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥ এতদুপপুরা-ণানাং লক্ষণঞ্চ বিদুর্বুধাঃ। মহতাঞ্চ পুরাণানাং লক্ষণং কথয়ামি তে॥ সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিং তেষাঞ্চ পালনং। কর্ম্মণাং বাসনা বার্ত্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণচ। বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্যচ নিরূপণং। উৎ-কীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। দশাধিকং লক্ষণঞ্চ মহতাং পরিকীর্ত্তিতম্।" সর্গ-প্রতিসর্গ প্রভৃতি পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত হইলে উপপুরাণ এবং দশাধিক লক্ষণাক্রান্ত হইলে মহাপুরাণ নামে কথিত হয়। এতদপেক্ষা স্পষ্টনির্দ্দেশ আর কি হইতে পারে? পুরাণের পঞ্চলক্ষণ সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী মহাশয় দুই একটী কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার ক্ষতি হয় নাই। মহাপুরাণেও পঞ্চলক্ষণ আছে, উপপুরাণেও আছে। মহাপুরাণে আর পাঁচটী অধিক থাকিলে, সাধারণতঃ "পুরাণং পঞ্চ লক্ষণং" বলার বাধা নাই। যদি চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেখাইতে পারেন, মহাপুরাণ পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত ও উপপুরাণ দশলক্ষণাক্রান্ত, তাহাহইলে আমাদের মত-খণ্ডনের সুবিধা হইবে। যে বৌদ্ধসিংহ অভিধানকার হই-য়াও পর্য্যায়শব্দ সম্বন্ধে অশেষ ভ্রম করি-য়াছেন, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান লইয়া পণ্ডিত-সমাজে উপস্থিত হওয়া হাস্যকর। "পুরাণং পঞ্চলক্ষণং" লেখায় আমাদের ক্ষতি নাই, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তকে চক্রবর্ত্তী মহাশয় অমরসিংহের পরবর্ত্তী বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, প্রমাণ দেন নাই। আমরা বলি, তাঁহার মতে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আধুনিক, তাহারই নেপাল হইতে আনীত—এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকাগারে রক্ষিত হস্তলিপি কত দিনের, একবার অনুসন্ধান করুন। প্রত্নতত্ত্বের কথায় গবেষণাই প্রশং-সনীয়, বাস্তাশিতা আদরণীয় নহে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, "প্রধান২ পুরাণের মতে মহাপুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত।" মত প্রচারের পূর্ব্বে লেখক কিঞ্চিৎ শ্রমস্বীকার করিয়া পুরাণগুলি পাঠ

করিলে আর আমাদের প্রতিবাদ করিতে হইত না। পুরাণের যে পঞ্চলক্ষণ লেখা আছে, উহা পুরাণ-সামান্যে প্রযোজ্য। মহাপুরাণের পঞ্চলক্ষণ এবং উপপুরাণের দশলক্ষণ কোনও স্থানে দৃষ্ট হয় না। 'পুরাণং পঞ্চলক্ষণং' না বলিয়া "পুরাণং দশলক্ষণং" বলিলে ভ্রম হইত, কারণ উপপুরাণও পুরাণ, তাহাতে দশলক্ষণ নাই। সকল মহাপুরাণেই দশ লক্ষণ বিদ্যমান; যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ সংবাদ নূতন নহে। দশলক্ষণাক্রান্ত উপপুরাণ ও পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত মহাপুরাণ, এরূপ কোন বচন যদি সদ্যোজাত সংহিতাদিতে পাওয়া যায়, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ততার পরিচায়ক, ইহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

শ্রীনীলকণ্ঠ-ধৃত গরুড়পুরাণের তত্ত্বরহস্যের দ্বিতীয়াংশে ধর্ম্মকাণ্ডে লিখিত আছে,—"পুরাণং ভাগবতং দৌর্গং নন্দিপ্রোক্তং তথৈবচ।" এখানে নন্দিপ্রোক্ত পুরাণের সাহচর্য্যে দুর্গামাহাত্ম্যযুক্ত ভাগবত উপপুরাণই হওয়া সঙ্গত।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে একদেশদর্শী, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলাম। নীলকণ্ঠ দেবীভাগবতকে মহাপুরাণ বলিয়াছেন, ইহা তিনি জানেন. কিন্তু শ্রীধরাবতার শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি যে শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ স্থির করিয়াছেন, ইহা তিনি গোপন করিয়াছেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে কোনও স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতকে পঞ্চম, কোনও স্থানে অষ্টম বলা অন্যায় হইয়াছে। পুরাণের নামোল্লেখক্রম সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাক্রমে লিখিত হইয়াছে। কোনও পুরাণে উৎপত্তিক্রমানুসারে নামোল্লেখ নাই। তবে কোনও স্থানে দৃষ্ট হয়, পদ্মপুরাণ প্রথম প্রণীত হয়, অন্যত্র দেখা যায়, বিষ্ণুপুরাণই সর্ব্বাগ্রে রচিত। এ দোষে যদি শ্রীমদ্ভাগবত মারা যায়, তবে কোনও পুরাণের রক্ষা থাকে না, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। একটী দৃষ্টান্তোল্লেখের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; আশা করি, পাঠকগণ বিরক্ত হইবেন না। বায়ুপুরাণে আছে, "প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা কৃতং। অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যঃ বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ।" সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মা পুরাণ রচনা করেন, তৎপর তাঁহার বদন হইতে বেদ বিনির্গত হয়! আরও দেখুন, পদ্মপুরাণে "পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা কৃতং। ব্রহ্মণস্তু সমাদেশাৎ বেদান্ আহৃতবান্ অসৌ।" প্রথমে ব্রহ্মা পুরাণ রচনা করেন, পরে ব্রহ্মার আদেশে নারায়ণ বেদ সংগ্রহ করেন। এই সকল পারম্পর্য্য লইয়া যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহাদিগকে আর কি বলিব! যোগীন্দ্র বাবু অবশ্য ইহার নিদান জানেন।

দেবীভাগবতের প্রথম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যোগীন্দ্র বাবু তাহাকে 'গায়ত্রী' বলিয়াছেন। গায়ত্রীছন্দস্ক মন্ত্র গায়ত্রী নহে। দাশরথী পরিপঠিত "তৎসবিতুর্বরেণ্যং" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রটীতে 'গায়ত্রী'শব্দ রূঢ়, ইহা বৈদিক মীমাংসার আলোচনাকারী পণ্ডিতগণ জানেন। মহাপ্রভুর গায়ত্রী প্রভৃতির ন্যায় লৌকিক গায়ত্রীছন্দস্ক শ্লোকগুলিকে শাস্ত্রে গায়ত্রী বলা হয় নাই। গায়ত্র্যর্থব্যাখ্যারূপ শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতেই আছে।

দেবীভাগবতের ঐ শ্লোকটীতে গায়ত্রীর অর্থ বিবৃত হয় নাই। যাঁহারা গায়ত্রীতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, সর্ব্ববেদার্থতত্ত্ব সংক্ষেপে গায়ত্রীতে বলা হইয়াছে; ভাগবতের প্রথম শ্লোকেও তাহাই আছে। গায়ত্রী অন্যত্র থাকিতে পারে না, কাজেই 'গায়ত্রী' বলিতে গায়ত্র্যর্থ-প্রকাশক শ্লোক বুঝি।

তৎপরে বৃত্রবধ কথার আলোচনায় যোগীন্দ্রবাবু বলেন—দেবীভাগবতেও দেবী কর্ত্তৃক বৃত্রবধব্যাপার লিপিবদ্ধ আছে। আমরা জানি, বেদার্থবিরুদ্ধ উপাখ্যান মহাপুরাণে থাকিতে পারে না। বেদে আছে, "ইন্দ্রো বৃত্রাণি জঙ্ঘনৎ" বেদে অসংখ্যস্থানে ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রবধ আছে, উহা বেদানুমোদিত। দেবীভাগবতের উপাখ্যান বেদবহির্ভূত। ইহাতে দেবীভাগবতকে মহাপুরাণ বলা যায় না। পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই বেদানুগত। বেদ 'বৃত্রবধ' বলিতে যাহা বুঝেন, মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত তাহাই বুঝিয়াছেন। দেবীভাগবত উপপুরাণ, তাহাতে প্রক্ষিপ্তভাবে আজগবী গল্প থাকিতেও পারে।

যোগীন্দ্র বাবু আদিত্যপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেবীভাগবতকে ভাগদ্বয়-ভূষিত মহাপুরাণ বলিতে চাহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভাগদ্বয় নাই, দেবীভাগবতে আছে। অতএব দেবীভাগবত আদিত্যপুরাণমতে মহাপুরাণ, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। সমাধানে যোগীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, দেবীভাগবতের উত্তরার্দ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের পরে রচিত, কারণ তাহাতে রাধার কথা আছে। এখন তাঁহার যুক্তিতেই তাঁহার মত খণ্ডন করার চেষ্টা করা যাউক। আদিত্যপুরাণ দেবীভাগবতের উত্তরার্দ্ধ রচনার পরে রচিত, সুতরাং তাঁহারই মতে উহা শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী। মহাপুরাণখানির উত্তরার্দ্ধ রচনার পূর্ব্বে উপপুরাণখানি রচিত হইল, ইহা অপেক্ষা হাস্যকর মত আর কি হইতে পারে? আদিত্যপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতকে জানিতেন, ইহা স্বয়ং লেখকেরই স্বীকৃত, সুতরাং তিনি যে ভাগদ্বয়াত্মক দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়াছেন, ইহা প্রক্ষিপ্ত বলায় আপত্তি কি? আর এক কথা, রাধা নূতন দেবতা নহেন; বৈদিক দেবতা। লক্ষ্মী যেমন ঋক্‌পরিশিষ্টোক্ত দেবতা, রাধাও তেমনি। ঋক্‌পরিশিষ্টে দৃষ্ট হয়—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেন চ রাধিকা।" এ পুস্তকখানিকেও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের দলে ফেলা চলে না। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যুক্তি তাঁহার পক্ষ সমর্থনে শক্ত নয়।

"শুকপ্রোক্তং" কথার অর্থ যোগীন্দ্র বাবুর মতে "শুকায় পক্ষিণে প্রোক্তং"। এরূপ অর্থ ব্যাকরণ-সঙ্গত নহে। এ চতুর্থী-তৎপুরুষ সমাস করিতে ব্যাকরণের আপত্তি আছে। 'শুকেন প্রোক্তং' এইরূপ তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস করিলে, কারক-বিভক্তি দ্বারা সমাস হয়। কারক-বিভক্তি ত্যাগ করিয়া, উপপদ বিভক্তির দ্বারা সমাস করা অনুশাসন-বিরুদ্ধ, যোগীন্দ্র বাবু ইহা জানেন কি? আর এক কথা, "অম্বরীশ! শুকপ্রোক্তং" ইত্যাদি বচনটী পদ্মপুরাণের। ঐ পদ্মপুরাণেরই পূর্ব্বোদ্ধৃত "পুরাণেষু চ সর্ব্বেষু" ইত্যাদি বচন এবং "শুকমধ্যাপয়ৎ সুতং"

এই পদ্মপুরাণীয় বচন পাঠ করিলে 'শুক' অর্থে পক্ষী বলিতে সাধ হয় না, 'ভাগবত' অর্থেও দেবীভাগবত বলিতে ইচ্ছা হয় না। পদ্মপুরাণ স্বয়ংই 'শুক' বলিতে বেদব্যাসপুত্র বুঝিয়া, তৃতীয়াসমাস-পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রও তাহাই প্রমাণ করে। এখন বোধ হয় বলা যায়, যোগীন্দ্র বাবুর ব্যাখ্যায় পদ্মপুরাণের নিজেরই আপত্তি।

চিৎসুখ ভাগবতের টীকা না লিখিলেও, ভাগবতের প্রামাণ্য পরিচয় দিয়াছেন। 'পুরাণার্ণব' টীকা না হইলেও, টীকার ন্যায় ভাগবতের কাজে লাগিয়াছে। চিৎসুখ-প্রণীত ভাগবতের টীকার কথা বিশ্বকোষে নাই বলিয়া গোস্বামীগণ ভ্রান্ত, এ কথা বলা অন্যায়। বিশ্বকোষে বিশ্বের—বিশেষতঃ সংস্কৃতশাস্ত্রের তথ্য অল্পই আছে। যাহা আছে, তাহাও বহুস্থানে ভ্রান্তিপূর্ণ। পুস্তক মিলাইয়া দেখিলেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভ্রম দূর হইবে। গোস্বামীরা হয়ত চিৎসুখপ্রণীত ভাগবত-টীকা দেখিয়াছিলেন; হয়ত তাহা অধুনা অন্ধকারে আছে, এরূপ মনে করাতেইবা বাধা কি? বোপদেব ভাগবত-টীকাকার, ইহা সত্য। যোগীন্দ্র বাবুর মতে তিনি স্বকৃত ভাগবতেরই টীকা লিখিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত নাকি ভূরি ভূরি! ভাষাপরিচ্ছেদের টীকা গ্রন্থকার লিখিতে পারেন, কিন্তু ভাগবতের ন্যায় বিরাট্ অদ্বিতীয় গ্রন্থ লিখিয়া, নিজে যে তাহার টীকা লিখিয়াছেন, ইহার দুই একটা প্রমাণ প্রার্থনা করি। ভূরি ২ নাইও, দিতেও পারিবেন না; দুই একটাই যথেষ্ট। "ভাগবততত্ত্বোক্তৌ শ্রমঃ" দেখিয়া যদি বোপদেব ভাগবত লিখিয়াছেন, মনে করা যায়, তবে আর "কাহার ভ্রম" বা "একদেশদর্শী কে?" বুঝিবার বাকী থাকিল কৈ?

বাণম্ ভট্ট একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ভাগবত-সম্বন্ধে কথা বলা তাঁহার পক্ষে যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় অনধিকারচর্চ্চা। শ্রীধরস্বামীর সময়ে ভাগবতদ্বয়ের মহাপুরাণত্বে বিবাদ ছিল বুঝা যায়, ইহা চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্মপর্য্যবেক্ষণে নীলকণ্ঠের সময়েও যে ঐ বিবাদ ছিল, তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই কেন?

সকল পুরাণ এক হস্তের রচনা নহে, এ তত্ত্বের আবিষ্কারে যোগীন্দ্র বাবু আমাদিগকে কি শিখাইয়াছেন? মহাভারতাদি গ্রন্থেরও সর্ব্বাংশ এক হাতে লেখা কি না, তাহার কিছু চিন্তা করিয়াছেন কি? শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষা কঠিন, অলঙ্কৃত, বিবিধ ছন্দবিশিষ্ট, সুগভীর চিন্তাপ্রসূত, ইহাও যোগীন্দ্র বাবুর মতে শ্রীমদ্ভাগবতের দোষ! ফলে দোষ আমাদের অদৃষ্টের। ভাগবতের কাঠিন্য মহাভারতে, রামায়ণে, বাশিষ্ঠ রামায়ণে বিদ্যমান। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত সুগভীর চিন্তায়—দার্শনিকতায় প্রায় একইরূপ। মহাভারতের অশ্বিস্তুতি প্রভৃতি পাঠ করিয়া যাঁহারা ভাষার সারল্যে মুগ্ধ হন, তাঁহাদের নিকট আমরা নিরুত্তর। ভাষার সারল্য ভাগবতেও যথেষ্ট। কতকগুলি শ্লোক কঠিন; মহাভারতাদিতেও তাহার অভাব নাই। মহাভারতও শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা খুব অল্প ছন্দে রচিত নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১টী নূতন ছন্দ আছে; তেমনি মহাভারতেও আর্য্যাদি নূতনের অভাব নাই।

যোগীন্দ্র বাবু বলেন, দেবীভাগবতকে পণ্ডিতেরা মহাপুরাণ বলিয়া আসিতেছেন। আমরা এই পণ্ডিতমণ্ডলীর সংবাদ পাই নাই। ভাগবতের টীকাকারেরা অপণ্ডিত ছিলেন কি? আশা করি, যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার পণ্ডিতবর্গের তালিকা প্রকাশ করিবেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে করেন, রঘুনন্দন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া, আমি শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণত্ব প্রমাণ করিতে চাহি; ফলে প্রবন্ধ পাঠে মনোযোগ না করায় তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমার উদ্দেশ্য শ্রীমদ্ভাগবতের আর্ষত্ব-স্থাপন; তজ্জন্য বলিয়াছি, রঘুনন্দনও ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন। রঘুনন্দন অনার্ষ গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণে বলেন নাই। যোগীন্দ্র বাবু বলেন, "অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে আধুনিক পণ্ডিতগণের মত ও বচন যথেষ্ট উদ্ধৃত হইয়াছে।" তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন, সুতরাং এরূপ উক্তিতে অপরাধ নাই। পণ্ডিত-সমাজ জানেন, আধুনিকগণের মত আছে, কিন্তু ঋষিপ্রণীত ভিন্ন "বচন" প্রমাণ হয় না। সংগ্রহকর্ত্তাদের উদ্ধৃত বচনগুলি, তাঁহাদের রচিত শ্লোক বা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের বচন, এবিষয়ে যোগীন্দ্র বাবুর জ্ঞানের পরিধি আমাদের পরিচিত নহে। রঘুনন্দন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্য স্বীকার করায়, উহার আর্ষত্বে তৎকালে সন্দেহ ছিল না, ইহাই আমার অভিপ্রায়। আজ কাল অনেকে বলেন "রঘুনন্দনের বচন" "মিতাক্ষরার বচন"—এসব কথার অর্থ কি, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পাঠকগণ বিচার করুন। দেবীভাগবতের 'ভাগবতত্ব' খ্যাপনে যোগীন্দ্র বাবুর যুক্তিজাল সমর্থ, কিন্তু মহাপুরাণত্ব জ্ঞাপনে অসমর্থ। দেবীভাগবতকে উপপুরাণ ভাগবত বলা আমাদের মত, সুতরাং তাঁহার অবশিষ্ট প্রমাণ কয়টীকে আক্রমণ করিয়া প্রতিবাদ-কলেবর বৃদ্ধি করিব না। মৎপ্রদর্শিত প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণত্ব স্থির করিয়াছে কি না ও যোগীন্দ্র বাবুর যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা দেবীভাগবতের মহাপুরাণত্ব প্রতিপন্ন হয় কি না, পণ্ডিত পাঠকগণ বুঝিবেন। "হয়গ্রীবাবতার" বলাতেই "হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা" অর্থাৎ হয়গ্রীবের ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান বা ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন সিদ্ধ হইয়াছে। বিদ্যা অর্থে জ্ঞান, প্রমাণ বেদ—উপনিষৎ। সারস্বত কল্পের কথা দ্বারা দেবীভাগবতকে 'ভাগবত' বলা হইয়াছে, মহাপুরাণ বলা হয় নাই। 'সারস্বত' অপদ্মও হইতে পারে। সারস্বতকল্পকে যদি পৌরাণিক কল্প বলিয়াই বুঝি, তথাপি ক্ষতি নাই। সারস্বতকল্পীয় দেবনর-বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে থাকিতে আপত্তি নাই। সারস্বতকল্পের বর্ণনা থাকিবার দরকার বুঝি না। উদ্ধৃত শ্লোকে তাহা বুঝায় না। শ্রীমদ্ভাগবত পাদ্মকল্পাশ্রিত পুরাণ নহে। পাদ্মকল্পের কথা আছে; সে শুধু সৃষ্টি-বর্ণন প্রসঙ্গে। অন্য কল্পের বৃত্তান্তও শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। আবশ্যক হইলে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইবে। এখন বোধ হয় বলিতে পারি, শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণত্বের প্রমাণ দিয়াছি। যোগীন্দ্র বাবু ঐ সব প্রমাণের একদেশ দর্শন করিয়াই 'বিশ্বকোষ' নকল করিয়াছেন। তাঁহার শেষ মত

অর্থাৎ "ভুখানাই নকল ভাগবত"—এই মত প্রমাণশূন্য—কেবল কল্পনা মাত্র। বৌদ্ধ বিপ্লবের নাম করিলে চলে না, প্রমাণ দিতে হয়; পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ চিন্তা করিয়া বলিতে হয়। যোগীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে আমার মতের খণ্ডন পাইলাম না, তাঁহার মতের সমর্থনও পাওয়া গেল না। তিনি প্রমাণগুলিকে নিজের ভাবেই দেখিয়াছেন; উহা একদেশ দর্শন কি না, পাঠকগণ বিচার করুন।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।
(পাবনা—দর্শন-টোল।)

মাতৃপূজা

(১)

এস বঙ্গবাসি! এস সবে ভাই,
আজি উচ্চ নীচ কোন ভেদ নাই;
ত্রিংশ কোটী কণ্ঠে মিলি এস গাই
ভারত মাতার বিজয়ের গান।

(২)

অনন্ত আনন্দে হৃদয় ভাসিবে,
বিষাদ বেদনা দূরে পলাইবে,
ভকতি জাগিবে, শকতি আসিবে,
মুছিয়া যাইবে দুঃখ-অপমান॥

(৩)

জাগ, জাগ আজি আর্য্য সুতগণ!
হের সমুদিত জাতীয়-তপন;
'মাতৃ পূজা-মন্ত্র' কররে গ্রহণ,
মায়ের সেবায় সঁপ প্রাণ-মন।

(৪)

ভারত-গৌরব স্মর এইবার,
স্মর আর্য্যাবর্ত্ত, সভ্যতা-বিস্তার,
ভীমার্জ্জুন-ভীষ্ম—বীর-অবতার,
কুরুক্ষেত্র মহা সমর ভীষণ॥

(৫)

স্মর রত্নাকর, পরাশর, ব্যাস,
সূরী ভবভূতি, মাঘ, কালিদাস,
চতুর্ব্বেদ, তন্ত্র, পুরাণ প্রকাশ,
উপনিষদাদি, জ্যোতিষ, দর্শন।

(৬)

স্মর হিন্দুকুল-গৌরবের ধাম—
মহারাষ্ট্র-পতি শিবাজির নাম,
প্রতাপ-আদিত্য, রাজা সীতারাম,
অশ্বমেধ, রাজসূয়-উদ্‌যাপন॥

(৭)

খনা, লীলাবতী, দময়ন্তী, সীতা,
সাবিত্রী, দ্রৌপদী, গার্গী, নচিকেতা,
চণ্ডী, ভাগবত, মনু, স্মৃতি, গীতা,
সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পবিবরণ।

(৮)

স্মর হিন্দুধর্ম্ম, জ্ঞান-মোক্ষাধার,
পুণ্য-তপোবনে 'সামের' ঝঙ্কার,
হৃদয়ে জাগিবে মহিমা অপার,
নবীন উত্তমে মাতিবে জীবন॥

(৯)

জ্বালাও ভারতে উৎসাহ-অনল;
সিংহের তনয় কেন হতবল?
স্বজাতি-স্বধর্ম্ম—জীবন-সম্বল;
জনমভূমির সাধহ কল্যাণ।

(১০)

বহে অনুকূল অদৃষ্ট-পবন,
কর সবে মিলি একতা-বন্ধন;
সুখে বল মুখে "বন্দে মাতরম্"!—
সকল-মঙ্গল-মহিমা-নিদান॥

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩১৪ সাল, ১৮২৯ শকাব্দা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুরের গলার অসুখের সূত্রপাত।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন।

আজ শনিবার, ১৩ই জুন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ; জ্যৈষ্ঠ শুক্লপ্রতিপদ তিথি; জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। বেলা তিনটা হইবে। ঠাকুর খাওয়া দাওয়ার পর ছোট খাটটীতে একটু বিশ্রাম করিতেছেন।

পণ্ডিতজী মেঝের উপর মাদুরে বসিয়া আছেন। একটী শোকাতুরা ব্রাহ্মণী ঘরের উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। কিশোরীও আছেন।

মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে দ্বিজ ইত্যাদি। অখিল বাবুর প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে একটী আসামী ছোকরা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু অসুস্থ আছেন। গলায় বীচি হইয়া সর্দ্দীর ভাব। গলার অসুখের এই প্রথম সূত্রপাত।

বড় গরম পড়াতে মাষ্টারেরও শরীর অসুস্থ। ঠাকুরকে সর্ব্বদা দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর আসিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টার দৃষ্টে)। এই যে তুমি এসেছ। বেশ বেলটী।

তুমি কেমন আছ?—বড় গরম পড়েছে! তুমি একটু একটু বরফ খেও।

মাষ্টার। আজ্ঞে, আগেকার চেয়ে একটু ভাল আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমারও বাপু বড় গরম প'ড়ে কষ্ট হয়েছে। গরমেতে কুল্পি-বরফ—এই সব বেশী খাওয়া হয়েছিল। তাই গলায় বীচি হয়েছে। গয়ারে এমন বিশ্রী গন্ধ দেখি নাই!

মাকে বলেছি 'মা! ভাল করে দেও, আর কুল্পি খাবনা।'

তার পর আবার বলেছি বরফও খাবনা।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্যকথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাকে যেকালে বলেছি খাবনা, সেখানে আর খাওয়া হবে না।

"তবে এমন হঠাৎ ভুল হয়ে যায়। বলেছিলাম, রবিবারে মাছ খাবনা; এখন এক দিন ভুলে খেয়ে ফেলেছি।

"কিন্তু জেনে শুনে হবার যো নাই। সে দিন গাড়ু নিয়ে একজনকে ঝাউতলার দিকে আস্‌তে বল্লুম। এখন সে বাহ্যে গিছ্‌ল; তাই আর একজন নিয়ে গেল। আমি বাহ্যে করে এসে দেখি যে আর একজন গাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে গাড়ুর জল নিতে পারলুম না। কি করি? মাটী দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—যতক্ষণ না সে এসে জল দিলে।

"মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে যখন সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন বলতে লাগলাম "মা! এই লেও তোমার শুচি, এই লেও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধভক্তি দেও; এই লেও তোমার ধর্ম্ম, এই লেও তোমার অধর্ম্ম; এই লেও তোমার পাপ, এই লেও তোমার পুণ্য; এই লেও তোমার ভাল, এই লেও তোমার মন্দ। কিন্তু, এই লেও তোমার সত্য, এই লেও তোমার মিথ্যা, একথা বল্‌তে পারলাম না।

একজন ভক্ত বরফ আনিয়াছিলেন। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হাঁগা খাব কি?"

মাষ্টার বিনীত ভাবে বলিলেন "মা'র সঙ্গে পরামর্শ না করে খাবেন না।" ঠাকুর অবশেষে খাইলেন না।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানীর অবস্থা ও ভক্তের অবস্থা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুচি অশুচি,—এটী ভক্তি ভক্তের পক্ষে। জ্ঞানীর পক্ষে নয়।

"বিজয়ের শাশুড়ী বল্লে, 'কই আমার কি হয়েছে? এখনও আমি সকলের খেতে পারি না!'

"আমি বললাম "সকলের খেলেই কি জ্ঞান হয়? কুকুর যা তা খায়; তাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী?

(মাষ্টারের প্রতি) আমি পাঁচ ব্যান্নুন দিয়ে খাই কেন? পাছে একঘেয়ে হলে এদের (ভক্তদের) ছেড়ে দিতে হয়।

"কেশব সেনকে বললাম, "আরও এগিয়ে কথা বললে তোমার দলটল আর থাকে না।

"জ্ঞানের অবস্থায় দলটল মিথ্যা।—স্বপ্নবৎ।

"মাছ ছেড়ে দিলাম। প্রথম প্রথম কষ্ট হ'তো; পরে তত কষ্ট হ'ত না।

"পাখীর বাসা যদি কেউ পুড়িয়ে দেয়, সে উড়ে উড়ে বেড়ায়; আকাশ আশ্রয় করে। দেহ, জগৎ—যদি, ঠিক মিথ্যা বোধ হয়, তাহলে আত্মা সমাধিস্থ হয়।

"আগে ঐ জ্ঞানীর অবস্থা ছিল। লোক ভাল লাগতো না। অমুক হাটখোলায় একটী জ্ঞানী আছে, কি একটী ভক্ত আছে, এই শুনলাম; আবার কিছু দিন পরে শুন-

লাম, ঐ সে মরে গেছে! তাই আর লোক ভাল লাগতো না।

"তারপর তিনি (মা) মনকে নামালেন; ভক্তি-ভক্তেতে মন রাখিয়ে দিলেন।

মাষ্টার অবাক্ হইয়া ঠাকুরের অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিষয় শুনিতেছেন। এইবার ঈশ্বর মানুষ হয়ে কেন অবতার হন, তাই ঠাকুর বলিতেছেন।

[নরলীলার গুহ্য অর্থ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। মানুষ-লীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়; এর ভিতর তাঁর বিলাস; এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন।

আর সব ভক্তদের ভিতর তাঁরই একটু একটু প্রকাশ। যেমন জিনিস অনেক চুস্‌তে চুস্‌তে একটু রস, ফুল চুস্‌তে চুস্‌তে একটু মধু।

(মাষ্টার প্রতি) তুমি এটা বুঝেছ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ, বেশ বুঝেছি।

[দ্বিজ ও পূর্ব্বসংস্কার।]

ঠাকুর দ্বিজের সহিত কথা কহিতেছেন। দ্বিজের বয়স ১৫। ১৬ হইবে। তাঁহার বাপ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিজ প্রায় মাষ্টারের সঙ্গে আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহ করেন।

দ্বিজ বলিতেছিলেন, যে তাঁর বাবা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে দেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজর প্রতি)। তোর ভাইরাও? আমাকে কি অবজ্ঞা করে?

দ্বিজ চুপ করিয়া আছেন।

মাষ্টার। সংসারের আর দু চার ঠোক্কর খেলে, যাদের একটু আধটু যা অবজ্ঞা আছে, চলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিমাতা আছে, ঘা (blow) ত খাচ্চে।

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) একে (দ্বিজকে) পূর্ণের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিওনা।

মাষ্টার। যে আজ্ঞে।

(দ্বিজর প্রতি) পেনেটীতে যেও।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ; তাই সব্বাইকে বল্‌ছি,—একে পাঠিয়ে দিও, ওকে পাঠিয়ে দিও।

ঠাকুর পেনেটীর মহোৎসবে যাইবেন। তাই ভক্তদের সেখানে যাবার কথা বলিতেছেন।

(মাষ্টারের প্রতি) তুমি যাবে না?

মাষ্টার। আজ্ঞে, ইচ্ছা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বড় নৌকা হবে, টল টল করবে না।

"গিরীশ ঘোষ যাবে না?

["হাঁ" "না"; the Everlasting "yea" and Everlasting "Nay" *]

ঠাকুর দ্বিজকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা এত ছোকরা রয়েছে, এই বা আসে কেন? তুমি বলো, অবশ্য আগেকার কিছু ছিল।

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংস্কার। আগের জন্মে কর্ম্ম করা আছে। সরল হয় শেষ জন্মে। শেষ জন্মে খ্যাপাটে ভাব থাকে।

---

* Carlyles' Sartor Resartus.

"তবে কি জান—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর "হাঁ"তে জগতের সব হচ্চে; আর তাঁর "না"তে হওয়া বন্ধ হচ্চে।

"মানুষের আশীর্ব্বাদ করতে নাই কেন? মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না; তাঁরই ইচ্ছাতে হয়—যায়।

"সে দিন কাপ্তেনের ওখানে গেলাম। রাস্তা দিয়ে ছোকরারা যাচ্চে দেখলাম। তারা এক রকমের।

"একটা ছোকরাকে দেখলাম, ১৯। ২০ বছর বয়স, বাঁকা সিঁতে কাটা, শিশ্ দিতে দিতে যাচ্চে।

"কেউ যাচ্চে বলতে বলতে,—"নগেন্দ্র! ক্ষীরোদ!"

"কেউ দেখি ঘোর তমো;—বাঁশী বাজাচ্চে, তাইতেই একটু অহঙ্কার হয়েছে।

(বিজয় প্রতি) যার জ্ঞান হয়েছে, তার নিন্দার ভয় কি? তার কূটস্থ বুদ্ধি—কামারের নেয়াই; তার উপর কত হাতুড়ীর ঘা পড়ছে, কিছুতেই কিছু হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি একবার—বাপকে দেখলাম রাস্তা দিয়া যাচ্চে।

মাষ্টার। লোকটী বেশ সরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু চোক রাঙ্গা।

[কাপ্তেনের চরিত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ। পুরুষ-প্রকৃতি-যোগ।]

ঠাকুর কাপ্তেনের বাড়ী গিয়াছিলেন—সেই গল্প করিতে লাগিলেন। যে সব ছেলেরা ঠাকুরের কাছে আসেন, কাপ্তেন তাহাদের নিন্দা করিয়াছিলেন। হাজরা মহাশয়ের কাছে বোধ হয় তাহাদের নিন্দা শুনিয়াছিলেন।

। কাপ্তেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি বল্লাম 'পুরুষ আর প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু নাই। নারদ বলেছিলেন, হে রাম, যত পুরুষ দেখ্‌তে পাও, সব তোমার অংশ, আর যত স্ত্রী দেখ্‌তে পাও, সব সীতার অংশ।

কাপ্তেন শুনে খুব খুসী। আর ব'ল্লে, 'আপনারই ঠিক বোধ হয়েছে,—সব পুরুষ রামের অংশে রাম, আর সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা।

এই কথা এই বল্লে; আবার তারই পরে ছোকরাদের নিন্দা আরম্ভ কর্‌লে! বলে 'ওরা ইংরাজী পড়ে,—যা তা খায়,—ওরা তোমার কাছে সর্ব্বদা যায়,—সে ভাল নয়। ওতে তোমার খারাপ হতে পারে। হাজরা যা একটী লোক যায়, খুব লোক। ওদের অত যেতে দেবেন না।

আমি প্রথমে বল্লাম, যায় তা কি করি?

তার পর প্যাণ্ (প্রাণ) থেঁতলে দিলাম। ওর মেয়ে হাঁস্‌তে লাগ্‌ল। বল্লাম, 'যে লোকের বিষয়বুদ্ধি আছে, সে লোক থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়বুদ্ধি যদি না থাকে, সে ব্যক্তির তিনি হাতের ভিতর,—অতি নিকটে।

কাপ্তেন রাখালের কথা বলে, যে ও সকলের বাড়ীতে খায়। বুঝি হাজরার কাছে শুনেছে। তখন বল্লাম, 'লোকে হাজার তপ জপ করুক, যদি বিষয়বুদ্ধি থাকে, তা হ'লে কিছুই হবে না; আর শূকর-মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে মন থাকে, সে ব্যক্তি ধন্য, তার ক্রমে ঈশ্বর লাভ হবেই। হাজরা

এত জপ তপ করে; কিন্তু ওর মধ্যে দালালি করবে—এই চেষ্টায় থাকে।

তখন কাপ্তেন বলে, হুঁ, তা ও বাৎ ঠিক হায়। তার পরে আমি বল্লাম, এই তুমি বল্লে, সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা, আবার এখন এমন কথা ব'লছ!

কাপ্তেন বল্লে, তা তো;—কিন্তু তুমি সকলকে তো ভালবাস না।

আমি বল্লাম, 'আপো নারায়ণঃ'; সব জল, কিন্তু কোনও জল খাওয়া যায়, কোনটীতে নাওয়া যায়, কোনও জলে শৌচ করা যায়। এই যে তোমার মাগ, মেয়ে ব'সে আছে, আমি দেখছি সাক্ষাৎ আনন্দময়ী!

কাপ্তেন তখন বলতে লাগল "হাঁ, হাঁ, ও ঠিক হায়।"

তখন আবার আমার পায়ে ধরতে যায়। এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। এইবার ঠাকুর কাপ্তেনের কত গুণ, তাহা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাপ্তেনের অনেক গুণ। রোজ নিত্যকর্ম;—নিজে ঠাকুর পূজা;—স্নানের মন্ত্রই কত!

কাপ্তেন খুব একজন কর্ম্মী;—পূজা, জপ, আরতি, পাঠ, স্তব, এ সব নিত্যকর্ম্ম করে।

[কাপ্তেন ও পাণ্ডিত্য; কাপ্তেন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা।]

আমি কাপ্তেনকে বকতে লাগলাম; বল্লাম, তুমি পড়েই সব খারাপ করেছ! আর প'ড়ো না।

আমার অবস্থা কাপ্তেন বল্লে, উড্ডীয়মান ভাব;—জীবাত্মা আর পরমাত্মা; জীবাত্মা যেন একটি পাখী, আর পরমাত্মা যেন আকাশ,—চিদাকাশ; কাপ্তেন বলে, 'তোমার জীবাত্মা চিদাকাশে উড়ে যায়,—তাই সমাধি।'

কাপ্তেন বাঙ্গালীদের নিন্দা ক'রলে। বল্লে, বাঙ্গালীরা নির্ব্বোধ! তা না হ'লে কাছে মাণিক রয়েছে, চিনলে না!

কাপ্তেনের বাপ খুব ভক্ত ছিল। ইংরেজের ফৌজে সুবাদারের কাজ করত। যুদ্ধক্ষেত্রে পূজার সময়ে পূজা করত;—এক হাতে শিবপূজা, একহাতে তরবার-বন্দুক!

[গৃহস্থভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

(মাষ্টারের প্রতি) তবে কি জান, রাতদিন বিষয় কর্ম্ম!—মাগ, ছেলে ঘিরে রয়েছে, যখন যাই দেখি। আবার লোক জন হিসাবের খাতা মাঝে মাঝে আনে। এক একবার ঈশ্বরেও মন যায়। যেমন বিকারের রোগী; বিকারের ঘোর লেগেই আছে, এক একবার চট্‌কা ভাঙ্গে। তখন 'জলখাব, জলখাব' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে; আবার, জল দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে যায়,—কোন হুঁস্ থাকে না!

[কর্ম্ম কত দিন?]

আমি তাই ওকে ব'ল্লাম—তুমি কর্ম্মী।

কাপ্তেন বল্লে, আজ্ঞা, আমার পূজা এই সব করতে আনন্দ হয়। জীবের কর্ম্ম বই আর উপায় নাই।

আমি বল্লাম, কিন্তু কর্ম্ম কি চিরকাল ক'রতে হবে? মৌমাছি ভন্ ভন্ কতক্ষণ করে! যতক্ষণ না ফুলে বসে। মধুপানের সময় ভন্ ভনানি চলে যায়।

কাপ্তেন ব'ল্লে, 'আপনার মত আমরা কি

পূজা আর আর কর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে পারি ?

তার কিন্তু কথার ঠিক নাই ;—কখনও ব'লে, 'এ সব জড়' ; কখনও বলে, 'এ সব চৈতন্য'। আমি বলি, জড় আবার কি ? সবই চৈতন্য।

[পূর্ণ ও মাষ্টার।]

পূর্ণের কথা ঠাকুর মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণকে আর একবার দেখ্‌লে আমার ব্যাকুলতা একটু কম পড়্‌বে।—কি চতুর !—আমার উপর খুব টান ; সে বলে, আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখ্‌বার জন্য।

তোমার স্কুল থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়েছে ; তাতে তোমার কি কিছু ক্ষতি হবে ?

মাষ্টার। যদি তাঁরা (বিদ্যাসাগর) বলেন, তোমার জন্য ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে, তা হ'লে আমার জবাব দেবার পথ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি বল্‌বে ?

মাষ্টার। এই কথা ব'লব, সাধুসঙ্গে ঈশ্বর-চিন্তা হয়, সে আর মন্দ কাজ নয় ; আর আপনারা যে * বহি পড়াতে দিয়েছেন, তাতেই আছে—ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভাল বাসবে।

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাপ্তেনের বাড়ীতে ছোট নরেনকে ডাকালুম্। ব'ল্লাম, তোর বাড়ীটা কোথায় ? চল্ যাই।—সে বলে, 'আসুন। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল সঙ্গে,—পাছে বাপ জানতে পারে।" সকলে হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অখিল বাবুর প্রতিবেশীর প্রতি) হাঁগা, তুমি অনেক কাল আস নাই। সাত আট মাস হবে।

প্রতিবেশী। আজ্ঞা, এক বৎসর হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার সঙ্গে আর একটী আস্‌তেন।

প্রতিবাসী। আজ্ঞা হাঁ, নীলমণি বাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি কেন আসেন না ?—একবার তাঁকে আস্‌তে বলো,—তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও।

(প্রতিবেশীর সঙ্গী বালক দৃষ্টে) ; এ ছেলেটী কে ?

প্রতিবেশী। এ ছেলেটীর বাড়ী আসামে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আসাম কোথা ? কোন্ দিকে ?

[জোর করে বিবাহ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

দ্বিজ আশুর কথা বলিলেন। আশুর বাবা তার বিবাহ দিবেন। আশুর ইচ্ছা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) দেখ দেখি,—তার ইচ্ছা নাই,—জোর ক'রে বিয়ে দিচ্ছে!

ঠাকুর একটী ভক্তকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভক্তি করিতে বলিতেছেন, জ্যেষ্ঠ ভাই, পিতা সম—খুব মান্‌বি।

---

* With all thy soul love God above (Vidyasagar's Poetical Selections.)

And as thyself thy neighbour love.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতজী বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে মাষ্টারের প্রতি।) খুব ভাগবতের পণ্ডিত।

মাষ্টার ও ভক্তেরা পণ্ডিতজীকে এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)। আচ্ছা জী! যোগমায়া কি?

পণ্ডিতজী যোগমায়ার ব্যাখ্যা করিলেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা-তত্ত্ব]

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাধিকাকে কেন যোগমায়া বলে না?

পণ্ডিতজী এই প্রশ্নের উত্তর এক রকম দিলেন। তখন ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন,—

"রাধিকা বিশুদ্ধসত্ত্ব; প্রেমময়ী। যোগমায়ার ভিতরে তিন গুণই আছে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ সত্ত্ব বই আর কিছু নাই।

(মাষ্টারের প্রতি) নরেন্দ্র এখন শ্রীমতীকে খুব মানে; সে বলে, সচ্চিদানন্দকে যদি ভালবাসতে শিখতে হয়, তা হ'লে রাধিকার কাছে শেখা যায়।

সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করবার জন্ত রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দকৃষ্ণই 'আধার'। আর তিনি নিজেই শ্রীমতী রূপে 'আধেয়'—নিজের রস আস্বাদন ক'রতে,—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে।

"তাই বৈষ্ণবদের গ্রন্থে আছে, রাধা জন্মগ্রহণ ক'রে চোক খুলেন নাই;—অর্থাৎ এই ভাব যে—এ চক্ষে আর কাকে দেখ্‌ব? যখন দেখতে যেয়ে যশোদা কৃষ্ণকে কোলে ক'রে নিলেন, তখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্ত রাধা চোক খুললেন। কৃষ্ণ খেলার ছলে রাধার চক্ষে হাত দিছলেন।

(আসামী বালকের প্রতি) একি দেখেছ, ছোট ছেলে চোকে হাত দেয়?

[সংসারী ব্যক্তি ও শুদ্ধাত্মা ছোকরার প্রভেদ]

পণ্ডিতজী ঠাকুরের কাছে বিদায় লইবেন।

পণ্ডিত। আমি বাড়ী যাচ্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সস্নেহে)। কিছু হাতে হয়েছে?

পণ্ডিত। বাজার বড়া মন্দা হায়!—রোজ্‌গার নেহি।—

পণ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখো,—বিষয়ী আর ছোকরাদের কত তফাৎ! এই পণ্ডিত রাত দিন টাকা টাকা করছে। কল্‌কাতায় এসেছে, পেটের জন্ত,—তা না হলে বাড়ীর সে গুলির পেট চলে না। তাই এর দ্বারে ওর দ্বারে যেতে হয়। মন একাগ্র করে ঈশ্বর-চিন্তা ক'রবে কখন? কিন্তু ছোকরাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন নাই। ইচ্ছা কল্লেই, ঈশ্বরেতে মন দিতে পারে।

"ছোকরারা বিষয়ীর সঙ্গ ভালবাসবে না। রাখাল মাঝে মাঝে বলত 'বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ভয় হয়।'

"আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হ'ল, তখন বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রতাম।

[পুত্র-কন্যা বিয়োগ জন্য শোক ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

দেশে শ্রীরাম মল্লিককে অত ভালবাসতাম; কিন্তু এখানে যখন এল, তখন ছুঁতে পারলাম না।

"শ্রীরামের সঙ্গে ছেলে বেলায় খুব প্রণয় ছিল। রাতদিন এক সঙ্গে থাকতাম। এক সঙ্গে শুয়ে থাকতাম। তখন ১৬। ১৭ বৎসর বয়স। লোকে ব'লত, এদের ভিতর একজন মেয়ে মানুষ হ'লে দুজনের বিয়ে হ'ত। তাদের বাড়ীতে যখন দুজনে খেলা ক'রতাম, তখনকার সব কথা মনে প'ড়ছে। তাদের কুটুম্বেরা পাল্কী চ'ড়ে আ'সত; বেয়ারাগুলো 'হিঞ্জোড়া' 'হিঞ্জোড়া' ব'লতে থাকৃত।

"শ্রীরামকে দে'খব ব'লে কতবার লোক পাঠিয়েছি। সে এখন চানকে দোকান ক'রেছে।

"সে দিন এসেছিল; দু দিন এখানে ছিল।

"শ্রীরাম ব'ললে, ছেলে পিলে হয় নাই। ভাইপোটিকে মানুষ করছিলাম; সেটী মরে গেছে।

"এই কথা বলতে বলতে শ্রীরাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে; চক্ষে জল এল; ভাইপোর জন্য খুব শোক হ'য়েছে।

"আবার বললে, ছেলে হয় নাই ব'লে স্ত্রীর যত স্নেহ ঐ ভাইপোর উপর পড়েছিল; এখন সে শোকে অধীর হয়েছে। আমি তাকে বলি, ক্ষেপি! আর শোক করলে কি হবে? তুই কাশী যাবি?

"বলে 'ক্ষেপি';—একবারে ডাইলিউট্ (dilute) হয়ে গেছে! তাকে ছুঁতে পারলাম না। দেখলাম, তাতে আর কিছু নাই।

ঠাকুর শোক সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিতেছেন; এ দিকে ঘরের উত্তরের দরজার কাছে সেই শোকাতুরা ব্রাহ্মণীটি দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মণী বিধবা। তাঁর একমাত্র কন্যার খুব বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটীর স্বামী রাজা উপাধিধারী,—কলিকাতানিবাসী,—জমিদার। মেয়েটী যখন বাপের বাড়ী আসিতেন, তখন সঙ্গে সেপাই শান্ত্রী—আসিত;—মায়ের বুক যেন দশ হাত হইত। সেই একমাত্র কন্যা কয়দিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে!

ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া ভাইপোর বিয়োগ জন্য শ্রীরাম মল্লিকের শোকের কথা শুনিলেন। তিনি কয়দিন ধরিয়া বাগবাজার হইতে পাগলের ন্যায় ছুটে ছুটে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিতেছেন; যদি কোনও উপায় হয়;—যদি তিনি এই দুর্জ্জয় শোক নিবারণের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণী ও ভক্তদের প্রতি)।—একজন এখানে এসেছিল। খানিকক্ষণ বসে বলছে, 'যাই একবার ছেলের চাঁদমুখটা দেখিগে'।

"আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, 'তবে রে শালা! ওঠ্ এখান থেকে;—ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ?

[জন্ম-মৃত্যুতত্ত্ব; বাজীকরের ভেল্কী।]

(মাষ্টারের প্রতি) কি জান, ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য।

[জন্ম-মৃত্যু ভেল্কী।]

"জীব, জগৎ, বাড়ী-ঘর-দ্বার—ছেলে-পিলে—এসব বাজীকরের ভেল্কী! বাজীকর কাটি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বল্‌ছে, লাগ, লাগ, লাগ! ঢাকা খুলে দেখ কতকগুলো পাখী! আকাশে উড়ে গেল! বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য! এই আছে এই নাই!

"কৈলাসে শিব বসে আছেন; নন্দী কাছে আছেন। এমন সময়ে একটা ভারি শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুর'! এ কিসের শব্দ হ'লো?' শিব বললেন, 'রাবণ জন্ম গ্রহণ করল, তাই শব্দ'। খানিক পরে আবার একটা ভয়ানক শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে—'এবারে কিসের শব্দ? শিব হেসে বল্‌লেন, 'এবার রাবণ বধ হলো!'

"জন্ম-মৃত্যু—এসব ভেল্কীর মত। এই আছে, এই নাই! ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি,—এই আছে, এই নাই,—ভুড়ভুড়ি জলে মিশিয়ে যায়;—যে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয়।

"ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র; জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই লয়।

"ছেলে, মেয়ে,—যেমন একটা বড় ভুড়ভুড়ির সঙ্গে ৫টা ৬টা ছোট ভুড়ভুড়ি!

"ঈশ্বরই সত্য। তাঁর উপর কিরূপে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন করে লাভ করা যায়, এখন এই চেষ্টা কর; শোক করে কি হবে?

সকলে চুপ করিয়া আছেন, ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'তবে আমি আসি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণীর প্রতি, সস্নেহে)। তুমি এখন যাবে? বড় ধূপ!—কেন, এঁদের সঙ্গে গাড়ী করে যাবে।

আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি, বেলা প্রায় তিনটা চারটা হইবে। ভারি গ্রীষ্ম। একটী ভক্ত ঠাকুরকে একখানি নূতন চন্দনের পাখা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর পাখা পাইয়া আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন "বা"! "বা"!—"ওঁ তৎসৎ!—কালী!" এই বলিয়া প্রথমেই ঠাকুরদের হাওয়া করিতে লাগিলেন। তাহার পরে মাষ্টারকে বলিলেন, দেখ দেখ কেমন হাওয়া!' মাষ্টারও আনন্দিত হইয়া দেখিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাপ্তেন ছেলেদের সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন।

ঠাকুর কিশোরীকে বলিলেন, 'এদের সব দেখিয়ে এস তো,—ঠাকুরবাড়ী।'

ঠাকুর কাপ্তেনের সহিত কথা কহিতেছেন।

মাষ্টার, দ্বিজ ইত্যাদি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন। দমদমার মাষ্টারও আসিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটীতে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়াছেন। তিনি কাপ্তেনকে ছোট খাটটীর একপার্শ্বে তাঁহার সম্মুখে বসিতে বলিলেন।

[পাকা-আমি বা দাস-আমি]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাপ্তেনের প্রতি) তোমার কথা এদের বল্‌ছিলাম; কত ভক্তি, কত পূজা, কত রকম আরতি!

কাপ্তেন (সলজ্জভাবে) আমি কি পূজা—আরতি কোরবো? আমি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে 'আমি' কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, সেই আমিতেই দোষ। আমি ঈশ্বরের দাস, এ আমিতে দোষ নাই। আর বালকের আমি;—বালক যেমন কোন গুণের বশ নয়; এই ঝগড়া করছে, আবার ভাব; এই খেলা-ঘর করলে, কত যত্ন করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেল্‌লে।

"দাস আমি—বালকের আমি, এতে কোন দোষ নাই। এ আমি আমির মধ্যে নয়; যেমন মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টতে অসুখ করে; কিন্তু মিছরিতে বরং অম্লনাশ হয়; আর যেমন ওঁকার শব্দের মধ্যে নয়।

[গোপীদের 'আমি']

"এই অহং দিয়ে সচ্চিদানন্দকে ভালবাসা যায়। অহং তো যাবে না;—তাই 'দাস আমি' 'ভক্তের আমি'; তা না হলে মানুষ কি নিয়ে থাকে!

"গোপীদের কি ভালবাসা! (কাপ্তেনের প্রতি) তুমি গোপীদের কথা কিছু বল। তুমি অত ভাগবত-পড়ো।

কাপ্তেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন,—কোন ঐশ্বর্য্য নাই—তখনও গোপীরা তাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভালবেসে ছিলেন। তাই কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি তাদের ঋণ কেমন করে শুধ্‌বে?—যে গোপীরা আমার প্রতি সব সমর্পণ করেছে,—দেহ-মন-চিত্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন। 'গোবিন্দ'! 'গোবিন্দ'! 'গোবিন্দ'! এই কথা বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইতেছেন। প্রায় বাহ্যশূন্য!

কাপ্তেন সবিস্ময়ে বলিতেছেন, 'ধন্য!' 'ধন্য!'

কাপ্তেন ও সমবেত ভক্তগণ ঠাকুরের এই অদ্ভুত প্রেমাবস্থা দেখিতেছেন। যতক্ষণ না তিনি প্রকৃতিস্থ হন, ততক্ষণ তাঁহারা চুপ করিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাপ্তেনের প্রতি) তার পর?

কাপ্তেন। তিনি যোগীদিগের অগম্য—'যোগিভিরগম্যম্‌'—আপনার ন্যায় যোগীদের অগম্য; কিন্তু গোপীদিগের গম্য। যোগীরা কত বৎসর যোগ করে যাঁকে পায় নাই, কিন্তু গোপীরা অনায়াসে তাঁকে পেয়েছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। গোপীদের কাছে খাওয়া, খেলা, কাঁদা, আব্দার করা, এ সব হয়েছে।

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ও অবতারবাদ।]

একজন ভক্ত বলিলেন 'শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্র লিখেছেন।'*

শ্রীরামকৃষ্ণ। বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানেনা।

কাপ্তেন। বুঝি লীলা মানেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার বলে নাকি কামাদি—এ সব দরকার!

দমদমার মাষ্টার। নবজীবনে বঙ্কিম লিখেছেন—ধর্ম্মের প্রয়োজন এই যে, তাতে শারীরিক, মানসিক, প্রভৃতি সব বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়।

কাপ্তেন। 'কামাদি দরকার',—তবে লীলা মানেন না? ঈশ্বর মানুষ হয়ে বৃন্দাবনে

* কৃষ্ণচরিত্র, ১ম সংস্করণ।

এসেছিলেন, তা মানেন না? রাধাকৃষ্ণ-লীলা মানেন না!

[পূর্ণব্রহ্মের অবতার বা নরলীলা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) ও সব কথা যে খবরের কাগজে নাই; কেমন করে মানা যায়!

"এক জন তার বন্ধুকে এসে বল্লে "ওহে! কাল ও পাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখ্‌লাম, সে বাড়ীটা হুড় মুড়্ করে পড়ে গেল।" বন্ধু বল্লে, "দাঁড়াও হে, একবার খবরের কাগজ খানা দেখি।" এখন খবরের কাগজে বাড়ী হুড়মুড় করে পড়ার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বল্লে, 'কই খবরের কাগজে ত কিছুই নাই!—ওসব কাজের কথা নয়।' সে লোকটা বল্লে—আমি যে দেখে এলাম? ও বল্লে "তা হোক্, যে কালে খবরের কাগজে নাই, সেকালে ওকথা বিশ্বাস কল্লুম না।" ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, একথা কেমন করে বিশ্বাস কর্‌বে? একথা যে ওঁদের ইংরাজি লেখা পড়ার ভিতর নাই।

(কাপ্তেনের প্রতি) পূর্ণ অবতার বোঝানো বড় শক্ত; কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর অনন্ত আসা।

কাপ্তেন। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।' বল্‌বার সময় পূর্ণ ও অংশ বল্‌তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণ ও অংশ;—যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য;—জ্ঞানীর জন্ত নয়। অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে—হে রাম! তুমিই ব্যাপ্য, তুমিই ব্যাপক, "বাচ্য বাচক ভেদেন ত্বমেব পর-মেশ্বর।"

কাপ্তেন। "বাচ্য-বাচক" অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। 'ব্যাপক' অর্থাৎ যেমন ছোট একটী রূপ; যেমন অবতার মানুষরূপ হয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সকলে বসিয়া আছেন। ঠাকুর কাপ্তেন ও ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন ও ত্রৈলোক্য (সান্যাল) আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর সহাস্যে ত্রৈলোক্যের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতেছেন।

[অহঙ্কারই বিনাশের কারণ ও ঈশ্বর-লাভের বিঘ্ন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাপ্তেনাদি ভক্তদের প্রতি) অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বরের বাড়ীর দরজায় সামনে এই অহঙ্কাররূপ গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। এই গুঁড়ি উল্লঙ্ঘন না ক'রলে তাঁর ঘরে প্রবেশ করা যায় না।

"একজন ভূতসিদ্ধ হ'য়েছিল। সিদ্ধ হ'য়ে যাই ডেকেছে, অমনি ভূতটী এসেছে। এসে ব'ল্লে "কি কাজ ক'রতে হবে বল। কাজ যাই দিতে পারবে না, অমনি তোমার ঘাড় ভা'ঙ্গব।" সে ব্যক্তি—যত কাজ দরকার ছিল, সব ক্রমে ক্রমে ক'রিয়ে নিল। তার পর আর কাজ পায় না; ভূতটী বল্লে, "এই বার তোমার ঘাড় ভাঙ্গি।" সে ব'ললে, "একটু থাকবেন, আমি আসছি।" এই ব'লে গুরুদে[illegible]ছে গিয়ে ব'ললে, "মহাশয়! ভারী বিপদে পড়েছি, এই এই বিবরণ;

এখন কি করি?" গুরু তখন ব'ললেন, "তুই এক কর্ম্ম কর্, এই চুলগাছটী সোজা ক'রতে বল্।" ভূতটী দিন রাত ঐ ক'রতে লাগল। চুল কি সোজা হয়? যেমন বাঁকা, তেমনি রইল।

"অহঙ্কার ত্যাগ না ক'রলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।

"কর্ম্মের বাড়ীতে যদি একজনকে ভাঁড়ারি করা যায়, যতক্ষণ ভাঁড়ারে সে থাকে, ততক্ষণ কর্ত্তা আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছা ক'রে ভাঁড়ার ছেড়ে চ'লে যায়, তখনই কর্ত্তা ঘরের চাবি দেয় ও নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।

"নাবালকেরই অছী হয়। ছেলেমানুষ—নিজে বিষয় রক্ষা করতে পারে না;—তখন রাজা ভার ল'ন।

"বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা কর্‌ছিলেন, বল্লেন, "ঠাকুর কোথা যাও?" নারায়ণ বল্লেন, "আমার একটী ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে; তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি"। এই ব'লে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বল্লেন, 'ঠাকুর এত শীঘ্র ফিরলে যে?' নারায়ণ হেসে বল্লেন, 'ভক্তটী প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল; ধোপারা কাপড় শুকোতে দিছ্‌ল, ভক্তটী মাড়িয়ে যাচ্ছিল; তাই দেখে ধোপারা লাঠি নিয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।' লক্ষ্মী আবার বল্লেন, "ফিরে এলেন কেন?" নারায়ণ হাসিতে হাসিতে বল্লেন "সে ভক্তটী নিজে ধোপাদের মারবার জন্য ইট তুলেছে, দেখলাম।" (সকলের হাস্য)।

[অহংকার ও কেশব সেন।]

"কেশব সেনকে বলেছিলাম, "অহং ত্যাগ করতে হবে"।

তাতে কেশব সেন বল্লে—"তা হলে মহাশয়, দল কেমন করে থাকে?"

"আমি বল্লাম, 'তোমার একি বুদ্ধি!—তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর,—যে আমিতে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে; কিন্তু পাকা-আমি, দাস-আমি, ভক্তের আমি, ত্যাগ করতে বল্‌ছি না। আমি ঈশ্বরের দাস; আমি ঈশ্বরের সন্তান,—এর নাম পাকা আমি। এতে কোনও দোষ নাই।

ত্রৈলোক্য। অহঙ্কার যাওয়া বড় শক্ত। লোকে মনে করে, বুঝি গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাছে অহঙ্কার হয় ব'লে গৌরী 'আমি' বলত না;—বলত 'ইনি'। আমিও তার দেখাদেখি বলতাম 'ইনি'; 'আমি খেয়েছি' না বলে, বলতাম 'ইনি খেয়েছেন।' সেজো বাবু তাই দেখে এক দিন বল্লে,"সে কি বাবা, তুমি ওসব কেন ব'লবে? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহঙ্কার আছে। তোমার ত আর অহঙ্কার নাই; তোমার ওসব বলার কিছু দরকার নাই।"

"কেশবকে বল্লাম,"আমি তো যাবে না;—অতএব দাস ভাবে থাক্;—যেমন দাস।

"প্রহ্লাদ দুই ভাবে থাকতেন। কখনও বোধ করতেন—'তুমিই আমি' 'আমিই তুমি';—'সোহহং'। আবার যখন অহংবুদ্ধি আসত, তখন দেখতেন, আমি দাস, তুমি প্রভু।

"একবার পাকা "সোঽহং" হলে পর, তার পর দাস-ভাবে থাকা ;—যেমন আমি দাস।

[ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ।]

(কাপ্তেনের প্রতি) "ব্রহ্মজ্ঞান হলে কতকগুলি লক্ষণে বুঝা যায়। শ্রীমৎভাগবতে জ্ঞানীর ৪টী অবস্থার কথা আছে — ১—বালকবৎ, ২—জড়বৎ, ৩—উন্মাদবৎ ৪—পিশাচবৎ। পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। আবার কখনও পাগলের মতন ব্যবহার করে।

"কখনও জড়ের ন্যায় থাকে। এ অবস্থায় কর্ম্ম ক'রতে পারে না, কর্ম্মত্যাগ হয়। তবে যদি বল জনকাদি কর্ম্ম করেছিলেন ; তা কি জান, তখনকার লোক কর্ম্মচারীদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ত। আর তখনকার লোকও খুব বিশ্বাসী ছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কর্ম্মত্যাগের কথা বলিতেছেন ; আবার যাঁদের কর্ম্মে আসক্তি আছে, তাঁদের অনাসক্ত হতে চেষ্টা ক'রতে ব'লছেন ; অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করিতে ব'লছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান হ'লে বেশী কর্ম্ম ক'রতে পারে না।

ত্রৈলোক্য। কেন ? পাওহারি বাবা এমন যোগী পুরুষ, কিন্তু লোকেদের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেন,—এমন কি, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, হাঁ, তা বটে। দুর্গাচরণ ডাক্তার এতো মাতাল, ২৪ ঘণ্টা মদ খেয়ে থাকত, কিন্তু কাজের বেলা ঠিক,—চিকিৎসা ক'রবার সময় কোনও ভুল হবে না।

"ভক্তি লাভ ক'রে কর্ম্ম ক'রলে দোষ নাই। কিন্তু বড় কঠিন, খুব তপস্যা চাই।

[ভক্তের আ র]

ঈশ্বরই সব ক'রছেন আমরা যন্ত্রস্বরূপ। কালী-ঘরের সামনে শিখরা বল'ছল, 'ঈশ্বর দয়াময়'। আমি বললাম, দয়া কা'দের উপর ?

শিখরা বল্লে 'কেন মহারাজ ? আমাদের সকলের উপর।

আমি বল্লাম, "আমরা সকলে তাঁর ছেলে ; ছেলের উপর আবার দয়া কি ? তিনি ছেলেদের দেখ্‌ছেন ;—তা তিনি দেখবেন না তো বামুন পাড়ার লোকে এসে দেখ্‌বে ?"

(কাপ্তেনের প্রতি)। "আচ্ছা, যারা 'দয়াময়' বলে, তারা এটা ভাবে না, যে আমরা কি পরের ছেলে ?

কাপ্তেন। আজ্ঞা হাঁ, এত আপনার ব'লে বোধ থাকে না।

[ভক্ত ও পূজাদি। ঈশ্বর ভক্তবৎসল]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে কি 'দয়াময়' বল্‌বে না ? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা, ততক্ষণ ব'লবে। তাঁকে লাভ হলে তবে ঠিক আপনার বাপ, কি আপনার মা, বলে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ বোধ হয় —আমরা খুব দূরের লোক,—পরের ছেলে।

"সাধনাবস্থায় তাঁকে সবই ব'লতে হয়। হাজরা নরেন্দ্রকে একদিন বল'ছিল 'ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর ঐশ্বর্য্য অনন্ত। তিনি কি আর সন্দেশ কলা—খাবেন ? না তিনি গান শুনবেন ? ওসব মনের ভুল।'

"নরেন্দ্র অমনি দশ হাত নেমে গেল। তখন আমি হাজরাকে বললাম, "তুমি কি

পাজী! ওদের অমন কথা ব'ললে ওরা দাঁড়ায় কোথা? ভক্তি গেলে মানুষ কি নিয়ে থাকে? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য, তবুও তিনি ভক্তাধীন!'

"বড় মানুষের দারবান একদিন এসে বাবুর সভার একধারে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কি একটি জিনিস আছে, কাপড়ে ঢাকা। অতি সঙ্কোচভাবে আছে। বাবু জিজ্ঞাসা কর'লেন, "কি দরবান, হাতে কি আছে?" দরবান সঙ্কোচভাবে একটি আতা বার করে বাবুর সামনে রাখ্‌লে,—ইচ্ছা বাবু ওটি খাবেন। বাবু দ্বারবানের ভক্তিভাব দেখে আতাটি খুব আদর করে নিলেন, আর বল্লেন, "আহা! এটি বেশ আতা, তুমি এটি কোথা থেকে কষ্ট ক'রে আন্‌লে?"

তিনি ভক্তাধীন। দুর্য্যোধন অত যত্ন দেখালেন, আর বল্লেন, এখানে খাওয়া দাওয়া করুন; ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু বিদুরের কুটীরে গেলেন! তিনি ভক্তবৎসল;—বিদুরের শাকান্ন তিনি সুধার ন্যায় খেলেন।

"পূর্ণ জ্ঞানীর আর একটি লক্ষণ—পিশাচবৎ। খাওয়া দাওয়ার বিচার নাই—শুচি-অশুচির বিচার নাই।

"পূর্ণজ্ঞানী আর পূর্ণমূর্খ, দুজনেরই বাহিরের লক্ষণ এক রকম! পূর্ণজ্ঞানী হয়ত গঙ্গাস্নানে মন্ত্র পাঠ কর্‌লে না; ঠাকুরপূজা করবার সময় ফুলগুলি হয় ত এক সঙ্গে ঠাকুরের চরণে দিয়ে চলে এল, কোনও মন্ত্র তন্ত্র নাই!

[কর্ম্মী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

"যতদিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা, ততক্ষণ কর্ম্ম।

"একটি পাখী জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্কে বসে ছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতরে ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়্‌ল। তখন পাখীটীর চট্‌কা ভাঙলো, সে দেখ্‌লে চতুর্দ্দিকে কূল কিনারা নাই। তখন ডাঙায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হ'য়ে গেল, তবু কূলকিনারা দেখ্‌তে পেলে না। তখন কি করে—ফিরে এসে আবার মাস্তুলে এসে বস্‌ল।

"অনেক ক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল;—এবার পূর্ব্ব দিকে গেল। সে দিকে কিছুই দেখতে পেলে না; চারি দিকে কেবল অকূল পাথার! তখন ভারী পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বস্‌ল। অনেক ক্ষণ জিরিয়ে এইবার দক্ষিণ দিকে; এইরূপে আবার পশ্চিম দিকে গেল। যখন দেখ্‌লে কোথাও কূলকিনারা নাই, তখন সেই যে মাস্তুলের উপর বস্‌ল, আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোন ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর কোনও চেষ্টাও নাই।

কাপ্তেন। আহা কেয়া দৃষ্টান্ত!

[ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়; যখন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ পায়; তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ

আসে। অনেকের ভোগ না কর'লে ত্যাগ হয় না। কুটীচক আর বহূদক। সাধকদের ভিতরও কেউ কেউ অনেক তীর্থে ঘোরে; এক জায়গায় স্থির হয়ে বস্‌তে পারে না; অনেক তীর্থের উদক—কিনা জল খায়। যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে যায়, তখন এক জায়গায় কুটীর বেঁধে বসে। আর নিশ্চিন্ত ও চেষ্টাশূন্য হয়ে ভগবানকে চিন্তা করে।

"কিন্তু কি ভোগ সংসারে কর'বে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ! এই আছে, এই নাই!

"প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগে আছে, সূর্য্য দেখা যায় না। দুঃখের ভাগই বেশী। আর কামিনী-কাঞ্চনমেঘ সূর্য্যকে দেখ্‌তে দেয় না।

"কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে 'মশায়, ঈশ্বর কেন এমন সংসার কর'লেন? আমাদের কি কোনও উপায় নাই?

"আমি বলি, 'উপায় থাকবে না কেন? তাঁ'র শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা' কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়,—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

"একজনের ছেলেটী যায় যায় হয়েছিল। সে ব্যক্তি ব্যাকুল হয়ে এর কাছে ওর কাছে উপায় জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছে। একজন বল্লে "তুমি যদি এইটী যোগাড় করতে পার তো ভাল হয়,—স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়্‌বে মড়ার মাথার খুলির উপর। সেই জল একটী ব্যাঙ খেতে যাবে। সেই ব্যাঙকে একটী সাপে তাড়া করবে। ব্যাঙকে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ ঐ মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর ব্যাঙটী পালিয়ে যাবে। সেই বিষ জল একটু নিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

"লোকটী অমনি ব্যাকুল হয়ে সেই ঔষধ খুঁজতে স্বাতী নক্ষত্রে বেরুল। এমন সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তখন ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে বল্‌ছে, ঠাকুর! এইবার মড়ার মাথা জুটিয়ে দাও। খুঁজতে খুঁজতে দেখে, একটী মড়ার খুলি, তাতে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়েছে; তখন সে আবার প্রার্থনা ক'রে বল্‌তে লাগল, দোহাই ঠাকুর! এইবার আর দুইটী জুটিয়ে দাও—ব্যাঙ ও সাপ! তার যেমন ব্যাকুলতা, তেমনি সব জুটে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটী সাপ ব্যাঙকে তাড়া ক'রে আস্‌ছে, আর কামড়াতে গিয়ে তার বিষ ঐ খুলির ভিতর পড়ে গেল!

"ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডা'কলে তিনি শুনবেনই শুনবেন,—সব সুযোগ ক'রে দেবেন।

কাপ্তেন। কেয়া দৃষ্টান্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ তিনি সুযোগ ক'রে দেন। হয় ত,—বিয়ে হ'ল না, সব মন ঈশ্বরকে দিতে পারলে। হয় ত ভায়েরা রোজগার ক'রতে লাগল বা একটী ছেলে মানুষ হ'য়ে গেল; তা হলে তোমার আর সংসার দেখতে হল না। তখন তুমি অনায়াসে যোলআনা মন ঈশ্বরকে দিতে পার।

"তবে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে হবে না। ত্যাগ হলে, তবে অজ্ঞান, অবিদ্যা নাশ হয়। আতস কাঁচের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়্‌লে কত জিনিস পুড়ে

যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে আতস কাঁচ নিয়ে গেলে এটী হয় না। ঘর ত্যাগ ক'রে বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়।

[ঈশ্বরলাভের পর সংসার—জনকাদির।]

"তবে জ্ঞান লাভের পর কেউ কেউ সংসারে থাকে। তারা ঘর-বার দুইই দেখতে পায়। জ্ঞানের আলো সংসারের ভিতর পড়ে, তাই তারা ভাল, মন্দ, নিত্য, অনিত্য, এ সব সেই আলোতে দেখতে পায়।

"যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটীর ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভিতরটী দেখতে পায়। কিন্তু যারা জ্ঞান লাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে, তার পর সংসারে আছে, তারা যেন সারসীর ঘরের ভিতর বাস করে। ঘরের ভিতরও দেখতে পায়, ঘরের বাহিরের জিনিসও দেখতে পায়। জ্ঞানসূর্য্যের আলো ঘরের ভিতরে খুব প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি ঘরের ভিতরের জিনিস খুব স্পষ্টরূপে দেখতে পায়,—কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, কোন্‌টী নিত্য, কোন্‌টী অনিত্য।

"ঈশ্বরই কর্ত্তা আর সব তাঁর যন্ত্রস্বরূপ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও গুরুগিরি।]

"তাই জ্ঞানীরও অহঙ্কার করবার যো নাই। মহিম্নস্তব যে লিখেছিল, তার অহংকার হয়েছিল। শিবের ষাঁড় যখন দাঁত বার ক'রে দেখালে, তখন তা'র অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। দেখলে এক একটী দাঁত এক এক মন্ত্র। তার মানে কি জান? এ সব মন্ত্র অনাদিকাল ছিল। তুমি কেবল উদ্ধার করলে।

"গুরুগিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য্য হওয়া যায় না।

"যে নিজে বলে 'আমি গুরু' সে হীনবুদ্ধি। দাঁড়িপাল্লা দেখ নাই? হাল্‌কা দিক্‌টা উঁচু হয়।

"যে ব্যক্তি নিজে উঁচু হয়, সে হাল্‌কা। সকলেই গুরু হতে যায়!—শিষ্য পাওয়া যায় না।

ত্রৈলোক্য ছোট খাটটীর উত্তর ধারে মেঝেতে বসিয়াছেন। ত্রৈলোক্য গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'আহা! তোমার কি গান!' ত্রৈলোক্য তানপুরা লইয়া গান করিতেছেন:—

গান।

তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিল্‌কো লাগায়া।
যো কুচ হায় সব্ তুঁহি হায়॥

(দ্বিতীয় ভাগ, ২১৫ পৃষ্ঠা)

গান।

তুমি সর্ব্বস্ব আমার (হে নাথ!) প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার॥
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম।
তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য,
তুমি স্রষ্টা—পাতা, তুমি হে উপাস্য।
দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা,
ভবার্ণবে কর্ণধার॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিয়া ভাবে বিভোর হইতেছেন। আর বলিতেছেন, আহা! তুমিই সব! আহা! আহা!

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর খানিক

গিয়াছে। ঠাকুর মুখ ধুইতে ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। হঠাৎ বলিলেন 'কই তোমরা খেলে না? আর ওরা খেলে না?' ঠাকুর ভক্তদের প্রসাদ দিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন।

[নরেন্দ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

আজ ঠাকুরের সন্ধ্যার পর কলিকাতায় যাইবার কথা আছে। ঝাউতলা থেকে ফিরিবার সময় মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'তাই ত কার গাড়ীতে যাই?'

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইতেছে। ঠাকুর-বাড়ীতে সব স্থানে ফরাস আলো জ্বালিয়া দিল। রোশনচৌকি বাজিতেছে। এবার দ্বাদশ শিব-মন্দিরে, বিষ্ণুঘরে ও কালীঘরে আরতি হইবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটীতে বসিয়া ঠাকুরদের নাম কীর্ত্তনানন্তর মা'র ধ্যান করিতেছেন।

আরতি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরে এদিক্ ওদিক্ পায়চারি করিতেছেন ও ভক্তদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে শরৎ ও আরও দুই একটি ছোকরা। তাঁহারা আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরের স্নেহ যেন উথলাইয়া পড়িল। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে, ঠাকুর নরেন্দ্রের মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'তুমি এসেছ!'

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে কলিকাতায় যাইবার জন্ত মাষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিলেন।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে পশ্চিমাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নরেন্দ্র ও আর কয়টী ছোকরা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছেন,—'নরেন্দ্র এসেছে, আর যাওয়া যায়? লোক দিয়ে নরেন্দ্রদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম; আর যাওয়া যায়? কি বল?

মাষ্টার। যে আজ্ঞা, আজ তবে থাক্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা কাল যাব, হয় নৌকায়, নয় গাড়ীতে। (অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) 'তোমরা তবে এস আজ;—রাত হল।' ভক্তেরা সকলে একে একে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সেবা-গীতা।

["ব্রহ্মচারিণ্" (ইংরাজী) মাসিক পত্র হইতে পদ্যানুবাদিত।]

১। শুন দীন-নিবেদন ভারত-সন্তান!
এ ভবে সেবাই শুদ্ধ সাধু অনুষ্ঠান।

২। পরসেবা করহে সাধন।
সেবার্থেই জীবন-ধারণ॥

৩। পরসেবা করহে সাধন।
সেবাতেই বিশ্বের স্থাপন॥

৪। পরসেবা করহে নিয়ত।
আত্মসেবা পরসেবা-গত॥

৫। পরসেবাপরায়ণ রহ নিরন্তর।
প্রতি বস্তু সেবাশীল বিশ্বে পরস্পর॥

৬। পরসেবা কর সম্পাদন।
তোমারেও পরে সেবি রক্ষিছে জীবন॥

৭। পরসেবা সাধ অনিবার।
সেবাই যে স্বভাব তোমার॥

৮। পরসেবা প্রত্যেকেরি কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
সেবাক্ষেত্রে কেহ কারো প্রভু কভু নয়॥

৯। পরসেবা কর অনিবার।
সৃষ্ট জীবে সেবে যেবা,
স্রষ্টারে সে করে সেবা;
সেবাতীত স্বরূপ তাঁহার॥

১০। দেখ ঐ আকাশে চেয়ে,রবি-শশী-তারা—
বিশ্বের সেবায় সদা ঘুরিতেছে তারা॥

১১। নিম্নে চেয়ে দেখ এ ধরায়।—
পশু-পক্ষী-তরু-লতা,
গিরি-সিন্ধু-গিরিসুতা,
সবে রত জগৎ-সেবায়॥

১২। পরসেবা কর নিরন্তরে।—
বহ্নি দহে, বায়ু বহে,
রবি রৌদ্র দিতে রহে,
নদী ছোটে, বৃষ্টি-হিম ঝরে।
সবাই জগৎ-সেবা করে॥

১৩। কি অশ্বথ তরুরাজ,
কি ক্ষুদ্র তুলসীগাছ,
সকলেই অবিরত—
জগৎ-সেবায় রত;
অশ্বত্থ-তুলসী, তুমি যার তুল্য হও,
যথাসাধ্য পরসেবা-ব্রতরত রও॥

১৪। কুটীরে বা প্রাসাদেই রও,
পরসেবা-ব্রত-রত হও॥

১৫। পরসেবা ধর, সেবা তুচ্ছিওনা কাজে।
উচ্চ-তুচ্ছ সেবাকার্য্য যা তোমারে সাজে॥

১৬। পরসেবা কর, ভেবনা ভাই!
তোমার সেবার নিয়োগ নাই;
প্রত্যেকেরি এই পৃথিবী-মাঝ,
আছেই কিঞ্চিৎ সেবার কাজ॥

১৭। পরসেবা করিবে নিশ্চয়;
ভেবনা সে যোগ্য তুমি নয়।
নেহাৎ কিছুনা কার্য্য পাও,
পথ হতে কাঁটাটি সরাও।

১৮। পরসেবা কর অহরহ;
ভেবনা সক্ষম তুমি নহ।
নেহাৎ ভাবিলে কার্য্যাভাব,
কোঁস্তা হাতে রাস্তা কর সাফ্॥

১৯। সেবা কর করি দান,
যদি হও বিত্তবান।
সেবা কর দিয়ে জ্ঞান,
যদি হও জ্ঞানবান।
সেব দিয়ে সদৌষধি,
চিকিৎসক হও যদি।
না হও তদুপযোগী,
শুশ্রূষায় সেব রোগী॥

২০। পরসেবা কর;
আর কিছু না পার,
মিষ্ট বাক্যে সবে
তুষ্ট কর ভবে॥

২১। পরসেবা কর;
আর কিছু না পার,
সাধু-চিন্তা সহ,
বিশ্ব-হিতে রহ॥

২২। পরসেবা-রত থাক,
প্রতিদান চেয়োনাক।
পরসেবা-রত থাকি,
আত্মতৃপ্তি পাওনা কি?

২৩। পরসেবা কর প্রতিক্ষণে।—

উচ্চতম প্রভু যিনি,
সেবেন সতত তিনি—
নীচাদপি নীচতম জনে ॥

২৪। পরসেবা কর সর্ব্বদাই।—
ধরা-নরাধিপ যাঁরা,
সর্ব্বোচ্চ সেবক তাঁরা—
স্বীয় স্বীয় সাম্রাজ্যে সবাই ॥

২৫। পরসেবা কর নিরন্তর।—
ভবে কার প্রভু কেবা?
একে অন্যে করে সেবা;
সবাই সেবক পরস্পর ॥

২৬। পরসেবা কর মন দিয়া।—
সেবার্থে কেহই কারে
অগ্রে আদেশিতে নারে,
পরসেবা নিজে না সাধিয়া ॥

২৭। পরসেবা কর সম্পাদন।—
সেবা-ধর্ম্ম বিনা হায়!
কেহ কভু নাহি পায়
স্বর্গীয় সুখের আস্বাদন ॥

২৮। পরসেবা কর, সেবা অবনীতে অত্র—
স্বর্গদ্বার-প্রবেশের প্রবেশিকা-পত্র ॥

২৯। পরসেবা কর সবে ভবে।
পরসেবা-রত জন
লভে আত্মপ্রসারণ,
এক হতে　সর্ব্বভূতে
সম অনুভবে ॥

৩০। পরসেবা কর সম্পাদন;—
সেবা-ধর্ম্ম সর্ব্বার্থসাধন।
অনৈক্যেতে ঐক্য আনে,
শ্রান্তি হরে শান্তি দানে,
বিষাদে প্রসাদ আনে,
দৈন্যে আনে ধন ॥

৩১। পরসেবা কর অনুরাগে।—
সেবার সম্মুখ হতে হিংসা-দ্বেষ ভাগে ॥

৩২। প্রভু হতে ইচ্ছা ধর,
সেবকের সেবা কর ॥

৩৩। আচার্য্যত্ব ইচ্ছা কর,
শিষ্যের সেবন ধর ॥

৩৪। সুপতিত্ব চাহ যেবা,
প্রেমে কর পত্নীসেবা ॥

৩৫ সুপিতৃত্ব চাহ যেবা,
স্নেহে কর পুত্রসেবা ॥

৩৬ পরসেবা নিত্য নিষ্কাম থাক্।
লাগায়োনা তায় কামের দাগ ॥

৩৭ ভ্রাতৃভাবে সেবা কর সবার।
প্রভু-ভৃত্য-ভাব ভেবনা তার ॥

৩৮। পরসেবা কর সবে।
পরেশ-পিতৃত্ব, নরের ভ্রাতৃত্ব—
সেবাতেই সিদ্ধ হবে ॥

৩৯। পরসেবা-রসে রম।—
সেবা-রাজ্যে তুচ্ছ
হয় সর্ব্ব-উচ্চ;
উচ্চ হয় নীচতম ॥

৪০। পরসেবা সদা করহে সবে।—
বিহঙ্গ-পতঙ্গ—
করে সেবা-সঙ্গ,
তরু-লতা তায় ফল প্রসবে ॥

৪১। পরসেবা কর, জাননাকি হায়!
কাদা-জল আদি সাথীর সেবায়,
কলঙ্ক-কণিকা হীরকত্ব পায়?

৪২। পরসেবা কর, জাননাকি হায়!
জল-বালি আদি সাথীর সেবায়,
জন্মে নীলমণি কর্দ্দম-কণায়?

৪৩। পরসেবা কর, জ্ঞানলাভি হায়!
কাদা-জল আদি সাথীর সেবায়,
বালুবিন্দু রত্ন-উপলত্ব পায়?*

৪৪। পরসেবা কর সবে।—
পরসেবা-বলে,
আত্মোন্নতি-ফলে,
সাধুতা-সুদীপ্ত হবে॥

৪৫। পরসেবা কর সদা।—
সেবা-ধর্ম্মে যেন
মেনো না কখনো
জাতি-কুল-বর্ণ-বাধা॥

৪৬। পরসেবা কর সবে সদা।
সেবাধর্ম্ম বরাভয়দাতা॥

৪৭। জীবন সার্থক কর পরসেবা করি।
পরসেবা-পরিতৃপ্ত পরাৎপর হরি॥

স্বারাজ্য-গীতা।

("ব্রহ্মচারিণ্" নামক ইংরাজী মাসিক-পত্র হইতে পদ্যানুবাদিত।)

১। শুন মম নিবেদন ভারত-সন্তান!
শুধু স্বারাজ্যেই তব মুক্তি বর্ত্তমান॥

২। আত্মজ্ঞানে চিনি আত্মা আপনার,
আত্মশাসনের লভ অধিকার॥

৩। জানহে আত্মাকে আপনার,—
জন্ম-মৃত্যু নাহিক ইহার।
অগ্নিতে না পোড়ে ইহা,
জলেতে না বোড়ে।
অস্ত্রেতে না ফাঁড়ে ইহা,
গুলিতে না ফোঁড়ে॥

৪। আত্মজ্ঞানে আত্মা চিনিয়া লও;
স্ব-আত্মশাসনে স্বরাট্ হও।
সম্রাট্ হও যে সাম্রাজ্যে সবে;
অনন্তে যাহার সীমান্ত হবে॥

৫। আত্মজ্ঞানে চেন আপনায়;
মহাশক্তি পাবে তুমি তায়।
অবশ্যই হইবে তোমার
স্বারাজ্য-সাম্রাজ্য-অধিকার॥

৬। সিংহ তুমি, জানিও বিশেষ;
আপনারে ভাবিওনা মেষ।
অবশ্যই হইবে তোমার—
স্বারাজ্য-সাম্রাজ্য-অধিকার॥

৭। মায়া-মোহ-মেঘ-মুক্ত হয়ে ভবে,
স্বরাট্-সম্রাট্ হও সগৌরবে॥

৮। দূর কর ইন্দ্রিয়-বিকার;
অজ্ঞানতা, ভ্রান্তসংস্কার;
হিংসা-দ্বেষ-গোঁড়ামী এড়াও।
স্বারাজ্যে—সাম্রাজ্যে শোভা পাও॥

৯। ভ্রাতৃভাবে ভালবেসে সবে,
লভ আত্মশাসন এ ভবে॥

১০। প্রভুশক্তিশালী যেন অন্য জন
না করে তোমাতে প্রভুত্বস্থাপন।
স্ব-আত্মা স্বায়ত্ত করিয়া লও;
আপনার প্রভু আপনি হও॥

১১। ক্লীবত্ব—কাপুরুষত্ব পরিহরি তব।
স্বরাট্ সম্রাট্-সত্ত্ব আত্মরাজ্যে লভ॥

---

* ৪১।৪২।৪৩ সংখ্যক গীতা-সূত্রের পরিষ্কার অর্থ-বোধ রসায়ন-বিজ্ঞানের তত্ত্ব-বিশেষের আলোচনা-সাপেক্ষ। ফলে মূল শিক্ষাটি এইরূপ যে, সেবা-গুণে অধম উত্তম হয়, তুচ্ছ উচ্চ হয়, নগণ্য সুগণ্য হয়। সেবায়-অসাধ্য সিদ্ধ হয়, অসম্ভব সম্ভব হয়।

১২। তব আত্মগত নিত্য এ বিশ্ববিরাট,
আত্মজ্ঞানে জেনে হও স্বরাট্ সম্রাট্॥

১৩। না হইলে আত্মজ্ঞানোন্নতি,
দীন দাস হন পৃথ্বীপতি।
ভৃত্য তাঁর আত্মজ্ঞান-বলে—
স্বরাট্-সম্রাট্ ধরাতলে!

১৪। আত্মজ্ঞ অভীত র'ন
রাজসভা-রণস্থলে।
স্বরাট্—সম্রাট্ হন
নিত্য আত্মজ্ঞান-বলে॥

১৫। ঐহিক স্বারাজ্যে ইচ্ছা যদি থাকে,
অধ্যাত্ম স্বারাজ্য উপার্জ্জিবে আগে॥

১৬। কায়মনোবাক্যে পবিত্র যে জন,
পাবে সে স্বারাজ্যে স্বায়ত্তশাসন॥

তত্ত্ব-চিন্তা।

(জীব ভাগ।)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে—মনুষ্যের কায়া আছে, কার্য্যও আছে, সুতরাং "জীব" অভিমান বা বোধ আছে। ঈশ্বরের প্রাকৃত কায়া নাই, কার্য্য আছে, জীবাভিমান নাই, সত্ত্ব-অনুভব আছে। ব্রহ্মের কায়া নাই, কার্য্যও নাই, সুতরাং জীবাভিমান এবং সত্ত্ব-অনুভব নাই। তিনি সৎসত্তা, যাঁহা হইতে সমস্ত উদয় বা প্রকাশ হইয়াছে, তিনি সাক্ষী-স্বরূপ।

জীবের বিষয় অধিক, আয়ত্ত অল্প।

ঈশ্বরের বিষয় যত, আয়ত্তও তত।

৩ ব্রহ্মের বিষয় নাই, সত্তা বলিয়া আয়ত্তই সমুদয়।

জীবের বিষয়—বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, ও ভূত, অর্থাৎ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতসম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়।

ঈশ্বরের বিষয়—জীব ও জীবের যাবতীয় বিষয়।

ব্রহ্মের বিষয় নাই, তিনি বিষয়ী নহেন, স্বরূপ, সর্ব্ব বিষয়ের সত্ত।

সর্ব্ব বিষয়ের সত্তা বলিয়া তাঁহাকে পূর্ণ বিষয়ী বলিতে চাও, বল; কিন্তু এ কল্পনা মিথ্যা, কারণ তাঁহার অধিকার বোধ নাই। যতক্ষণ তাঁহাকে অধিকার-বোদ্ধা ভাবিবে, ততক্ষণ তাঁহাকে ঈশ্বর বল; আর যতক্ষণ সেই অধিকার-বোদ্ধা ঈশ্বরকে বিষয়ভোগী মনে করিবে, ততক্ষণ তাঁহাকে জীব বল। অর্থাৎ অনাসক্ত জীবই ঈশ্বর, ভোগশূন্য অনুভবস্বরূপ ঈশ্বরই ব্রহ্ম।

স্থানে স্থানে বুদ্ধি ও চৈতন্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারা একাধিক প্রকার বলিয়া, বিভিন্নতা বুঝাইবার জন্য গুরুরা বলেন—

(১) বুদ্ধি তিন প্রকার—দেহবুদ্ধি, জীব-বুদ্ধি, আত্মবুদ্ধি।

(২) চৈতন্য চারি প্রকার—জীবচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্য, কূটস্থচৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য।

৪। দেহ-বুদ্ধিতে কেবল "তুমি প্রভু" এই বোধ হয়। জীব-বুদ্ধিতে "তুমি-আমি" (সখ্যভাব) বোধ থাকে।

আত্মবুদ্ধিতে কেবল "অহং" বোধ হয়।

৫। (ক) জীবচৈতন্যে "জলাকাশ" বোধ।

জীব জলকে দেখিতেছে—জল সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ বোধ।

—মেঘ দেখিতেছে না, জলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতেছে; মেঘ সম্বন্ধে আনুমানিক বোধ।

—জল ও মেঘের প্রতিবিম্বকে যে দেখাইতেছে—অর্থাৎ সূর্য্য, তৎসম্বন্ধে বোধ আসিতেছে না।

—জল, মেঘ ও সূর্য্য যে আকাশে আছে, তৎসম্বন্ধে কোন বোধই নাই।

(খ) ঈশ্বর-চৈতন্যে "মেঘাকাশ" বোধ।

—জীব মেঘকে দেখিতেছে, তৎসম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ বোধ।

—জীব সূর্য্যকে দেখিতেছে না, তৎসম্বন্ধে আনুমানিক বোধ।

—সূর্য্যাধার আকাশ সম্বন্ধে বোধ আসিতেছে না; বোধ নাই তাহা নহে।

(গ) কূটস্থ চৈতন্যে "ঘটাকাশ" বোধ।

—জীব সূর্য্যকে দেখিতেছে, তৎসম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ বোধ।

—জীব আকাশকে দেখিতেছে না, তৎসম্বন্ধে তাহার আনুমানিক বোধ।

(ঘ) ব্রহ্মচৈতন্যে "আকাশ" বোধ।

—জীব আকাশকে দেখিতেছে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বোধ।

ভাষা—কল্পনা।

যে রূপে, যে ভাবে, যে অবস্থায় অহং প্রকাশ, তৎসম্বন্ধে গুহ্য ও বাহ্য দুইই থাকে। গুহ্য প্রকাশ করিবার একটী উপায় ভাষা। গুহ্য উপলব্ধি করিবার একটী উপায় কল্পনা। ভাষায় প্রকাশিত গুহ্য বিষয় সাধারণতঃ বোধগম্য হয় না। কল্পনাশক্তিও সকলের নাই; সুতরাং শাস্ত্র বা শাস্ত্র-উল্লিখিত বিষয় সমুদয় সকলের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে।

দেবতার বিষয় বা পশুর বিষয় (গুহ্য বিষয়) অবগত হইবার মনুষ্যের একমাত্র উপায় কল্পনা। যাহার যেরূপ কল্পনা, তাহার ধারণাও তদনুযায়িনী। আমরা দেবতাকে দেবতা বলিয়া কল্পনা করি; পশুকে পশু বলিয়া কল্পনা করি। পশুরা আমাদিগকে পশু-বোধ হইতে কি ভাবিয়া থাকে, তাহা আমরা জানি না, তাই বলিয়া পশুদিগের মনুষ্য সম্বন্ধে কোন বোধ নাই, তাহা প্রকৃত নহে। পশু-বোধ আমাদের নাই, তাই আমরা জানি না—তাহারা আমাদিগকে কি বলিয়া জানে।

৭। মনুষ্য কল্পনায় "ব্রহ্ম," সুতরাং কল্পনা মাত্র। ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহার যেরূপ কল্পনা, তাহার ধারণাও তদনুরূপিণী। একের ধারণায় ব্রহ্ম যাহা, অপরের ধারণায় তাহাই, ইহা স্বীকার্য্য নহে। এই হেতু "বুদ্ধিভেদ" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৮। কল্পনা অনুভব-প্রসূত। এই অনুভব, অনুভবস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত সকলেরই আছে, তবে সদৃশ নহে।

৯। বোধ অপরোক্ষ—সহজ; বোধি পরোক্ষ সহজ নহে—শিক্ষা দ্বারা উপলভ্য।

অপরোক্ষ বোধ সত্য, পরোক্ষ বোধ সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত। মনুষ্য জন্মে জন্মে পরোক্ষ-বোধ সংগ্রহ করে—করিতে করিতে তাহার অপরোক্ষ বোধ পরোক্ষ-বোধে ডুবিয়া যায়। শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গুরু-দীক্ষা হইতে যে বোধ জন্মে, উহাও পরোক্ষবোধ, তবে শাস্ত্রে কথিত বিষয় উপলব্ধি ও মন্ত্রসাধন করিলে অপরোক্ষ বোধ আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে। অপরোক্ষ বোধ উদয়েই যেন বহির্মুখ অহং অন্তর্মুখে ধাবমান হয়। তখন সেই অহং ভাবের চিত্তবৃত্তিকে "মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা" কহে।

১০। আত্মজ্ঞ অহংকে যে অর্থে "সৎ-স্বরূপ" কহিয়াছেন, তাহা এখন সাধারণতঃ বোধগম্য হয় না, কারণ সাধারণ শ্রোতা পরোক্ষ বোধ বশতঃ সত্য কল্পনা বা সত্য ধারণা করিতে অক্ষম। সেই "সৎ-স্বরূপ" কথা যার তার মুখে শুনা যায়। মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, কোনও ব্যক্তি উহা প্রকৃত ধারণা করিতে পারে নাই। "ঈশ্বর" শব্দ অনুরাগের সহিত প্রয়োগ এক, আর ভয়প্রদর্শন করাইতে বা ভয়ে বা অনুরাগবিহীন হইয়া প্রয়োগ করা এক। "রাম" শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনুষ্য প্রসন্নতা লাভ করিত, এখন বিষ্ঠায় পদস্পর্শ হইলে "হা রাম!" বলিয়া উঠে। এরূপ পরিবর্ত্তনের হেতু পরোক্ষ বোধে সত্য কল্পনা—সত্য ধারণা স্থান পায় না, উদয়ও হয় না।*

* "রাম" নামের ফল চিত্তপ্রসন্নতা সর্ব্বত্রই। বিষ্ঠাস্পর্শজনিত অপ্রসন্নতা "হা রাম!" বাক্যেই বিদূরিত হয়! সে স্থলেও "রাম" নামই অশুচিতার শুচিত্ব—অপবিত্রতার প্রায়শ্চিত্ত। (সঃ)

১১। অবস্থা—

জীব চারি প্রকার অবস্থায় থাকিতে পারে। ১। জাগ্রত, ২। স্বপ্ন, ৩। সুষুপ্তি, ৪। তুরীয়।

(১) জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ (অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ) জাগ্রত (কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত) থাকে মন সর্ব্বনাড়ীতে বিচরণ করে; সুতরাং সুখ দুঃখ দুইই ভোগ হয়। মনের আজ্ঞা মত সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য করিলেও, তাহাতে বুদ্ধির দৃষ্টি থাকে। জাগ্রতিতে তিন অংশ বিকার, উহাতে তামসিক মোহ। জাগ্রতিতে "আমি" ভ্রূযুগে থাকেন।

(২) স্বপ্নাবস্থায় "আমি" কণ্ঠে থাকেন। মন স্বপ্ননাড়ীতে বিচরণ করে। ঐ নাড়ী হৃদয়ের চতুর্দ্দিকে গোলক ধাঁধার ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। স্বপ্নে দুই অংশ বিকার। উক্ত নাড়ীতে বিচরণ কালে সুখ থাকে না, কেবল দুঃখ বোধ হয় বা ভোগ হয়। স্বপ্নে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গণ কাজ করে না, কেবল মন কাজ করে।

(৩) সুষুপ্তিতে এক অংশ বিকার। সুষুপ্তিতে "আমি" হৃদয়ে থাকেন। তখন মনও কার্য্য করে না, বুদ্ধির সহিত আনন্দময় কোষে স্বরূপের আভাস দর্শন করে। দর্শনে এত সুখ পায় যে, উহার জন্য প্রত্যহ লালায়িত হয়। (ভাল নিদ্রা না হইলে আমরা ভাল থাকি না)।

৪। সুষুপ্তির অতীত যে অবস্থা, তাহার নাম তুরীয়। ইহা নির্ব্বিকার স্বরূপ অবস্থা। ইহা জাগ্রত-সুষুপ্তিবৎ অপূর্ব্ব অবস্থা। এই অবস্থায় সমাধি পূর্ণ হয়; ইহাতে প্রকৃত ব্রহ্ম-যোগ হয়।

১২। যুগ—গুরুরা বলেন—সৎ স্বয়ং, স্বরূপ অহংকে জানা আর ব্রহ্মকে জানা একই কথা। "সত্যে" অর্থাৎ যখন সত্য পূর্ণ ছিল—তাহাতে মিথ্যা স্পর্শ করে নাই, তখন পূর্ণ চৈতন্য হেতু অহংব্রহ্ম—অর্থাৎ অহংএ আর ব্রহ্মে প্রভেদ নাই—এই ভাব ছিল। তখন ঈশ্বর ও মায়া বা প্রকৃতির প্রয়োজন হয় নাই। দেবতা হন নাই।

১৩। কর্ম্মযোগে সেই সত্যে মিথ্যা বা ভ্রম স্পর্শ করিল। ধরিয়া লও, ক্রমে এক পাদ মিথ্যাজ্ঞান উপস্থিত হইলে, মনুষ্য 'অহংব্রহ্ম' ভাব ধারণা করিতে পারিল না। এই অবস্থার নাম ত্রেতা; এই সময়েই "ত্রেতা" যুগ। তখন ব্রহ্ম হইতে অহংকে পৃথক্ করিয়া, ব্রহ্মকে "প্রভূ" ভাবিয়া, অহং "দাস" ইতি জ্ঞান আরব্ধ। এই সময় হইতে দুটী মার্গ—অর্থাৎ "জ্ঞানমার্গ" এবং "ভক্তিমার্গ" নির্দ্ধারিত হইল। যাঁহারা সত্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন, তাঁহারা জ্ঞানমার্গী, যাঁহারা ত্রেতাভাবাপন্ন হইলেন, তাঁহারা ভক্তিমার্গী হইলেন।

১৪। দুইজনে থাকিলে আমরা "আমি" ও "তুমি" প্রয়োগ করি। সুতরাং ভক্তেরা প্রভুকে "তুমি" প্রয়োগ আরম্ভ করিল। ভক্ত বলিল "আমি তোমার"। জ্ঞানমার্গী বলিল "আমি তুমিই" (অর্থাৎ ভক্তিমার্গীর 'তুমি')। এ দুইটীই একই কথা না হউক, একই ফলদর্শী। কেন না "আমি তোমার" বলিলে অভিমানসূচক "আমি"টা থাকে না; আর "আমি তুমিই" বলিলেও "আমি"টা থাকে না।

১৫। "অহং ব্রহ্ম" বলিতে এখন আমাদিগের গা শিহরিয়া উঠে। বহু অবতরণ হেতু অপরোক্ষ জ্ঞান অভাবে আমরা উহা বলিতে ও ধারণা করিতেই অক্ষম হইয়াছি। ঋষিদিগের মধ্যে কেহ কেহ অন্তঃকরণে "অহংব্রহ্ম" বুঝিতে পারিয়াও, ব্রহ্মকে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ না করিয়া, তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন নাই, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এ টুকুও সংস্কারজ বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞান দ্বারা ঐ সংস্কার তিরোহিত হইলে আর পার্থক্য রক্ষা করেন নাই; তখন আবার "অহংব্রহ্ম" বাক্যই বলিয়াছেন।

১৬। ত্রেতাভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য "দ্বাপরে" উপস্থিত হইল; তখন সত্য দুইপাদ, মিথ্যা দুইপাদ। তখন 'অহংব্রহ্ম' ভাব অধিকতর বিশ্লিষ্ট হইয়া, ঈশ্বর সহ নানা সম্বন্ধের সৃষ্টি হইল, এবং অর্দ্ধাধিকার অসত্যপূর্ণ ও সাধনশূন্য হইয়া পড়িল।

১৭। দ্বাপর অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমরা "কলিতে" উপস্থিত হইলাম। কলিতে ত্রিপাদ মিথ্যা, একপাদ মাত্র সত্য। সুতরাং আভিমানিক "আমি" সর্ব্বক্ষণ এবং কদাচ "সেব্য, প্রভু বা ব্রহ্ম"। ব্রহ্ম আছেন বা ঈশ্বর আছেন, ইহা আর প্রায়ই মনে আইসে না।

১৮। যাহার পক্ষে যখন যে যুগ, তাহার পক্ষে সেই যুগের উল্লিখিত ভাবের উদয় হয়। অর্থাৎ তোমার যখন সত্য-উদয়, তখন তোমার "আমি" আর (ব্রহ্মজ্ঞাপক) "তুমি" একই হইয়া যায়। যখন তোমাতে ত্রেতা-উদয়, তখন তোমার "আমি" দাস আর সেই "তুমি" প্রভু ইতি জ্ঞান হয়।

আবার যখন তোমাতে দ্বাপর-উদয়, তখন দাস্য সখ্যাদি বিবিধ ভাব এবং যখন তোমাতে কলির উদয়, তখন তুমি আর তোমার সেই "তুমি"কে গ্রাহ্য কর না, আভিমানিক "আমি"ই সর্ব্বকর্ত্তা জ্ঞান কর।

১৯। যদি এখন এক কলিতে পাদ মাত্র সত্য জ্ঞান, তবে কলি হইতে সত্যের উদয় কিরূপে সম্ভব? উত্তর— (১) এক কলিতেই যাহা সত্য, তাহা পূর্ণ। যথা "মাতা" শব্দে সত্যেও যে ভাব বুঝাইত, ত্রেতায় ও দ্বাপরে, আর এখন কলিতেও তাহাই বুঝায়। অর্থাৎ মাতাকে অন্য কেহ বলিয়া বোধ হয় না। (২) বহুকাল 'অজ্ঞানে' থাকিয়া, একটামাত্র কথায় 'জ্ঞান'-উদয় হয়! সেই জ্ঞান আর অজ্ঞানে পরিণত হয় না। কলিতে সত্য-জ্ঞান উদয় মাত্র উহা পূর্ণ হইবে; পূর্ণজ্ঞান-যুগই সত্যযুগ।

২০। যাঁহাদিগের অন্তরে সত্যের 'অহং-ব্রহ্ম' জ্ঞান বা উহার আভাস এখনও পর্য্যন্ত আছে, তাঁহারা এখনও জ্ঞানমার্গী, তদ্ব্যতীত ত্রেতাদি অবস্থাপন্ন সকলেই ভক্তিমার্গী।

ভক্তিমার্গ সহজ। ভক্তিমার্গী আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনা হইতে শ্রেষ্ঠকে ধরিয়া থাকেন। শুভাশুভের ভার তাঁহাতেই অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। শুভস্বরূপ ভগবানে অনুরাগ—অনুধ্যান করিতে করিতে শুভাশুভের প্রভেদ দেখিতে পান না। ক্রমে নিরভিমানী হইয়া সেই শ্রেষ্ঠের অনুগত রহেন। ইনি 'লয়' হওয়া চাহেন না; শ্রেষ্ঠের অনুগত থাকিয়া সেবা করিবেন, ইহাই ইঁহার প্রার্থনা।

২১। জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাকৃত কঠিন। জ্ঞানমার্গীর অবলম্বন জ্ঞান, লক্ষ্য 'সোঽহং' স্বরূপ। এই মার্গে সাধকের স্বাবলম্বী হইয়া, শুভাশুভের দায়ী আপনাকে মনে করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়। দুঃখে খেদ বা অপরে দোষারোপ করিবার যো নাই।

২২। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড।

জ্ঞানমার্গী জ্ঞানকাণ্ড—এবং ভক্তিমার্গী কর্ম্মকাণ্ড লইয়া থাকেন, সাধারণতঃ এই ভ্রম জন্মিতে পারে। জ্ঞানালোচনায় থাকিয়া ব্রহ্ম বা আত্মচিন্তায় মহৎ হওয়া যায় সত্য, কিন্তু জ্ঞানমার্গীও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না। তপস্বীরা, ঋষিরা, যোগীরা, সকলই কর্ম্মী; তাই বলিয়া তাঁহারা বিষয়কর্ম্মী নহেন। ভক্তদিগের কর্ম্ম বিষয়কর্ম্ম না হউক, তাহা অবস্তু সম্বন্ধে কর্ম্ম নহে। ঋষি-দিগের কর্ম্ম অবস্তু-সম্বন্ধীয়।

২৩। জ্ঞানমার্গীর উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ দ্বারা "যাহা তাহাই" হওয়া। (ব্রহ্মে লীন বা পরিণত হওয়া।) ইঁহারও সাধনাবলম্বন কর্ম্ম। ভক্তিমার্গীর উদ্দেশ্য প্রভুর সহবাস, অবলম্বন—কর্ম্ম। জ্ঞানমার্গী কর্ম্মকে জানিয়া কর্ম্ম করেন, ভক্তিমার্গী কর্ম্মকে না জানিয়া কর্ম্ম করেন। অন্যত্র বলা হইয়াছে—জ্ঞানমার্গী কর্ম্মদায়ী, ভক্তিমার্গী দায়ী নহে।

২৪।—যখন উভয় মার্গে 'কর্ম্ম' অবলম্বন, তখন উভয় মার্গেই 'যোগ' সম্ভব, এ কথার প্রতিবাদ করা উচিত নহে। যোগের কথা পরে বলা হইবে। যোগের একটী অবস্থার নাম 'ধ্যান'। ভক্তিমার্গীও ধ্যান করেন বলিয়া আপনাকে 'যোগী' মনে করিতে

পারেন। জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মকে ধ্যান করেন, ভক্তিমার্গী ভগবানকে ধ্যান করেন। এই দুই প্রকার ধ্যানে বিভিন্নতা কি, তাহা বিচার্য্য।

২৫। ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানমার্গী নিরাকার নির্গুণ অনন্তকে কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন। ইহাতেও যম-নিয়মাদি 'যোগ' ক্রিয়ার প্রয়োজন। ঐ ক্রিয়াগুলি অনায়াস-সাধ্য নহে। ভক্তিমার্গী রূপযুক্ত, গুণযুক্ত অবয়বধারী প্রভুকে ধ্যান করেন। ইহাতে উল্লিখিত 'যোগ' ক্রিয়ার সাপেক্ষতার প্রয়োজন হয় না। কেন না একবার দৃষ্ট মূর্ত্তি মনে করিলেই মনে আইসে। কিন্তু স্বরূপকল্পনার নিরাকার সূক্ষ্মধ্যান সুলভ নহে; মনে করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাহার পর, ভক্তিমার্গী ধ্যান মাত্র আপনার ঠাকুরকে দেখিতে পান, অমনি তাঁহার কাজ ফুরায়। ইহাতে জ্ঞানমার্গীর 'যোগ' হয় কি? ঠাকুর ও ভক্ত ত পৃথক্ থাকেন।

জ্ঞানমার্গীকে ব্রহ্মযুক্ত হইতে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। শ্রবণ-মননাদির পরে 'ধ্যান' উল্লেখ করা হইয়াছে। একে ইঁহার 'ধ্যান'ই দুঃসাধ্য, তাহাতে অবস্তু—অদৃষ্ট—অননুভূত বলিয়া 'ধ্যেয়'কে 'ধারণা' করাও কঠিন। ধারণা করিয়া তাঁহাতে 'যুক্ত থাকা' আরও কঠিন। নিদিধ্যাসন ব্যতীত ইহা ঘটিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত সূক্ষ্ম 'ধ্যান'—প্রকৃত সূক্ষ্ম 'যোগ' ভক্তিমার্গীর নহে, উহা জ্ঞানমার্গীর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবামাচরণ বসু।

বর্ণ-ভেদ ও জাতি-ভেদ।

যেমন হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এক কথা নহে, তেমন বর্ণ-ভেদ ও জাতি-ভেদ এক কথা নহে। বর্ণভেদ বুদ্ধ-পূর্ব্ব ঘটনা, জাতি-ভেদ বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী ঘটনা। বর্ণ-ভেদ হিন্দুধর্ম্মেরই এক প্রকার অবস্থা; জাতি-ভেদ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিশেষত্ব। বর্ণ-ভেদ-কালের শেষভাগে যদিও বিবাহ অনেকটা নিয়মিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে হিন্দু খণ্ড খণ্ড হইয়া, পুরুভুজের খণ্ডগুলির ন্যায় বিভিন্ন হইয়া পড়ে নাই। আদান-প্রদান নিয়মিত হইলেও রহিত হয় নাই; স্পর্শ-দোষ প্রথা ছিল না। হিন্দু আর্য্যানার্য্য-মিশ্রিত এক মহাজাতি, রক্ত-মাংসে এক। ইহার আদ্যাবস্থা অবশ্য অতি পবিত্র হিন্দুত্ব, পরবর্ত্তী অবস্থাও জাতি-ভেদের ন্যায় যোগ-নাশক নহে। ইহার আদ্যন্তই বেদমন্ত্র দ্বারা শাসিত। জেতা-জিত উভয়েই হিন্দু-স্থানবাসী এক অভিন্ন জাতি, বিবাদ বিস-ম্বাদ থাকিলেও তাহাদের জন্মসত্ব তুল্য। সকলেই স্বদেশী, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমান। জাতি-ভেদে এই স্বজাতীয়তার স্বদেশীত্ব নাই। জাতি-ভেদ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের দুর্গ; ইহাতে পানাহার বর্জ্জিত; বিবাহ ত না-ই, কেবল অনৈক্যের উপর অনৈক্যের স্তর জমাট বাঁধিয়া আসিতেছে। আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের পর হইতে এই জাতি-ভেদের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছি; এজন্য তদবধি আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ-সামর্থ্য, সকলই ক্রমশঃ ক্রমশঃ ক্ষয়

পাইতেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে আমাদের অস্তিত্বও যে থাকিবে না, জনসংখ্যার রিপোর্ট যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা কালের ভেরীর এই শোকজনক নিনাদের পূর্ব্বতান অবশ্যই শুনিয়াছেন। এজন্য বর্ণ-ভেদ ও জাতি-ভেদ সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলা নিতান্ত অসাময়িক না হইতেপারে। বিশেষতঃ দেশের লোক স্বদেশী আন্দোলনে যে ভাবে ব্যাপৃত হইয়াছে, তাহাতে জাতি-ভেদের সহিত ইহার কিরূপ ঘাত-প্রতিঘাত হইবে, সে ভাবনাও অনিবার্য্য।

আর্য্যজাতি পঞ্চনদ প্রদেশে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলে, তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ সমাজপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, বেদ-মন্ত্র পাঠে তাহার অনেকটা জানা যাইতেছে। অনার্য্য জাতির সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ কম ছিল না; কিন্তু যে অনার্য্য তাঁহাদের বশতাপন্ন হইত, তাহাদের জন্মসত্ব সম্পূর্ণরূপে আর্য্যগণের জন্মসত্বের সঙ্গে মিশিয়া যাইত। ফলে অধুনা ইংরেজ নামক 'আর্য্যজাতি' দেশীয় খৃষ্টান ও অন্যান্য লোককে যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ভারতের পূর্ব্বতন জেতা আর্য্যজাতি, জিত অনার্য্যের প্রতি তদপেক্ষা উচ্চ অধিকার দিয়াছিলেন। আমি জানিনা, বৃটিষ ভারতে কোন্ ভারতবাসী—তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, যাহাই হউন, পঞ্চনদবাসী সুদাসের অধিকার ও সমাদর পাইয়াছেন।

এইরূপই হিন্দু জাতির আদ্য গঠন; ইহাতে আর্য্যানার্য্য রক্তপ্রবাহের মিলন নিষিদ্ধ হয় নাই; স্পর্শ-দোষ প্রথা সমাজের উপর এত কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত করিতে পারে নাই।* কিন্তু এরূপ হইলেও গাত্রচর্ম্মের বর্ণানুসারেও দুটি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"যোদাসবর্ণ মধরং গুহাকঃ" (ঋগ্বেদ ২।১২।৪)

এই স্থলে আমরা দাসবর্ণের লোকের উল্লেখ দেখিতেছি। দাসগণকে অনেক সময় দস্যুও বলা হইয়াছে।

"হিরণ্যয়মুত ভোগং সসান হত্বী দস্যূন্ প্রায়বর্ণমাবৎ" (ঐ ৩।৩৪।৯)

এই মন্ত্রে বলা হইতেছে "দস্যুদিগকে বধ করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।" সুতরাং দ্বিবিধ বর্ণের লোকের উল্লেখ দেখিতেছি;—দাসবর্ণ ও আর্য্যবর্ণ।

"অদেদিষ্ট বৃত্রহা গোপতির্গা অংতঃ কৃষ্ণাঁ। অরুষৈর্ধামভির্গাৎ।" (ঐ ৩।৩১।২১)

এই মন্ত্রে বলা হইতেছে—ইন্দ্র আর্য্যদিগকে গাভী দান এবং দীপ্তিযুক্ত তেজদ্বারা কৃষ্ণদিগকে বিনাশ করুন।

"পঞ্চাশৎকৃষ্ণা নিঃবপ সহস্রা" (৪।১৬৩)

এ মন্ত্রে দেখা যায়, ইন্দ্র ৫০ হাজার কৃষ্ণকে অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের লোককে বধ করিয়াছিলেন। দাসবর্ণ যে কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই।

"সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্যেভিঃ সনৎ সূর্য্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ" (ঐ ১।১০০।১৮)

---

* থিয়সফী, ইলেক্ট্রিসিটি, অরা, ব্যাসিলি, সূক্ষ্ম সদসৎশক্তির আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সংক্রমণ ইত্যাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত যাঁহারা হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রের 'স্পর্শদোষ' বিধির তত্ত্ব-রহস্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্পর্শদোষকে নিরবচ্ছিন্ন (invariably) দোষ দিতে পারেন না। (সঃ)

এই মন্ত্রে বলা হইতেছে—ইন্দ্র শ্বেতবর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন। সুতরাং ইন্দ্রানুগৃহীত আর্য্যবর্ণ শ্বেতবর্ণের লোক ছিলেন।

"ঋষিম্বাংসা নিধিমিবাপ গূড়ুহমুদর্শভাচুপথু-বন্দনায়।" (১।১১৬।১১)

বন্দন ঋষি কূপে নিপতিত হইয়া নিধি অর্থাৎ রত্নবৎ দৃষ্ট হইতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল।

"শ্বিত্যং চো মা দক্ষিণতস্কপর্দ্দাঃ" (ঐ ৭।৩।১)

এই মন্ত্রে বশিষ্ঠদিগকে শ্বেতবর্ণের লোক ও দক্ষিণ দিকে কপর্দ্দধারী বলা হইয়াছে।

সুতরাং আর্য্যবর্ণ সাধারণতঃ শ্বেত, গৌর বা উজ্জ্বল বর্ণ; কিন্তু দাসবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। বেদের মন্ত্র হইতে এ বিষয়ে আরও প্রমাণ উদ্ধৃত করা যায়। তবে বোধ হয় সে সময়ে জেতৃ আর্য্যবর্ণের সহিত তদানীন্তন ভারতবাসী দাসবর্ণের সম্বন্ধ অধুনা বিজেতৃ ইংরেজদিগের সহিত দাস ভারতবাসীর সম্বন্ধ অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না। দাদা ভাই নৌরোজী সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বৃটিস্ রাজত্বের মধ্যে সকল প্রজার জন্ম-সত্ব এক।

সেই অতিপ্রাচীন ভারতে অনার্য্য দাসেরা আর্য্যধর্ম্মা ও আর্য্যগণের বন্ধু হইতেন; তাঁহাদের আদান-প্রদান ও ভোজ্যান্নতা চলিত এবং গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ থাকিলেও অনার্য্যেরা সর্ব্বাংশে ক্রমশঃ আর্য্য হইয়া যাইতেন।*

"উত কণ্বং নৃষদঃ পুত্রমাহুরুত শ্যাব ধনমাদত্ত বাজী।
প্রকৃষ্ণায় রুশদপিন্বতোধর্ত্তমত্র নকিরস্মা অপীপেৎ॥"

(ঐ ১০।৩১।১১)

এই ঋকের ১ম অর্দ্ধে কণ্বকে শ্যাব (কৃষ্ণ) ও পর অর্দ্ধে পরিষ্কাররূপে কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা কণ্বকে এক জন দাসবর্ণের ঋষি মনে করা অসঙ্গত নহে। অন্ততঃ দাস ও আর্য্যবর্ণের সংযোগে কণ্বের উৎপত্তি, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

কণ্ব অতি প্রাচীন ঋষি; বোধ হয় প্রাচীনত্বে অঙ্গিরার পরই কণ্বের স্থান। ভরদ্বাজ প্রভৃতি বহু ঋষি স্ব স্ব মন্ত্রের মধ্যে কণ্বের উল্লেখ করিয়াছেন। এই যে অতি হৃদয়গ্রাহী উষামন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের গৌরব, তাহা প্রায়শঃ কণ্বগোত্রীয়দিগের। উষা কেবল ভারতবর্ষের দেবতা, এমত নহে, সমুদায় আর্য্যজগতের দেবতা। এই যে আর্য্য-জগৎ আজ কালিদাসের শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছে, এ শকুন্তলা আর কেহই নহেন, কণ্বদের সেই অতুল্য রূপলাবণ্যবতী উষাদেবী। পুরাণের মধ্যদিয়া শরীরিণী হইয়া আসিয়া 'শকুন্তলা' হইয়াছেন।*

যাহাহউক কৃষ্ণবর্ণ কণ্ব ঋষি কি শ্বেতবর্ণ

* বর্ত্তমান ভারত-বিজেতা শ্বেতাঙ্গ জাতির সহিত ভোজ্যান্নতা ও আদান-প্রদানে আমরা—'কালা আদমিরা' মিশিয়া উন্নতি লাভ করি, ইহা আশা করি, আমাদের প্রবন্ধকার মহাশয়ের অভিপ্রেত নহে। (সঃ)

* শকুন্তলার তত্ত্ব ঐতিহাসিক কি রূপক-কাল্পনিক, সে বিচারের এ স্থান নহে। লেখক প্রসঙ্গতঃ স্বকীয় সিদ্ধান্তই লিখিয়াছেন। (সঃ)

বশিষ্ঠাদির তুলনায় প্রাচীন ভারতে কোনরূপ হীন ছিলেন?

"সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে।
কক্ষিবং তং য ঔশিজঃ" ॥১॥ ১।১৮।১

দীর্ঘতমা ঋষি উশিজ্ দাসীগর্ভে কক্ষিবান্ ঋষিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, এজন্য কক্ষিবান্ ঔশিজা। কক্ষিবান্ মূলতঃ দাসবর্ণ কি আর্য্যবর্ণ হইয়া ঋষিসমাজ শোভিত করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার মিশ্রোৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ কি? কিন্তু এই মিশ্রোৎপত্তি বশতঃ আর্য্যসমাজে কি তিনি কোন অংশে হীন ছিলেন? বরঞ্চ স্বময রাজা কক্ষিবান্‌কে শ্রীমান দেখিয়া, তাঁহাকে আপন ১০টি কন্যা সম্প্রদান করেন এবং যৌতুক স্বরূপ ১০০ নিষ্ক, ১০০ বৃষ, ১০৬০ টি গাভী ও ১১ খানি রথ প্রদান করেন। (১।১২৫।১ সায়নের টীকা)। ইহা কি দাসবর্ণের সংস্রবে জন্মসত্ত্বের তারতম্যের পরিচায়ক?

কেবল ইহাও নহে, কক্ষিবানের কন্যা অতি সুন্দরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিদুষী; তাঁহার নাম ঘোষা। তিনি ১০ম মণ্ডলের ৩৯।৪০ সূক্তের ঋষি বলিয়া খ্যাত। "যুবং শ্যাব্যায় রুশতী মদত্তং" (১।১১৮) উজ্জ্বলবর্ণা ঘোষাকে কৃষ্ণবর্ণ পতিকে প্রদান করিলেন। ইহাতে দাসবর্ণ ও আর্য্যবর্ণে রক্তবিনিময়ের বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। বোধহয় ইহার কিছু পরবর্ত্তী কালে এরূপ বিবাহে কতক আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণ-গৌর বর্ণ-ভেদে তখন দাস-আর্য্য-ভেদ ছিল না; তথাপি কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বড় সহজে 'রুশতী' অর্থাৎ উজ্জ্বলবর্ণা রুক্মিণী ও সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও, এসময়েও দাসবর্ণে ও আর্য্যবর্ণে বিবাহ রহিতের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কেবল কণ্ব কেন? আরো অনেক দাসবর্ণের ঋষি ছিলেন। তন্মধ্যে আঙ্গিরস কৃষ্ণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিম বাবুর পাঠকেরা অবশ্যই অবগত আছেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের আঙ্গিরস কৃষ্ণই মহাভারতের যুদ্ধনেতা। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু এই কৃষ্ণ কে?

"ত্রীণিশতান্যর্বতাং সহস্রাদশগোনাম্।
দদুষ্পজ্রায় সাম্নে।"

"উদানট্ ককুহো দিবমুষ্ট্রান্ চতুর্যুজো দদৎ
শ্রবসাযাদ্বংজনং॥" ঐ ৮।৬ ৪৭।৪ ঋক্।

এই দুই মন্ত্রে বলা হইতেছে, তিরিন্দির রাজা পজ্র ও সাম নামক ঋষিদ্বয়কে ৩০০ অশ্ব ও ১০০০ গো প্রদান করিয়াছিলেন। এবং ইনি (সেই তিরিন্দির) ৪ উষ্ট্রধন এবং দাস স্বরূপে যদুগণকে প্রদান করিয়া কীর্ত্তি দ্বারা স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন।

পজ্র অঙ্গিরা-গোত্রীয় ঋষি। ইনি যে কতকগুলি যাদবকে দাসস্বরূপে পাইয়াছিলেন, তাহা উপরোক্ত মন্ত্রে পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইতেছে। সুতরাং আঙ্গিরস কৃষ্ণ—যিনি একজন বিখ্যাত যাদব, তিনি পজ্র ঋষির দাসগণ হইতে উৎপন্ন কিনা, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য ও আলোচ্য। ফলে মনু যেমন এক জীবনে বিশ, ক্ষত্র ও ঋষি; আঙ্গিরস কৃষ্ণও সেইরূপ হয়ত এক জীবনে দাস, বিশ, ক্ষত্র ও ঋষি। আমেরিকায় যেমন কোন প্রেসিডেন্ট হল চালনা পরিত্যাগ

করিয়া দেশের সর্ব্বোচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; আঙ্গিরস কৃষ্ণের উন্নতি তদপেক্ষা বড় বেশী বিস্ময়কর নহে।

এই উপলক্ষে আমরা দ্রোণাচার্য্যের উল্লেখও করিতে পারি। দ্রোণাচার্য্য কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, অথচ তিনি যোদ্ধা। তাঁহার উৎপত্তি হয়ত শ্বেত-কৃষ্ণ সংযোগে অথবা কৃষ্ণবর্ণ পিতা-মাতা হইতে। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য কি কোন আর্য্যসত্বে বঞ্চিত ছিলেন?

আমরা এক্ষণে রামের কথা উল্লেখ করিতেছি।

"প্র তদ্দুঃশীমে পৃথবানে বেনে প্র রামে
বোচমসুরে মঘবৎসু।" ১০।৯৩।১৪

এই মন্ত্রে রামকে 'অসুর' বলা হইয়াছে। অসুর শব্দ ঋগ্বেদে প্রায়শঃ বলবানঅর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সত্য; কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহাকে "অসুরঘ্ন" শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। এমন স্থলে অসুর শব্দের অর্থ সায়ন রাক্ষস অর্থাৎ অনার্য্য-দস্যু করিয়াছেন। আমরা যদি উপরোক্ত মন্ত্রের অসুর শব্দ এই অর্থে গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরা ঐ রামকে অক্লেশেই দাসবংশজাত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ফলে দাশরথি রামেরও গাত্রচর্ম্মের যেরূপ বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়—নবদূর্ব্বাদল-শ্যামবর্ণ, তাহাতে তাঁহাকে মূলবর্ণতত্বে মিশ্রোৎপত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিতে হইবেই। ফলে তখন শ্বেতাশ্বেত বর্ণভেদ আর্য্যজাতিতে অভেদে মিশ্রিত হইয়াছিল।

মূলবাদীরা যাহাই বলুন, যদি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ রামের সহচর হন, তবে রাম সুদাসের সমসাময়িক, একথা বলিতেই হইবে; কেননা উক্ত দুই প্রসিদ্ধ ঋষি সুদাসের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে রাম বৈদিক যুগের অন্তর্গত, তাহাতেও সন্দেহ নাই। বৈদিক যুগে সে সময়ে দাসবর্ণের অনেকে আর্য্যাশ্রিত হইয়া এমন প্রভাবশালী হইয়াছিলেন যে, আর্য্যবর্ণের লোকেরা তাঁহাদিগকে বিজয়ের প্রধান নেতা বলিয়াও স্বীকার করিতেন এবং বিজয় কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। সুদাস এইভাবে পঞ্চাবে ১০ জন রাজাকে আর্য্যবর্ণের বশীভূত করেন। অযোধ্যার রামের বিজয়কাহিনী ত অনেকেই জানেন।*

ফলে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের সময়ে—অর্থাৎ ঋষিযুগের মধ্য সময়েই দাস ও আর্য্যবর্ণের মিশ্রণ বশতঃ অনেক আর্য্য দাস-বর্ণের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুদাসের আর্য্য ও অনার্য্য উভয়বিধ শত্রু ছিল। (৭। ১৮। ৮) শুনহোত্র ঋষিও (৬।৩৩।৩) দাস ও আর্য্যশত্রুর যুগপৎ উল্লেখ করিয়াছেন। ১০।৩৮।৩ ঋকে দেবভক্তি-শূন্য আর্য্যবর্ণের লোকের উল্লেখ দেখা যায়।

---

* যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম সমগ্র হিন্দুভারতে ভগবদবতার রূপে চিরপূজিত; যাঁহারা যোগীগণের সাধ্য, ঋষিগণের আরাধ্য, মুনিগণের ভাব্য ও ভক্তগণের সেব্য, তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গের শ্যাম ও কৃষ্ণবর্ণের তুলনা পার্থিব কোন শ্যাম-কৃষ্ণ পদার্থে অসম্ভব। অতএব সেই বর্ণের কথা তুলিয়া এবং দু-একটি বেদবাক্যের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহাদিগকে 'দাস-বর্ণজাত' বুঝাইতে চেষ্টা করা অবতারবাদী সাকারোপাসক শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুর বিচারে নিতান্তই ব্যর্থ, বিড়ম্বিত ও হাস্যাস্পদীভূত। (সঃ)

তাহারা যে দাসবর্ণের সংযোগে আর্য্যবর্ণের শত্রুতা করিত, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। যেরূপ 'ফ্রাঙ্কোপ্রুসিয়ান্' যুদ্ধের অনেক পূর্ব্ব হইতে অলসেস্ লোরেনের অনেক যুবতী জার্ম্মাণ পতি গ্রহণ করিয়া, তত্তৎ দেশবাসীদিগকে জার্ম্মানদিগের পক্ষাবলম্বী করিয়াছিলেন, সেইরূপ হয়ত অনেক আর্য্যরমণী দাস-বর্ণের পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি আর্য্য-বংশকে দাস-পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই অবস্থাই ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কতিপয় পুরুষ পরে—অর্থাৎ মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে এমন ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, তখন আর্য্যানার্য্য পক্ষ প্রায় সমতুল্য। পরস্পর বিমিশ্রণে ইহাই বর্ণভেদের আস্থাবস্থা—বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব—আর্য্যানার্য্য-মিশ্রিত ভারতবাসীর স্বদেশীত্ব ও সমানত্ব; রক্তে মাংসে—জন্মে মরণে তুল্যাধিকারিত্ব।

কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধের পর বর্ণভেদ একটু রূপান্তরিত হয়। এ সময় যাজক, যোদ্ধা, শিল্পী ও কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের মধ্যে বিবাহ কতকটা নিয়মিত হয়। যথা যাজক যোদ্ধার, যোদ্ধা শিল্পীর, শিল্পী শ্রমজীবীর কন্যা অসংকোচে বিবাহ করিতে পারিবে এবং তদুৎপন্ন সন্তান সমাজে প্রতিষ্ঠাশূন্য হইবে না; বিপরীতভাবে বিবাহোৎপন্ন সন্তান নিন্দাভাজন হইবে। এই সকল নিষেধ সত্বেও, শাস্ত্রে উভয়বিধ (অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ) বহু সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে; সুতরাং যাবৎ এতাদৃশ ব্যবহার ছিল, তাবৎ দাসবর্ণে ও আর্য্যবর্ণে রক্তপ্রবাহ সম্যক্ রুদ্ধ হয় নাই। বৌদ্ধযুগেও এতাদৃশ অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ জন-সংখ্যার উল্লেখ ও অনুমোদন দেখিতেছি। সংহিতা-সাহিত্যে তাহার নিদর্শন। বৌদ্ধধর্ম্মের লোপের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-ভেদের লোপ ও জাতি-ভেদের উৎপত্তি। পরবর্ত্তী সংখ্যায় জাতিভেদের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

কবিতার প্রতি।

(১)

আজি এই মধুময় দিনে,
কবিতে গো, হৃদয়ের সখি!
দাঁড়াইয়া জীবন-পুলিনে,
বিস্ময় রূপ তব দেখি।

(২)

অতীতের নেপথ্য হইতে
অযাচিত করুণার মত,
এসেছিলে হাসিতে হাসিতে,—
ভুলাইয়া শোক-দুঃখ যত।

(৩)

কি জানি, কি রহস্য-জড়িত,
এই অন্ধ মানব-জীবন!
কোন্ দিব্য-প্রেমে বিনির্ম্মিত,
পর কেন হয় গো আপন?

(৪)

কে আসি? কোথায় ছিলে তুমি?
কাল-স্রোতে ভাসিয়ে ভাসিয়ে,

কত মরু-সিন্ধু অতিক্রমি
তুমি আমি মিলিনু আসিয়ে!

(৫)

অজানিত অতিথির কাছে
মুক্ত করি' হৃদয়-ভাণ্ডার,
সুখ, দুঃখ,---সঞ্চিত যা' আছে,
সমাদরে দিলে উপহার!

(৬)

আশাতীত সুধা করি পান,
(তৃষিত, তাপিত, আমি, বালা!)
বহুদিনে জুড়াইনু প্রাণ,
নিভাইনু হৃদয়ের জ্বালা।

(৭)

শুনালে কি সম্মোহন গান,
বিমোহিয়া আশার স্বপনে।
নবভাবে জাগাইয়া প্রাণ,
ঘুরাইলে প্রান্তরে—কাননে।

(৮)

সুমঙ্গল-কর-পরশনে
খুলে দিলে স্বর্গের দুয়ার;
দেখাইলে সাদরে যতনে—
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার।

(৯)

নিরাশায় হ'য়ে প্রতিহত,
তব পাশে আসিনু যখন;
মায়াময়ী জননীর মত
স্নেহাঞ্চলে করিলে ব্যজন।

(১০)

নবভাবে নবরূপ লয়ে,
জীবনের প্রত্যেক দিবসে,
অতীত গৌরব-কথা কয়ে,
ডুবাইলে ভাবামৃত-রসে।

(১১)

কবে, কোন্ বিধাতার বরে
লভিয়াছ এ চির-স্বরূপ?
কোন্ ব্রত উদ্‌যাপন তরে
এ সংসারে ভ্রমিছ এরূপ?

(১২)

পুণ্যতোয়া তমসার তীরে,
সেই দূর-অতীত-সীমায়,
আশ্রয় করিলে বাল্মীকিরে,
শরাহতে ক্রৌঞ্চের মায়ায়!

(১৩)

সে অবধি এ বিশ্ব-মাঝার
মূর্ত্তিমতী মমতার প্রায়
ভ্রমিতেছ, সঙ্গীত তোমার
ছুটিয়াছে সহস্র ধারায়!

(১৪)

যদি এই আশ্রিতে তোমার,
হেরিয়াছ স্নেহের নয়নে;
তবে এরে ভুলিওনা আর—
জন্মান্তরে, যুগ-আবর্ত্তনে!

(১৫)

নহ তুমি সাধনার ধন,—
দীপ্ত দৃপ্ত তপোবল-ফল;
'দান'-রূপে করিলা প্রেরণ
জগদীশ—দীনের সম্বল।

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

শ্রীহরিঃ

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইনমতে রেজিষ্টারীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩১৪ সাল, ১৮২৯ শকাব্দা।

ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার অনুশীলন।

১। যে বিদ্যা দ্বারা মোক্ষের অভিন্ন স্বরূপ, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হয়, তাহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা। মুণ্ডকোপনিষদের উপক্রমে আছে "ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং" অর্থাৎ "ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিদ্যাং সর্ব্ব-বিদ্যাশ্রয়াং।" ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার আশ্রয়। তাহা ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্ম-সম্বন্ধীয় বিদ্যা। ব্রহ্মসূত্রের আরম্ভেই আছে—"অথা-তো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। চিত্তশুদ্ধি হইতে ব্রহ্ম-বিচারের ইচ্ছা জন্মে, এজন্য ব্রহ্মসূত্র নামক বেদান্ত শাস্ত্রের অবতারণা। "তস্মাৎ বেদান্তবাক্যবিচার মুখেন ব্রহ্মণো বিচারার্হ-ত্বাৎ" অতএব বেদান্ত (অর্থাৎ উপনিষৎ)-বাক্য বিচারদ্বারা পরব্রহ্মের স্বরূপ বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সমস্ত বাক্যই ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার বিচারই ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন। তদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। মনুসংহিতাতে আছে—"সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ।" ১২। ৮৫। "এষাং বেদা-ভ্যাসাদীনাং সর্ব্বেষামপি মধ্যে উপনিষদুক্ত পরমাত্মজ্ঞানং প্রকৃষ্টং স্মৃতং যস্মাৎ সর্ব্ব-বিদ্যানাং প্রধানং। অতএব হেতুমাহ যতো মোক্ষস্তস্মাৎ প্রাপ্যতে।" (কুল্লুক-ভট্ট)। বেদাভ্যাসাদি যত কর্ম্ম, তন্মধ্যে উপনিষদুক্ত আত্মজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; যে হেতু তাহা হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষ লাভ হয়। ইহা সমস্ত বিদ্যার প্রধান। আত্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান, পরমাত্মবিদ্যা ও

ব্রহ্মবিদ্যা একই কথা। ভগবদ্‌গীতার নবম অধ্যায়ের সূচনায় ভগবান এই পরমজ্ঞানকে "গুহ্যতম" শব্দে আদরপূর্ব্বক "রাজবিদ্যা" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। "ইদং জ্ঞানং-রাজবিদ্যা—বিদ্যানাং রাজা।" ইহা সকল বিদ্যার রাজা।

২। সমস্ত উপনিষদের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা দেদীপ্যমান। পরমারাধ্য ব্যাসদেব সার্দ্ধ-পঞ্চশত সূত্রদ্বারা ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্রে তাহার বিচার করিয়াছেন এবং শঙ্করাচার্য্য, আনন্দ-গিরি, বিদ্যারণ্য, ভারতীতীর্থ, মধ্বাচার্য্য, রামানুজস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ তাহার ভাষ্য ও টীকা প্রভৃতি করিয়াছেন। সেই সকল সূত্রের উপলক্ষিত যত শ্রুতি আছে, তাঁহারা ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর, এই একাদশখানি উপ-নিষৎ এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবর্ণের বিশেষ বিশেষ স্থল হইতে তৎ সমস্ত স্ব স্ব ভাষ্যা-দিতে উদ্ধৃতি পূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়াছেন। অতএব বেদান্তবিচারে এই সমস্ত উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রই প্রামাণ্য। এই গুলি এবং তাহার সহিত বেদান্তাধিকরণমালা, বেদান্ত-সার, পঞ্চদশী এবং ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি কয়েকখানি গীতা হইতে, ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু-ভদ্রসন্তানদিগের কর্ত্তব্য, নিয়ম-পূর্ব্বক উপনিষৎ এবং তৎসহভাবী ঐ সকল শাস্ত্র শ্রবণ করেন।

৩। ব্রহ্মবিদ্যা অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ। ধর্ম্ম-ক্রিয়া যেমন পুরোহিত, মন্ত্র, নৈবেদ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার, আমন্ত্রণ, অধিবাস, হোম, জপ, দক্ষিণা ও দানাদি-সাপেক্ষ, ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন সেরূপ পদ্ধতি-পর-ক্রিয়া-সাপেক্ষ নহে। অপরঞ্চ, এই অনুশীলন কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ অভিমান-লক্ষণ-মনো-বৃত্তি-নিঃসৃত কোনরূপ জ্ঞানক্রিয়াও নহে। ইহা 'অণিমা লঘিমা' প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্য এবং ব্রহ্মলোকাদি স্বর্গকামনার্থেও অনুষ্ঠিত হয় না। এই মহাবিদ্যার উদ্দেশ্য কেবল আত্ম-সাক্ষাৎকার।

৪। ইহার শ্রুতি-বেদান্তবিহিত অনু-শীলন সম্পূর্ণরূপে অকর্ত্রাত্মক জ্ঞানধর্ম্মী। ব্রহ্মবিদ্যা আর ব্রহ্মজ্ঞান—একই কথা। তথাপি ইহা বলা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ ভেদ ঔপচারিক মাত্র; অথবা শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার সহিত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের প্রমাণ-প্রমেয়-সম্বন্ধ-বাচক। নতুবা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর চিত্তের শাস্ত্রবিহিত বিশুদ্ধি বশতঃ তাঁহা কর্ত্তৃক যৎকালে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন হয়, তখন যুগপৎ তাঁহার আত্মাতে স্বয়ম্প্রকাশ জ্ঞানার্কস্বরূপ পরমাত্মার শান্তিরসপুঞ্জ-পরমজ্যোতি সন্দীপিত হইয়া থাকে। এইরূপ শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার অসকৃৎ আবৃত্তিই জ্ঞানানুষ্ঠান এবং 'অপরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনা' শব্দের বাচ্য।

৫। একই ব্রহ্মকে বিভিন্ন অধিকারী-গণ নানাভাবে গ্রহণ করেন। বেদব্যব-সায়ীগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন। সে অধিকারে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "বেদ" অর্থাৎ "শব্দব্রহ্ম"। তাহা নিখিল কর্ম্মকাণ্ডের ও যজ্ঞীয় দেবতা সমূহের প্রতিপাদক, এবং ঋত্বিক্ ও যজমানগণের উপকারক। অতএব

জ্ঞানযোগীগণ (ব্রহ্মজ্ঞানীরা) তাঁহাকে পরমাত্মা বলেন। যে অধিকারে তিনি দেহাদি ব্যতিরিক্ত এবং ক্রিয়া, কারক ও ফলসম্বন্ধ বিরহিত আত্মস্বরূপ। অতঃপর ভক্তেরা তাঁহাকে 'ভগবান' বলেন। সে অধিকারে তিনি রূপ, গুণ, নামাদিবিশিষ্ট উপাসনার বিষয়।

৬। তন্মধ্যে উপনিষৎ প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মভাব, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়। ব্রহ্মজ্ঞানীগণ ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধির যত্ন করিয়া থাকেন। আত্মস্বরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়।

৭। এই অনুশীলন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান স্থিরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত "যোগ" শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এ যোগ কর্ম্মযোগ নহে। ইহাকে পরোক্ষ "ব্রহ্মোপাসনা" বলা যাইতে পারে। ইহার অনুষ্ঠান ও আবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাতে ব্যুৎপত্তি জন্মে। "যোগ" শব্দে নানা অর্থ। যথা ভগবদ্গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে কহিয়াছেন—"জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং।" অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় দ্বিবিধ। প্রথমতঃ "জ্ঞানযোগ"; ইহা সাক্ষাৎ উপায় (Direct means)। এই উপায়টী "সাংখ্যানাং" অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের। এস্থানে সাংখ্য এবং বেদান্ত, উভয় শাস্ত্রসম্মত জ্ঞানীই অভিপ্রেত। দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মযোগ; ইহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির গৌণপরম্পরা উপায় (Indirect means)। এই উপায়টী কর্ম্মীদিগের। কর্ম্মীরা শাস্ত্রবিহিত দেবার্চ্চনাদি কর্ম্মদ্বারা যখন ঈশ্বরারাধনা করেন, তখন সেই সকল কর্ম্ম "কর্ম্মযোগ" আখ্যা লাভ করে, এবং তাঁহারা "যোগী" অর্থাৎ "কর্ম্মযোগী" নামে উক্ত হন। এই উভয় স্থলে "যোগ" শব্দ যেমন "উপায়" অর্থে গৃহীত হয়, তদ্রূপ "সংযোগ" অর্থেও সঙ্গত হইতে পারে; অর্থাৎ যে জ্ঞান ব্রহ্মেতে যুক্ত—কিনা ব্রহ্মজ্ঞানে অন্বিত, তাহাই "জ্ঞানযোগ"। আর যে কর্ম্মকাণ্ড ব্রহ্মেতে উদ্দিষ্ট, তাহাই "কর্ম্মযোগ"। অতএব ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন, প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির ক্রিয়ানিরপেক্ষ, সাক্ষাৎ উপায়রূপী "যোগ" বা "ব্রহ্মোপাসনা" তাৎপর্য্যে গৃহীত হয়। ইহা পরোক্ষলক্ষণবিশিষ্ট, এবং সিদ্ধাবস্থায় সাক্ষাৎ জীবন্মুক্তিস্বরূপ পরমাত্মজ্ঞানে পরিণত হয়। তখন আর তাহাকে "উপায়" বা "যোগ" বলা যায় না। কিন্তু আত্মস্বরূপের অহৈতুক প্রেমাস্পদত্ব বিধায়, সেই পরমাত্মজ্ঞানকে অপরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনা বলা যাইতে পারে। ইহাই গীতার জ্ঞানলক্ষণা চতুর্থীভক্তি।

৮। যাঁহারা কর্ম্মযোগী, অর্থাৎ ঈশ্বরদিগের ও ঈশ্বরীগণের উদ্দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন ও যজ্ঞ-দেবার্চ্চনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের তদতিরিক্ত ব্রহ্মবিদ্যার—অর্থাৎ আত্মবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করাও শাস্ত্রবিহিত। কেননা ঐ সকল কর্ম্মই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সহায়। শ্রুতি কহেন—"তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি" তপঃ, দম এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তির উপায়। (তলবকার ৩৩)। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" (শ্রুতিঃ) আত্মার

দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক। ব্রহ্মসূত্রে কহেন "কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ।" (৩। ৪। ৪৮) বেদবিহিত সকল কর্ম্মে উত্তম গৃহস্থের (অর্থাৎ কর্ম্মযোগীর) অধিকার আছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত রূপ আত্মার দর্শন-শ্রবণাদি বিধিও ঐরূপ গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবেক। মনু কহিলেন—"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্" (১২। ৯২) কথিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম (বরং) পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়সংযমে ও বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেন। কুল্লূকভট্ট এ বচনের টীকায় কহেন—"এতচ্চৈষাং মোক্ষোপায়ান্তরঙ্গোপায়ত্ব প্রদর্শনার্থং নত্বগ্নিহোত্রাদি পরিত্যাগ পরতয়েত্যুক্তং।" এই বচনটী মোক্ষের অন্তরঙ্গ উপায় প্রদর্শনার্থ উদিত হইয়াছে, নতুবা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের পরিত্যাগার্থ নহে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে—"অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনং"। যজ্ঞ-আচার-দানাদি পরম ধর্ম্ম, যাহার যোগে আত্মদর্শন হয়। শঙ্করাচার্য্য কহেন, "সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি কিন্তুতীব শ্রেয়ো ভবতি।" (আত্মানাত্মবিবেকঃ) সাধনচতুষ্টয় সম্পত্তির অভাবেও গৃহস্থদিগের কর্ত্তৃক আত্মানাত্মবিচার কৃত হইলেও, তাহা দ্বারা প্রত্যবায় হয় না; অতএব সমস্ত কর্ম্মযোগিগণের উক্ত মহাবিদ্যার অনুশীলন করা উচিত।

৯। যে সকল কর্ম্মীর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মিয়াছে, তাঁহাদেরত কথাই নাই। কেননা তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে এবং আত্মসাক্ষাৎকারে স্বতঃ যত্নবান্। অতঃপর যাঁহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন এবং হিন্দু-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামে স্বাভাবিক একেশ্বরবাদ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার আরাধনা করেন, তবে তাঁহারা একদিকে ব্রহ্মবিদ্যার ফল এবং তৎসাহায্যে অন্যদিকে হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন। কেন না ব্রহ্মবিদ্যা যেমন আত্মজ্ঞানের প্রসূতী, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মেরও জননী। আমাদের সম্মুখে অনেক ব্রাহ্ম উপনিষৎ, গীতা এবং অন্যান্য পরমার্থশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যুগপৎ বেদবিহিত ধর্ম্মসেবক এবং আত্মতত্ত্বানুশীলক হইয়াছেন।

১০। অতএব কর্ম্মযোগী, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু-কর্ম্মনিষ্ঠগৃহস্থ, এবং ব্রাহ্ম—সকলেরই উপনিষদাদি শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আক্ষেপের স্থল বিস্তর। উপরিউক্ত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অনেকে বিষয় সেবায় বিক্ষিপ্তচিত্ত। তদ্ভিন্ন কেবল মাত্র বিষয়কর্ম্মী লোক অনেক। আবার পাশ্চাত্য বহুবিধ বিদ্যাতে নিপুণ অসংখ্য ব্যক্তি দৃষ্ট হন, যাঁহারা জ্ঞান-ধর্ম্মের কথা ভালবাসেন না; অথবা যাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা অশাস্ত্র-ঈশ্বর রচনা করতঃ তাঁহার গুণ ও কৌশল বর্ণনা মাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। শাস্ত্রীয় জ্ঞান-ধর্ম্ম তাঁহাদের ভাল লাগে না। সুতরাং একদিকে বর্ণাশ্রমাচার ও যজ্ঞ-দেবার্চ্চনাদি

কর্ম্মের এবং অন্যদিকে ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মতত্ত্ব অনুশীলনের পাত্রাভাব।

১১। পঞ্চদশী ধ্যানদীপে আছে—"পামরাণাং ব্যবহৃতের্ব্বরং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ। ততোপি সগুণোপাস্তির্নির্গুণোপাসনং ততঃ। যাবদ্বিজ্ঞান সামীপ্যং তাবৎ শ্রৈষ্ঠ্যং বিবর্দ্ধতে। ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষাৎ নির্গুণোপাসনং শনৈঃ॥" (১২১ ও ১২২ শ্লোক।) অজ্ঞানীদিগের অশাস্ত্র-ব্যবহারাপেক্ষা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান শ্রেয়ঃ। তদপেক্ষা সগুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ। আর সর্ব্বাপেক্ষা নির্গুণোপাসনা অতিশয় শ্রেষ্ঠ। এই উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, ইহা ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হয়। এই কয়েকটী উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। সুতরাং শাস্ত্রীয় কর্ম্মভূমিতে যাঁহাদের স্থিতি নাই, অথবা শাস্ত্রবিহিত সগুণ বা নির্গুণোপাসনারূপ যোগ বা ব্রহ্মচিন্তারূপ ধ্যান-সমাধিতে যাঁহাদের মতি নাই, কিম্বা উপনিষদাদি মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণে যাঁহাদের উৎসাহ নাই, ব্রহ্মবিদ্যাতে তাঁহাদের রতি অসম্ভব। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা ও পরমাত্মজ্ঞান সাধনের পাত্র অতি দুর্লভ। এই দৌর্লভ্য চিরকালই অল্প-বিস্তর আছে। তথাপি সম্ভাবিত অধিকারীকে প্রবোধিত করিতে শাস্ত্র উপেক্ষা করেন নাই।

১২। আত্মার বার্ত্তা অতীব দুর্জ্ঞেয়। শ্রুতি কহেন—"আশ্চর্য্যোবক্তাকুশলোঽস্যলব্ধাশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।" (কঠ) ইঁহার বক্তাও আশ্চর্য্য, লব্ধাও আশ্চর্য্য এবং নিপুণ আচার্য্যদ্বারা অনুশিষ্ট হইয়াছেন, এমত জ্ঞাতাও আশ্চর্য্য। ভগবদ্গীতাতেও এই শ্রুতির তুল্যার্থ বচন দৃষ্ট হয়। "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ" ২। ২৯। এই আত্মাকে কেহবা শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আশ্চর্য্যবৎ বোধ করেন, কেহবা আশ্চর্য্যবৎ বর্ণন করেন, কেহবা আশ্চর্য্য হইয়া শ্রবণ করেন এবং কেহবা শ্রবণ করিয়াও জানিতে পারেন না। বক্তা ও শ্রোতাদিগের দেহাত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনাই এই বিস্ময়ের হেতু। কেবল ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা উক্ত বিপরীত ভাবনা ক্রমশঃ তিরোহিত হয়। সাংখ্যদর্শনেও আত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্ব কথিত হইয়াছে। যথা—"নশ্রবণমাত্রাৎতৎসিদ্ধিরনাদিবাসনায়াবলবত্বাৎ" (কপিলসূত্র ২। ৩॥) প্রকৃতি হইতে আত্মা স্বতন্ত্র, এই মোক্ষজনক আত্মতত্ত্বের শ্রবণ সকলের ভাগ্যে সমানে ঘটে না; কেননা যে সকল শাস্ত্রে সেই সকল তত্ত্বকথা আছে, তাহা শ্রবণে অনেকেরই মতি হয় না। কেবল তাঁহাদেরই হয়, যাঁহারা বহুজন্মের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তভূমিকে প্রস্তুত করিয়াছেন। তথাপি অনাদিবাসনা বলবতী বিধায়, কেবল শ্রবণ মাত্রে ফল হয় না। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ আত্মচিন্তন ও ধারণার প্রয়োজন। তদ্দ্বারা বহুজন্মের পর উক্ত অনাদিবাসনা ও অবিবেকতা তিরোহিত হইয়া, আত্মজ্ঞানরূপ মোক্ষ অনুভূত হয়।

১৩। সাংখ্য-মতে ব্রহ্ম স্বীকৃত হন না। প্রত্যেক "আত্মাই" মোক্ষাবস্থায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "ব্রহ্ম"। বেদান্তদর্শনের মতে,

একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সকল মুক্ত আত্মার মোক্ষরূপী পরমাত্মা। তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানাই আত্মজ্ঞান। শ্রুতিশাস্ত্রই (Scriptures) উভয় দর্শনের মূল। শ্রুতি-প্রতিপাদ্য "আত্মা" শব্দটিকে সাংখ্য, "অসংখ্য আত্মা" রূপে গ্রহণ করিয়াছেন; আর বেদান্ত ব্যবহারিক অবস্থায় "অসংখ্য বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ" স্বীকার করিয়াও, মোক্ষাবস্থায় একমাত্র পরমাত্মাকে তাঁহাদের সার্ব্বজনীন আত্মত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। উভয় দর্শন মতেই আত্মতত্ত্ববিদ্যা শ্রুতিমূলক; সুতরাং তাহার অনুশীলন, আত্মার ধ্যান, ধারণা, বিচার প্রভৃতি মোক্ষজনক। তদ্দ্বারা প্রকৃতির বিকাররূপ দেহাদিতে আত্মবোধ এবং অনাদি অবিবেকতা, অজ্ঞান, অবিদ্যা ও বাসনা নিঃশেষে ধ্বংস হয়। বেদান্তের বিশেষ বাক্য এই যে, উপযুক্ত পাত্রেতে স্বপ্রকাশ-ব্রহ্ম আত্মস্বরূপে দৃষ্ট হইবা মাত্র ঐ সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব একমাত্র ব্রহ্মই জিজ্ঞাসার বিষয়। অশেষ বস্তুবিচার নিষ্প্রয়োজন। একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাই সর্ব্বপ্রতিবন্ধকশূন্য ও সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত মোক্ষস্বরূপ-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের আকর-স্থান। যোগ, উপাসনা, আত্মচিন্তা, বিচার প্রভৃতি যত প্রকার উপায়দ্বারা ঐ জ্ঞান, মুমুক্ষু পুরুষের আত্মাতে সুপ্রকাশিত হয়, একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনের অভ্যন্তরে সে সমস্ত উপায়ই নিহিত আছে। তৎসম্বন্ধে উপনিষৎ, ভগবদ্গীতা এবং পঞ্চদশী প্রভৃতি শাস্ত্রে বিস্তর উপদেশ দৃষ্ট হয়। তাহার কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। যতদূর সম্ভব, তৎসমস্তের একবাক্যতাও প্রদর্শন করিলাম।

১৪। তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে চতুর্থ শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিকে "ক্রিয়াবান" বলিয়াছেন; যথা—

(১) "প্রাণোহ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি। বিজানন্‌বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।"

(২) অর্থ।—ইনিই প্রাণ, যিনি সর্ব্বভূতে (আত্মারূপে) প্রকাশ পাইতেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তি ইঁহাকে জানিয়া ব্রহ্মভিন্ন অন্য কথা কহেন না। ইনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন, ইনিই ক্রিয়াবান, এবং ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মধ্যে বরিষ্ঠ।

(৩) এই শ্রুতিতে যে "ক্রিয়াবান্" শব্দ আছে, শঙ্করাচার্য্য তাহার এই তাৎপর্য্য লেখেন, যথা—

(৪) "জ্ঞান-ধ্যান-বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া যস্য সোহয়ং ক্রিয়াবান্। •• কেচিত্তু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যয়োঃ সমুচ্চয়ার্থমিচ্ছন্তি তচ্চৈষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ইত্যনেন মুখ্যার্থবচনেন বিরুধ্যতে। নহি বাহ্যক্রিয় আত্মক্রীড়শ্চ ভবিতুং শক্তঃ কশ্চিৎ। বাহ্যক্রিয়াবিনিবৃত্তঃ আত্মক্রীড়ো ভবতি। বাহ্যক্রিয়াত্মক্রীড়য়োর্বিরোধাৎ। নহি তমঃপ্রকাশয়োর্যুগপদেকত্রস্থিতিঃ সম্ভবতি। তস্মাদসৎ প্রলপিতমেবৈতদনেন জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়প্রতিপাদনং।"

(৫) অর্থ।—জ্ঞান-ধ্যান-বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া যাঁহার, তিনিই (এই শ্রুতির কথিত) ক্রিয়াবান। কেহ কেহ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম

(অর্থাৎ যজ্ঞ-দেবার্চ্চনা ও হোমাদি কর্ম্ম) ও ব্রহ্মবিদ্যা, এ উভয়ের সমুচ্চয়ার্থ ইচ্ছা করেন। (অর্থাৎ তাঁহারা মনে করেন, উভয়ে একত্রে অনুষ্ঠেয় ও তারতম্যরহিত সমফলজনক। কিন্তু সেরূপ মনে করা ভ্রম; কেননা তাহাহইলে, তাহার এই মুখ্যার্থবচন যে "ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ," ইহার সহ বিরোধ পড়ে। যেহেতু কোন ব্যক্তি যুগপৎ বাহ্য ক্রিয়াতে আসক্ত ক্রিয়াবান্ এবং সেই সঙ্গে আত্মাতে রতিবিশিষ্ট ক্রিয়াবান্, উভয়ই হইতে পারে না। বাহ্যক্রিয়া হইতে বিনিবৃত্ত ও আসক্তিশূন্য হইলে আত্মাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে পারে। তাহার কারণ এই যে, বাহ্যক্রিয়া ও আত্মক্রীড়া এ উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ। তমঃ আর প্রকাশ এ দুই একসময়ে একত্রে স্থিতি করিতে পারে না। অতএব এই জ্ঞান (আত্মরতি) আর কর্ম্ম (বাহ্যক্রিয়া), এ উভয়ের সমুচ্চয় প্রতিপাদন অসৎ-প্রলাপ মাত্র।

(৬) তাৎপর্য্য।—এস্থানে সমুচ্চয় শঙ্কা নিবারণই শঙ্করের উদ্দেশ্য। কিন্তু আত্মরতি ও বাহ্যক্রিয়া কি জন্য পরস্পর বিরুদ্ধ, এ কথার উত্তর এই যে, বাহ্যক্রিয়ার লক্ষণ দ্বিবিধ; মন্ত্রময় এবং মনোবুদ্ধ্যাদির ব্যাপারবিশিষ্ট। যথা যজ্ঞাদি ক্রিয়া। তাহা একদিকে মন্ত্রসমবায়ী, অন্যদিকে কর্ত্তার মনোবুদ্ধ্যাদির কার্য্য। অনেক লোক এমন আছেন, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনকেও ঐ শ্রেণীর ক্রিয়ার মধ্যে আনয়ন করেন। তাহাতে ব্রহ্মের উদ্দেশে নৈবেদ্য ও হোমাদির উৎসর্গ করেন না বটে; কিন্তু শ্রুতিপাঠকে এক প্রকার মন্ত্রপাঠের ন্যায়ই গণ্য করেন, এবং ব্রহ্ম চিন্তাকে মানসিক ভক্তির এবং বুদ্ধিবিরচিত কর্ত্তৃত্বজ্ঞানের ব্যাপার বলিয়া ধরেন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মরতি উক্ত উভয় লক্ষণেরই অতিক্রান্ত। কেননা আত্মরতির তুলনায় উভয়ই বাহ্যক্রিয়া। চক্ষুপদাদি দশ ইন্দ্রিয় যেমন বহিশ্চর, মনোবুদ্ধিও সেইরূপ বহির্বিষয়নিষ্ঠ। সমস্ত চিত্তবৃত্তি ব্যতীত আত্মরতি প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং বিক্ষিপ্তচিত্তে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন হয় না। *

(৭) তথাচ গীতা ৩। ১৭।—"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।" অর্থ—যাঁহার আত্মাতেই রতি, যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাঁহার কোন কর্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি) করণীয় নাই। কর্ম্মসাধনে তাঁহার পুণ্য হয় না, না করিলেও প্রত্যবায় হয় না। এই গীতাবচনে আত্মরতিকে কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট করিয়াছেন। অতএব আত্মবিদ্যার অনুশীলনে কিছুমাত্র ক্রিয়ানুপ্রবেশ নাই। বাহ্যব্যাপারও নাই, মানস ব্যাপারও নাই। এ সম্বন্ধে পশ্চাৎ আরো বুঝা যাইবে।

(৮) কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পার যে—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" এগুলি কি মানসিক ক্রিয়া নহে? এ কথার উত্তরে শঙ্করের উক্তি গ্রহণ করা যাইতেছে, যথা—"শ্রবণবৎ অবগত্যর্থত্বান্মনননিদিধ্যাসনয়োঃ" শ্রবণ যেমন জ্ঞান মাত্রের অভিজ্ঞাপক, তদ্বৎ মনন, নিদিধ্যাসন ও দর্শন শব্দেরও অবগতি অর্থ অর্থাৎ জ্ঞান মাত্র অভিপ্রায়; কিন্তু যেগুলি

মানসিক ক্রিয়া নহে। "নমু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া, ন, বৈলক্ষণ্যাৎ, ক্রিয়া হি নাম সা যত্র বস্তুস্বরূপ নিরপেক্ষৈব চোদ্যতে পুরুষ চিত্তব্যাপারাধীনা চ।" যদি বল— ব্রহ্মজ্ঞান মানসিক ক্রিয়া? সেকথা খাটে না। কেননা ক্রিয়ার লক্ষণ আর ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ পরস্পর বিপরীত। ব্রহ্ম স্বয়ং পরমবস্তু (substance and self-illuminating real entity)। সেই বস্তুস্বরূপ জানিবার অপেক্ষা না করিয়া, কোন অলৌকিক ফলের নিমিত্তে যে দর্শন, শ্রবণ, ধ্যান ও মননাদি পুরুষের আয়ত্তাধীন চিত্তব্যাপার, তাহার নাম ক্রিয়া। (শারীরক ভাষ্য ১।১।৪) তথাচ তলবকার শ্রুতি। "অন্যদেব তদ্বিতাদথো অবিদিতাদধি।" তিনি বিদিত কি অবিদিত—তাবৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন। অতএব তিনি "বিদিত-ক্রিয়ার"—জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্মপদ নহেন।

১৫। এতাবতা উপরিউক্ত শ্রুতি-প্রতিপাদিত যে "ক্রিয়াবান্" শব্দ এবং তদ্ভাষ্য-বিবৃত যে জ্ঞান, ধ্যান, বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া, তৎসমস্ত একমাত্র নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম-স্বরূপতে পরিসমাপ্ত হইল। এক্ষণে ব্রহ্ম-দর্শনের উপায় স্বরূপ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য যোগাদশ্রুতি কয়েকটী দৃষ্টান্ত স্বরূপে গৃহীত হইতেছে। সেই সকল যোগোপদেশ এবং তদুদ্দিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা কতদূর ক্রিয়ালক্ষণাক্রান্ত, তাহা ক্রমে বোধগম্য হইবেক।

১৬। কঠোপনিষদের ষষ্ঠবল্লীতে আছে। যথা—

(১) "নসন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদামনীষা মনসাভি-কপ্তোয এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" ॥৯॥

অর্থ।—যাহা দর্শনের বিষয়, সেই প্রত্যগাত্মার * স্বরূপ তদন্তর্গত নহে। অতএব সেই প্রকৃত আত্মাকে কেহ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন। "বিকল্প বর্জ্জিতয়া মনসা মনন রূপেণ সম্যগ্দর্শনেন অভিকপ্তঃ অভিসমর্থিতোভিপ্রকাশিত ইত্যেতৎ। আত্মা জ্ঞাতুং শক্যতে ইতি বাক্যশেষঃ।" বিকল্পবর্জ্জিত (সংশয়শূন্য) মননরূপ সম্যগ্দর্শনাধারে সেই স্বপ্রকাশ আত্মা প্রকাশিত হইলে, সাধক তাঁহাকে জানিতে পারেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন।

(২) সেই বিকল্পবর্জ্জিত মননরূপ সম্যগ্-দর্শন-সামর্থ্য কিপ্রকারে জন্মে, তদুত্তরে পরের দুইটী শ্রুতিতে যোগ রূপ ক্রিয়া কহিতেছেন।—

(৩) "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তমাহুঃ পরমাঙ্গতিং॥১০॥ তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং। অপ্রমত্তস্তদাভবতি যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ"॥১১

অর্থ।—যখন মন সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বীয় বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া "আত্মন্যেব অবতিষ্ঠন্তে" আত্মাতে স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধিও স্বীয় ব্যাপারে বিচেষ্টিত না হয়, তখন তাদৃশ অবস্থাকে জ্ঞানীরা পরমগতি বলেন। এই যে স্থিরা ইন্দ্রিয়-ধারণা, ইহাকেই যোগ কহে। তৎকালে প্রমাদবর্জ্জিত সমাধানের প্রতি যত্ন কর্ত্তব্য।

---

* "প্রত্যগাত্মা" Animating and illuminating universal soul.

কেননা যোগের যেমন উৎপত্তি আছে, সেইরূপ অপায়ও আছে। অপায় পরিহারার্থ অপ্রমাদ কর্ত্তব্য। এই অবস্থায়, আত্মা "অবিদ্যাধ্যারোপণবর্জিত" পরমাত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন তাঁহাতে অবিদ্যার আরোপিত মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার নিবৃত্ত হয়। (শঙ্কর) +

(৪) যোগ—ক্রিয়ারূপী বটে; কিন্তু চিত্তবৃত্তিকে নিবৃত্ত করা তাহার উদ্দেশ্য। তাহা নিবৃত্ত হইলেই, মন বিকল্পবর্জিত ও ক্রিয়াশূন্য হয়। তাহাতে অখিল অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং পরমাত্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়। সেই বিকল্পবর্জিত ও নিষ্ক্রিয় মন, পরমাত্মস্বরূপের উদয়ে আপনিও বিনষ্ট হয়। তখন আত্মা পরমাত্মাতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অতএব যোগক্রিয়া প্রত্যগাত্মাকে প্রকাশ করণে অসমর্থ। তাহা কেবল আত্মসম্বন্ধীয় অজ্ঞান নষ্ট করে মাত্র। কেননা প্রত্যগাত্মা স্বয়ম্প্রকাশ।

১৭। অতএব যজ্ঞ-দেবার্চ্চনাদির ন্যায় কোনরূপ বাহ্যক্রিয়া এবং চিত্তবৃত্তির নিরোধ ও ইন্দ্রিয়ধারণা রূপ কোন প্রকার মানসিক ক্রিয়া ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারেনা। তিনি সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার অবিষয়। কেননা "যন্মনসা ন মনুতে" মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু যাঁহাদ্বারা মনের প্রত্যেক মনন সুপরিজ্ঞাত, তিনি ব্রহ্ম। এইরূপ ক্রিয়ানুপ্রবেশশূন্য ব্রহ্মজ্ঞানই হিন্দু-শাস্ত্রের গৌরব। অন্য কোন দেশের শাস্ত্রে ও দর্শনে এপ্রকার বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা দৃষ্ট হয় না। তৎ সর্ব্বত্রেই মনোবুদ্ধি—এমন কি, শরীর-ইন্দ্রিয়াদির আধিপত্য বিরাজমান। সুতরাং মোক্ষ লক্ষণ অদৃশ্য। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্র মতে, আত্মারূপ দর্পণে, চিত্তবৃত্তি সমস্ত এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি, বিক্ষিপ্ত মলস্বরূপ। ব্রহ্মবিদ্যার আশ্রয় লইয়া, তৎসমস্তকে বেশ করিয়া মুছিয়া ফেল, তখন সেই নির্ম্মল দর্পণে স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মকে মুখ্যাত্মারূপে দর্শন পাইবে। এই আত্ম-সাক্ষাৎকারই হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মোক্ষ-লক্ষণ। সে আত্মদর্শন তোমার ক্রিয়া নহে; কিন্তু সেই পরমাত্মার আত্মপ্রকাশ মাত্র। পরের দুইটী শ্রুতিতে এই তত্ত্ব সপ্রমাণ করিতেছেন।—

(১) 'নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥'
(১২ এবং ১৩)

+ "অবিদ্যাধ্যারোপণবর্জিত" এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পদার্থ। তাঁহাতে যে মনোবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, স্থূলদেহ এবং সংসার-ব্যবহার স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা "অবিদ্যা-অধ্যারোপ" মাত্র। অনাদি অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম তাহার ঘটক। তৎসমস্ত আত্মাতে আরোপিত অর্থাৎ অধ্যস্ত হয় মাত্র। এই অধ্যারোপ বেদান্তের "রজ্জু-সর্প-ন্যায়" এবং সাংখ্যের "জবাস্ফটিক-ন্যায়" লক্ষণাত্মক। আত্মা, মনোবুদ্ধ্যাদি উপাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলে পরে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই স্বরূপাবস্থা "অবিদ্যাধ্যারোপণবর্জিত।" [i. e. free from the beginningless imputations imposed upon it (the soul) by ignorance in the shape of mind, intellect, senses and matter. C. S. B.]

(২) শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ করেন—"বুদ্ধ্যাদি চেষ্টাবিষয়ং চেদ্ ব্রহ্ম"? যদি বল, ব্রহ্ম মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি চেষ্টার কি বিষয়ীভূত? ইহার উত্তর এই যে, তাহা নহে। কেননা, এই দুইটী শ্রুতিতে তাহা নিষেধ করিতেছেন। যথা—তাঁহাকে না বাক্য, না মন, না চক্ষু দ্বারা পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন—তিনি আছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে পান। তদ্ভিন্ন কি প্রকারে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে? তিনি আছেন, এই প্রকার প্রত্যয়েও তাঁহাকে পাওয়া যায়, আর তত্ত্বভাবেও তাঁহাকে জানা যায়। উভয়ের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার অস্তিত্ব মানেন, তাঁহারা তত্ত্ব-ভাবেও তাঁহাকে পান।

(৩) এখন প্রশ্ন এই যে, এই অস্তিত্ব-প্রত্যয়টী কি মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য নহে? এ কথার উত্তর এই যে, তাহা নহে। হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ প্রাকৃত লোকের পক্ষে দুষ্কর। ভারতবাসীগণ যে স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা প্রথমতঃ উপনয়ন, মন্ত্রদীক্ষা ও যজ্ঞদীক্ষাদি দ্বারা সংস্কৃত হয়, পরে কামনা-ত্যাগ হইলে, নিষ্কাম ধর্ম্মদ্বারা অধিকতর পূত হয় এবং পশ্চাৎ জ্ঞানপথাবলম্বী হইলে, পরমার্থ-শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানে পরিণত হইয়া যায়। ইহার প্রত্যেক অবস্থায় মনোবুদ্ধ্যা-দির স্বাভাবিকী গতি রোধ করা ও তৎ-পরিবর্ত্তে যথাধিকার শাস্ত্রীয় বুদ্ধি অথবা ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অতএব উপরিউক্ত অস্তিত্ব-প্রত্যয়টী শাস্ত্রা-নুসারী; কিন্তু স্বাভাবিক চিত্তবৃত্ত্যাদির কার্য্য নহে।

(৪) শঙ্করাচার্য্য লেখেন—"অস্তিবাদিন আগমার্থানুসারিণঃ" যাঁহারা বেদার্থানুসারি-অস্তিবাদী, তাঁহারাই তাঁহাকে পান। তদ্ভিন্ন যাঁহারা নাস্তিবাদী অথবা অশাস্ত্র-স্বাভাবিক ঈশ্বরবাদী, তাঁহারা কি প্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারেন? স্বাভাবিক ঈশ্বরবাদীগণ স্বাভাবিক জগৎ দর্শনে সৃষ্টি-কর্ত্তা স্বরূপ একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনু-মান করেন। কিন্তু বেদান্ত বলেন—জগৎ ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাই-তেছে। যেমন সত্যরজ্জুকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যা-সর্প সত্যবৎ প্রতিফলিত হয়। ইহাই আগমার্থ।* এই জ্ঞান দ্বারা, অস্তিবাদী পুরুষ ব্রহ্মের তটস্থ ও সোপাধিক লক্ষণ ভেদ পূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ ও তত্ত্বভাব

---

* মিথ্যা দুই প্রকার। একপ্রকার একেবারে অলীক ও অস্তিত্বশূন্য; যেমন আকাশ কুসুম, শশশৃঙ্গ ও বন্ধ্যার পুত্র। অন্য-প্রকার মিথ্যা অলীক নহে, কিন্তু এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম। যেমন রজ্জুতে সর্প এবং শুক্তিতে রজত-ভ্রম। ইহাকে 'অধ্যাস' কহে। পরমাত্মা ব্রহ্মসত্তা ও কূটস্থ। একেবারে অস্তিত্বশূন্য শশবিষাণবৎ অলীক পদার্থ তাঁহাতে অধ্যস্ত হয় না। সুতরাং এ জগৎ সেরূপ মিথ্যা পদার্থ নহে। কেননা ইহা সেই সৎস্বরূপে অধ্যস্ত হইয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। জীবের কর্ম্ম, বাসনা, অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রকৃতি, এই গুলি জগতের বীজ। সেই বীজ অভাবরূপী নহে (not a nonentity); কিন্তু ভাবরূপী (is an entity)। বাহ্য জগৎ, স্থূল শরীর ও সূক্ষ্মদেহ তাহারই কার্য্য। আত্মা, অবিদ্যা-বশতঃ তৎসমস্তকে 'আমি' ও 'আমার' মনে করেন। পরমাত্মদর্শনে ঐ ভ্রম তিরোহিত হয়। ইহা কেবল মুক্তাত্মার পক্ষে।

লাভ করেন। ফলে যাঁহারা জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া, স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব অনুমান করেন, তাঁহারা সেরূপ পারমার্থিক ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। অতএব শ্রুত্যুক্ত এই অস্তিত্ব-প্রত্যয়টী মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য নহে; কিন্তু আগমার্থ-অনুসারী।

(৫) "যতোবা ইমানি" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র যদিও জগৎ-কার্য্যরূপ তটস্থলক্ষণ ও ঔপাধিক-নির্দ্দেশ দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" প্রভৃতি উপদেশ দ্বারা তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে আদেশ দিয়াছেন। সেই সকল উপদেশের উদ্দেশ্য এই যে, সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মেতে এই জগৎ অন্বিত হওয়াতে সত্যের স্থায় প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহার জ্ঞানোদয় হয়, তাঁহার দৃষ্টি হইতে ঐ তটস্থ ও উপাধি-লক্ষণ অস্তগত হয় এবং ব্রহ্ম কেবল তত্ত্বভাবে প্রকাশ পায়েন।

(৬) "তস্যাহুপাধিকৃতাস্তি প্রত্যয়েনো উপলব্ধস্য পশ্চাৎ প্রত্যস্তমিত সর্ব্বোপাধি-রূপাত্মনঃ তত্ত্বভাবো বিদিতাবিদিতাভ্যাম-ন্যোহদ্বয় স্বভাবো নেতি নেতিহস্থূলমনণ্বহ্রস্ব-মদৃশ্যে অনাত্ম্যেহনিলয়নে ইত্যাদি শ্রুতি-নির্দ্দিষ্টঃ তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি অভিমুখী ভবতি আত্মপ্রকাশনায় পূর্ব্বমস্তীত্যুপলব্ধবতঃ ইত্যেতৎ"। (শাঙ্কর ভাষ্য।)

(৭) অর্থ।—যে সাধকের সেই শাস্ত্রানুযায়ী উপাধিকৃত অস্তিত্ব-প্রত্যয়ে জগতের মূলস্বরূপ আত্মার উপলব্ধি হয়, তাঁহারই হৃদয়ে পশ্চাৎ সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত স্বতত্ত্ব-স্বরূপ পরমাত্মার তত্ত্বভাব আপনা হইতে প্রকাশিত হয়।—সেই তত্ত্বভাব কিপ্রকার, তাহা কহিতেছেন। যিনি বিদিত ও অবিদিত হইতে অন্য, অদ্বয়স্বভাব; ইহা নহে, ইহা নহে, যাঁহার নির্দ্দেশ; যিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন; যিনি অদৃশ্য, অশরীরী, নিরাধার, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য তত্ত্বভাব। এই তত্ত্বভাব, ঐ পূর্ব্বঅস্তিত্ববিশ্বাসী ব্রহ্মবাদীর আত্মাতে পরমাত্মাকে প্রকাশ করিয়া দিবার নিমিত্ত অভিমুখ হয়।

১৮। এই অদ্বয় তত্ত্বভাব, ক্রিয়া-লক্ষণা স্বাভাবিকী চিত্তবৃত্তির অতিক্রান্ত; এ পর্য্যন্ত তাহা বুঝান গেল। যদি বল, ধ্যানযোগ দ্বারা তাহা লাভ হয়, এ কথাও সংপূর্ণ রূপে লগ্ন হয় না। কেননা, চিত্তচাঞ্চল্য-রাহিত্য ও চিত্তবৃত্তির নিরোধাবস্থার নামই যোগ। সে যোগ দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় অজ্ঞান নষ্ট হয় মাত্র; কিন্তু তাহা অদ্বয় ব্রহ্মভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না। যেহেতু সে ব্রহ্মভাব স্বয়ম্প্রকাশ। যোগ ও তপস্যাদি দ্বারা যাঁহার সত্ত্বশুদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি) হয়, তাঁহার আত্মাতে ঐ ব্রহ্মভাব, অদ্বয় আত্মা রূপে দৃষ্ট হয়েন। সেই অদ্বয় আত্মাই সাধকের নিখিল দুঃখসংযোগের বিয়োগরূপী যোগসংজ্ঞিত। এই অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যরূপ পরমযোগ সিদ্ধ হয়। তখন জীবাত্মা, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ক্রিয়া-লক্ষণবর্জ্জিত হইয়া, সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত অদ্বয় পরমাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

১৯। কিন্তু যদিও এই ক্রিয়ালক্ষণবর্জ্জিত অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব উপনিষদাদি সর্ব্ববেদান্তের মুখ্য উপদেশ এবং তাহাই 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামে

অভিহিত হয়, তথাপি তৎ-সহভাবী বিধায়, ছান্দোগ্য ও শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি কোন কোন উপনিষদে এবং পঞ্চদশী ও বেদান্ত-সার প্রভৃতি গ্রন্থে নানা প্রকার ক্রিয়া-লক্ষণা ধ্যান-ধারণা এবং ব্রহ্মোপাসনার বিধি দিয়াছেন। সেগুলি যজ্ঞ-দেবার্চ্চনাদি ক্রিয়ার ন্যায় সম্পন্নসবায়ী কর্ম্মযোগ নহে; কিন্তু অমূর্ত্ত ব্রহ্মের পরোক্ষ ঔপাধিক ও সাবলম্ব উপাসনা। তৎসমূহের আলোচনা ও অনুষ্ঠানও ব্রহ্মবিদ্যা সাধনে উপকারী। সেগুলির বিচারে বিশেষ যত্ন কর্ত্তব্য। এই সমস্ত উপাসনার এবং তৎপ্রতিপাদক শ্রুতি অর্থাৎ বেদবাক্য সমূহের সামান্যতঃ দ্বিবিধ অবয়ব। এক পক্ষে ক্রিয়াধর্ম্মী বিধায়, সে গুলিকে যেন ব্রহ্মসাধন ক্রিয়াঙ্গ বোধ হয়, পক্ষান্তরে জ্ঞানের অন্তরঙ্গ বিধায়, ব্রহ্মজ্ঞানের সদৃশ বলিয়া অনুভূত হয়। এই সমস্ত ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, আত্মান্বেষণে মতি এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সমুৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ সেগুলি বহুবিধ অবলম্বনযুক্ত। যথা—মন, প্রাণ, প্রণব, গায়ত্রী, আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতির বৈরাটিক অঙ্গ ইত্যাদি। শাস্ত্রে এই সমস্ত অবলম্বন নির্দ্দিষ্ট থাকাতে এবং ক্রিয়াধর্ম্মী বিধায়, লোকে এই প্রকার অনুষ্ঠান ভালবাসে। কেননা অবলম্বন-যুক্ত ধ্যানাদিরূপ ক্রিয়াতে এবং উপাসনায় তাঁহারা অভ্যস্ত। এই হেতু উপনিষদাদি মোক্ষশাস্ত্রে জ্ঞানের অন্তরঙ্গ উপায় রূপে এ গুলির বিধি দিয়াছেন। এগুলিকে ধ্যান, উপাসনা বা যোগ, যাহা ইচ্ছা বলিতে পার; কিন্তু তৎসমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়া-ধর্ম্মী নহে। [illegible] তৎসমস্ত জ্ঞানাঙ্গমাত্র; এবং যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়াভাগ যাহা তাহাতে আছে, তাহা অবলম্বন মাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য।

প্রথম প্রস্তাব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পৃথিবীর সমুদয় সুসভ্য সমাজে সুব্রাহ্মণের প্রশংসা শ্রবণ ও পাঠ করা যায়; কুব্রাহ্মণের প্রশংসা কোথাও নাই। কুব্রাহ্মণের উপনীতের কোন মূল্য নাই এবং কুব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে কোন প্রকার লাভ বা অভিশাপে কোন প্রকার ক্ষতি হইতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্রে সুব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অসংখ্য উক্তি পাঠ করা যায়। বস্তুতঃ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি কর্ত্তৃক পৃথিবীর কত স্থানে কত প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার সহজে ইয়ত্তা করা যায় না। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ তাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যাহা কিছুর প্রয়োজন, মানব-কুলগৌরব সুব্রাহ্মণবর্গ তাহা অকাতরে দাতা কর্ণের ন্যায় জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান-বৈভব ব্রাহ্মণ জাতির অতুলনীয় প্রতিভা-বলে, অব্যভিচারিণী ভক্তি-মাহাত্ম্যে, অনন্যসাধারণ তপঃপ্রভাবে এবং বিশ্ববিখ্যাত বিক্রমে, বীরাধিক বীর মহাবলী ক্ষত্রিয় [illegible] প্রভৃতিকে সাময়ে শিশুর ন্যায় [illegible]

বশীভূত হইয়া থাকিতেন এবং ব্রাহ্মণের ইঙ্গিতানুসারে সমুদয় গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ব্যাপারাদি সম্পাদন করিতেন। ব্রাহ্মণ জাতি কোন কালেই ধর্ম্মের বিনিময়ে ধনাকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে স্থান দেন নাই। অখণ্ড আনন্দ-প্রদায়ক মোক্ষধনের পরিবর্ত্তে ক্ষণিক খণ্ডসুখদ পার্থিব ধনকে ইঁহারা কখনই গ্রহণ করেন নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, সমাজতত্ত্ব, কৃষি, অর্থব্যবহার, সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা, কুটিল রাজনীতি, জটিল গণিত, ব্যবস্থাশাস্ত্র প্রভৃতি যাহা লইয়াই আলোচনা করি, সর্ব্ববিষয়েই ব্রহ্মকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণের অসাধারণ প্রতিভা, পরিশ্রমপরায়ণতা, কার্য্যকুশলতা এবং আধ্যাত্মিক তেজ অবলোকন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়ি। দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণের এতটা সামর্থ্য না থাকিলে, দেবগুরু স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের পদপ্রক্ষালন সেবা-সম্পাদনে সম্মত হইতেন কি? বস্তুতঃ জগতে যদি সুব্রাহ্মণের জন্ম না হইত, এই মায়াময়ী ও পাপময়ী মর্ত্ত্যভূমি যদি সুব্রাহ্মণের পদস্পর্শে পবিত্রা না হইত, যদি সুব্রাহ্মণের পূর্ণ আশীর্ব্বাদে পাপী মানব বিগতকল্মষ হইতে না পারিত, তাহা হইলে কবির ভাষায় আমি কহিতাম—

দয়ার উৎস, জ্ঞানের আকর,
বিবেকের দীপ, ভক্তি-বারিধি।
হতো অন্ধকার সব চরাচর,
না জন্মিতে তুমি জগতে যদি॥

ঊর্দ্ধ্বরেতা-কুলবরিষ্ঠ শ্রীমৎ মহর্ষি মনু মহোদয় বোধহয় এই জন্যই লিখিয়া গিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণং দশবর্ষন্তু শতবর্ষন্তু ভূমিপম্।
পিতা-পুত্রৌবিজানীয়াৎব্রাহ্মণস্তু তয়োঃপিতা।"
(মনুসংহিতা)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি দশবর্ষবয়স্ক হয়েন, আর ভূমিপ (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়) যদি শতবর্ষবয়স্ক হয়েন, তথাপি উভয়ের মধ্যে মান্য বিষয়ে পিতা-পুত্রের ন্যায় পৃথক্ জানিতে হইবে। মহর্ষিমনু আরও লিখিয়াছেন— "যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ঃ সধর্ম্ম স্যাদশঙ্কিতঃ" অর্থাৎ সুশিষ্ট ব্রাহ্মণবৃন্দ যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ ধর্ম্মবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। ভাগবতের মহানুভব মহর্ষি মহাশয় কহেন, "ব্রাহ্মণবর্গ জগতের গুরু এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শ্রীমুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত, সুতরাং ব্রাহ্মণেরা পৃথিবীর আলোক ও মানবরূপে দেবতা।" মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার সদাসুখপাঠ্য রামায়ণে লিখিয়াছেন, "শতাধিক হস্ত দূর হইতেও ব্রহ্মমূর্ত্তির অপূর্ব্ব জ্যোতিদ্বারা ব্রাহ্মণেরা আপনা হইতেই সুপরিচিত হইয়া থাকেন।" বেদে, উপনিষদে ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে, ভগবানের অপর নাম ব্রাহ্মণ। সর্ব্ব শাস্ত্রের মূল বেদে, ব্রাহ্মণই ভগবানের নামান্তর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফরাসী দেশের মুসো জেকলিয়ৎ অনুমান করেন, ব্রাহ্মণের দেহে, মনে, মস্তিষ্কে, আত্মার সর্ব্ববিধ সাত্ত্বিকতার প্রভাব দেখা যায়। ফলতঃ নানাবিধ কারণে বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণ-সমাজের বিক্রমের হ্রাস ঘটিয়া থাকিলেও, এখনও ব্রাহ্মণেরা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী ও সামর্থ্য অধিকার করিয়া আছেন। সুব্রাহ্মণবর্গ চিরকালই পূজ্য

ও নমস্ক। ভক্তাধিকভক্ত দাশরথি রায় গাহিয়াছিলেন——

"মন-মানসে সদা ভজ দ্বিজ-চরণপঙ্কজ।
দ্বিজরাজ করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ॥"

—(অপিচ) "এ রোগের ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণেরি পদরজ।" ইত্যাদি।

মহাভারতে লিখিত আছে, সুব্রাহ্মণের পরামর্শ আয়ুর্বর্দ্ধক ও বিবিধ কল্যাণের আকর। যে ব্যক্তি সুব্রাহ্মণের বাক্যে অবহেলা করে, তাহার পরমায়ু থাকিলেও অপরাহ্ণে আয়ুক্ষয় হয়।

"দীপনির্ব্বাণগন্ধঞ্চ ব্রহ্মবাক্যমরুন্ধতীম্।
ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ॥"

মহামহর্ষি মনু লিখিয়াছেন——

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥"

হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংহিতায় লিখিত আছে—

"সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য মূর্ত্তিভ্যঃ পূতেভ্যঃ সর্ব্বসংস্কৃতৈঃ।
গুরুভ্যঃ সর্ব্ববর্ণানাং ব্রাহ্মণেভ্যো নমোনমঃ॥"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বাপর হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। রাজপ্রাসাদবাসী মহাসমৃদ্ধিশালী রাজাধিরাজের যে সম্মান নাই, কুটীরবাসী ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণের তদপেক্ষা অধিক সম্মান। এ অপূর্ব্ব ও অবিচলিত সম্মান কিরূপে ব্রাহ্মণেরা উপার্জ্জন করিলেন, হিন্দুদিগের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে,—সত্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সদাচার, উত্তম ও সচ্চরিত্রতাই তাহার মুখ্য কারণ"। ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে, বিদ্যা-তপঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণের মুখ অগ্নিতুল্য—"বিদ্যাতপঃ সমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু।" মনু ইহাও কহেন, ব্রাহ্মণ মহাদেবতা স্বরূপ—"ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ"। মনু মহর্ষি ইহাও কহিয়াছেন যে—

"যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ॥"

অর্থাৎ, দেবতাগণ যে ব্রাহ্মণের মুখে হবনীয় দ্রব্যাদি ভোজন করেন, পিতৃলোক সকল যাঁহাদিগের মুখে শ্রাদ্ধাদি-প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করেন, ঈদৃশ ব্রাহ্মণ হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নহেন।

"স্বাধ্যায়েনজপৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়াসুতৈঃ
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥"

মনুর মতে উপরি উক্ত গুণ দ্বারা মনুষ্যেরা ব্রাহ্মণ-শরীর প্রাপ্ত হয়।

"শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্॥"

বেদজ্ঞান, স্মৃতিজ্ঞান, সদাচার প্রভৃতিতে সমলঙ্কৃত পুরুষই ব্রাহ্মণ। "ব্রহ্মবেদঃ তং যো অধ্যয়নং করোতি স ব্রাহ্মণঃ"। "ব্রহ্মবিৎ স ব্রাহ্মণঃ।" "নিত্যব্রতী সত্যব্রতঃ সর্ব্বো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।"

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।"

অত্রিসংহিতায় ঋষি কহেন, ব্রাহ্মণগণ জপহোমের দ্বারা অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হয়েন। "পাবকাইব দীপ্যন্তে জপহোমৈঃ দ্বিজোত্তমাঃ।" মহাত্মা মনু, ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া, অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা শ্রেষ্ঠতা স্থির করিয়াছেন।—

"ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠতর। বিদ্বানের মধ্যে শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আছে, তাঁহারা আরও শ্রেষ্ঠ; কৃতবুদ্ধিদিগের মধ্যে যাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনে কদাচ পরাঙ্মুখ নহেন, তাঁহারা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ সকলের শিরোমণি। এরূপ ব্রাহ্মণ সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী।

ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিবা মাত্রই পৃথিবীর সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন, যেহেতু সকলের ধর্ম্ম সমূহের রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণের জন্ম হয়।

"ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে।"

ব্রাহ্মণের দেহ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্ত্তি; ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণ মোক্ষলাভের উপযুক্ত হয়েন।

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তি ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
সহিধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
উত্তমাঙ্গোদ্ভবাৎ জ্যৈষ্ঠ্যাঃ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্য বাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখারবিন্দ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছে বলিয়া এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অগ্রে ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছে বলিয়া, ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু।

"আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতামূর্ত্তি প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্ত ভ্রাতা স্বমূর্ত্তিরাত্মনঃ॥"

ব্রাহ্মণমাত্রেরই আচার্য্য (উপদেশক ও শিক্ষক), কারণ আচার্য্য ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি; গর্ভধারিণী মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি এবং সহোদর ভ্রাতা আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তি। ব্রাহ্মণ মর্ত্ত্যে কেবল দেবতা নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ব্রহ্মবিৎ স্বয়ংই ব্রহ্ম।

হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য যথেষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ইহাও লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচার সঃ বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ, যে ব্রাহ্মণের খাদ্যখাদ্যের বিচার নাই, জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে ব্যবসায়ের বিচার নাই, এবং দেহ ও মন অশুচি, অথবা যে ব্রাহ্মণ বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আচারভ্রষ্ট হইয়াছে, সে ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই (এই শূদ্রলক্ষণ জন্য) শূদ্র। "আমিষের প্রসার" নামক পুস্তকে চিন্তাশীল গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"তুমি সাম্যবাদী, তুমি প্রশ্ন করিবে যে, ব্রাহ্মণ তোমার শ্রেষ্ঠ কিসে? আচ্ছা, আমি তোমায় বলি, ঐ যে উচ্চশৃঙ্গ গিরিরাজ হিমালয় ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্ত অধিকার করিয়া আছে, উহার সহিত কি অন্যান্য পর্ব্বতের সমকক্ষতা চলে? প্রশস্তবক্ষা পূতসলিলা ভাগীরথীর সহিত কি অন্যান্য নদীর সমকক্ষতা চলে? অভ্রভেদী সহস্র যোজনব্যাপী হিমালয়কে পদচ্যুত করিয়া, যদি তোমার আশ্রম-সম্মুখস্থিত উচ্চ বল্মীক-স্তূপকে তাহার স্থানে বসাও, তাহা কি কখনও সাজে? তীর্থবাহিনী, বাণিজ্যসহায়িনী, ক্ষেত্র-উর্ব্বরতাদায়িনী, প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তাপবর্জ্জিত

তৃষ্ণানিবারিণী, সমগ্র-আর্য্যাবর্ত্তব্যাপিনী, ত্রিতাপনাশিনী, পতিতপাবনী গঙ্গার পদবীতে শৈবালবিশিষ্টা, অস্বাস্থ্য-সলিলা, কোন স্রোত-বিরহিতাকে স্থাপন করাইলে কি কখনও সাজে? যাহার ভিতরে চৈতন্যশক্তি যত অধিক পরিমাণে থাকে, সে তত বড় হইবেই হইবে; কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় ঘটিবে না। একটি অশ্বত্থবীজ এক স্থানে রোপণ কর, আর একটি নারিকেল উহার নিকটে আর এক স্থানে রোপণ কর। অশ্বত্থবীজ একটি সর্ষপ অপেক্ষাও বহুগুণে ক্ষুদ্র। এখন এই দুই বস্তুর শক্তির বিচার কর। ক্ষুদ্র অশ্বত্থবীজোদ্ভূত বৃক্ষ, কাণ্ড-শাখা-পত্রবিশিষ্ট প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষই বা কেন, আর বৃহৎ নারিকেলোদ্ভূত বৃক্ষ কাণ্ডৈকমাত্র একটি সরল দণ্ড—সামান্য নারিকেল বৃক্ষইবা কেন? উভয় বীজই সমানভাবে তাপ, জল, বায়ু দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, একই ক্ষেত্রে এইরূপ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষের কারণ হয় কেন? নারিকেল যেখানে রোপণ কর না কেন, উহা অশ্বত্থবীজের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হইবে না। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, অশ্বত্থবীজের এমন একটী শক্তি আছে, যে উহা ক্ষুদ্র হইলেও, উহার মৃত্তিকা-রসাকর্ষণী শক্তি নারিকেলের বীজের শক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক, এবং শক্তিদ্বারা সে মৃত্তিকার সারভাগ অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া সে অত বড়; নারিকেল তাহা পারে না বলিয়া সে উহা অপেক্ষা অত ছোট। সকল নদীই গঙ্গা নয়, সকল দার্শনিকই কপিল নয়, সেইরূপ সকল মনুষ্যই ব্রাহ্মণ নয়। জড়জগৎ যে নিয়মে নিয়মিত, মানব-জগৎ তাহা নহে। জড়-জগতের নিজ ক্রিয়া নাই; মানব-জগতের উন্নতি-অবনতি স্বীয় স্বীয় ক্রিয়া-সাপেক্ষ। সকল মনুষ্যেতেই 'ব্রাহ্মণ' হইবার শক্তি-বীজ নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু যাহার সেই শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ হয়; যাহার হয় না, সে ব্রাহ্মণও হয় না; সে ইতর মনুষ্য রহিয়া যায়। প্রাগুক্ত উদাহরণ স্মরণ করিয়া দেখ, যেমন নারিকেল-বৃক্ষের বীজ অপেক্ষা তাবৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ অধিক শক্তিসম্পন্ন, তেমনই অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজসমূহের মধ্যেও শক্তির অল্লাধিক্য আছে। সৃষ্টিই বৈষম্যময়; আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতে গেলে, বৈষম্যই সৃষ্টি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

'স্বদেশী'-সমস্যা

ভগবানের কি ইচ্ছা, জানিনা; ক্রমে দিন দিন দেশে 'স্বদেশী' সমস্যা বিষম হইয়া উঠিল। স্বদেশভক্তি-ভাবুকগণ ভাবিয়া দেখিবেন, দেশে কি সঙ্কটকাল উপস্থিত। একদিকে প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়ার দেশবিধ্বংসিনী বিলোল রসনা, আর দিকে দারুণ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী লক্ষ লক্ষ নরমুণ্ডভক্ষণে ভীষণ-দশনা! দুঃসহ দুর্ম্মূল্যতার দাউ দাউ অগ্নিশিখা। দারিদ্র্যের বিকট বিভীষিকা! সর্ব্বোপরি এই 'স্বদেশী'-সমস্যা-সঙ্কটে [illegible] স্বার্থসংঘর্ষণ (সুতরাং) [illegible]

রাজ-রোষের বজ্র বর্ষণ! এক্ষণে উপায় কি? 'স্বদেশী' আমাদের 'জীবন-কাঠি—মরণ-কাঠি' হইয়াছে। স্বদেশী ছাড়িলে এখন আত্মহত্যা করিতে হয়, আপন দোষে মরিতে হয়। আবার স্বদেশী বাঁচাইতেও দেখি কর্ম্মদোষে রাজরোষে মারা যাই। কবিবর ভারতচন্দ্রের কবিগাথা আজ ভারতবাসীর প্রাণের কথা।—

"না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ-কুরঙ্গ॥"

এ উভয় সঙ্কটে উপায় কি? দেশের বর্ত্তমান স্বাভাবিক সঙ্কট অবস্থাকে এই 'স্বদেশী'-সমস্যা আরও বিকট করিয়া তুলিয়াছে; কেননা সঙ্কটের সকল অংশেই স্বদেশী-সাধনার কার্য্যকারিতাই ধার্য্য হইয়াছে। প্লেগ প্রভৃতি রোগাদিকোর কারণ প্রধানতঃ দারিদ্র্য এবং 'স্বদেশী'ই তন্নিবারণের উপায় বলিয়া বিজ্ঞ অভিজ্ঞগণের অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উপযুক্ত খাওয়া পরার অসংস্থান ও অনুপযুক্ত বাসস্থানাদি দোষেই সংক্রামক ব্যাধির সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। প্লেগ প্রভৃতিতে কয়টা সাহেবলোক বা বড়লোক মরে? দেশের দুঃস্থ অপস্তরস্থ জনসমাজেই মারী-মরণ বিস্তারিত। সুতরাং দারিদ্র্যের সহিতই এই দেশ-উচ্ছেদক রাক্ষসের অনেকটা অবিচ্ছেদ-সম্বন্ধ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তারপর দুর্ভিক্ষ-দুর্ম্মূল্যতার এই দারুণ কশাঘাতও দারিদ্র্যের কঠোর হস্ত হইতেই বর্ষিত। শস্যাদির অল্পতা এই দুর্ভিক্ষ—দুর্ম্মূল্যতার সাময়িক গৌণ কারণ হইলেও, সাধারণ মুখ্য কারণ দারিদ্র্যই বটে। সত্য বটে, সেই "এক টাকায় আটমন চাউলের" দেশে আজ আট টাকায় একমন চাউল হইয়াছে, কিন্তু অস্মদ্দেশের তুলনায় বিলাত প্রভৃতি দেশে স্বভাবতঃই খাদ্য শস্য-ফলাদির দ্বিগুণ-চতুর্গুণ মূল্য বারমাস বর্ত্তমান; অথচ দুর্ভিক্ষ—দুর্ম্মূল্যতার হাহাকার নাই; কেননা সর্ব্বঅভাব-সম্পূরক ধনের অভাব নাই।

"উপবাসী ভারতবাসী অর্থ-অল্পতায়।
গড়ে মাসে একটিলোকের দেড়টিটাকা আয়॥"

ইহা কিন্তু কবি-কল্পনা নহে; ইহা রাজনীতি, অর্থনীতি, বার্ত্তা-তত্ত্বজ্ঞান ও গণিত বিজ্ঞানের দুষ্কর আবিষ্কারের স্বীকৃত সত্য। এরূপ শোচনীয় দৈন্যদশায় সাধারণের "পেটের দানা—পরণের তেনা" যোটাই কষ্ট; তাতে উপযুক্ত খাওয়া-পরা, উপযুক্ত বাড়ী-ঘর করার কল্পনা কেবল দুরাশার দুঃস্বপ্ন মাত্র,—আকাশ-কুসুম চয়নের আয়োজন মাত্র। অনশনে, অর্দ্ধাশনে, অযোগ্যাশনে স্বভাবতঃই আমাদের রক্তের জোর কম, জীবনী শক্তি ক্ষীণ। দেহরাজ্য আক্রমণকারী সংক্রামক রোগবীজের সঙ্গে কে আর সংগ্রাম করিয়া তাহাকে নির্ব্বীর্য্য বা নিষ্কাশিত করিবে? সুতরাং যেই আক্রমণ, সেই অধিকার। কাজেই ভারতে দুর্ভিক্ষ-মৃত্যু ও রোগ-মৃত্যু পৃথিবীর সর্ব্ব সভ্যদেশ হইতেই অনুপাতে অধিক হইয়া পড়িয়াছে। কি শোচনীয়! কি নৈরাশ্যকর!

অতএব উপায় কি? উপায়—'স্বদেশী'। অধুনা যে দিক্ দিয়াই দেখ, দেখিবে—আমাদের সকল অপায়ের উপায়ই এই 'স্বদেশী'। এই 'স্বদেশী' ধর্ম্মই কেন্দ্রীভূত

হইয়া, আমাদের সকল কর্ম্ম নিজ বৃত্তে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 'স্বদেশী' সাধনায় আমাদের পরদ্বারে ভিক্ষা হ্রাস পাইবে, স্বাবলম্বন-শিক্ষা হইবে। আমাদের গোলামী ছাড়িবে, কৃষিকার্য্যাদি বাড়িবে; শিল্প বজায় থাকিবে, ব্যবসায়—বাণিজ্য জাঁকিবে। ইহাতে নবউদ্ভাবন উঠিবে, নবপ্রতিভা ফুটিবে। আর, আয়ু, বল, বুদ্ধি,—ক্রমে সর্ব্বসম্পৎ যুটিবে। বিত্ত-বিদ্যার সুবৃষ্টি—অর্থাৎ লক্ষ্মী-সরস্বতীর সুদৃষ্টি, ভারতবক্ষে শত ধারায় ছুটিবে। সংক্ষেপতঃ 'স্বদেশী' সাধনাই—আমাদের স্বদেশ-প্রেমানন্দ-নন্দনের কল্যাণ-কল্পলতিকা, আমাদের সর্ব্বফলদায়িকা। আমাদের দারিদ্র্য, রোগ, অনশন, অল্পায়ুতা, দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, ঐক্যহীনতা, লক্ষ্যহীনতা— ফলে সর্ব্ববিষয়েই একান্ত দীনতার একমাত্র প্রতীকার—কেবল কায়-মনোবাক্যে 'স্বদেশী' সাধনাধিকার।

আমাদের এ হেন 'স্বদেশী' সাধন বজায় রাখা আজ বেজায় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্গীয় সুধার ন্যায়, অমৃতকুণ্ডের বারি-বিন্দুর ন্যায়—ভগবানের কৃপা-প্রসাদ রূপ জিনিসটি আমরা ঠিক সময়ে পাইয়াছিলাম সত্য; কিন্তু এখন সেবন করিতে যে জীবন নিয়া টান পড়িতেছে, তার উপায় কি? বলিয়াছি ত, 'স্বদেশী'কে মরিতে দিলে আমরা আপন দোষে মরিব, আবার ব্যস্ত—অব্যবস্থ ভাবে বাঁচাইতে গেলেও হয়ত রাজরোষে মরিব; সুতরাং এই 'স্বদেশী'-সমস্যায় "শাঁখের করাৎ"-সঙ্কটে পরিত্রাণ-প্রক্রিয়াই অধুনা আমাদের একমাত্র জাতীয় কর্ত্তব্য।

যাঁহারা "Extreamest" আখ্যা আগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করেন, অর্থাৎ যাঁহারা চরমপন্থী গরম দল, তাঁহাদের মত—জ্বলে জ্বলুক রাজরোষ, আসে আসুক অসন্তোষ।—

জরিমানা, জেলখানা, দ্বীপান্তর, ফাঁসী
কিছুতে না ছাড়িবে 'স্বদেশী' বঙ্গবাসী।
আসুক পুলিস, গুর্খা, বন্দুক, কামান,
'স্বদেশী' না ছাড়িব থাকিতে দেহে প্রাণ।
"বন্দে মাতরম্" মন্ত্র, 'বয়কট্' যন্ত্র—
সাধনে স্বরাজ-সিদ্ধি পাবে প্রজাতন্ত্র।
স্বাবলম্ব-অবলম্বে অবিলম্বে ভবে,
স্বায়ত্ত শাসন লাভ অবশ্যই হবে॥
শক্তি সাধ, বুক বাঁধ, প্রাণদিতে শেখ;
ভবিষ্যৎ ইতিহাস হৃদিরক্তে লেখ।
রাজরোষ—অসন্তোষ - যা হবার হোক্;
লাজপত্—অজিত্ বা নির্ব্বাসিত রোক্;
একে শত লাজপত পাইব নিশ্চিত।
একটি অজিতে পাব সহস্র অজিত॥

চরমপন্থী দলের এই ভাবের গরম মন্তব্য—সংযমপন্থী নরম দল ঐ ভাবে ও ঐ সুরে স্বীকার করেন না; অথচ স্বদেশী অর্জ্জনে ও বিদেশী বর্জ্জনে আগ্রহ ও আবশ্যকতা-বোধ ঠিক সমান; অন্ততঃ অল্প নহে। তবে গরম দলের স্বদেশী অর্জ্জন অপেক্ষাও যেন বিদেশী বর্জ্জনেই ঝোঁকটা বেশি। 'নরম' দলের অর্জ্জনেই অধিক টান। অনেকে বিদ্বেষমূলক বোধে 'বয়কট্' শব্দটাই পছন্দ করেন না। ফলে গরম দলের কথায় ধরণে ও 'রকম সকমে' গবর্ণমেন্ট রাজদ্রোহ-উত্তেজক রাজবিদ্বেষ দোষ পাইতেছেন এবং ক্রমশঃ উগ্রতর শাসনে অগ্রসর হইতেছেন। ভারত-ভাগ্যের বিধাতা

বিধাতা স্বয়ং মর্লি সাহেবও ঐ কারণে 'শত্রু' শব্দ পর্য্যন্ত বলিয়া বসিয়াছেন। শত্রু যারে জানা যায়, তারে ফাঁসে ঝুলাইতে বা তোপে উড়াইতেইবা কতক্ষণ? কথা সহজ নয়; অবস্থা বাস্তবিক সঙ্কটময়। গরম দলের অতি-গরমেরা ভীরুই বলুন আর কাপুরুষই বলুন, সাধে সাধে এরূপ একটা অগ্রসর ও আশান্বিত জাতিকে 'সর্ব্বশক্তিমানপ্রায়' গবর্ণমেণ্টের কোপ-কবলে ফেলিয়া নিস্পেষিত ও উৎসাদিত করার সম্ভাবনা সংঘটন সংযত দল কিছুমাত্র বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করেন না। প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের বিরোধিতা যে বাধায়, সে দুর্ব্বলের মিত্র নহে। ফাঁপা-দম্ভের ফাঁকা আওয়াজে কোন ফল নাই। বরং যাতে দুর্ব্বলও সবল হয়, মানুষ হয়, অত্যাচারে—অবিচারে—প্রবলের পদদলন-প্রতীকারে সক্ষম হয়, বৈধ ও সংযত ভাবে 'স্বদেশী' সাধনপ্রভাবে সেই শিক্ষার চেষ্টা করাই বহুদর্শী প্রবীণ সংযত সম্প্রদায়ের অভিমত। সমস্বার আবধানে ভ্রূণরক্ষণ বা নবজাত শিশুর সতর্ক সংপালন যেরূপ প্রয়োজনীয়, আমাদের এই সুকুমার সদ্যজাত স্বদেশ-সেবাব্রতকেও রাজা, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের কোপ হইতে শত সতর্কতায় সতত রক্ষা করা তদ্রূপ প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয়। সুতরাং অসংযম, ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা ও বিদ্বেষ-বিরোধিতা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎপ্রাজ্ঞঃ" এ নীতি ছাড়িয়া, আপাত-উদ্দীপনার নেশার প্রবলকে খোঁচা, "স্বদেশীর" দুর্ব্বল চেষ্টাকে আহত করিয়া—[illegible] মূর্খতা [illegible]।

এই যে রাজরোষে আমরা লাজপত ও অজিতকে হারাইতে বসিয়াছি, ইহাতে লাভ মনে করা ভুল। 'এক লাজপতে শত লাজপত বা এক অজিতে সহস্র অজিত লাভ' ফাঁকা বাগাড়ম্বরে সম্ভব হইলেও বাস্তবতায় বিপরীত। পুরুভুজের দৃষ্টান্ত, রক্তবীজের উদাহরণ সাহিত্যে সাজে ভাল, কিন্তু ইতিহাসের কাজে আসা কঠিন। যেমন যায় তেমন আর হয় না। এই দেশেই দেখুন, তেমন একটি গৌরাঙ্গ, একটি রামপ্রসাদ বা রামকৃষ্ণ, একটি বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম, একটি রাজেন্দ্র বা হেমচন্দ্র, একটি কেশব বা দেবেন্দ্র, একটি বিজয়কৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ আর পাওয়া যাবে কি? এ সব দেশ-দীপকের শূন্যাসন আর পূর্ণ হবে কি? ঈশ্বর না করুন, যদি আমাদের বর্ত্তমান স্বদেশ-গৌরব সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার, রবীন্দ্রনাথ, রমেশ, যোগেশ (অধিক নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন) প্রভৃতি রাজরোষে নির্ব্বাসিত, নিরুদ্ধ, নির্ব্বাক্ বা নিশ্চেষ্ট হইতে বাধ্য হন; তবে কি সেটা দেশের পক্ষে—'স্বদেশী' সাধন-লক্ষ্যে শুভার্থ হইবে? কেহ হয়ত "এক সুরেন্দ্রে শত সুরেন্দ্র" প্রভৃতি আকাশ-কুসুম দেখাইবেন, কেহবা—

"যতই ওরা মারবেরে ঘা,
তত‌ইরে ঢেউ উঠবে।
"যতই ওরা চোক্ রাঙাবে,
আমাদের চোক্ ফুটবে॥"

ইত্যাদি পদ্যের ভাব-মদ্যের নেশার মোহে আশার বাণী শুনাবেন, কিন্তু সংযত সাধনের অভাবে কবির ভবিষ্যৎ-বাণী ফলিবে কি?

উহা হয়ত সাহিত্যের স্বপ্ন-স্বর্ণাসন ছাড়িয়া সত্যের কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে নামিবেইনা। আবার ঐরূপ সাহিত্য-সম্ভোগটুকুরও রাহিত্য-সম্ভাবনা সংঘটিতপ্রায়। ঠোঁটের পাতা, কলমের মাথা, কাগজ চালানো, সগজ খেলানো প্রায় বন্ধ হবারই সন্দেহ উপস্থিত। এদিকে দারুণ দুর্ভিক্ষ-দুর্ম্মূল্যতার কষাঘাত; অন্নাভাবে—অর্থাভাবে, অনশনে—অপমানে 'ত্রাহি ত্রাহি' আর্ত্তনাদ; তদুপরি মামলা-মোকদ্দমায়, প্লেগ-কলেরা-ম্যালেরিয়ায় দেশ যায়-যায়! আবার মাঝে হতে ভ্রান্ত ভ্রাতৃবিরোধে গুণ্ডার কাজ—লুট-তরাজ, খুন-নিমখুন, ঘরে আগুন, বিত্তনাশ, সতীত্বনাশ, এক কথায়—সর্ব্বনাশ! দেখুন একবার দেশের কি দশা! ইহার উপর আবার রাজরোষের দিগন্তদাহী দুরন্ত বহ্নি-বর্ষণ, রাজনৈতিক পাশব বলের প্রবল পীড়ন! পুলিশের স্থল, 'গুর্খা'র ফণা, 'মুচলেকা'-ধরা, বেতমারা, জরিমানা, জেলখানা, উদ্বন্ধন-নির্ব্বাসন, নির্ব্বাক্-নিশ্চেষ্টী-করণ! এ জীর্ণ বিশীর্ণ, নিঃস্ব, নিরস্ত্র, নিরন্ন নির্জ্জীব দেশে এত কি সহ্য হয়? কাজেই বলি, দেশ যায়-যায়! মহী-গাত্রে বা মান-চিত্রে অস্তিত্ব থাকিলেও, আমাদের জাতীয় জীবন-ক্ষেত্রে তাহা নাস্তিত্বপ্রায়! যাহাদের কথায়, কাজে, মেজাজের ঝাঁজে, শুদ্ধ সাহিত্যিক ফাঁকা আওয়াজে সেই আসন্ন উৎ-সন্নতার অনুকূলতাই ঘটে, তাহারা আশায়, ভাষায় ও চেষ্টায় দেশের মিত্র হইলেও, কার্য্যতঃ শেষটা তাহাদের শত্রুতাই দাঁড়ায় বটে।

আমাদের ছেলেরাও কতকটা বাল্যবয়সের উদ্দীপনা-প্রিয়তা ও উচ্ছৃঙ্খলশীল স্বভাবের ফলে অনেকেই ধীর, গম্ভীর, সংযত ও সুভব্য ভাবে স্বদেশী সাধনায় ব্রতী হইতে পারিতেছেন না। এই নিত্য চঞ্চল জগতের কোন কার্য্যই কিন্তু বিশৃঙ্খল চঞ্চল ভাবে হইবার নহে। চাঞ্চল্যের মধ্যেই আবার গাম্ভীর্য্য, শৃঙ্খলা, সংযম ও সুনিয়ম। আমাদের নবীনগণ স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে এই সত্য-সূত্রটি না ভোলেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়। তাঁহারাই আশায় আমাদের উজ্জ্বল অতীতের পুনরাবির্ভাব, উৎসাহে মূর্ত্তিমান বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের ভরসাস্বরূপে, স্বদেশের সুখ-সাধে, আমাদের শুভাশীর্ব্বাদে আয়ু আরোগ্য-সৌভাগ্যে ভাগ্যবান। তাঁহারাই ভবিষ্য-সমাজের সেবক, নেতা ও কর্ত্তা: তাঁহাদেরই মতে, কথায় ও কাজে ভবিষ্য-সমাজ চালিত, পালিত, পুষ্ট বা নষ্ট, উন্নত বা অধোগত হইবে। তাঁহারাই 'স্বদেশী' জাতীয় জীবন গড়াইতে, বাড়াইতে, সুন্দর ও সমুন্নত করিতে, আমাদেরই আয়োজন-উপকরণ সত্বে উত্তরাধিকারী ও দায়িত্বে সর্ব্বকার্য্য-ভারধারী। উদ্যম-অধ্যবসায়, দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত তাঁহাদিগকে ধীর, গম্ভীর সংযত ও সুশৃঙ্খল হইতেই হইবে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও চঞ্চলতায় কর্ম্মযোগীর কদাচ সিদ্ধিলাভ সম্ভবেনা। আবার অপ্রেম ও বিদ্বেষ সংসৃষ্ট কোন অভীষ্ট কার্য্যেই ঈশ্বরের কৃপা-সাহায্য পাওয়া যায় না।

জাতীয় জীবন গঠনে আদর্শও উচ্চ, উদার ও মহৎ হওয়া চাই। এতদিন 'জাতীয় জীবন' শব্দ আমরা ইংরাজীর অনুবাদ রূপে সাহিত্যে ব্যবহার করিলেও, উহার প্রকৃতার্থ অবধারণে অক্ষম ছিলাম। জিনিসটা সাহিত্যে ছিল, কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে সে

ছিল না! ব্যক্তিগত ব্যষ্টি জীবন ছিল, কিন্তু বহুকাল যাবত্ সমষ্টিগত জাতীয় জীবন ছিল না বলিলেই হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাই সে শবদেহে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে। তাই অধুনা এই 'স্বদেশী' আন্দোলন-উপলক্ষে, জাতীয় বক্ষে নিস্পন্দ হৃদ্‌পিণ্ডে পুনঃ শোণিতসঞ্চারণ ও নবস্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

হিন্দুর জাতীয় জীবন একদিন ছিল। যে অপার্থিব অধ্যাত্ম-জীবনের ভুবনপাবনী শক্তিতে হিন্দু একদিন জগদুজ্জ্বল প্রতিভায় জগতে প্রতিষ্ঠিত ছিল; যে সর্ব্বজ্ঞান-বিধায়িনী—পূর্ণ মানবত্বপ্রদায়িনী শক্তিতে হিন্দু একদিন বিশ্বাচার্য্যের উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিল, আজ তাহার ক্ষীণ ইতিহাসের দীন আভাষ মাত্র কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান। "তেহি নো দিবসা গতাঃ" কিন্তু তথাপি সেই অতুল্য অসামান্য উচ্চাদর্শের নিদর্শন আজ আমাদের শীর্ণ স্মৃতিসূত্রে—শাস্ত্রাদির জীর্ণ-বক্ষে জড়িত ও লুক্কায়িত!

হিন্দুর আদর্শ বিশ্বোদার। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মনীতি। হিন্দুর কেহ শত্রু নহে। হিন্দুর কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই। আবার "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" ইহাও হিন্দুর নিত্যস্মরণীয় নীতিসূত্র। আত্মরক্ষার অপরিহার্য্য অনুরোধে আদর্শ হিন্দু কাহাকেও কষ্ট দিতে বাধ্য হইলেও, তাহা রাজসিক শত্রুভাবে বা তামসিক বিদ্বেষবুদ্ধিতে নহে; পরন্তু সাত্ত্বিক নিষ্কাম কর্ত্তব্য-বোধে। নিষ্কাম সাত্ত্বিক কর্ত্তব্যপালনই মূলনীতি বলিয়া, আত্মরক্ষার অবশ্যকর্ত্তব্যতাস্থলে আততায়ী ব্রাহ্মণকে বধ করিলেও "ব্রহ্মহত্যা" মহাপাপ ঘটে না। "জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াত্তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ"। অর্জ্জুন ভগবদুপদিষ্ট হইয়া, গুরুহত্যা—ব্রহ্মহত্যা করিয়াও, নিষ্কাম কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সাত্ত্বিকী শক্তিতে অশুভ কর্ম্মবন্ধ বা পাপের নামগন্ধ হইতেও মুক্ত ছিলেন, গীতাভক্ত হিন্দু ইহা বিশ্বাস করেন। সাত্ত্বিকতার নিষ্কাম অধিকারে আদর্শ হিন্দুর অকরণীয় বা অসাধ্য কিছুই নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার রাজসিক বৈরিতা-বুদ্ধির লেশ বা তামসিক পরবিদ্বেষ থাকিতে পারে না।

হিন্দুর প্রতি ইংরাজের রাজদ্রোহের সন্দেহ ভুল; কেননা, নৈতিক আদর্শে ইংরাজের প্রতি হিন্দুর শত্রুতা বা বিদ্বেষবুদ্ধি থাকিতে পারে না; তবে সাত্ত্বিকী আত্মরক্ষা-নীতির অবশ্য কর্ত্তব্যতায় হিন্দু স্বদেশী অর্জ্জন ও বিদেশী বর্জ্জনে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। ইহাতে ইংরাজ বণিগ্‌বৃত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কষ্ট বোধ করিলে নাচার। "বয়কট" বা বিদেশীবর্জ্জন বাদ দিয়া, শুধু স্বদেশী অর্জ্জন যদি মিণ্টো সাহেবের "Honest স্বদেশী" হয়, তবে তাহা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। "কাণ টানিলেই মাথা আসে।" 'স্বদেশী' টানিলেই "বয়কট্" আপনি আসে। এ দুয়ের যুগপৎ কার্য্যকারিতা বা অবিচ্ছিন্নতা অনিবার্য্য। "বয়কট্"-শূন্য স্বদেশী যদি সম্ভব হয়, সেক্সপিয়রের সাইলকের রক্তশূন্য 'মাংস-কর্ত্তনও' অসম্ভব নয়। অথবা ঐ দুয়ের সম্বন্ধ রক্ত-মাংস অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠতর। দুইটিই একই বস্তুর দুই পিঠ স্বরূপ; পরস্পর সাপেক্ষ (Co-relative)। একের অভাবে অন্যের

অস্তিত্বই অসম্ভব। একটি কৌতুক-কবিতা এইরূপ,—

"কাঁটা বেছে না ফেলে কর৩ মৎস্যাহার।
উকুন না মেরে মাথা রাখ পরিষ্কার॥
কুপথ্যটি না ছাড়িয়া রোগ দূর কর।
মল মূত্র না ত্যজিয়া পানাহার ধর॥
গ্রীষ্ম নাশ ব্যজনে, ত্যজনা বহ্নি তাপ।
ধর্ম্মকর্ম্ম কর, কিন্তু ছাড়িওনা পাপ॥
নাও বেয়ে যাও নেয়ে, জলেরে ঠেলনা।
নিশ্বাসে বাঁচাও প্রাণ, প্রশ্বাস ফেলনা॥"

এই সব উপহাস উপদেশ যদি সম্ভব হয়, তবেই "বয়কট"বিমুক্ত "Honest স্বদেশী" অসম্ভব নয়। সুতরাং উক্ত পদ্যটির শেষে আর দুটি পংক্তি প্রক্ষেপ করা যায়, যথা—

বাঞ্ছ যদি 'Honest স্বদেশী' বিশেষণ,
বিদেশী না ত্যজি কর স্বদেশী গ্রহণ।

ফলে চর্ব্বী মাড়-দেওয়া কাপড় পরা এবং শূকর-গরুর হাড় রক্তযুক্ত লুণ চিনি খাওয়া প্রভৃতি আজ আদর্শ হিন্দুর অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে রাজার জাতি ব্যাজার হন, নাচার! রাজার খাতিরে, গুরুর খাতিরে, কি বাপ মা'র খাতিরে, কারো খাতিরেই ধর্ম্মের খাতির—ভগবানের খাতির ত্যাগ করা যায় না।

কেবল যে হিন্দুর অস্পৃশ্য শূকর-গরুর শোণিতাদির সংস্রব জন্যই 'ধর্ম্মের খাতির' বলা গেল, তা নয়। হিন্দুর যে সবই ধর্ম্ম। হিন্দু-জীবনের ঐহিক-পারত্রিক, পারিবারিক-সামাজিক-বৈষয়িক, শারীরিক-মানসিক-আধ্যাত্মিক, সমস্ত 'ইক্'গুলির সমস্ত কর্ত্তব্যই ধর্ম্ম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বদেশী অর্জ্জন ও বিদেশী-বর্জ্জন ব্যতীত আমাদের উচ্ছেদ-উন্মুখ জাতীয় জীবনে আত্মরক্ষার আর উপায়ান্তর নাই; সুতরাং সর্ব্বাগ্রসাধ্য নিত্যধর্ম্ম আত্মরক্ষার অনুরোধে ভারতবাসী উহাতে যথাসাধ্য একান্ত বাধ্য। ইংরাজ ধৃতব্রত ও কৃতপ্রতিজ্ঞ 'স্বদেশী' সাধকবর্গকে জেলে না পূরিলে আর তাহাদের প্রাণপণ পালিত এই অর্জ্জন বর্জ্জন ব্রত বিসর্জ্জন করাইতে পারিবেন না। কেননা, জেলের কয়েদীরই কেবল খাওয়া-পরায় স্বাধীনতা নাই; আর সকলের অবশ্য আছে।

যে স্বদেশী হইয়া 'স্বদেশী'-বিরোধী, সে দেশ-দ্রোহী, মাতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী, আত্মদ্রোহী। 'স্বদেশী'র বিরুদ্ধাচরণ পরিষ্কার আত্মহনন। অনপরাধে পরের হাতে অপঘাতে মরা অপেক্ষা আত্মহত্যা অধিকতর আপত্তি-বিপত্তি-জনক। যাহা হউক, শাস্তি দিয়া—ভয় দেখাইয়া; 'স্বদেশী' দমনে ইংরাজরাজ কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা বিশ্বরাজ ঈশ্বরই জানেন। ফলে আস্তিক 'স্বদেশী'দের আন্তরিক বিশ্বাস যে, ঈশ্বরেচ্ছাই এ দেশে 'স্বদেশী'বেশে অবতীর্ণ; নচেৎ এক কালের নীরব—নিস্পন্দ—নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যু-নিদ্রা হইতে হঠাৎ এরূপ জ্বলন্ত—জীবন্ত জাতীয় জাগরণ কিরূপে সম্ভব হইল? ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, বঙ্গোদ্ভূত এই অদ্ভুতশক্তিশালী ক্ষুদ্র "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রটি একেবারে আসমুদ্র-অচলেশ ও আব্রহ্ম-সিন্ধুদেশ ব্যাপিয়া স্বদেশী-প্রেমোদ্দীপনার কি তুমুল তরঙ্গ তুলিয়াছে! অতএব যদি এই 'স্বদেশী' সাধন বিশ্বরাজেরই অভিপ্রেত হয়, তবে এই বৈষ্ণরাজের বিরুদ্ধাচরণে ইহা রুদ্ধ হইবার নহে।

ভগবদিচ্ছায় আমাদের বৈশ্যরাজার যে ক্ষাত্রধর্ম্ম মাত্রই নাই, তাহা নহে; বরং আপেক্ষিক ভাবে বিলক্ষণই আছে। নচেৎ সসাগরা ভারতভূমির এমন অভূতপূর্ব্ব একছত্র সাম্রাজ্য-সম্ভোগ বিশ্ববিধাতা যে নেহাৎ অযোগ্যকে দিবেন, এমন অযোগ্য বিবেচক তিনি নহেন। বিপুল বৈশ্যত্বের পাছেও ক্ষত্রিয়ত্ব না থাকিলে, ভগবান কাহারও রাজ্যলাভ বিধান ও রাজ্যপালন-শক্তি প্রদান করেন না। জগতে প্রাচীন বিপুল ইহুদী জাতি চিরকাল মূর্ত্তিমান বৈশ্যত্ব রূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও, মাত্র ক্ষত্রিয়ত্বের একান্ত অভাবেই জগতে কোথাও কোন রাজ্যলাভ বা একটা স্থায়ী মূল বাসস্থান লাভ করিতেও পারিলনা! উহারা পাবুটের পানাপুকুরের পানা-রাশির ন্যায় পৃথিবীময় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। খৃষ্টান জাতি তেমন বৈশ্য নহে। ইহারা ক্ষাত্র বৈশ্য। চীন জাপানী প্রভৃতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ জাতিও ক্ষাত্র বৈশ্য। বিংশ শতাব্দীর বিগতভাগ্য হিন্দুজাতিই কেবল বুঝি পূর্ণ শূদ্রত্বের প্রান্তসীমায় সমাগত। তবে কিনা, "হারিয়ে তারিয়ে কাশ্যপ গোত্র" গোছ ব্রাহ্মণত্বও যদি কিছু থাকে, তবে তাহাও এই জাতিতেই আছে; আর কোথাও নাই। ভারতে মুসলমানের আমলেও ক্ষাত্রত্ব যে কিছু ছিল, ক্রমে কমিতে কমিতে এই ইংরাজের আমলে এখন তাহার কেবল স্মৃতি-সাক্ষ্য মাত্র ইতিহাসের বক্ষে রক্ষিত; কিন্তু প্রত্যক্ষে কিছুই লক্ষিত হয় না। কেবল ঐ হতাবশেষ ব্রাহ্মণত্বের লেশই আমাদের—পতিতের একমাত্র পুনরুত্থান-ভরসাস্থল।

অতএব এই স্বদেশী সাধনে, এই পূর্ণশূদ্রত্ব পতিত জাতির ব্রহ্মণত্বকেই চরমাদর্শ করিয়া, আত্মোন্নয়নে অগ্রসর হইতে গেলেই বৈশ্য ও ক্ষাত্র ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছিতে হইবে। পর্য্যায়ক্রম অতিক্রম করিয়া লম্ফ-গতির ফল প্রায় পদভঙ্গেই পর্য্যবসিত হয়। তাই আমাদিগকে কৃষি শিল্প বাণিজ্য রূপ বৈশ্য ব্রতে, অর্থে ও সম্পদে যেমন সমর্থ ও সুসম্পন্ন হইতে হইবে, তেমনি ব্যায়ামাদি বলচর্চ্চায় বাহুবল, সাহস, উদ্যম, অধ্যবসায়, বীরত্ব, মহত্ত্ব, প্রভুত্ব, দান, দয়া, প্রভৃতি ক্ষাত্রধর্ম্মও লাভ করিতে হইবে; এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণামে আমাদের অনন্যসাধারণ অমূল্যধনের অবশেষ-লেশ, পুণ্য পবিত্রতা জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রেমানন্দ-বীজ স্বরূপ ব্রাহ্মণত্ব লাভার্থ আত্ম-নির্ভরতার অবিরোধে ভগবানে নির্ভর রাখিতে ও যথাধিকার ভগবদ্ভজন-পর থাকিতে হইবে। এইরূপ বিচার-বিহিত শাস্ত্রসম্মত সুপ্রণালীতে অটল—অচঞ্চল, সংযত, সুগম্ভীর সাত্ত্বিক ভাবে 'স্বদেশী' সাধন চালাইলেই, আমরা এই সঙ্কটসঙ্কুল স্বদেশী-সমস্যায় সমুত্তীর্ণ হইব, সন্দেহ নাই। তাহাহইলে, অনুদ্যম, অলসতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, প্রভৃতি তামসিক দোষরাশিও থাকিবেনা, আবার রাজসিক ঔদ্ধত্যের তারল্য-তরঙ্গে রাজার সঙ্গে বোঝাবুঝি—জেদাজেদিও লাগিবেনা। সাত্ত্বিক পথে চলিলে, ঈশ্বরও সন্তুষ্ট ও সহায় হইবেন।

অবিদ্বেষ, ঔদার্য্য প্রেম ও পবিত্রতার সর্ব্ব-সংরক্ষণী স্বর্গীয়শক্তি অতিক্রম করিয়া, ইংরাজরাজ রাজদ্রোহের ছিদ্র ধরিতে পারিবেন কি? তবে যদি একেবারে সাধারণ সভ্যতার ঘোমটা খুলিয়া, প্রচণ্ড পাশব বলে জেদ্‌ধরিয়া জোর করিয়া 'স্বদেশী' ছাড়াইতে ও বিদেশী ধরাইতে চাহেন, তবে যে ভারতের ভবিষ্যৎ কি পথ করিবে, কি মূর্ত্তি ধরিবে, তাহা ভারতের সেই চিরআরাধ্য শ্রীভগবানই জানেন। সে যাহাই হউক, গালাগালি-দলাদলি, বিরাগ-বিদ্বেষ, বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা, অনৌদার্য্য-ঔদ্ধত্য হইতে ভগবৎকৃপায় মুক্ত ও শুদ্ধ স্বদেশী সাধনায় কায়মনোবাক্যে যুক্ত থাকিতে পারিলেই আমাদের পুনর্জ্জীবন, পুনরুত্থান ও সর্ব্বসিদ্ধি-সমৃদ্ধির সমাধান হইবেই। ঈশ্বর-নির্ভর-নিরাপদ স্বাবলম্ব কর্ম্মযোগ-পথে ধর্ম্মকে সঙ্গী—প্রেমকে পথপ্রদর্শক পাইলে, গন্তব্যদেশে পৌঁছিতে হিন্দুর বিন্দুমাত্র সন্দেহের বিষয় নাই।

'স্বদেশী সমস্যা' আর কিছুই নহে, এই স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে রাজা-প্রজা উভয় পক্ষের স্বার্থ-সংঘর্ষণ-সমাধানের সমস্যা। 'স্বদেশী' টিঁকিলে ও জাঁকিলে, ভারতবাসী টেঁকে, জাঁকে, ওঠে, জাগে, মানুষ হয়। নচেৎ রোগে শোকে, দুর্ভিক্ষ-দুর্ভোগে, দৈন্য-দৌর্ব্বল্যে, অনশনে, অপমানে অচিরে উচ্ছন্ন যায়। আর 'বয়কট' ব্রহ্মাস্ত্রের বিকট আঘাতে ভারতের বণিক-রাজ ইংরাজের বাণিজ্য বিপন্ন হয়। ম্যাঞ্চেষ্টার—ল্যাঙ্কশায়র—লিবারপুলে হাহাকার ওঠে, অশ্রুধারা ছোটে; ফলে অতি ক্ষতি ঘটে। কাজেই ইংরাজরাজ স্বজাতি-স্বার্থরক্ষার্থ—অর্থাৎ আত্মরক্ষার্থ তৎপ্রতীকার কল্পে, 'স্বদেশী' বিকার-কল্পিত রাজ দ্রোহাদির অভিযোগে, স্বীয় সমস্ত রাজশক্তি-পরিচালিত পাশবশক্তি প্রয়োগে—ক্রমশঃ প্রয়োজনানুরূপ প্রস্তুত হইতেছেন ও হইবেন। ভারতের জন্যই ভারতশাসন ইংরাজ-আমলে অসম্ভব। ভারত রাজস্ব-স্বার্থ-স্রোতের মুখ্য প্রবাহই 'সাত সমুদ্র তের নদী' বাহিয়া বিলাত অভিমুখে ধাবিত; গৌণ প্রবাহও ইংরাজের ভারতীয় স্বার্থের অন্তর্ভূত ভাবেই ভারতবাসীর কথঞ্চিৎ জীবন ধারণে অবশেষিত। এই জন্যই ভারত-শাসনের সঙ্গে ভারত-শোষণ ইংরাজ-রাজত্বের অনিবার্য্য অপরিহার্য্য ফল। ৭ ৮ শত বৎসরের সুদীর্ঘ মুসলমান রাজ-শাসনে আর যত দোষই থাকুক্, ভারত-অর্থের ও ভারত-স্বার্থের বিদেশে টান না পড়াতে 'শোষণ' মোটেই ছিলনা। বরং ভারত সত্বরস ভারতেই সঞ্চিত থাকাতে, শোষণের পরিবর্ত্তে পোষণই হইত। বর্ত্তমানে, স্বদেশী সাধনে, ভারত-প্রজা চায় ভারত-পোষণ, আর স্বজাতি-স্বার্থসাধনে ইংরাজরাজ চান ভারত-শোষণ। পোষণ যাহা চান, তাহাও শোষণার্থে। যেমন দুগ্ধার্থীর গো-পোষণ। উভয়ের উদ্দেশ্যই পোষণ ধরিয়া নিলেও, প্রধানতঃ প্রজার উদ্দেশ্য পোষণার্থে পোষণ এবং রাজার উদ্দেশ্য শোষণার্থে পোষণ। ইহাই 'স্বদেশী' সমস্যা। ভারতবাসী এক দিন ইহা ভাল বোঝে নাই। সাময়িক ভাবে কখনও হয়ত কিছু বুঝিলেও, সাধারণতঃ

মোহাভিভূত—নিদ্রিত ছিল। এই স্বদেশী আন্দোলন রূপ স্বর্গীয় অমৃত কুণ্ডের ছিটায় গোটা দেশটা যেন হঠাৎ 'আড়া মোড়া' ছাড়িয়া, গা ঝাড়িয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই আবার ঘুম-পাড়ানোর দরকার। নেহাৎ না ঘুমাইতে চাহিলে, রাজ-অবাধ্যতা বা রাজদ্রোহিতা-দোষে—মারিয়া ধরিয়া, জব্দ, নিঃশব্দ, নিশ্চেষ্ট ও নির্জ্জিত করিয়া রাখা আবশ্যক। আর ঘুমের সম্ভাবনা কম দেখিয়া ও সদ্যজাগ্রতের অঙ্গ-বিক্ষেপ রাজবিধি-ভঙ্গ ভাবিয়াই মারা ধরা আরম্ভ হইয়াছে। এখন ভারতবাসীর পক্ষে বৈধ প্রতিবিধান কি? এ স্বদেশী সমস্যার শুভ সমাধান কি?

'স্বদেশী' পরিত্যাগ অবশ্য উপায় নহে; বরং ঘোর অপায়। উহাতে আত্মনাশ—সর্ব্বনাশ—মহাপাপ। তবে প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের প্রতিযোগিতাস্থলে আত্মরক্ষার্থ দুঃসাহস, দুরাশা, অসংযম, ঔদ্ধত্য, চপলতা ও ব্যাপকতা যথাসম্ভব পরিহার পূর্ব্বক, ধীর, গম্ভীর, সংযত, বৈধ, অথচ সুদৃঢ়, সুদক্ষ, সুশৃঙ্খল ভাবে স্বদেশী সাধন চালাইতে হইবে। সুস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া—আর ঘুমাইতে নাই। সুকর্ম্মে লাগিয়া, ধরিয়া ছাড়িতে নাই। কর্ত্তব্যের সুপথে এতদূর অগ্রসর হইয়া আর পিছাইতে নাই। পিছাইলে মৃত্যু নিশ্চয়; বরং সতর্ক-অগ্রসরণে বাঁচিবারই উপায় হয়। ধর্ম্মনির্ম্মিত কর্ম্মপথে, আত্মনির্ভরতা-রথে, প্রীতি-মৈত্রীর পথ-প্রদর্শন মতে, সংযতবেগে ও ভগবদ্ভক্তিবল-যোগে অগ্রসর হইতে পারিলে, পুনর্জীবন—পুনরুত্থান—শক্তি ও মুক্তিলাভ নিঃসংশয়—সুনিশ্চয়।

উপসংহারে ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা—প্রবেদন,—জগৎ শান্ত হউক্, যুদ্ধ-বিগ্রহ ক্ষান্ত হউক্। প্রবলেরা পীড়ন ছাড়ুক্, দুর্ব্বলেরা স্বাবলম্বে বাড়ুক্। অতিস্বার্থ সংযত হউক্, মুমূর্ষুর জীবন রউক্। উন্নত—সহজে ফুটুক্, পতিত—স্বায়ত্তে উঠুক্। ভগবৎকৃপায় ভারত আবার উঠিয়া আপন আচার্য্যাসনে বসুক্; জগৎ তাহার শিষ্যত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞান-ধর্ম্মানন্দে—পরমেশ-প্রেমানন্দে ভাসুক্। ভগবৎকৃপাবিধানে, স্বদেশী সমস্যার শুভ সমাধানে—ভারতে অচিরে সে দিন আসুক্।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

বীণার শেষ তান।

আর বীণা বাজিলনা, ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার;
আকাশে মিশিয়া গে'ছে করুণ ঝঙ্কার তার!
জীবন-প্রভাতে বসি' প্রকৃতির নিকেতনে,
যে সুর-সপ্তকে বীণা বেঁধেছিনু যতনে;—
সেই সুরে সারাদিন গাহিয়া বিষাদ-গান,
তিতি' অশ্রুজলে, আহা হল' দিবা অবসান!
অই কা'রা সুবাতাসে তরণী বাহিয়া যায়;
কেমন ইমন-সুরে উদাস-রাগিণী গায়!
আমার জীবন-তরী কর্ণহীন, জীর্ণতর,
অনন্ত আবর্ত্ত-মাঝে ঘুরিতেছে নিরন্তর।
সন্ধ্যার আঁধার ক্রমে ঘেরিতেছে চারিধার;
অস্তাগার-পুরোভাগে ভাসে অশ্রু-পারাবার!

অনিবার্য্য অনুতাপ! এই বড় খেদ মনে,
বিশ্বাসের ক্ষীণজ্যোতিঃ পশিলনা এ জীবনে!
না হেরিল এ হৃদয় শান্তির উজ্জ্বল আলো;
আঁধারে আসিয়ে, পুনঃ আঁধারেই যেতে হল!
এবার গাহিল বীণা—জীবনের শেষ গান,—
নীরবিল চিরতরে, ফুরাইল শেষ তান॥

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

বিশ্ব-প্রেম।

বেদ, কোরাণ, বাইবেল, বিজ্ঞান, পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থ; হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম ও সকল সম্প্রদায়, এমন কি, পদার্থবাদী বা নাস্তিক-গণ পর্য্যন্ত মানবকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন; এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম কাহাকে বলে বা কর্ত্তব্য কি? ইহার উত্তর সংক্ষেপে এক কথায় হওয়া বড়ই কঠিন; যে হেতু মানবের সহস্র সহস্র কার্য্য আছে; কার্য্য-ক্ষেত্রও অসীম। ইহার মধ্যে কোন্‌টী কর্ত্তব্য, কোন্‌টী অকর্ত্তব্য, তাহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন। অনেকস্থানে সৎকার্য্যের মধ্যেও মন্দ কার্য্য আছে এবং অসৎ কার্য্যের মধ্যেও উৎকৃষ্ট কার্য্য আছে। কার্য্যকাল ব্যতীত তাহার ন্যায্যান্যায্যতা সহজে অবধারণ করা যাইতে পারেনা। এমন কি, মিথ্যা বাক্য কহা অতীব মন্দ কার্য্য, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এমন স্থলও আছে যে, মিথ্যা বাক্যই অতি কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। মনে করুন, একজন পথিকের নিকট প্রভূত অর্থ আছে; ঐ পথিকের প্রাণনাশ করিয়া অর্থ অপহরণ করিবার জন্য দস্যুগণ তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছে। পথিক অর্থ সহ কোন এক তপোবনাশ্রমে একটী ঋষির শরণাপন্ন হইলেন। ঋষি দয়ালু, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়; ঋষি ঐ শরণাপন্নকে আশ্রয় দিলেন এবং তাহাকে লুকাইয়া রাখিলেন। দস্যুগণ কিছুক্ষণ পরে আসিয়া ঋষিকে পথিকের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। দস্যুগণ সশস্ত্র; ঋষি তাহাদিগকে বলদ্বারা নিবারণ করিতে পারেন না; নিকটে রাজপুরুষ বা শান্তিরক্ষকও নাই। ঋষি যদি বলেন যে, আমি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিবনা, তবে দস্যুগণ তাহাকে বধ করিতে পারে; এস্থলে ঋষির কর্ত্তব্য কার্য্য কি? সত্য কথা বলিলেও দস্যুগণ পথিকের প্রাণ নষ্ট করিয়া অর্থ অপহরণ করে এবং তৎসহ ঋষিরও প্রাণ নষ্ট করিতে পারে। আবার পথিকের কোন সন্ধান জানেন না, বলিলে, মিথ্যা কথা বলা হয়। অতএব এস্থলে মিথ্যা কথা বলাই অতীব কর্ত্তব্য কার্য্য হইতেছে কিনা, পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। যাহা হউক, কর্ত্তব্যনির্ণয়ে একটী কষ্টি-পাথর আছে; সেই কষ্টিপাথরের নাম মহৎ বা সদুদ্দেশ্য। প্রকৃত পক্ষে যদি কার্য্যের উদ্দেশ্য সৎ বা মহৎ হয়, তবে বাহ্যতঃ যেরূপই হউক না কেন, উহাই কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। এই সৎ ও মহৎ কথার মধ্যেও অতি কঠিন সমস্যা আছে। একের মনে যাহা সৎকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, অন্যের নিকট তাহা অসৎ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে

যে না পারে, এমত নহে। মানবের মধ্যে সম্প্রদায় ভিন্ন২ ধর্ম্ম ভিন্ন২ ব্যবহার ভিন্ন২; অতএব ভিন্ন ভিন্ন মানবের নিকট সৎ ও মহৎ কার্য্যের সংজ্ঞাও ভিন্ন ২ হইতে পারে। তবে সর্ব্বসম্মত হইতে পারে, সৎ কার্য্যের এমন একটী সংজ্ঞা অবশ্যই আছে; ফলে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যেই মানবের এক প্রাণতা বা বিশ্বপ্রেমের মূল আছে, দৃষ্ট হইবে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, যেমন আস্তিক-নাস্তিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই মানবকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন, সেইরূপ মানবের স্থায়ী হিতজনক কার্য্যকেও তাঁহারা সদুদ্দেশ্যমূলক কর্ত্তব্য কার্য্য বলিতে বোধ হয় অস্বীকার করেন না। কিন্তু এই স্থানে 'হিত' কথাটী লইয়া আত্মবাদী ও জড়বাদী বা নাস্তিকের মধ্যে মতভেদ আছে। আস্তিক বলিবেন—মনুষ্যের কিসের স্থায়ী হিত? যাহা অস্থায়ী, তাহাতে কখনও স্থায়ী হিত হইতে পারেনা। অতএব দেহ, ইন্দ্রিয়, মনের বাসনা ও ইন্দ্রিয়ের এবং বাসনার বিষয়—অর্থাৎ গৃহ, দ্বার, স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ্, সকলই অস্থায়ী; সুতরাং তাহাতে স্থায়ীহিত বা উন্নতি কখনই হইতে পারেনা। যাহা স্থায়ী পদার্থ, তাহারই স্থায়ী উন্নতি। আত্মা স্থায়ী, অমর, অতএব আত্মারই স্থায়ী উন্নতি যাহাতে হয়, সেই কার্য্যই সদুদ্দেশ্যমূলক কর্ত্তব্য কার্য্য। নাস্তিক আত্মা স্বীকার করেন না; নাস্তিক বলিবেন—ব্যক্তির দেহ-ইন্দ্রিয় অস্থায়ী হইলেও, ইন্দ্রিয়ের বিষয়—অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, ধন, সম্পদ্, ক্ষমতা অস্থায়ী হইবে কেন? মানব ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত অস্থায়ী হইলেও, সমাজ বা সমষ্টিগত মানব-জগৎ অস্থায়ী নহে। আমরা ধন, সম্পদ, রাজ্য, সম্ভ্রম, ক্ষমতা, বল, বীর্য্য প্রভৃতি যাহা সঞ্চয় করিব, তাহা আমরা ভোগ না করি, আমাদিগের বংশাবলি—স্বজাতিসম্প্রদায় পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে তাহা ভোগ করিবে; তবে ঐ সব উন্নতি স্থায়ী উন্নতি নহে কেন? পলাশী-যুদ্ধজেতা লর্ড ক্লাইব ইংরাজের ভারতসাম্রাজ্য সংস্থাপনের মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান; তাহার ফলভোগ ক্লাইব না করুন, কিন্তু ইংরাজ জাতি করিতেছেন। এমন কি, পৃথিবীতে বাণিজ্যাদি দ্বারা যে ধন-সম্পদ্—সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইবে, তাহা পৃথিবীতেই থাকিবে এবং মানবজাতিই তাহা ভোগ করিবে এবং তদ্দ্বারা মানবকুল ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। অতএব সমাজের বা ব্যক্তির ধনৈশ্বর্য্যের—অর্থাৎ বিষয়ের উন্নতি অস্থায়ী উন্নতি নহে। উহা দ্বারা যখন মানবসমাজেরই উন্নতি সাধিত হয় এবং মানবসমাজ যখন স্থায়ী, তখন ঐ উন্নতিই স্থায়ী; এস্থলে আবার একটী অদৃশ্য আত্মার কল্পনা কেন? আস্তিক বলিবেন—

কে বলিতে পারে আত্মা অদৃশ্য? আত্মাই প্রত্যক্ষ; তোমার বিষয়ই অদৃশ্য। যদি তোমার চৈতন্য বা জ্ঞান না থাকে, তবে বিষয়-সম্পদ্—এমন কি, দৃশ্য জগৎ আছে, তুমি বলিতে পার? অতএব তোমার চৈতন্য বা জ্ঞানের মধ্যে বিষয়-সম্পদ্ প্রভৃতি দৃশ্য জগৎ ভাসমান আছে; চৈতন্য বা জ্ঞানের অভাবে দৃশ্য জগৎ নাই। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। একটু গাঢ় চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, যদি জীবকুল ধ্বংস পায় ও জগতে চৈতন্য না

থাকে, তবে কি দৃশ্য জগৎ আছে, বলিতে পারেন? জ্ঞান বা চৈতন্যের অভাবে দৃশ্য জগতের অভাব; জ্ঞান বা চৈতন্য আছে বলিয়াই জগৎ আছে; অতএব জ্ঞানই কর্ত্তা, জগৎ কর্ম্ম। জ্ঞানই স্থায়ী, জগৎ অস্থায়ী। জগৎ না থাকিলেও, জ্ঞান বা চৈতন্য আত্ম-স্বরূপসত্তায় থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকিলে জগৎ থাকিতে পারে না। জ্ঞানই আত্মা; আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ; অতএব জ্ঞানের উন্নতিই স্থায়ী উন্নতি।

ডারউইনের থিয়রি—বেদান্তদর্শনের বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদের একাংশ (অর্থাৎ স্থূলভাব) মাত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন বা পৃথিবীর কোন উচ্চতম স্থানে সিংহাসনোপরি আসীন নহেন; অথবা জগৎ হাতে গড়াইয়াও কেহ সৃষ্টি করেন নাই বটে, কিন্তু অনন্তের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানস্রোত প্রবাহিত আছে। বস্তুর অস্তিত্ব ব্যতীত কেবল রাসায়নিক সংযোগে তাহার বিকাশ হইতে পারে না। আজকালের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সর্ব্বত্রই তাড়িতশক্তি আছে; কিন্তু সকল পদার্থে তাহার বিকাশ নাই; সাধারণতঃ গুহ্য অবস্থায় থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ সংযোগে তাহার বিকাশ হইয়া থাকে; কিন্তু তাড়িতশক্তি দৃশ্যই হউক বা অবিকাশিতই হউক, যদি তাহার আদৌ অস্তিত্ব না থাকে, তবে কি রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা তাহা বিকাশ পাইতে পারে? যাহা আদৌ নাই, তাহার বিকাশ অসম্ভব ও অদার্শনিক (Illogical)। অনন্ত জ্ঞানময়ী নিরাকারা চিচ্ছক্তিই আদি; উহাই জগতের আদি প্রকৃতসত্তা। সর্ব্বাবস্থাতেই জ্ঞানের বা চৈতন্যের অস্তিত্ব আছে; তবে বিষয়-সংযোগে বাহ্য জগতে উহার বিকাশ হয়। তাড়িত যেমন বস্তু-সংযোগ ব্যতীত বিকাশ পাইতে পারেনা, কিন্তু তড়িৎ তড়িৎই থাকে; সেই রূপ জ্ঞান বা চৈতন্য, তাহার আশ্রয় দেহ ও আশ্রিত বাহ্য বস্তু সংযোগব্যতীত বাহ্য-জগতে বিকাশ পায় না। অন্তর্জগতে নিরাকার চৈতন্য স্বয়ংই বিকাশিত; অতএব উহা স্বক্ষেত্রে—অর্থাৎ কারণ-স্বরূপাবস্থায় (Potential state) স্বয়ং বিকাশিত থাকে। ঐ জ্ঞান বা চিচ্ছক্তি অনাদি, পূর্ণ, অখণ্ড; তবে কার্য্য-জগতে অর্থাৎ পঞ্চভূতে যাহা অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাহাই অংশ বা খণ্ড। ঐ চৈতন্য বা জ্ঞান পঞ্চভূতোৎপন্ন মানব-মস্তিষ্কে আবদ্ধ হইয়া, তদ্‌-গুণানুগামী হয়। অতএব পঞ্চভূতের পরিণাম দেহ মধ্যে আবদ্ধ হইয়া সংকীর্ণ ও ব্যক্তিভাবাপন্ন হইয়া যায়। বেদান্ত বলেন—সত্ব, রজ ও তমোগুণ প্রকৃতিরই গুণ; উহা আত্মার গুণ নহে। অতএব রজগুণোৎপন্ন কাম-ক্রোধাদি ও তমো-গুণোৎপন্ন বিষয় বিভব বাসনা দ দ্বারা জ্ঞানও তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া সংকীর্ণ হয়। প্রত্যেকে আপন আপন সুখান্বেষণ করে, অর্থাৎ আত্ম-সুখে রত হয়; কিন্তু মানবে ঐ ত্রিগুণের বিকাশ আছে; তন্মধ্যে ঐ সত্বগুণ হইতে শুদ্ধজ্ঞান বিকাশিত বা জ্ঞানের মণ্ডল পরি-বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু মানবের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ব্যতীত জ্ঞানের মণ্ডল বাস্তবিক পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। যেমন ক্ষুদ্র বস্তুতেও তাড়িতাণু আছে, তাহা অন্ত

বস্তুবিশেষের সহিত সংযুক্ত হইলে, ঐ উভয় বস্তুস্থ তাড়িত একত্রিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ পরস্পরের প্রেম সংযুক্ত হইয়া, বহু 'আমি' একটী আমিত্বে পরিণত হইলে, ক্ষুদ্রজ্ঞান বৃহৎজ্ঞানে পরিণত হইতে থাকে। এইরূপে সংকীর্ণ আমিত্বের প্রসার হইলে, জ্ঞানের মণ্ডলও পরিবর্দ্ধিত হয়। যতই পরস্পরের মধ্যে প্রেম এবং একপ্রাণতা হইবে, বহু 'আমি' একটী আমিত্বে পরিণত হইবে, ততই যে আত্মার বা জ্ঞানের মণ্ডলও পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? প্রকৃত পক্ষে পরস্পরের মধ্যে একতা, প্রেম, একপ্রাণতাই আত্মার স্থায়ী উন্নতি। উহা আরো একটু বিশদ ভাবে না বলিলে কথাটী পরিষ্কার হইবে না। সেই পরমাত্মজ্ঞান প্রত্যেক পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেই অনন্ত জ্ঞানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাসমান আছে। জগতের প্রত্যেক পদার্থে সেই সদ্ বস্তুর সত্তা আছে; তবে এই জড়জগৎরূপ অসৎ পদার্থের মধ্যে সর্ব্বত্র তাঁহার বিকাশ নাই। যেখানে সেই জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহাও অসৎপদার্থমিশ্রিত বিকাশ। জীব-জন্তুর দেহ ভৌতিক; অতএব উহা অসৎ পদার্থ। উহার মধ্যে মানবেই ত্রিগুণের বিকাশ হওয়ায়, মানবেই কিঞ্চিৎ অপেক্ষাকৃত জ্ঞানের আধিক্য প্রকাশ পায়। ফলে উহা অসৎমিশ্রিত ও ক্ষুদ্র আমিত্বরেখা দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু সমগ্র জগতে যখন মূল জ্ঞান এক, তখন ঐ জ্ঞানের বিষয় বিভিন্ন হইলেও, জ্ঞান বিভিন্ন নহে। ঘট-জ্ঞান, পটজ্ঞান, ব্রজ্ঞান ইত্যাদি। ঘট, পট, পুত্র ছাড়িয়া দিলে জ্ঞান একই থাকে। "মাসাব্দ যুগ কল্পেষু গতা গম্যেষ্বনেকধা। নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা। ইমমাত্মাপরানন্দং পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।" সেই অদ্বিতীয় পরমাত্ম অখণ্ড মূলজ্ঞানেই যখন এই অনন্ত জগৎ ভাসমান, তখন ঐ আমিত্ব-বেষ্টিত জ্ঞানের আমিত্বের সংকীর্ণ রেখা প্রসারিত করিয়া, উহার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূরিতে পারিলে, আমাতেই অনন্ত জগৎ ভাসমান হইতে পারে। প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন:—

"সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥"

(বঙ্গার্থ)—এই অনন্ত জ্ঞান সর্ব্বগামী; সুতরাং সেই জ্ঞানই আমি; আমা হইতে সমুদায়; আমাতেই সমুদায় আছে; আমি নিত্য, অক্ষয় ও অব্যয় ব্রহ্মজ্ঞান, আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলাম এবং পরেও থাকিব। অন্য স্থানে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"রূপং মহত্তে স্থিতমত্র বিশ্বং।
ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদা
স্তেষ্বন্তরাত্মাখ্যমতীব সূক্ষ্মম্।
তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদি বিশেষণানাং।
অগোচরে যৎ পরমাত্মরূপং॥
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি।
তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায়॥"

প্রকাণ্ড অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই তোমার মহৎ রূপ। এই জগৎ তদপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র; এই বিভিন্ন জীব-জন্তু তোমার এক একটী

স্থূল রূপ; তাহাদের অন্তরাত্মাই তোমার অতিসূক্ষ্ম রূপ। ঐ সূক্ষ্মাদি বিশেষের অবিষয়ীভূত তোমার পরমাত্মস্বরূপ রূপ আছে। আর এক স্থানে প্রহ্লাদ কহিয়াছেন—

দেবা যক্ষাঃ সুরাঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
পিশাচারাক্ষসাশ্চৈব মনুষ্যাঃ পশবস্তথা॥
পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈব পিপীলিকাঃ সরিসৃপাঃ।
ভূমিরাপো নভো বায়ুঃ শব্দস্পর্শস্তথা রসঃ।
রূপং গন্ধো মনোবুদ্ধিরাত্মা কালস্তথা গুণাঃ।
এতেষাং পরমার্থঞ্চ সর্ব্বমেতৎ ত্বমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ উপরোক্ত সমস্তই তুমি এক চৈতন্যময়। এরূপ বিপুল বিশ্বপ্রাণতা ও বিরাট প্রেম হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত আর কোথায়ও নাই। আর্য্য মহাত্মা ও মহর্ষিগণ প্রত্যেক মানব, জীব-জন্তু, উদ্ভিদ্ ও জড়জগৎ, সমস্তই আত্মময় দেখিতেন। আমাদের দেহের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বহুল লোমকূপ আছে; তাহার একটীতে লোমস্ফোট হইলে, সমস্ত শরীর তাহার বেদনা অনুভব করে। জ্ঞানীর পক্ষে জগতের যে কোন জীবের কষ্টে তাঁহার কষ্ট অনুভূত হয়। জ্ঞানীরা সমগ্র জগৎকে তাঁহাদের এক একটী অঙ্গ মনে করেন; উহারই নাম বিশ্বপ্রেম। রাম যদি শ্যামের জমির আইল ঠেলিয়া লয়, শ্যাম তখন রামের উপর খড়্গহস্ত হয়; ইহার কারণ, শ্যাম হইতে রামের ভেদ জ্ঞান। যদি উভয়ই একমন হয়, তবে বিবাদ দূরে যাউক্, উভয়ই এক হইয়া যায়! তোমার দেহের মধ্যে কোটী কোটী দেহরক্ষক জীবাণু আছে; তাহারা সৌহার্দ্দ ভাবে এক প্রাণে পরস্পরের সহানুভূতিতে স্বীয় স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দেহ রক্ষা করিতেছে। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বা অসামঞ্জস্য নাই। যখন অসামঞ্জস্য হয়, তখনই মানবদেহের পীড়া উপস্থিত হয়। সেইরূপ এই পৃথিবীতে মানবগণের মধ্যে বিবাদ ও অনৈক্য ভাবই মানবসমাজে পীড়া স্বরূপ। একপ্রাণতা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন ব্যতীত এই ভয়ঙ্কর পীড়া আরোগ্যের কোনই উপায় নাই। এক একটী মুন্সেফী আদালতে বার্ষিক অনূন ২।৩ হাজার মোকদ্দামা যে রুজু হইতেছে, উহাও উপরোক্ত সান্নিপাতিক পীড়ার কার্য্য। যেমন অঙ্গে স্ফোটকাদি হইলে অস্ত্রাঘাত করিতে হয়; কোন অঙ্গে পচা ধরিলে, ঐ অঙ্গ ছেদনও করিতে হয়, সেইরূপ মানবের পরস্পরের মধ্যে চৌর্য্য, দস্যুতা, নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধে কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত প্রভৃতিও তদ্রূপ। সুতরাং পীড়াদ্বারা দেহের যেমন হানি হয়, পরস্পরের মধ্যে একতার অভাব, অসৌহার্দ্দ, বিবাদ, কলহ, চৌর্য্য ও দস্যুতা দ্বারা সেইরূপ মানব-সমাজের বিশেষ হানি হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির সুস্থ দেহে শান্তিভোগ যেমন সুখকর, জগতে মানবের মধ্যে একপ্রাণতা ও ভ্রাতৃভাব মানব-জগতের তদ্রূপ সুখকর। আর্য্য ঋষিগণের একপ্রাণতা কেবল মানব-জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, সকলের সহিত তাঁহাদের একপ্রাণতা ছিল! আর্য্য ঋষিগণের তপোবনে হিংস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, ছাগ, মৃগ, পশু ও পাখী পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসাশূন্য হইয়া, যেন বিরাট প্রেমে মত্ত হইয়া, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনপূর্ব্বক শান্তিসুখে বিরাজ করিত।

সিংহ-ব্যাঘ্রের যে স্বভাবজাত হিংসাবৃত্তি, তাহা ঋষিদিগের বিশ্বজনীন প্রেমের বলে অন্তর্হিত হইয়াছিল। আজকালকার দিনে ইহা অলৌকিক বলিয়া পদার্থবাদীগণ বা তাঁহাদের শিষ্যগণ হয়ত অবিশ্বাস করিবেন; কিন্তু এখনও এই দুর্দ্দিনে হিমালয়বাসী মহাত্মাগণের আশ্রমে যদি একবার তাঁহারা দৃষ্টি করিয়া চর্ম্মচক্ষুর সার্থকতা সাধন করিতে পারেন, তবে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁহারা সংসারের কোলাহলে থাকেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা নির্জ্জনে থাকিয়া, এই পীড়াগ্রস্ত মানব-জগতের জন্য ব্যথিত হইয়া, পীড়া উপশমের নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তবে বাতশ্লেষ্মা বিকারগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ঔষধ ধারণ অতি কঠিন। রোগ যেমন আপন কর্ম্মফলে উৎপন্ন হয়, সমাজের রোগও সমাজের কর্ম্মফলে উৎপন্ন হয়। মহাত্মা দূরে থাকুন, কর্ম্মফল নিবারণ করিতে স্বয়ং ঈশ্বরেরও যেন ক্ষমতা নাই! যেহেতু কর্ম্ম ঐশিক (প্রাকৃতিক) নিয়মে উৎপন্ন হয়; অতএব কর্ম্মফল লঙ্ঘন ঈশ্বরও করিতে পারেন না বা করেন না। তবে শারীরিক রোগ হইলে, চিকিৎসক যেমন ঔষধ প্রদানরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, সমাজের মানসিক রোগাদির ঔষধ প্রদান মহাত্মাগণও সেইরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করেন। অপর, চিকিৎসকগণ যেমন অগ্রে উপবাসাদি দ্বারা শরীর নীরস না করিয়া প্রায় ঔষধাদি প্রয়োগ করেন না, মহাত্মাগণও সেইরূপ সময় উপস্থিত না হইলে ঔষধ প্রদান করেন না। অবশ্য তাঁহারা এই জড়জগতে উপস্থিত হইয়া, দ্বারে দ্বারে লোকের হিতের জন্য বেড়ান না বা চাঁদার খাতা খুলিয়া দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত জনগণের উপকার সাধন করিতে আসেন না। তাঁহাদের সহিত জড়জগতের সম্বন্ধ অতি কম। তাঁহারা পার্থিব উন্নতিকে উন্নতি বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করেন ও সময়মত জগতে আধ্যাত্মিক শক্তি বিতরণ ও শুভ বুদ্ধি প্রদান করেন। কিন্তু ক্ষেত্র উপযুক্ত না হইলে, বীজ কখনও উপ্ত হয় না; এই জন্য ক্ষেত্র উপযুক্ত করিবার জন্য, সময় উপস্থিত হইলে, জড়জগতের সহিত কখন কখন সংস্রব রাখেন। কালধর্ম্মে ভারত-গৌরব অস্তমিত ও মুসলমান-রাজত্বকালে ক্রমে ক্রমে ভারত-রাজ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ার পর, পাশ্চাত্য শিক্ষারূপ উষা উদিত হইলে, ঐ অস্পষ্ট আলোকে প্রথমে যাহা দেখা যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া যেমন বোধ হয় কিম্বা অজ্ঞান শিশু যেমন আপাত চাকচিক্য দেখিয়া তাহাতে বিমোহিত হয় ও তাহাই উৎকৃষ্ট বস্তু মনে করে, আধুনিক বঙ্গবাসীর পক্ষে তদবস্থাই ঘটিয়াছে। যাহাই হউক, বালকেরা যাহা দেখে, তাহা জানিবার ইচ্ছা তাহাদের বলবতী হয়; সেই সময় গুরুজন তাহাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে থাকেন— অর্থাৎ শিক্ষা দিতে থাকেন। সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে ভারত-সমাজরূপ বালকের নানা বিষয়তত্ত্ব জানিবার ঔৎসুক্য দেখিয়া, ক্ষেত্র-প্রস্তুতির সময় বুঝিয়া, মহাত্মাগণ ভাবী বীজবপনের নিমিত্ত দুই চারিটী শিষ্যের প্রতি অনুকম্পাপুরঃসর তাহাদের

শুভবুদ্ধি প্রদান করিয়া, তাহাদিগের দ্বারাই ভারতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। চিন্তাশীল পাঠকগণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শুদ্ধান্তঃপুরে পর্য্যন্ত নাস্তিকতা ও সুরাদেবী প্রবেশ করায়, তৎসহচর উন্মত্ততা ও অশ্লীলতার সহিত অশ্বত্থাদিরও ছড়াছড়ি হইত; সেই স্থানে আবার এখন হোম, স্বস্ত্যয়ন, শৌচাচার, দেবার্চ্চনাদি স্থান পাইতেছে। বিদ্যাসুন্দর, লণ্ডনরহস্য, ডনজন্ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ভগবদ্গীতা, পঞ্চদশী, বেদান্ত—উপনিষদ্ প্রভৃতি তত্ত্বং স্থান অধিকার করিতেছে। ইহা কাহার প্রসাদে? সমুদ্রে জোয়ার হইলে, বড় বড় নদ-নদী দিয়া ঐ জল খাল-বিলে আসিয়া পৌঁছে। এই যে অস্ত বিশ্বপ্রেমের কথা লিখিতেছি, সে কাহার প্রসাদে? অবশ্য সাক্ষাৎভাবে মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক না হউক, তাঁহাদিগের শিষ্যপরম্পরাক্রমে সূক্ষ্মফল এতদূর আসিয়াছে। গীতা, পঞ্চদশী, বেদান্ত, চিরকাল ছিল, এখনও আছে; কিন্তু এতকাল তাহাদের অনাদর ছিল কেন? এখন ঐ সকল গ্রন্থের আদর ও আলোচনার বৃদ্ধি কোথা হইতে আসিল? জানিবেন, সেই মহাত্মাদের প্রসাদাৎ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

ভগবন্! কৃপা কর কাতর ভারত-প্রতি।
তোমা বিনে এ দুর্দ্দিনে দুর্গতির কেবা গতি?
নানা রোগাচ্ছন্নতায় ভারত উচ্ছন্ন যায়;
অনিবার অশ্রুধার, হাহাকার—হায় হায়!
দুর্ভিক্ষে মিলেনা ভিক্ষা, অনশন—অর্দ্ধাশন;
আগুন স্বদেশী চা'ল, রেঙ্গুন্ রাখে জীবন!
নিরন্ন-নিঃস্ব-নিরস্ত্র, পর-হস্তে অন্ন-বস্ত্র;
শক্তিক্ষীণ, দীন হীন, স্বদেশে বিদেশীগ্রস্ত!
এরো পরে রাজরোষে—প্রচণ্ড 'খাণ্ডবদাহ'!
জরিমানা, জেলখানা, নির্ব্বাসন দুর্ব্বিষহ!
হয়ত 'মার্সাল্ ল'ও অদূরে আগতপ্রায়;
তা হলেই সঙ্কটের ষোলকলা পূরে যায়।
এ পূর্ণ বিপদে তূর্ণ রক্ষ প্রভু পরমেশ!—
ও অভয় চরণে এ চিরাশ্রিত ভীত দেশ।
তোমারি কৃপা-প্রসাদ এ শুভ 'স্বদেশী'ব্রত—
যথাশক্তি সাধি যেন রহি পদে ভক্তিরত।
শুভাশুভে সুখ-দুঃখে বিপদে সম্পদে আর,
যুগে যুগে ভারতের ভক্তিযোগ শক্তি-সার।
'স্বদেশী' সঙ্কটে তাই তব প্রেমাশ্রয় চাই;
ও পদ-প্রসাদ ভিন্ন এবে অন্য গতি নাই।
তব কৃপা অবলম্বে স্বাবলম্ব-সাধনায়,
সেবে যারা, ভবে তারা অবিলম্বে সব(ই) পায়।
পালয়িতা পিতা তুমি—মাতৃরূপ নিরুপম—,
মাতৃভূমি রূপে বন্দি, গাই 'বন্দে মাতরম্'॥

শ্রীশঃ——

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ। ১৩১৪ সাল, ১৮২৯ শকাব্দা।

বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি।

ভারতই মোক্ষ বা নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের জন্মভূমি। যে অবস্থায় দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, সেই ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত অবস্থাকে নির্ব্বাণ মুক্তি কহে। নির্ব্বাণসাধক আচরণসমূহ নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম। নির্ব্বাণ ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত অবস্থা বলিয়া, ইন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক্ নিরুদ্ধ করাই নির্ব্বাণধর্ম্ম সমূহের শেষ ফল। সমাধি এবং ঐন্দ্রিয়িক ও মানস বিষয়ে সম্যক্ বৈরাগ্যই ইন্দ্রিয় ও মনকে নিরোধ করিবার উপায়। সুতরাং সম্যক্ সমাধি ও সম্যক্ বিরাগ (যোগশাস্ত্রের ভাষায় নিরোধসমাধি ও পরবৈরাগ্য) নির্ব্বাণের মুখ্য ও সাধারণ উপায়। অতএব যাহা ঐ দুইয়ের বিরুদ্ধ, তাহা নির্ব্বাণধর্ম্ম নহে; যাহা উহার অনুগত, তাহাই নির্ব্বাণধর্ম্ম।

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের কচিৎ কচিৎ এবং প্রধানতঃ উপনিষদে নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের উপদেশ দেখা যায়। তদ্ব্যতীত বেদের অনুগত সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে নির্ব্বাণের উপদেশ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও নির্ব্বাণধর্ম্মেরই উপদেশ দেখা যায়।

সমাধি ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে সাংখ্যাদি আর্য্য-শাস্ত্রে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে যেরূপ উপদেশ আছে, তাহা যে বস্তুতঃ এক, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।—

আর্য শাস্ত্র।

১। তদেবার্থ মাত্রনির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ। যোগসূত্রম্।

ধ্যান বা চিত্তের একতানতা পরিপুষ্ট হইয়া যখন কেবল ধ্যেয় বিষয় মাত্রই বোধগোচর

থাকে, আত্মহারার ন্যায় সেই ধ্যানই সমাধি।

২। সমাধি ফলভেদে দুই প্রকার; বিভূতি মাত্র ফল এবং কৈবল্য ফল। তন্মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কৈবল্যফল, আর কৈবল্য বিষয়ে অপ্রযুক্ত সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা অননুবিদ্ধ, সমাধি বিভূতি মাত্র হেতু। বৌদ্ধদের লোকীয় সমাধির ফলও সিদ্ধি বা দেবত্বপ্রাপ্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৩। নির্ব্বাণের উপায়সংগ্রহ যথা "শ্রদ্ধা-বীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বকমিতরেষাং।

যোগসূত্র।

অর্থাৎ কৈবল্যকামী যোগীরা শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন। প্রজ্ঞা অর্থে সমাধিজা প্রজ্ঞা।

বস্তুতঃ শ্রদ্ধা হইতে বীর্য্য, বীর্য্য হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে সমাধি, এবং সমাধি হইতে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়।

৪। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা, এই চারি পদার্থের অনুগম ভেদে সবীজ সমাধি চারি প্রকার। যথা "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগতঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ।

যোগসূত্র।

তত্র প্রথমঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয় বিতর্ক বিকল সবিচারঃ। তৃতীয়ো বিচার বিকলঃ সানন্দ চতুর্থ স্তদ্বিকলো অস্মিতা মাত্র ইতি।

যোগভাষ্য।

অর্থাৎ সবিতর্ক ঐ চারিভাবের অনুগত। সবিচার বিতর্করহিত। সানন্দ বিচাররহিত; সাস্মিত ঐ আনন্দরহিত। বৌদ্ধদের ২য় ও ৩য় ধ্যানযোগের সানন্দ সমাধির অনুরূপ। সানন্দ সমাধি আনন্দানুভববিষয়ক, সুতরাং আধ্যাত্মিক। ইহাতে 'দহর পুণ্ডরীকাদি' ধ্যানে হৃদয়মূলা সর্ব্বদেহব্যাপী সাত্ত্বিকতা বা সুখ অনুভূত হয়। পতঞ্জলি বলেন—'নির্ব্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্ম প্রসাদঃ'। অনাত্ম-ভাবের চরমসীমা "অস্মি" বা আমি, এইরূপ প্রত্যয়। এই প্রত্যয় বিষয়ক সমাধিই যোগের সাস্মিত সমাধি। অনাত্ম-বোধের ইহা চরম সীমা।

পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন "তমণু মাত্রমাত্মানমণু বিদ্যা—অস্মীতি তাবৎ সম্প্রজানীতে"।

যোগভাষ্যে।

অর্থাৎ সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধিতত্ত্বকে অনুভব-পূর্ব্বক "আমি" এই প্রত্যয় মাত্র রূপে জানা যায় ইহা অনাত্মবোধের চরমসীমা।

৫। সম্প্রজ্ঞাত যোগই কৈবল্যের সাক্ষাৎ উপায়। সবিতর্কাদি সমাধিজাত প্রজ্ঞা চিত্তের সম্যক্ নিরোধে প্রযুক্ত হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। যথা—"যস্ত একাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্ কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি—নিরোধমভিমুখং করোতি, স সম্প্রজ্ঞাতঃ যোগঃ"।

যোগভাষ্য ১।১

অর্থাৎ একাগ্র ভূমিকায় উৎপন্ন যে সমাধি—

(১) যথাভূত বিষয় প্রকাশ করে।

(২) ক্লেশ ক্ষয় করে।

(৩) কর্ম্মবন্ধন বিশ্লথ করে।

(৪) নিরোধকে অভিমুখ করে—তাহা সম্প্রজ্ঞাত যোগ। তাহার নিষ্ঠা সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। সেই প্রান্তপ্রজ্ঞা এবং পর বৈরাগ্য পূর্ব্বক সম্যক্ নিরোধ হইলে,

তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে। তাহারই ফল কৈবল্য বা নির্ব্বাণমুক্তি।

যে প্রজ্ঞায় জ্ঞাতব্য, কর্ত্তব্য ও হাতব্য শেষ হয় ও যৎপরে আর জ্ঞাতব্য, কর্ত্তব্য ও হাতব্য-অবশেষ থাকে না, তাহাই প্রান্ত-ভূমি প্রজ্ঞা।

ফলতঃ যোগশাস্ত্রের সম্প্রজ্ঞাত যোগে—

ক। যথাভূত প্রজ্ঞা হয়।

খ। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ ক্লেশ ক্ষয় পায়।

গ। কর্ম্মবন্ধন বা সংস্কার ক্ষীণ হয়।

ঘ। অবিদ্যাদি সমস্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার ও পরবৈরাগ্যের দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হয়।

৬। সম্প্রজ্ঞাত যোগ সম্যগাচরিত হইলে, নিরোধভূমিক, অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা কৈবল্য হয়।

অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হইলে, জীবনেই বিদেহ-কৈবল্য লাভহয়। বৌদ্ধেরাও 'উপাদি-সেস' এবং 'অনুপাদিসেস' এই দুই প্রকার নির্ব্বাণ স্বীকার করেন। বৌদ্ধদের পরি-নির্ব্বাণ * যোগের নিরোধ।

৭। যোগমতে, প্রথম কল্পিক, মধু-ভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি এবং অতিক্রান্ত-ভাবনীয়, এই চারি প্রকার যোগী।

অতিক্রান্তভাবনীয়, প্রান্তভূমি প্রজ্ঞাসম্পন্ন যোগীরাই কৃতকৃত্য হইয়া সাক্ষাৎ কৈবল্য লাভ করেন; অপরে দেহপাতে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পরে মুক্ত হন।

যোগমতে প্রজ্ঞার অন্যতম প্রধান বিষয়—হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়। অর্থাৎ অনাগত দুঃখ, দুঃখহেতু, দুঃখমুক্তি ও মুক্তির উপায়।

সমাধি দ্বারা, সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ হয়।

৮। অবিদ্যাবন্ধনের মূল, তাহা অনাদি। তাহার আদিসম্প্রয়োগ নাই।

৯। "যে চৈত্তে মৈত্র্যাদয়ো ধ্যায়িনাং বিহারাঃ" ইত্যাদি যোগভাষ্যে প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য-বচন—অর্থাৎ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, এই ধ্যায়ীদের বিহার।

১০। ধর্ম্মচর্য্যা দ্বিবিধ, বাহ্য ও আধ্যা-ত্মিক। 'বাহ্যং স্তুতি, দানাদি, চিত্তমাত্রা-ধীনং শ্রদ্ধাদ্যাধ্যাত্মিকং। * * * তয়োর্মানসঃ বলীয়ঃ'।

যোগভাষ্য ৪। ১১।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি।" গীতা।

১১। সাংখ্যমতে জগৎ ঈশ্বরের কার্য্য নহে; কিন্তু অনাদি কার্য্য-কারণ-পরম্পরা মাত্র; কিন্তু ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয়-শূন্য বা অনাদি মুক্ত পুরুষ আছেন এবং হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি আছেন।

১২। পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা নিরয় ও স্বর্গে গমন এবং প্রেতের উপকারার্থে দানাদি। *

* 'পরিনির্ব্বাণ' শব্দ উত্তর কালে অর্হতের দেহনাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধর্ম্মপদের প্রাচীন গাথায় উহা বিদেহ-কৈবল্যের মত অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়; যথা "পরিনির্ব্বান্ত্যা-নাসবা ক্ষীণাসবাশ্চতে লোকে জ্যোতিষ্মৎ পরিনির্বৃতাঃ।" ৬।১৪

* পুণ্য ও পাপ হইতে মৃত্যুর পর দিব্য ও নারক শরীর গ্রহণ বৌদ্ধদেরও আছে, যথা—"যে কেচিবুদ্ধং সরণং গতাসে নতে-গমিস্সন্তি অপায়ং। পহায় মানুষং দেহং দেবকায়ং পরিপুরেস্সন্তীতি॥

মহাসময়সুত্তং।

বৌদ্ধ শাস্ত্র।

১। "কুশলচিত্তে কগ্‌গতা সমাধি" "অবিকৃখেপ লকৃখণং" "অবিকম্পনং।"
বিশুদ্ধিমার্গ। ৩অঃ।

উহা অবিক্ষেপ লক্ষণ এবং কম্পনরহিত।

২। বৌদ্ধদেরও সমাধি গতি-ভেদে দ্বিবিধ—লোকীয় ও লোকোত্তর। তন্মধ্যে "তিসু ভূমিসু কুসলচিত্তেকগ্‌গতা লোকিয়ো সমাধি। অরিয়মগসম্পযুত্তা লোকুত্তর সমাধি।"

বিশুদ্ধিমার্গ। ৩ অঃ।

অর্থাৎ কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর, এই তিন ভূমিতে লোকীয় সমাধি হয়। আর আর্য্যমার্গের সহগত সমাধি লোকোত্তর।

৩। "সদ্ধায় সীলেন চ বীরিযেন চ সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছয়েন চ।" ধর্ম্মপদ ১০। ১৬

অর্থাৎ শ্রদ্ধা, শীল, বীর্য্য, সমাধি; ধর্ম্মবিনিশ্চয়পূর্ব্বক এবং বিদ্যাচরণসম্পন্ন ও স্মৃতিযুক্ত হইয়া দুঃখবিয়োগ লাভ করে।

শীল যোগীদের যম ও নিয়ম * ব্যতীত আর কিছু নহে। দীর্ঘ নিকায়ের সীলক্‌খন্দের প্রত্যেক সূত্রেই বৌদ্ধদের সীলস্কন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে।

ধর্ম্মবিনিশ্চয় এবং বিদ্যা যোগের প্রজ্ঞা। সমাধির ফল যে প্রজ্ঞা, তাহা বুদ্ধঘোষও বলেন, যথা বিশুদ্ধিমার্গে ১৪ অধ্যায়ে "সমাধিত্তো যথাভূতং পজানাতি পস্‌সতীতি বচনতোপন সমাধি তস্‌সা (পঞ্‌ঞায়) পদট্‌ঠানং॥"

৪। "সো বিবিচ্চেব কামেহি বিবচ্চেব অকুসলেহি ধম্মেহি সবিতক্কং সবিচারং বিবেকজং পীতিসুখং পঠমং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি।"

পোট্‌ঠপাদসুত্তং।

অর্থাৎ কাম ও অকুশল ধর্ম্ম হইতে পৃথক্‌ হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ (পৃথক্‌ত্বজাত) প্রীতিসুখযুক্ত প্রথমধ্যান।

যুক্ত প্রথমধ্যান—

যোগশাস্ত্রের সবিতর্ক, সবিচার, নির্ব্বিতর্ক, নির্ব্বিচার সমাধির ন্যায় বৌদ্ধদেরও বিভাগ আছে। "অথসালিনির" চিত্তুপ্পাদকণ্ডে ধ্যানের পঞ্চকনয় দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন উপনিষৎ আছে, তন্মধ্যে ছান্দোগ্য একখানি। ছান্দোগ্যে আছে—"আহারশুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ"। অর্থাৎ বিষয়-গ্রহণরূপ আহারশুদ্ধি হইলে, চিত্তশুদ্ধি হয়; চিত্তশুদ্ধি হইলে ধ্রুবাস্মৃতি হয়; স্মৃতিলাভে সমস্ত গ্রন্থি হইতে বিপ্রমোক্ষ হয়। বৌদ্ধেরাও বলেন—"একায়নো অয়ং ভিক্‌খবে মগ্‌গো সত্তানং বিসুদ্ধিয়া * * * যদিদং চত্তারো সতি পট্‌ঠানা"।

মজ্ঝিম নিকায়ে সতি পট্‌ঠান সুত্তং।

অর্থাৎ হে ভিক্ষুকগণ! এই যে চারি স্মৃতি-প্রস্থান, তাহাই সত্বাদির বিশুদ্ধির জন্য এক মাত্র উপায়; অতএব এই প্রধান স্মৃতিরূপ সাধন যে বৌদ্ধেরা প্রাচীন উপনিষৎ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

---

* নিয়মের অন্তর্গত ঈশ্বর-প্রণিধান বৌদ্ধদের নাই বটে, কিন্তু বুদ্ধপ্রণিধান আছে। পুরুষের শরণাগতি; বুদ্ধপ্রণিধানও তাহাই। ফলতঃ ঈশ্বরপ্রণিধান সমাধি-সিদ্ধির অন্যতম হেতু। "বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তং" এই যোগসূত্রানুসারে বুদ্ধপ্রণিধানও যোগশাস্ত্রসম্মত।

স্মৃতি একটি প্রধান সমাধি সাধন। পাশ্চাত্যদের মতে বৌদ্ধশাস্ত্রাপেক্ষা যে সব

বৌদ্ধদের দ্বিতীয় ধ্যান বিতর্ক-বিচার-রহিত আধ্যাত্মিক "একোদিভাব" বা এক-তানতা সহগত প্রীতিসুখস্বরূপ।

(হংসাবতী) ধম্মসঙ্গান। ২৮ পৃঃ।

তৃতীয় ধ্যান প্রীতিশূন্য বা চিত্তাগত হ্লাদশূন্য। তাহাতে "সুখং কায়েন পটি-সম্বেদেতি"।

বৌদ্ধদের নির্ব্বিচার দ্বিতীয় ধ্যানও "অজ্ঝত্তং সম্পসাদনং" লক্ষণে লক্ষিত।

বৌদ্ধদের চতুর্থ ধ্যান সংজ্ঞাগ্র বিষয়ক যথা "ততোখো পোট্‌ঠপাদ ভিক্‌খুইষ সক-সঞ্‌ঞী হোতিসো ততো অমুত্র ততো অমুত্র অনুপুব্বেন সঞ্‌ঞগ্গং ফুসতি।"

সীলক্‌খন্ধের পোট্‌ঠপাদসুত্তং।

অর্থাৎ হে পোট্‌ঠপাদ, তদনন্তর ভিক্ষু স্বকসংজ্ঞী (স্ব বা আত্মসংজ্ঞী) হইতে থাকেন ও পরে ইহা হইতে পৃথক্‌" "ইহা হইতে পৃথক্‌" (অর্থাৎ নেতি নেতি) এইরূপ ক্রমে সংজ্ঞার (বাহ্য বোধের) অগ্র বা সীমা স্পর্শ করেন।

৫। 'লোকুত্তর' মার্গ নির্ব্বাণের সাক্ষাৎ উপায়। 'লোকুত্তর মার্গ চারি অবস্থায় বিভক্ত। তাহারা সকলই "নিয্যানিক" বা বন্ধন ছেদ করিয়া উর্দ্ধগতিশীল, "অপচয়-গামী" বা সংস্কারক্ষয়কারী সমাধি; তাহার প্রথম ভূমিতে "অনঞ্‌ঞাতঞ্‌ঞসমস্সামী-তিন্দ্রিয়ং" অর্থাৎ "অজ্ঞাত জানিব" এইরূপ ইন্দ্রিয় বা শক্তি নিশ্চয় হয়; এবং তাহা "দিট্‌ঠিগতানাং বা অযথা জ্ঞানের প্রহান-কারী দ্বিতীয় ভূমিতে কামরাগ এবং ব্যাপাদ বা হিংসার তনুভাব বা ক্ষীণতা হয়; তৃতীয় ভূমিতে কাম-রাগ ও ব্যাপাদের অনবশেষ প্রহান বা সমূলঘাত—নাশ হয়। চতুর্থ ভূমিতে রূপরাগ, অরূপ-রাগ, মান, উদ্ধচ্চ (চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা) ও অবিদ্যার অনবশেষ প্রহান হয়। ইহাতে "অঞ্‌ঞিন্দ্রিয়" অর্থাৎ জ্ঞাত, প্রাপ্ত, বিদিত সমস্ত ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা হয়। বিশেষ ধর্ম্মসঙ্গনি ১। ৫ দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধশাস্ত্রের লোকুত্তর মার্গে—

ক। প্রজ্ঞা বা আজ্ঞা হয়।

খ। অবিদ্যা, ত্রিবিধ—রাগ, ব্যাপাদ, অভিমান, বিক্ষেপ ক্ষয় হয়।

গ। সংস্কার ক্ষয় ও বন্ধন ভেদ হয়।

ঘ। উহাদের অনবশেষ প্রহান হয়।

৬। বৌদ্ধশাস্ত্রে এ বিষয়ের স্ফুট উল্লেখ দেখা যায় না। তবে বৌদ্ধদের "সঞ্‌ঞা-বেদয়িত নিরোধ" সমাধি, যোগের নিরোধ-সমাধির অনেক নিকট এবং বোধহয় একই। কিন্তু "আকাসেচ সকুন্তানং গতি তেষং দুরন্নয়া" "সুঞ্‌ঞাগর পবিট্‌ঠস্‌স' অর্থাৎ অর্হৎদের গতি আকাশে পক্ষীর গতির ন্যায় দুর্লক্ষ্য। শূন্যাগারে প্রবিষ্ট ইত্যাদি বচন হইতে উহা অনুমিত হয়। ফলে যে চিত্ত সম্যক্‌ রাগশূন্য এবং সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধে অনুরক্ত, তাদৃশ চিত্ত সমাহিত থাকিলে, যোগের নিরোধ সমাধি ব্যতীত কি হইতে পারে ?

৭। বৌদ্ধদের লোকুত্তর মার্গস্থদেরও চারি ভেদ, যথা—স্রোত, আপন্ন, সকৃদাগামী অনাগামী ও অর্হৎ।

অর্হতেরাই পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। অপরেরা ব্রহ্মলোকে বা উচ্চ স্বর্গে গমন করেন ও পরে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হন।

বৌদ্ধ মতে সম্যক্ দৃষ্টির বিষয় চারি আর্য্যসত্য, যথা—দুঃখ, দুঃখহেতু, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের পথ। মার্গবিভঙ্গ সূত্র দ্রষ্টব্য।

সমাধির দ্বারা "ইদ্ধি" (ঋদ্ধি) বা অলৌকিক শক্তি লাভ হয়।

৮। অবিদ্যা মূল সংযোজন ও মূল আসব।

অত্থসালিনিতে উদ্ধৃত বুদ্ধ-বচন হইতে জানা যায় যে—"অবিদ্যার আদি বা যাহার পূর্ব্বে অবিদ্যা ছিল না, তাহা জানা যায় না।

৯। মৈত্রী আদিকে বৌদ্ধেরা ব্রহ্ম-বিহার বলেন। সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র মতে উহা অতি প্রাচীন সাধন। ব্রহ্মা ঐ সাধন সম্পন্ন।*

১০। এই সাংখ্যীয় তত্ত্বটি বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। বস্তুতঃ চিত্তমাত্রাধীন ধর্ম্মচর্য্যার অতি প্রচার করাই বৌদ্ধদের বিশিষ্টতা। তবে বাহ্যপূজাও তাঁহাদের সম্যক্ ত্যাজ্য নহে। যথা প্রজ্ঞাপারমিতায় "পুষ্পধূপগন্ধমাল্যবিলেপনচূর্ণচিবরচ্ছত্রধ্বজঘণ্টাপতাকাভি সুবর্ণপদ্মমৈশ্চ পুষ্পৈ দিবৈশ্চ বাদ্যৈ" প্রভৃতি বচনে পূজা করা দেখা যায়। (৩০ বিবর্ত্ত।)

১১। বৌদ্ধশাস্ত্রেও জগৎ সকর্ত্তৃক নহে। অনাদি ঘটনা-পরম্পরা মাত্র। কিন্তু উদিচ্য বা মহায়ান বৌদ্ধেরা 'আদি বুদ্ধ' নামে অনাদি মুক্তপুরুষ স্বীকার করেন এবং অবলোকিতেশ্বর, ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদিও স্বীকার করেন।

১২। বৌদ্ধেরাও ইহা স্বীকার করেন। "পাপকৃতভয়ত্থৈব ইহ প্রেত্য চ শোচতি। পুণ্যকৃতুভয়ত্রৈব ইহ প্রেত্যচ মোদতে"। ধম্মপদ ১।১৫।১৬।

---

* যদিও নিকায় জাতকাদি সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে ব্রহ্মবিহার বুদ্ধের পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমান (যেমন মহাসুদর্শন সূত্রে মহাসুদর্শন রাজা এই সাধন করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি) তথাপি Rhys Davids সাহেব উহা বৌদ্ধদের উদ্ভাবিত বলিতে চান। তিনি আরও বলেন "But they have been found in any Indian book not a Buddhist work, and therefore almost certainly exclusively Buddhist." কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। উপরিউদ্ধৃত প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য-বচন এবং পাতঞ্জল সূত্র তাহার প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত Rhys Davids সাহেব আরও কতকগুলি উদ্ভট তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্বে ধ্যান ছিল বটে, কিন্তু বৌদ্ধেরা 'সমাধি' আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে "Samadhi has not yet been found in any Indian book older than the Pitakes." অথচ তাঁহার মতে 'বৃহদারণ্যক উপনিষৎ' পিটকাপেক্ষা বহু প্রাচীন। সেই বৃহদারণ্যকে আছে—"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষু সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" সুতরাং Rhys Davidের যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ধ্যান ও সমাধির তিনি যেরূপ ভেদ করিতে চান, তাহাও তত্ত্বে না প্রবেশ করার ফল। বস্তুতঃ প্রগাঢ়তম ধ্যানই সমাধি। ঐ উভয় পদই নির্ব্বিশেষে বৌদ্ধ ও আর্ষ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মজাল সূত্রে শাশ্বতাদিবাদীদের ধ্যানকে সমাধি পদের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। আর "মার্গবিভঙ্গ সূত্রে" বৌদ্ধদের চারি ঝান বা ধ্যানকে সমাধি বলা হইয়াছে, যথা—"* * * চতুত্থং ঝানং উপসমুজ্জ বিহরতি অয়ং বুচ্চতি সম্মা সমাধি।"

এবমেব ইতোদিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

তিরোকুড্ড সুত্তং।

অর্থাৎ সেইরূপ ইহলোকে দত্ত দান (প্রেতের উদ্দেশে) প্রেতের ভাল করে।

এই তালিকা হইতে পাঠক দেখিবেন যে, তত্ত্বতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য ধর্ম্ম এক। তাহাদের সাদৃশ্য ও একত্ব আরও অনেক দেখান যাইতে পারে; কিন্তু বাহুল্য ভয়ে দেখান হইল না। অবশ্য বুঝাইবার প্রণালী, পদার্থের গুণ প্রভৃতি সামান্য বিষয়ে বহু ভেদ আছে, কিন্তু মূল ধর্ম্মতত্ত্বে কিছু ভেদ নাই। ফলে প্রাচীন সাংখ্য ও যোগের উপর প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপিত।

কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধগণ ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—সীল, স্মৃতি, ব্রহ্ম বিহার, সমাধি (চারি ধ্যান) রূপাবচর ধ্যান, অরূপ ধ্যান, ইহা সব বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীন বটে; (কারণ সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের তাহাই তাৎপর্য্য) † কিন্তু লোকোত্তর মার্গ বুদ্ধদেবের নিজের আবিষ্কৃত, তিনিই উহার আদি শাস্তা। আর্যশাস্ত্রে নির্ব্বাণের কথা নাই। তাহার মুক্তি ব্রহ্মলোকে গমন পর্য্যন্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহরানন্দ অরণ্য।
(কাপিলাশ্রম)

† Rhys Davides সাহেবও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যথা—Now it is perfectly true, that of these thirteen (অর্থাৎ সীল সমাধি আদি হইতে লোকোত্তর মার্গ পর্য্যন্ত) consecutive propositions groups of propositions, it is only the last that is No. 13 (অর্থাৎ লোকুত্তর মার্গ) that is exclusively Buddhist.

Dialogues to the Buddha P. 52.

কর্ম্ম ও ফলিত জ্যোতিষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আর্য্যশাস্ত্রে এই শিশুমার অধঃশিরা ও কুণ্ডলীভূত। তাঁহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গুলে অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম্ম ও প্রজাপতি; পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটিতে সপ্তর্ষি। তাঁহার দক্ষিণাবর্ত্ত কুণ্ডলীভূত দেহের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে সমসংখ্যক নক্ষত্র বিরাজিত। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে অজবীথী এবং উদরে আকাশগঙ্গা; তাঁহার দক্ষিণ নিতম্বে পুনর্ব্বসু, বাম নিতম্বে পুষ্যা; দক্ষিণ পদে আর্দ্রা—বাম পদে অশ্লেষা; দক্ষিণ নাসিকায় অভিজিৎ—বাম নাসিকায় উত্তরাষাঢ়া; দক্ষিণ নেত্রে শ্রবণা—বাম নেত্রে পূর্ব্বাষাঢ়া; দক্ষিণ কর্ণে—ধনিষ্ঠা—বাম কর্ণে মূলা ইত্যাদি। তাঁহার হনুতে ক্ষেত্ররূপী অগস্ত্য ও যম; মুখে অঙ্গারক; উপস্থে শনৈশ্চর; শৃঙ্গাদিতে বৃহস্পতি, বক্ষস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনে অশ্বিনীকুমার, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্ব্বাঙ্গে কেতু এবং রোমে সর্ব্ব তারাগণ।*

* "যস্য পুচ্ছাগ্রেঽবাক্ শিরসঃ কুণ্ডলীভূত দেহস্য ধ্রুব উপকল্পিতঃ। তস্য লাঙ্গুলে প্রজাপতিরগ্নিরিন্দ্রো ধর্ম্ম ইতি পুচ্ছমূলে

শ্রীভগবান বাসুদেবের এই শিশুমাররূপ অথবা তাঁহার যোগমায়া তাঁহার অনন্ত শক্তির অংশবিশেষ কি না, তাহা পাঠকের আলোচনীয়। তাঁহার যে অনন্ত শক্তি পাতালে সঙ্কর্ষণ বা নাগরূপী, নভোমণ্ডলে সেই শক্তি শিশুমার—সম্ভবতঃ আধিভৌতিক রূপে অভিহিত হইয়াছেন। যে শক্তি প্রভাবে এই মেদিনীমণ্ডল ধৃত রহিয়াছে—বসুন্ধরা—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও নানাবিধ শ্যামল শস্য উৎপাদন করিয়া জীবের জীবন-প্রবাহ রক্ষা করিতেছে—যে শক্তি প্রভাবে সমগ্র জীবমণ্ডলী অনুপ্রাণিত রহিয়াছে—সেই অনন্ত শক্তি কর্ত্তৃক শূন্য আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রাদি ধৃত ও শাশ্বত ভ্রমণে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাড়িতাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণাদি যে শক্তির বিকাশ—পরমাণুর নিত্য সংযোগ ও বিয়োগ যাহার পরিণাম—যে শক্তিজ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি বিশেষণে—বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন নামে বিশেষিত; সেই অনন্ত শক্তি কর্ত্তৃকই নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতির্গণ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া অহরহঃ বিচরণ করিয়া থাকে—কখনও কক্ষচ্যুত হয় না। সেই একই শক্তি বিভিন্ন কার্য্য ও বিভিন্ন স্থলবিশেষে—বিভিন্ন নাম, উপাধি, ও মূর্ত্তি অবলম্বন করে।

ধাতা বিধাতা চ কট্যাং সপ্তর্ষয়ঃ। তস্য দক্ষিণাবর্ত্ত কুণ্ডলীভূত শরীরস্য যান্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বে নক্ষত্রাণি উপকায়ন্তি। দক্ষিণায়নাদি তু সব্যে যথা শিশুমারস্য কুণ্ডলাভোগ সন্নিবেশস্য পার্শ্বয়োরুভয়োরপ্য বয়বাঃ সম সংখ্যা ভবন্তি। পৃষ্ঠেত্বজবীথী আকাশগঙ্গা চোদরতঃ॥ পুনর্ব্বসু পুষ্যৌ দক্ষিণ বাময়ো পাদয়োরভিজিদুত্তরাষাঢ়ে দক্ষিণ বাময়ো র্নাসিকয়োর্যথা সংখ্যং শ্রবণ পূর্ব্বাষাঢ়ে দক্ষিণ বাময়ো র্লোচনয়ো র্ধনিষ্ঠা মূলঞ্চ দক্ষিণ বাময়ো কর্ণয়ো মঘাদীন্যষ্টনক্ষত্রাণি দক্ষিণায়নাদি বাম-পার্শ্ব বঙ্ক্রিষু যুঞ্জীত। বধিষু অস্থিষু। তথৈব মৃগশীর্ষাদান্যুদগয়নানি দক্ষিণ পার্শ্বেষু প্রতি লোমেন যুঞ্জীত। শতভিষা জ্যেষ্ঠে স্কন্ধয়ো দক্ষিণ বাময়ো র্নসেৎ। উত্তরাহনাবগস্ত্যঃ অধরাহনৌ যমঃ মুখে চাঙ্গারকঃ শনৈশ্চর উপস্থে বৃহস্পতিঃ ককুদি বক্ষস্যাদিত্যোঃ হৃদয়ে নারায়ণো মনসি চন্দ্রো নাভ্যামুশনা স্তনয়োরাশ্বিনৌ, বুধঃ প্রাণাপানয়োঃ রাহুর্গলে কেতবঃ সর্ব্বাঙ্গেষু রোমেষু সর্ব্বে তারাগণাঃ * * * (শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ, ২৩ অধ্যায়)

আধুনিক প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে যে "There can be no independent force since all force is an inherent and necessary property of matter; consequently, there is no unmaterial creative power." এ জগতে স্বয়ম্ভূ বা স্বয়ম্প্রধান কোন শক্তি নাই; যাহা কিছু আমরা শক্তির পরিচয় পাই, তাহা কেবল পরমাণুর ধর্ম্ম বা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ মাত্র।' সুতরাং সৃষ্টিশক্তি বলিয়া কোন অজড়শক্তি নাই। তাঁহারা আরও বলেন "Gravitation is the sole cause, the acting God and matter its prophet" কিন্তু জগৎপূজ্য মহাত্মা সার আইজ্যাক্ নিউটনের মত অন্যবিধ। তাঁহার মতে "that there is some subtle spirit, by the force and action of which all movements of matter are determined" এমন কোন সূক্ষ্ম চৈতন্যশক্তি আছেন যে, তাঁহারই শক্তি ও কার্য্যকারিতায় পরমাণুর গতি

অনুশাসিত হয়। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এই যে "Gravity must be caused by an agent acting constantly according to certain laws, but whether this agent be material or immaterial, I have left to the consideration of my readers" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এমন একজন কর্ত্তা আছেন, যিনি কতিপয় বিধিঅনুযায়ী নিয়ত ক্রিয়া করিয়া থাকেন এবং যাঁহার কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই কর্ত্তা জড় কি অজড়, তাহার বিচার-ভার আমি আমার পাঠকবর্গের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

মাধ্যাকর্ষণশক্তি কর্ত্তৃক এই পৃথিবী ধৃত রহিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহা পতিত হয় না এই ধারণায় তদনুরূপ উত্তর প্রত্যাশায় জনৈক পরীক্ষক প্রশ্ন করেন "Why dose not the earth fall ? কেন এই পৃথিবী পড়িয়া যায় না? অধিকাংশ বালকই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। অবশেষে একটী বালিকা অন্যবিধ প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষকের প্রশ্নের সমাহার করে। বালিকার প্রশ্ন এই যে "Where should the earth fall ?" এই পৃথিবী পড়িবে কোথায়? বালিকার প্রশ্ন অতি সুসঙ্গত। (১) কারণ এই শূন্য ও অনন্ত আকাশের উৰ্দ্ধ-অধঃ কোথায়? তবে কোথায় এই পৃথিবী পতিত হইবে?

আমরা তুলনাবৃত্তি দ্বারাই উৰ্দ্ধ—অধঃ, ক্ষুদ্র—বৃহৎ, ইত্যাদি তুলনা করিয়া থাকি। কিন্তু অনন্তের তুলনা সম্ভবেনা; উৰ্দ্ধ—অধঃও থাকিতে পারে না। সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি যেরূপ অনন্ত আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, পৃথিবীও তদনুরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। আমরা এই পৃথিবীতে দণ্ডায়মান হইয়া পদমূলকেই অধঃভাগ দেখি; সুতরাং মস্তকোপরি আকাশ অতি উৰ্দ্ধ এবং চতুঃ পার্শ্বস্থ আকাশ তাহাহইতে ক্রমনিম্ন হইয়া যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে, আপাত দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আকাশের এই ক্ষিতি স্পর্শ-আকারে যে বৃত্ত দৃষ্টিগোচর হয় তাহাকে "ক্ষিতিজ বৃত্ত" কহে। এই "ক্ষিতিজ বৃত্ত" ভিন্ন আমরা সম্পূর্ণ-আকাশ মণ্ডল দেখিতে পাইনা; যাহা দেখিতে পাই, তাহা অর্দ্ধ মণ্ডল বা অর্দ্ধ বর্ত্তুলাকার। আমরা যেমন আকাশ মণ্ডলকে শূন্যগর্ভ বর্ত্তুলাকার দেখিতে পাই, আমেরিকা,

(1) "Why does not the earth fall ? He wanted to evoke answers about gravitation and so forth. Most of the children could not answer at all ; a few answered, that it was gravitation or something. One bright little girl answered it by putting another question 'where should it fall.' Because the question is nonesense. There is no falling or rising for the earth. In infinite space, there is no up or down ; that is only in the relative. Where is the going or coming for the infinite? Whence should it come and whither should it go (vide Lecture delivered in England on the real and apparent man by swami Vibekanand)

ইয়ুরোপ ও অন্যান্য ভূখণ্ডীয় তাবৎ মানবেই সেইরূপ দেখিয়া থাকে। আমাদের মত তাহাদেরও উর্দ্ধদিকে উন্নত আকাশ এবং পদমূলে ক্ষিতি। (২) এই পৃথিবী নিশ্চল বা স্থির নহে, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে; সুতরাং সূর্য্যকে নিশ্চল ও স্থির কল্পনা করিলেও কখন সূর্য্যের একদিকে কখন বা বিপরীত দিকে—কখন দক্ষিণ পার্শ্বে কখন বা বাম পার্শ্বে অবস্থিতি করে। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করে।

(২) সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে ভচক্র ভ্রমণ ব্যবস্থা এইরূপ আছেঃ—

"নিরক্ষ দেশে ক্ষিতি মণ্ডলোপগৌ ধ্রুবৌ
নরঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরৌ।
তদাশ্রিতং খে জলচক্রবৎ সদা ভ্রমদ্ভচক্রং
নিজ মস্তকোপরি॥
উদগ্ দিশং যাতি যথা যথা নরস্তথা তথা
খান্নত মৃক্ষমণ্ডলম্।
উদগ্ ধ্রুবং পশ্যতি চোন্নতং ক্ষিতেস্তদন্তরে
যোজনজাঃ পলাংশকাঃ॥
যোজন সংখ্যা ভাংশৈ ৩৬০ গুণিতা
কুপরিধি হৃতো ৪৯৬৭ ভবন্ত্যংশাঃ।
ভূমৌ কক্ষায়াং বা ভাগেভ্যো যোজনাপি
চ ব্যস্তম্॥"

"Astronomers who see in gravitation an easygoing solution for manythings, and an universal force which allows them to calculate thereby planetary motions; care little about the cause of Attraction. They call gravity a law, a cause in itself. We call the forces acting under that name Effects, and very secondary effects, too. oneday it will be found that scientific hypothesis does not answer after all and then it will follow the corpuscular theory of light, and be consigned to test for many scientific causes in the archives of all exploded speculations." Vide secret Doctrine Vol I.

পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলাদি গ্রহও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং পৃথিবী কখন অন্যান্য গ্রহগণের সহিত সূর্য্যের এক দিকে সাক্ষাৎ করে কখন বিপরীত দিকে চলিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় কে উপরে কে নিম্নে অবস্থিত, তাহা কদাপি স্থির করা যাইতে পারে না। সুতরাং কে কাহার উপর পতিত হইবে?

পরম মনীষিনী স্বর্গীয়া ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কী মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

যাহাহউক শিশুমাররূপী ভগবান বাসুদেবের যোগ-মায়ার আশ্রয়ে অনিমিষ ও অব্যক্ত কালের গতি ক্রমে জ্যোতির্গণ আকাশান্ত আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; এবং তাহাদের গতি অনুসারে অনিমিষ ও অব্যক্ত কাল, নিমিষ, দণ্ড, মাস, অয়ন, বৎসর ইত্যাদিতে ব্যক্ত হইয়া থাকে। তজ্জন্য জ্যোতিশ্চক্র কাল-চক্র নামে অভিহিত হয়।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে—"শীঘ্রোচ্চ", "মন্দোচ্চ" ও "পাত" নামে আকাশ মণ্ডলে তিনটী স্থান আছে তাহাদের কর্ত্তৃক গ্রহাদির গতি অনুশাসিত হয়। যে প্রদেশের প্রতি মণ্ডল (কক্ষ) পৃথিবী হইতে অনেক দূরে

অবস্থিত, তাহাকে "উচ্চ" কহে। গতিজ্ঞঃ মনীষীগণ এই তুঙ্গ স্থানেরও গতি কল্পনা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য গতির ইতর বিশেষে এই উচ্চ স্থান "শীঘ্রোচ্চ" ও "মন্দোচ্চ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন গ্রহের কক্ষ অয়নান্তবৃত্তের যে স্থান কর্ত্তন করে তাহাকে "পাত" কহে। এই স্থানত্রয় গ্রহাদির গতির হেতু।

এই পৃথিবী হইতে দ্বাদশ যোজন পর্য্যন্ত যে বায়ু প্রবাহিত তাহাকে "ভূবায়ু" কহে।* মেঘ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি এই বায়ুতে বিরাজিত। তদূর্দ্ধে "প্রবহবায়ু"—এই প্রবহানিলে গ্রহগণ বিচরণ করিতেছে। দুই দিকে দুইটী ধ্রুব তারা মধ্যস্থলে গ্রহাদি বাত-রশ্মি কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে। বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে; পশ্চাতে যখন যে স্থানের নিকট-বর্ত্তী হয় সেই স্থানের গতি অনুসারে তাহা-রাও গতিশীল হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)
শ্রীযদুনাথ দে।

* "ভূবায়ু"র অপর নাম "আবহ"। ইহার ঊর্দ্ধে প্রবহবায়ু তাহারপর "উদ্বহ", তাহারপর "সংবহ", তাহারপর "সুবহ", তাহারপর "পরিবহ", তাহারপর "পরাবহ" বায়ু যথাক্রমে উর্দ্ধমার্গে প্রবাহিত। এই সপ্ত-বিধ বায়ুর উল্লেখ সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

লেখক।

অভিধর্ম্ম বা বৌদ্ধদর্শন।

যে বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্ব্বাণাদি পারমার্থিক বিষয়ের বিশেষ লক্ষণ ও প্রভেদাদি বর্ণিত আছে তাহার নাম অভিধর্ম্ম। "পরমত্থ-ভাবেন অভিবিসিট্ঠা ধম্মাধাতি আদি না অভিধম্মো ধম্মসঙ্গনি আদি;" অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গনি বিভঙ্গ, কথাবত্থু, পুগ্গলি পঞ্ঞত্তি, ধাতুকথা যমক ও পট্ঠান এই যে গ্রন্থ সকলে পরমার্থভাবে বিশিষ্ট ধর্ম্ম * সকল আছে তাহার নাম অভিধর্ম্ম। ঐ গ্রন্থ সকলের মধ্যে ধর্ম্মসঙ্গনি বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সারবান্। কথা-বত্থু অশোকের সময় তিস্স কর্ত্তৃক পাটলি-পুত্রে রচিত হয়।

* ধর্ম্মশব্দের অর্থ বৌদ্ধশাস্ত্রপাঠীদের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক। 'দহতি পবত্তেতি সম্পাপুণেতুংবাদেতি তস্মা ধম্মোতি'বুচ্চতি' অর্থাৎ যাহা প্রবর্ত্তন করায় বা পাওয়াইয়া দেয় তাহা ধর্ম্ম। অন্যত্র আছে যাহা স্বভাব ধারণ করে তাহা ধর্ম্ম। পঞ্চ পদার্থকে ধর্ম্ম বলা হয়, যথা— ফলনির্ব্বর্ত্তক হেতু, আর্য্যমার্গ, ভাষিতার্থ, কুশল ও অকুশল। তদ্ব্যতীত গুণ এবং নিঃসত্তা-নির্জ্জীবতা (শূন্যতা) অর্থে ও ধর্ম্ম শব্দ প্রযুক্ত হয়। পরিয়ত্তি বা ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্ম। স্বভাব ধারণই ধর্ম্মের লক্ষণ। ইহাতে বোধ হয় বাহ্য ও মানস এবং তদতীত (নির্ব্বাণ রূপ) সমস্ত ভাবপদার্থই ধর্ম্ম। বিশেষ্য বিশেষণ ও ক্রিয়া বাচক প্রায় সমস্ত ভাব পদার্থই ধর্ম্ম। 'তিনি' 'তুমি' প্রভৃতি যে সমস্ত সর্ব্বনাম বা তৎসদৃশ পদ স্বভাব ধারণ করে না তাহাদের অর্থ ধর্ম্ম নহে।

অভিধর্ম্মের চারিটি অর্থ আছে যথা অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহে। †—

তথ বুত্তাভিধম্মত্থা চতুধা পরমত্থতো।
চিত্তং চেতসিকং রূপং নিব্বানমিতি সব্বথা॥

চিত্ত, চৈতসিক রূপ ও নির্ব্বাণ ইহারা অভিধর্ম্মের অর্থ। বৌদ্ধশাস্ত্রে অর্থ শব্দের মানে হেতুগম্যভাব। "হেতু অনুসারেন অরিয়তি' অধিগমরতি সম্পাপুণিয়তি" (বি। ৭৪)। অর্থাৎ হেতুর দ্বারা যাহার অধিগম অথবা প্রাপ্তি হয় তাহাই অর্থ। যেমন কতকগুলি হেতু হইতে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয় অতএব নির্ব্বাণ এক অর্থ।

চিত্ত, চৈতসিক এবং রূপই বৌদ্ধদের পঞ্চ স্কন্ধ। তন্মধ্যে চিত্ত বিজ্ঞান স্কন্ধ; চৈতসিক বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার স্কন্ধ। এই প্রবন্ধে আমরা পঞ্চ স্কন্ধ ভাবেই ব্যাখ্যা করিব। বিজ্ঞানাদি চারি স্কন্ধ ইতরেতর মিশ্রিত তজ্জন্য প্রথমত রূপস্কন্ধ বর্ণিত হইতেছে।

রূপস্কন্ধ।

স্কন্ধ অর্থে সমূহ, রূপসমূহের নাম রূপ স্কন্ধ। "তত্থ যং কিঞ্চি সীতাদিহি রূপ্পণ লক্খণং ধম্মজাতং সব্বন্তং একতোকত্বা রূপ-ক্খন্ধোতি বেদিতব্বং" (বি। ১৪)। অর্থাৎ শীতাদির দ্বারা যে ধর্ম্মজাত রূপ্পণ (পীড়ন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াভিঘাতক) লক্ষণক হয়, তাহারা একত্র রূপস্কন্ধ। সাংখ্যের ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমস্তই বৌদ্ধদের রূপ। রূপ মূলত দ্বিবিধ ভূতরূপ ও উপাদায়রূপ। পৃথিবীধাতু, আপোধাতু, তেজোধাতু বায়োধাতু এই চারি ধাতু ভূতরূপ। "মহাভূতে উপাদায় পবত্তন্তং রূপং উপাদায়রূপং"। (বিভা। ৬)। অর্থাৎ মহাভূতকে উপাদান বা গ্রহণ বা আশ্রয় করিয়া যাহারা প্রবৃত্ত হয় তাহারা উপাদায়রূপ। উপাদায়রূপ বা উপাদারূপ চব্বিশ সংখ্যক। অতএব সাকল্যে রূপ অষ্টাবিংশতি প্রকার হইল। তাহারা সলক্ষণ উক্ত হইতেছে।

(১) পৃথিবীধাতু="যং কক্খলত্তং খরগতং, কক্খলত্তং কক্খলভাবো অজ্ঝত্তং বা বহিদ্ধা বা উপাদিন্নং বা অনুপাদিন্নং বা" (ধ; রূপ-কণ্ড, পঞ্চকং)। অর্থাৎ যাহা কঠিন, খরস্পর্শ, কাঠিন্য সংহতভাব এবং যাহা আধ্যাত্মিক (শারীর ধাতু) বা বাহির ও উপাদিন্ন হয় (কর্ম্মসমুত্থান) বা অনুপাদিন্ন তাহা পৃথ্বী ধাতু।

(২) আপোধাতু=আপো (তরল), আপোগত (তারল্য সম্বন্ধীয়) সিনেহো (স্নেহ) সিনেহগতং (বন্ধনত্তং, সংথাত অথবা সন্ধান) এবং আধ্যাত্মিক বা বাহির ও উপাদিন্ন বা অনুপাদিন্ন *।

† অ=অভিধম্মত্থসঙ্গহো। বি=বিসুদ্ধি-মগ্গো। ধ=ধম্মসঙ্গনি। বু=বুদ্ধঘোষ। বিভা=বিভাবিনী টীকা। এই সঙ্কেতগুলি পাঠক স্মরণ রাখিবেন। এতন্মধ্যে বুদ্ধঘোষ রচিত বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধে অনেক বিষয় যথাযথ অনুবাদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বৌদ্ধধর্ম্মের অতি উৎকৃষ্ট সার সংগ্রহ। ইহার এক সিংহলী ভাষায় ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোন ভাষায় ইহা অনুদিত হয় নাই।

* বৌদ্ধমতে আপোধাতুর স্পর্শ লক্ষণ নাই উহাতে যে শৈত্য আছে তাহা তেজোধাতুর, কারণ শৈত্য বস্তুত এক প্রকার উষ্ণতা। কিন্তু তরলতা যে কেন স্পৃষ্টব্য নহে তাহার

(৩) তেজোধাতু=তেজ, তেজোগত, উষ্মা, উষ্মাগত, উষ্ণ, উষ্ণগত এবং আধ্যাত্মিকাদি।

(৪) বায়োধাতু=বায়ু, বায়ুগত (প্রণালিতা), পক্ষিততুং (বাতস্ফীততা, নলাদির ন্যায়) এবং অধ্যাত্মিকাদি। ইহারা চারি ভূতরূপ, অবশিষ্ট অষ্টাদশ উপাদারূপ, যথা—

(৫) চক্ষু="তথ রূপভিঘাতারহ ভূতপ্পসাদ লক্খণং। দট্ঠুকামনিদান কম্মসমুট্ঠান ভূতপ্পসাদ লক্খণং বা চক্খু" বি। ১৪। অর্থাৎ রূপভিঘাতের দ্বার-স্বরূপ, বা দর্শন কামনামূলক কর্ম্মসমুত্থিত যে ভূতপ্রসাদ বা ভৌতিক প্রকাশভাব তাহাই চক্ষুর † লক্ষণ।

(৬) শ্রোত্র। (৭) ঘ্রাণ। (৮) জিহ্বা। (৯) কায়=ইহারাও ঐরূপ যথাক্রমে শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্য অভিঘাতের দ্বারভূত ভূতপ্রসাদ। অথবা শব্দাদি জ্ঞানের কামনামূলক কর্ম্মোত্থ ভূতপ্রসাদ।

চক্ষুরাদি ৫টি রূপের নাম প্রসাদরূপ। "কর্ম্মই উহাদের বিশেষের কারণ। ভূতের বিশেষ হইতে উহাদের বিশিষ্টতা হয় না কারণ তাহা হইলে "প্রসাদ" উৎপন্ন হইত না। পৌরাণেরা বলেন সমানদেরই প্রসাদ হয় বিসমানদের হয় না" (বু)।

(১০) রূপ="চক্খু পটিহনন লক্খণং রূপং" (বি। ১৪)। অর্থাৎ চক্ষুকে প্রতিঘাত করা দৃশ্য রূপের লক্ষণ। উহা চক্ষু বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং চক্ষুর্হাভূতাশ্রিত।

(১১) শব্দ (১২) গন্ধ। (১৩) রস= ইহারা যথাক্রমে শ্রোত্রাদির প্রতিহননকারী ও শ্রোত্রাদি বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত।

এই চারিরূপ গোচর বা বিষয় রূপের অন্তর্গত। তদ্ব্যতীত আপচাড়া তিন মহাভূত ও গোচর রূপ। নীল পীত; ভেরিশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ; মূলগন্ধ, স্কন্ধগন্ধ; মূলরস, স্কন্ধরস প্রভৃতি রূপাদির বহু ভেদ আছে।

(১৪) স্ত্রীন্দ্রিয়। (১৫) পুরুষেন্দ্রিয়= স্ত্রী ও পুরুষের কায় ও কার্য্যগত যে সমস্ত বিশেষত্ব তাহারাই স্ত্রীন্দ্রিয় ও পুরুষেন্দ্রিয়ের লক্ষণ। স্ত্রীদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চাল চলন, ক্রীড়াপরিচ্ছদাদির বিশেষত্বই স্ত্রীন্দ্রিয়। পুরুষেন্দ্রিয়ও তদ্রূপ। উহারা সকল শরীর ব্যাপী

সদুত্তর নাই। বস্তুত তরলতা কাঠিন্যের ন্যায় স্পর্শ করিয়া জানা যায়॥

† প্রসাদ বা উপাদিন্ন চারি ভূতের প্রকাশভাব উক্ত হওয়াতে চক্ষু বস্তুত অনিদর্শন (অগোচর) ও মাংস চক্ষুর অতীত। ইহা বুদ্ধঘোষ বলেন। অথসালিনি আদি গ্রন্থে তিনি সসম্ভার চক্ষুর এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন।" নীলোৎপল সন্নিভ, নীল (কৃষ্ণ) পক্ষ্মসমাকীর্ণ, শ্বেতকৃষ্ণমণ্ডল বিচিত্র মাংসপিণ্ড চক্ষুর্বস্তু বা চক্ষুর আধার। তৈলাসিক্ত সপ্ত পিচু পটলের বা তুলার পাঁজের ন্যায় সপ্ত অক্ষিপটলে ইহা (চক্ষু) ব্যাপ্ত। যেমন ক্ষত্রিয়কুমারকে চারিজন ধাত্রী, ধারণ স্নাপন, মণ্ডন ও বীজন করে সেইরূপ উহাকে চারি ভূতধাতু সন্ধারণ, বন্ধন, পরিপাচন ও সমুদীরণ (চালন) করে। উহা স্থূল আহার ও চিত্তাহারের দ্বারা উপস্তম্ভিত, আয়ুর দ্বারা পরিপালিত, বর্ণগন্ধরসাদি পরিবৃত। ধর্ম্মসেনাপতি (সারিপুত্র) বলেন "তাসিঞ্চং সুখুমং এতং ওকাসিরসমূপমং" অর্থাৎ উহা ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম, ঐকা কীটের শির সদৃশ। শ্রোত্রাদির ও এইরূপ বিবরণ আছে, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হয় নাই।

এই ছুইটি রূপের নাম ভাবরূপ।

(১৬) জীবিতিন্দ্রিয়=“সো তেসং রূপীনং ধম্মানং আমুট্‌ঠিতি, যপনা, যাপনা, ইরিয়না, বত্তনা, পালনা, জীবিতং জীবিতিন্দ্রিয়ং” (ধ। রূপকণ্ডে)। অর্থাৎ শরীর—ধর্ম্ম সকলের যে আয়ুস্থিতি, ক্রিয়া, ক্রিয়া-নিষ্পাদন, বর্দ্ধন, বর্ত্তন (সন্ততি), পালন ও জীবন তাহাই জীবিতিন্দ্রিয়ং।

‘ধাত্রী যেমন কুমার পালন করে, জল যেমন উৎপলকে রক্ষা করে, সেইরূপ সহজ রূপের (শরীরের) অনুপালনই জীবিতি-ন্দ্রিয়ের লক্ষণ’ (বু)। ইহার নাম জীবিত-রূপ।

(১৭) হৃদয়বস্তু=“মনোধাতু ও মনো-বিজ্ঞান ধাতুর নিশ্রয় (আবাস অথবা organ)। হৃদয়ের অভ্যন্তস্থিত লোহিতকে আশ্রয়পূর্ব্বক ইহা ভূতের দ্বারা সন্ধারিত, স্কুল ও চিত্তাহারের দ্বারা উপস্তম্ভিত, আয়ুর দ্বারা অনুপালীয়মান, মনোধাতু ও মনো-বিজ্ঞান ধাতুর এবং তত্তৎ সহভাবী ধর্ম্ম সকলের ‘বস্তু’ ভাবে অবস্থান করিতেছে” (বি। ১৪)।

ইহার নাম হৃদয়রূপ। আধুনিক মতে এই ‘বস্তু’ মস্তিষ্কে স্থিত।

(১৮) আকাশধাতু=“রূপপরিচ্ছেদ লক্খণা আকাশধাতু” (বি। ১৪)। অর্থাৎ রূপের পরিচ্ছেদ বা পর্য্যন্ত বা অবধি প্রকাশ লক্ষণক আকাশধাতু।

(১৯) কায়বিজ্ঞপ্তি। (২০) বাগ্বি-জ্ঞপ্তি=কায় ও বাক্যের দ্বারা বিজ্ঞাপন বা জানান। “সহজ রূপের বা শরীরের স্তম্ভন, সন্ধারণ ও চালনপূর্ব্বক যে আকার বিকার তাহা কায়বিজ্ঞপ্তি। চিত্ত সমুত্থিত বায়ু-ধাতু হইতে এই সঞ্চালন সিদ্ধ হয়।”॥(বু)

“বাক্যের ভেদ কারক যে চিত্তোত্থ পৃথিবী ধাতুর দ্বারা উপাদিন্ন ঘট্টন (কণ্ঠাদিতে অভিঘাত ; তাহা হইতে যে আকার বিকার হয় তাহাই বাগ্বিজ্ঞপ্তি।” (বু)

এতদুভয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে এবং ইহাদের নাম বিজ্ঞপ্তিরূপ।

(২১) রূপেরলঘুতা। (২২) রূপের মৃদুতা (অস্তব্ধতা বা অরোধতা)। (২৩) রূপের কর্ম্মণ্যতা অর্থাৎ শারীর ক্রিয়ার অনু-কুল কর্ম্মণ্যভাব বা অদুর্ব্বলতা।

এই তিন এবং বিজ্ঞপ্তিদ্বয়ের নাম বিকার রূপ। ইহারা রূপের এক এক প্রকার বিকার। (মাংশপেশীর কর্ম্মণ্যতাই উপরে গৃহীত হইয়াছে, Steam engine আদির কর্ম্মণ্যতা বোধহয় বায়ুভূতের অন্তর্গত)।

(২৪) রূপের উপচয় (বর্দ্ধি বা পূর্ণতা)। (২৫) সন্ততি—* অর্থাৎ বর্দ্ধিত রূপের সন্তান ভাব। (২৬) রূপের জরতা বা পরিপাক অর্থাৎ স্বভাব ত্যাগ না করিয়া, অন্য ভাব ধারণ ; যেমন পুরাণ ধান্য।

(২৭) রূপের অনিত্যতা বা নাশ।

এই চারিটির নাম লক্ষণরূপ।

(২৮) কবলিকার আহার=ওজঃ নামক অন্নের সূক্ষ্মভাগ। ওজের দ্বারা প্রাণীরা সজীব থাকে। ইহার নাম আহাররূপ।

এই অষ্টাবিংশতি রূপকে আধ্যাত্মিক,

* কোন অপূর্ণ উৎস জলপূর্ণ হইলে তাহা সেই জলের উপচয় পরে উপছিয়া যাইলেও যেমন উৎস জলপূর্ণ থাকে তাহা সন্ততি। (বু)

বাহির; ওহারিক (স্থূল), সূক্ষ্ম; দূরে, সন্নিকটে; নিষ্পন্ন, অনিষ্পন্ন ইত্যাদি বর্গে বিভক্ত করিয়া দেখান হয়, কিন্তু তাহাতে রূপের তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না।

বৌদ্ধমতে রূপ রস আদি তেজ আদি ভূতের গুণ নহে। যাহারা ঐরূপ বলেন তাহাদিগকে বুদ্ধঘোষ এই উত্তর দেন—"যদি পৃথিবীর গুণ গন্ধ হয় তবে জলীয় আসব সমালোচনা অপেক্ষা পৃথিব্যধিক কর্পাসে অধিক গন্ধ হওয়া উচিত"। বৌদ্ধশাস্ত্রে কতকগুলিকে দ্রব্য (গুণ সমষ্টি) ও কতকগুলিকে গুণ বা ক্রিয়া রূপে এক জাতি সমন্বিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের চারিভূত বস্তুর কঠিন, তরল, উষ্ণ ও বায়বীয় অবস্থা হইলে সঙ্গত হইতে পারে। তজ্জন্য পৃথিবী ধাতু না বলিয়া কঠিনতা বলা উচিত। কঠিনতার অতিরিক্ত পৃথিবী ধাতু কি আছে তাহার বৌদ্ধ কি উত্তর দেন জানি না। এক ভাবেরই তারতম্যানুসারে সমস্ত দ্রব্য কাঠিন্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কঠিনধাতু বলিয়া কোন বিশেষ বস্তু নাই। সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে দৃশ্য রূপাদির সহিত এক জাতিতে নিক্ষেপ করিয়া বুঝান হইয়াছে। তাহাতে চক্ষুরাদি প্রসাদ রূপ কেবল প্রকাশশীল ভৌতিক গুণ বা (Sensory organ) হইবার-সামর্থ মাত্র বলিয়া সূচিত হইতেছে। কিন্তু তাহারা কর্ম সমুত্থান। কর্ম আবার যুক্ত মানস ধর্ম। অতএব মানস হেতুর দ্বারা ভূতের প্রসাদই জ্ঞানেন্দ্রিয় হইল। ইহা সাংখ্যের অভিমানও ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রায় তুল্য হইল। বিশেষত বৌদ্ধের চক্ষুরাদিরা অনিদর্শন, সাংখ্যের ইন্দ্রিয়ও ইন্দ্রিয়াতীত। দৃশ্য-রূপ চক্ষুর দ্বারা রূপন করে, কিন্তু চক্ষু কিসের দ্বারা করে? ইহার দুই উত্তর হইতে পারে "আমি চক্ষুষ্মান্" এই ভাবের দ্বারা, অথবা এক চক্ষু গোলক দেখিয়া উহার প্রসাদ ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া। ইহার শেষ কল্পই বোধ হয় বৌদ্ধ সম্মত নচেৎ অন্যান্য স্কন্ধও রূপনের অন্তর্গত হয়।

'মনোবিকার উৎপাদন করে' এই হিসাবে স্ত্রীন্দ্রিয় ও পুরুষেন্দ্রিয় রূপ হইতে পারে, চক্ষুরাদি বা জীবিতিন্দ্রিয় যে জাতির ব্যক্তি, স্ত্রীন্দ্রিয় ও পুরুষেন্দ্রিয় যে জাতির তদ্ব্যক্ত ব্যক্ত হইতে পারে না। "জননেন্দ্রিয়" উহাদের সমতুল্য ব্যক্তি হইতে পারে। জননেন্দ্রিয়ের দ্বিবিধ উপবিভাগ হইতে পারে; অথবা স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব নামক রূপ শরীরের উপবিভাগ হইতে পারে। বস্তুত রূপ বিভাগ করিতে যাইয়া "আমড়া, জাম, লেংড়া, বম্বাই" এইরূপ বিভাগ করার ন্যায় উহা অন্যায্য।

লঘুতা ধরিলে গুরুতাও ধরা উচিত। শীতোষ্ণতাকে যে কারণে উষ্ণতা মাত্র ধরা হইয়াছে সেই কারণে একটি মাত্র ধরিলে গুরুতাধর্ম্মই প্রাপ্ত হয়। মৃদুতা ও কর্ম্মণ্যতা উক্ত হইয়াছে কিন্তু জড়তা বা জড়তা কেন গণিত হয় নাই তাহা বুঝা যায় না।

আকাশ ধাতু ও কল্পিত পদার্থ। বস্তুত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের (শীত উষ্ণ)

দ্বারা ব্যাপ্ত ব্যতীত বিস্তার কল্পনাই করিতে পারিবে না। পার্থিব সমস্ত দ্রব্যের ব্যবধির সর্ব্বদিকে বায়ু, আলোকআদি থাকে; চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে আলোক বা নীলবর্ণ থাকে। বর্ণাদিশূন্য আকাশ কোথাও নাই। কেবল শব্দে সমাহিত হইলে যে শব্দময় বিস্তারের জ্ঞান হয় তাহাই সাংখ্যের আকাশভূত। এ আকাশের সহিত বৌদ্ধদের সম্পর্ক নাই।

বৌদ্ধদের আধ্যাত্মিক ও বাহির সাংখ্যের গ্রহণ (বাহ্য করণ) ও গ্রাহ্যের অস্পষ্ট বিষ। সাংখ্যীয় বিভাগানুসারে প্রকাশ শীলভাব, ক্রিয়াশীলভাব ও স্থিতিশীলভাব ভেদে গ্রহণ ও গ্রাহ্য ত্রিবিধ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় প্রকাশ প্রধান, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ক্রিয়াপ্রধান, ও পঞ্চপ্রাণ স্থিতিপ্রধান। আর গ্রাহ্য পদার্থেরও প্রকাশভাব, ক্রিয়া এবং জাড্য-ভাব আছে। গ্রাহ্য আধ্যাত্মিক হইয়া উক্ত গুণানুসারে জ্ঞানশক্তির, কর্ম্মশক্তির ও প্রাণশক্তির অধিষ্ঠান হয় এবং বাহ্যরূপ গ্রাহ্যে শব্দাদি প্রকাশ্যভাব, ক্রিয়াভাব ও কাঠিন্যাদি ক্রিয়ানোদ্য জাড্যভাব পাওয়া যায়। সাংখ্যের জ্ঞানেন্দ্রিয় বৌদ্ধদের প্রসাদ ভূতের সহিত তুল্য, কর্ম্মেন্দ্রিয় বৌদ্ধদের (আধ্যাত্মিক) কর্ম্মতা ও বিজ্ঞপ্তিদ্বয়ের দ্বারা অস্পষ্টভাবে সূচিত। সাংখ্যের প্রাণ স্থূলত বৌদ্ধের জীবিতিন্দ্রিয়। লঘুতাদি-ধর্ম্ম তাত্ত্বিক বিভাগ নহে, উহারা আপেক্ষিক গুণ; সাংখ্যে তদ্রূপই উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধের লক্ষণরূপ সাংখ্যের (লক্ষণাদি) পরিণামের অন্তর্গত। ইহারাও তত্ত্ব বিশেষের ভেদকগুণ নহে সাধারণ ধর্ম্ম মাত্র। বস্তুত জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ এবং বিষয়, ভূত ও তন্মাত্র (বৌদ্ধের আকাশান্ত্য য়তন ইহার কতক অনুরূপ) নামক সাংখ্যেরা যে বিভাগ করেন তাহা অনবদ্য ন্যায় ও সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। তাহার ন্যায় সরল স্পষ্ট এবং পরমার্থ বোধের অনুকূল বিভাগ আর নাই।

বেদনা স্কন্ধ।

"যং কিঞ্চি বেদয়িত লক্খণং সব্বন্তং একতোকত্বা বেদনা স্কন্ধো বেদিতব্বো" (বি)। অর্থাৎ যাহা কিছু বেদয়িত লক্ষণ তাহা একত্র বেদনা স্কন্ধ। বেদয়িত অর্থে সুখাদি বেদনা অর্থাৎ অনুভব। বেদনা জাতিবশে তিন প্রকার কুশল বেদনা, অকুশল বেদনা ও অব্যাকৃত বেদনা। কুশল ধর্ম্মের (চিত্তের) সম্প্রযুক্ত (যে ধর্ম্মেরা একত্র উৎপন্ন ও লয় হয়, এবং যাহারা একালম্বন ও এক বস্তুক বা একাধার তাহারাই সম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম) বেদনা কুশল, অকুশল—সম্প্রযুক্ত বেদনা অকুশল এবং অব্যাকৃত (স্থূলত যে যে অবস্থায় সুখ ও দুঃখ রূপ বিরুদ্ধ কোটির স্ফুট বোধ থাকে না তাহারা অব্যাকৃত ধর্ম্ম) সম্প্রযুক্ত অব্যাকৃত বেদনা।

স্বভাব ভেদে বেদনা পঞ্চ প্রকার-সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্ম্মনস্য, ও উপেক্ষা। ইষ্ট স্পৃশ্যের অনুভব সুখ। অনিষ্ট স্পৃশ্যের অনুভব দুঃখ। অতএব সুখ ও দুঃখ কায়িক। সেইরূপ ইষ্ট ও অনিষ্ট মনো বিষয়ের অনুভব সৌমনস্য ও দৌর্ম্মনস্য। মাধ্যস্থতা-বেদনা উপেক্ষা। মূলত এই পঞ্চ প্রকার বেদনাই বেদনা স্কন্ধ।

সংজ্ঞা স্কন্ধ।

'যাহা কিছু সঞ্জানন লক্ষণক তাহা

সব একত্র সংজ্ঞা স্কন্ধ (বি। ১৪)। এই সঞ্জানন সম্বন্ধে মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে এইরূপ আছে—রাজা মিলিন্দ বলিতেছেন "প্রভো নাগসেন! সংজ্ঞার কিরূপ লক্ষণা? নাগসেন বলিলেন—মহারাজ, সঞ্জাননা লক্ষণা সংজ্ঞা। সঞ্জাননা কি? যেমন নীল সঞ্জানন করে, পীত সঞ্জানন করে, লোহিত, শ্বেত, মঞ্জিষ্ঠা সঞ্জানন করে। রাজা—উপমা করুন। নাগসেন—মহারাজ যেমন রাজার কোষাধ্যক্ষ ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া রাজভোগ্য সকল নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত ও মঞ্জিষ্ঠ বর্ণের দেখিয়া সঞ্জানন করে ইহাও সেইরূপ।

ইহা হইতে সংজ্ঞার তত্ত্ব কিছুই স্থির হয় না। সূত্র পিটক শাস্ত্রে সংজ্ঞা শব্দ অনেক অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়। অভিধর্ম্মে সম্+জ্ঞা ধাতু নিষ্পন্ন নানা পদ দিয়া সংজ্ঞার পর্য্যায় করা হইয়াছে। তবে বুদ্ধ ঘোষ বিশুদ্ধিমার্গে সংজ্ঞা প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানের ভেদ মূলক এক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা হইতে তৎকালীন সংজ্ঞা পদার্থ একরূপ নিশ্চয় হয়। সেই দৃষ্টান্ত এই— যেমন হৈরণ্যিকের ফলকে স্থাপিত এক রাশি কার্ষাপণ দেখিয়া একজন অজাতবুদ্ধি বালক কেবল তাহার চিত্র, বিচিত্র, দীর্ঘ, চতুরস্র, পরিমণ্ডল ভাব মাত্র জানে। আর একজন সাধারণ মনুষ্য উহা দেখিয়া সেই চিত্র বিচিত্রতাদিও জানে এবং উহা যে মানুষের উপভোগ হেতু, রত্ন-ভূত তাহাও জানে। কিন্তু একজন হৈরণ্যিক (স্বর্ণাদি মুদ্রা ব্যাবসায়ী) উহা দেখিয়া চিত্রবিচিত্রতাদি সমস্ত জানে, অধিকন্তু উহার কোন্‌টা ছেক (খাঁটি বা দক্ষ) কোনটা কূট বা কৃত্রিম, কোনটা অর্দ্ধসার তাহা এবং ঐ কার্ষাপণ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ও জানিতে পারে। সংজ্ঞা বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞাও সেইরূপ। সংজ্ঞা অজাতবুদ্ধি বালকের জানার মত, বিজ্ঞান সাধারণ পুরুষের জানার মত ও প্রজ্ঞা হৈরণ্যিকের জানার মত। নীলাদি ভাবে বিষয়ের আকার জানা সংজ্ঞা আর তদূর্দ্ধে লক্ষণ ও পটিবেধ বা তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বক জানা বিজ্ঞান।

"অথসালিনি তে" বুদ্ধ ঘোষ বলিয়াছেন সংজ্ঞা 'উপস্থিত বিষয়ক,' এবং যেমন সূত্রধর বিশেষ বিশেষ চিহ্নের দ্বারা কাষ্ঠ অবগত হয় তেমনই ভেদক চিহ্নের দ্বারা জানাই সংজ্ঞা।

অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে প্রাথমিক নীল পীতাদি জ্ঞান হয়, যাহা এক-ইন্দ্রিয় মাত্র-গৃহীত, যাহা অন্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা অনুবিদ্ধ নহে, তাহাই সংজ্ঞা হইল।

সংজ্ঞাও কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত এই তিন ভাগে বিভক্ত। বস্তুত কিন্তু রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, ও স্প্রষ্টব্য এই পঞ্চ ভাগে বিভজনীয়। "নহিত্থং বিঞ্ঞাণং অথি যং সঞ্ঞায় বিপ্পযুক্তং" (বু)। অর্থাৎ সংজ্ঞার অসহভাবী বিজ্ঞান হইতে পারে না।*

এই সংজ্ঞাকে সাংখ্যেরা 'আলোচন' জ্ঞান বলেন। ইংরাজীতে সংজ্ঞাকে sense

* এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে আকাশ বিজ্ঞান্ কোন সংজ্ঞা সম্প্রযুক্ত? শব্দরূপাদিয়া সব চতুর্ভূতাশ্রিত। চতুর্ভূতাতিরিক্ত আকাশধাতু কিসের দ্বারা সংজ্ঞিত হয়? ফলত তদ্বিষয়ে বিকল্প বা অনবহিত কল্পনা হয় মাত্র।

perception না বলিয়া sense percept বলা উচিত। কারণ নীল সংজ্ঞা যদি নীল perception হয়, নীল বিজ্ঞান তাহা হইলে কি হইবে। সূত্র পিটকের "অভিসংজ্ঞা নিরোধ" "সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ" ইত্যাদি সংজ্ঞার অর্থ অন্যরূপ।

(ক্রমশঃ)

হরিহরানন্দ আরণ্য
কাপিলাশ্রম।

বেদ ও বেদান্তের জন্ম

(প্রথম প্রস্তাব)

বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। যাহার আদি নাই তাহাই অনাদি; ইহাই অনাদি শব্দের অর্থ। পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যদি বেদ অনাদি হয় তাহাহইলে ইহার জন্ম কিরূপে সম্ভব? প্রবন্ধের শীর্ষ দেশে আমি কেন "বেদের জন্ম" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, এবং ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি, যথাস্থানে অতঃপর তাহা উল্লেখ করিব। "অপৌরুষেয়" শব্দের অর্থে ইহাই বুঝায় যে, যাহা পুরুষ বা মানব কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয় নাই। যাহা মানবের কল্পনা প্রসূত নহে অর্থাৎ যাহা পরমেশ্বর প্রণীত তাহাই অপৌরুষেয়। বেদ এই জন্য অনাদি ও অপৌরুষেয়। বেদান্তের কথা পরে কহিব।

যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগকে ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। পরমেশ্বরের শক্তি ও গুণ তাঁহার সহিত নিত্য বর্ত্তমান। ঈশ্বর বা পরমেশ্বর "স্বয়ম্ভূ" সুতরাং তাঁহার আদি, অন্ত, জন্ম বা ক্ষয় নাই। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমানত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বত্র বিদ্যমানত্ব, দয়া, ন্যায়, নিরপেক্ষতা, এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান তাঁহাতে অনাদিভাবে নিত্য বর্ত্তমান। বেদশাস্ত্র, ভগবানের জ্ঞানের বিকাশ। তিনি পৃথিবীর কল্যাণ কামনায়, লোক শিক্ষার নিমিত্ত, যে জ্ঞানমহিমা প্রকটিত করিয়া ছিলেন তাহারই সমষ্টি মাত্র বেদ শাস্ত্র। সুতরাং বেদে যাহা আছে তাহা "মানবকল্পিত" বলিয়া উল্লেখ করিতে কেমনে সাহসী হইতে পার? রাজদূত রাজাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কথাগুলি ব্যক্ত করেন তাহা রাজদূতের মুখ হইতে নিঃসৃত হইলেও তাহার বাক্য বলিয়া পরিগণিত হয় না, উহা রাজার বাক্য; দূত কেবল বাহক বা কথক মাত্র। ধর্ম্মপ্রণিধিগণ যে সকল নীতি অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা জগতে চিরকাল ব্রহ্মবাক্য বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিয়াছে, এই জন্য মুসা, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতির বাক্যকে তাঁহাদের অনুবর্ত্তীগণ ঈশ্বরবাক্য ভিন্ন অন্য আখ্যায় আখ্যাত করেন নাই। এই জন্য কোরাণ, বাইবেল, হিন্দুশাস্ত্র, জেন্দাবস্তা প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্র অর্থাৎ "ভগবান দত্ত বাক্য সংগ্রহ" বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে।

পরমেশ্বরকে অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করিলে তাঁহার জ্ঞানকেও অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে; বাক্যগুলি জ্ঞানের প্রকাশ জনক শব্দ মাত্র। ব্রহ্মবাক্যও সুতরাং

অনাদি। এই জন্য শাস্ত্রে শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এই জন্য বাইবেলে যিশুখৃষ্টকে শব্দ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই জন্যই অপরাপর শাস্ত্রেও শব্দের এত মাহাত্ম্য দেখা যায়। তাহাহইলেই বেদ অনাদি বলিয়া প্রমাণীত হইল, কারণ ইহা ব্রহ্মবাক্য। তাঁহারই প্রণিধিত, অনুমোদিত, অনুগৃহীত ও নির্ব্বাচিত ভক্তাধিক ভক্ত ঋষিগণ নিষ্পাপ শরীরে ও নিষ্কলঙ্ক মনে, ঐ বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া বেদশাস্ত্র প্রকটিত করিয়াছেন, সুতরাং বেদ কেবল পবিত্র বা পুরাতন নহে, ইহা অনাদি ও অপৌরুষেয়।

পৃথিবীর পুরাতন ও সভ্য জাতি সমূহের ধর্ম্মশাস্ত্রাবলী যেরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলে বেদসংগ্রহ সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রথমে কোরাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই গ্রন্থ মুসলমানদিগের নিকট ঈশ্বর বাক্য অর্থাৎ কালামুল্লা বলিয়া সম্মানিত। ইহার "ফাতেহা" নাম্নী প্রথম সুরা (অধ্যায়) হইতে আরম্ভ করিয়া একশত চতুর্দ্দশ অধ্যায় (অর্থাৎ শেষ অধ্যায়) পর্য্যন্ত, মুসলমানদিগের মতে, ব্রহ্ম বাক্য। শ্রুতিধরেরা ইহা মহম্মদের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, তদন্তর মৃগচর্ম্মে, শুভ্র প্রস্তরে, খোর্ম্মাগাছের পাতায় অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন। মহম্মদের মৃত্যুর পরে জয়দ, এবুনেকাব, ইবন্ হেজাজ প্রভৃতি অনেক বিদ্বান ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোরাণ পুস্তকাকারে লিখিত হয়। উপরিউক্ত একশত চৌদ্দ অধ্যায়ের মধ্যে সপ্তাশীতি অধ্যায় মক্কানগরীতে এবং অবশিষ্ট মদিনা নগরীতে, পরমেশ্বর তাঁহার ভক্ত মহম্মদকে অভিব্যক্ত করেন এবং মহম্মদের নিকট হইতে আরবের বিদ্বানগণ তাহা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। এই জন্য বলা যাইতে পারে, মুসলমানদিগের মতে কোরাণ ব্রহ্মবাক্য হইলেও ইহার জন্মস্থান বা উৎপত্তিস্থান মক্কা ও মদিনা। প্রায় পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে কোরাণ সংগৃহীত হইয়া ছিল। যিশু খৃষ্টের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক তাঁহার বাক্যাবলী, উপদেশ নিচয় ও ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সংগৃহীত ও বর্ণিত হইয়া যে গ্রন্থ প্রকটিত হইয়াছে তাহাই বাইবেল পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ, ইহার নাম নিউটেস্টামেণ্ট। মাথু, মার্ক, জন, লুক, পল, পিটর, জেমস্ ও জুদ্ (য়িহুদা) এই কয়েক জনে নিউটেস্টামেণ্টের সংগ্রাহক, তন্মধ্যে মাথুর গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। এই গ্রন্থ খৃষ্টের মৃত্যুর ৬১ বৎসর পরে প্রকটিত হইয়া ছিল। যিশু কোথায় কি কথা কহিয়াছিলেন এবং কোথায় কি করিয়া ছিলেন, বাইবেলে তাহা লিখিত আছে। খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, যিশু যাহা কহিয়া বা করিয়া ছিলেন তাহা ঈশ্বরপ্রণোদিত। তিনি ভগবৎ শক্তিতে সামর্থ্যবাণ হইয়া এই সকল অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন এবং নীতি উপদেশ দিতেন। খৃষ্টের জন্ম প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। বাইবেলের প্রথমাংশ "পুরাতন টেস্টামেণ্ট" নামে প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় প্রত্নতত্ত্ব বিদদিগের মতে এই গ্রন্থ পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্ব সাময়িক। পুরাতন টেস্টামেণ্ট য়িহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র,

তাহারা নূতন টেস্‌টামেণ্ট কিম্বা যিশুখৃষ্টকে মানে না, কিন্তু খৃষ্টানেরা নূতন ও পুরাতন পুস্তককে মানিয়া থাকে। পুরাতন বাইবেল পাঠ করিলে, য়িহুদীদিগের কোন্ মহানুভবকে ভগবান কোন্ স্থানে কিরূপ কথা কহিয়া ছিলেন তাহা অনেকটা বুঝা যায়। পুরাতন বাইবেলের জন্মস্থান বা উৎপত্তি স্থান পালেস্‌টাইন (অথবা আসিয়া মাইনর) দেশ। কিন্তু বেদ কত প্রাচীন? শ্রীভগবান কর্ত্তৃক কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে কোন্ ঋষির নিকটে প্রত্যাদেশ দ্বারা বেদোক্তি করিয়া ছিলেন? এই প্রশ্ন কয়েকটি যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তেমনি অত্যন্ত কঠিনোত্তর সাধ্য। ইহার মিমাংসা হইলেই বেদের জন্মস্থান অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান এবং উৎপত্তির কাল কতকটা বুঝা যাইতে পারে। এস্থলে ইহাও কহিয়া রাখা আবশ্যক, বেদাপেক্ষা পুরাতন শাস্ত্র, পুরাতন গ্রন্থ এবং বৃহত্তর গ্রন্থ জগতে আর নাই।

পূজ্যপাদ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র কর্ত্তা মহোদয়গণ সমস্ত জগতকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, ইহাদের এক একটি অংশের নাম "বর্ষ।" সমগ্র পৃথিবীর চারি ভাগ বা বর্ষের নাম এই———কিম্পুরুষ বর্ষ, হিরণ্য বর্ষ, নাভিবর্ষ এবং ভারতবর্ষ। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত দুটি বর্ষ বেদের জন্মের অথাৎ উৎপত্তির অথবা সংগ্রহের স্থান। শ্রীভগবান এই দুই স্থানে ঋষিগণকে বেদোক্তি করেন। নাভি বর্ষে বেদ সংগৃহীত হয় এবং ভারতবর্ষে উহা প্রকটিত (Published) হইয়াছিল। প্রথম তিন বর্ষ, বেদশাস্ত্র সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে উপকার করিয়াছে, সুতরাং উহা বেদের প্রসূতি ভূমি। ভারতবর্ষ, বেদাস্ত্রের জন্ম দেশ। প্রথম তিন বর্ষে বেদাস্ত্রের উৎপত্তি হয় নাই এবং হইবার আবশ্যক ও ছিলনা। কেন ছিলনা তাহা পরে বুঝাইব।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, কিম্পুরুষ বর্ষ, হিরণ্যবর্ষ ও নাভিবর্ষ, কোথায়? উহা কি কেবল কল্পনা না বাস্তবিক দর্শনীয় দেশ? আমি দেখাইব, ইহা কল্পনা নহে, ঐ তিন বর্ষ এখন ও বর্ত্তমান। ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করার আবশ্যক নাই, কারণ আমরা এই পবিত্র, প্রাচীন ও সুপ্রশস্ত দেশের অধিবাসী; এই পুণ্যময় দেশ অসংখ্য প্রকার মহাবিপদ সহ্য করিয়াও এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অপর তিনটি "বর্ষ" বা দেশ অনেকের নিকট অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। কাল প্রভাবে ভারতবর্ষের সহিত অপর তিন বর্ষের সম্পর্ক রহিত হইয়া গিয়াছে। সে কথা পরে লিখিব। কাল প্রভাবে অপর তিন বর্ষের লোকেরা ভারতের সহিত সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র হইয়া যাইবার পরে, শাস্ত্রকর্ত্তাগণ ভারতবর্ষকেই ধরাধামে একমাত্র পুণ্যধাম বলিয়া পরিগণিত করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক ভারতবর্ষ কেবল অতীবপুরাতন ও অতীব পবিত্র দেশ নহে, পরন্তু সর্ব্ববিধ শক্তি, গুণ, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পুণ্যে ভারতবর্ষ অতিশয় পরাক্রান্ত মহাদেশ। এই পুণ্যময় মহাদেশের বর্ণনায় বিষ্ণু পুরাণ লিখিয়াছেন—

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥"

*　　*　　*

ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্মভূমৌ বিধীয়তে॥

*　　*　　*

চত্বারি ভারতেবর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ॥
তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ॥
পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো বিষ্ণুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা॥
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি, ধন্যাস্তু তে
ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে, ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ
সুরত্বাৎ॥
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিততৎফলানি, সংন্যস্য বিষ্ণৌ
পরমাত্মরূপে।
অবাপ্য তাং কর্ম্মমহীমনন্তে, তস্মিল্লঁয়ং যে
ত্বমলাঃ প্রযান্তি॥
জানীম নৈতৎ ক্ব বয়ং বিলীনে, স্বর্গপ্রদে
কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যাম ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা, যে ভারতে
নেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ॥"

মহাসমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে যে বর্ষ অবস্থিতি করিতেছে, যেখানে ভারত-সন্ততিগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহারই নাম ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ হইতেই মানবগণ স্বর্গ, মোক্ষ, মধ্য ও অন্ত অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক ও পাতাললোক প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন স্থানেই মর্ত্ত্য মানব কর্ম্মভূমির মাহাত্ম্য জানে না ও বুঝে না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। অপর বর্ষে যুগভেদের প্রয়োজন নাই। মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে এই স্থানে বসিয়াই তপস্বীজনেরা তপস্যা করিতে পারেন, এই স্থানে বসিয়াই যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞে আহুতি দিয়া থাকেন, এবং পরলোকের আদরার্থে যে কিছু দানকার্য্য, তাহাও এই স্থানে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুকে যজ্ঞপুরুষ জানিয়া, এই জম্বুদ্বীপের লোকেরাই যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। অন্য দ্বীপের ব্যবস্থা রূপ নহে। জম্বুদ্বীপ মধ্যে আবার ভারতবর্ষই পারলৌকিক কার্য্যানুষ্ঠান পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতভূমিই কর্ম্মভূমি। অপর সমস্ত দেশই ভোগতৃপ্তির জন্য অবস্থিত রহিয়াছে। প্রাণী-গণ সহস্র সহস্র জন্মের পর, কদাচিৎ পুণ্য-বলে এই পুণ্যভূমি ভারতে মানবজন্ম লাভ করিয়া থাকে। স্বর্গবাসী দেবতারা বলিয়া থাকেন, "ভারতবাসীগণ দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও ধন্য। কেননা তাঁহাদের জন্মভূমি স্বর্গ ও মোক্ষ, উভয় প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ। ভারতের নির্ম্মল ও নিষ্পাপ লোকেরা তাঁহা-দের সমুদায় কর্ম্মফল পরমাত্মা স্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া, তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকেন"। স্বর্গপ্রদ পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয় হইলে, আবার আমরা সমুদায় ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করিব, এইরূপ কামনা দেবতারা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন।

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতভূমিই

কর্ম্মভূমি ও এখানকার অধিবাসী আর্য্যজাতির দেহই কর্ম্মদেহ, এ কথাটা বিকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত, পাশ্চাত্যভাবে বিভোর, স্থূলদর্শী সাম্যবাদীগণের অবশ্যই মনঃপূত হইবে না। কিন্তু যাঁহারা মনীষী ও সূক্ষ্মদর্শী, যাঁহারা ব্যবহারিক জগতের সর্ব্বত্র ছোট বড়, ভাল মন্দ, উচ্চ নীচ, ইত্যাকার বৈষম্য বা বৈচিত্র্যভাবই দেখিতে পান, তাঁহাদের নিকট ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। বস্তুতঃ ভারত ও ভারতের অধিবাসী আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জল, বায়ু ভূমির গুণ এবং ষড় ঋতুর নিয়মিত পরিবর্ত্তন, ইত্যাদি যে চতুর্দ্দশ প্রকার ভৌমিক কারণে মানব-প্রকৃতির পূর্ণতা সংসাধিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল ভারতেই সম্ভবে। ফলে এই ভারতবর্ষই যে, সমগ্র পৃথিবীর অনুকৃতি স্বরূপ এবং পৃথিবীর অন্যত্র যাহা কিছু আছে তাহা ভারতেও আছে, এ কথা সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতির মধ্যেও অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। আবার "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই মরতে" এইরূপ প্রবাদবচনও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ লিখিয়াছেন, "হলাহলের বিষ বিষ মধ্যেই গণ্য নয়, অগ্নির তেজ তেজমধ্যেই গণ্য নয়, কিন্তু ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়া এবং ব্রাহ্মণকে নির্য্যাতন করিয়া যে মহাপাতকী হয়, তাহাতে মহাপাপরূপ যে বিষধর (সর্প) দর্শন করে, সেই প্রাণঘাতী ও কুলঘাতী বিষের আর প্রতিকার নাই; অন্যায় অপমানগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্রাহ্মণের মনোমধ্যে যে দুঃখাগ্নি জ্বলে, সেই অগ্নিতে ব্রহ্মস্বাপহারীর ও ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচারকারীর ইহকাল, পরকাল, জন্মজন্মান্তর এবং সমগ্রকুলকে জ্বালাইয়া দেয়। যে ব্যক্তি কুম্ভীপাক নরকে ষষ্ঠি সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত বিষ্ঠাতে কৃমি হয়।" ফলতঃ ব্রাহ্মণবর্গ সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা শ্রদ্ধার পাত্র। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই প্রণম্য ছিলেন। বেদে ব্রাহ্মণের নাম আর্য্য, শুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী, গুণী, তেজ ও আত্মা। উপনিষদে ব্রাহ্মণের নাম ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ও স্বভাব উল্লেখ করিয়া শ্রীমৎ ভগবৎগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন——

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জব মেব চ।
জ্ঞানবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং॥

মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়াছেন, ব্রহ্মতেজে বলীয়ান এবং জ্ঞান ও গুণে পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণকে দর্শন করিলেই দূর হইতে চিনিয়া লওয়া যায়। গৌতমসংহিতার ঋষি, ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন——

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানাং
জিতেন্দ্রিয়ং।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষা শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

হিন্দুশাস্ত্র কর্ত্তাদিগের উক্তি পরিত্যাগ করিয়া যদি অহিন্দুর উক্তির দিকে দৃষ্টি পাত করা

যায় তাহাহইলেও বুঝিতে পারি, হিন্দুধর্ম্ম বিরোধীগণও মুক্তকণ্ঠে ব্রাহ্মণের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বহুশাস্ত্র ও বহুভাষাভিজ্ঞ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত (আচার্য্য) প্রফেসর মোক্ষমুলর (ম্যাক্‌মুলর) এবং প্রফেসর কাওয়েল, হণ্টার, উইলসন, মুর, রোয়েবর, গোগড্রষ্টুকর প্রভৃতি ইউরোপীয় বিদ্বানগণ লিখিয়াছেন—"ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা অসাধারণ প্রতিভাশালী। তাঁহাদের বুদ্ধি, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা, সিদ্ধান্ত ও ব্রহ্মজ্ঞান অপরিমেয় ও অপ্রমেয়।" বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মবিনাশ করিবার জন্যই নিজের মত প্রচার করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বেদবিরোধী, ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও শাস্ত্রবিরোধী ছিলেন। হিন্দুর হোম, যজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপাদি নাশকরাই তাঁহার ধর্ম্মের মতছিল। তিনি ও তাঁহার ধর্ম্ম হিন্দুবিদ্বেষী; কিন্তু তথাপি তিনি ব্রাহ্মণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেন "ব্রাহ্মণগণ পূজার পাত্র। সকলেরই উচিত তাঁহাদিগকে মান্যকরা। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কখন পাপ করিতে পারেননা বা ব্রাহ্মণ কখন লোভী, অজিতেন্দ্রিয় ও পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতে পারেন না।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণগণ ত্যাগী ছিলেন। তাঁহারা পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়া আত্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহারা গো হিরণ্য ধান্যাদির প্রতি প্রলুব্ধ হইতেন না। তাঁহাদের ধ্যানই একমাত্র ধন ছিল, সেই ধনই তাঁহারা সযত্নে রক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণগণ কাজে কাজেই অজেয় ছিলেন, ধর্ম্মই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র অপ্রতিহত গতি ছিলেন। জীবনের অষ্টচত্বারিংশবর্ষ তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রয় করিয়া থাকিতেন। সেই সময়ে তাঁহারা চরিত্র রক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান লাভে যত্ন করিতেন। ব্রাহ্মণ তৎপরে সবর্ণা পত্নী গ্রহণ করিতেন, কদাচ শুল্কদ্বারা কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহ করিতেন না। তাঁহারা কদাচ গোহত্যা করিতেন না; অগ্নিপক্ক সমুদয় ভোজ্যাদিই ভগবৎ প্রীত্যর্থে নিবেদন করিতেন। তাঁহারা প্রশান্ত, দীর্ঘকায়, সুন্দর ও প্রথিতযশা ছিলেন।" এই সকল বাক্যদ্বারা বুদ্ধ-দেবের ব্রাহ্মণের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার "ধর্ম্মপদের" [illegible] শ্লোক নিচয়ে ব্রাহ্মণলক্ষণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"দেবতা গন্ধর্ব্ব আর মানব নিকরে
ব্রাহ্মণের গতি বল বুঝিবে কি করে?
চিরদিন রিপুজয়ী ব্রাহ্মণ নিকর
পবিত্র অর্হৎ পদে স্থিত নিরন্তর।
নাহিক মমতা যাঁর তিনিই ব্রাহ্মণ
ভৌতিক পদার্থ নাহি ভাবেন আপন।
সঞ্চয়ে আসক্তি নাই সাধুতে যতন
পার্থিব কামেতে মুক্ত সেজন ব্রাহ্মণ।
আপনারে চির দিন সুদীন ভাবিয়া
কাটান জীবন যিনি পরার্থ লইয়া।
মনুষ্যত্ব, মহত্ব, বীরত্ব, সুবিজ্ঞান,
বিশ্বজয়ী সুপ্রবুদ্ধ আর মতিমান,
পূর্ব্বাপর আপনার বিদিত যেজন,
জ্ঞানী, পাপপুণ্যহীন সে জন ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ হৃদয় সদা পরিপূর্ণ জ্ঞান।
সর্ব্বাদির অন্তর্দর্শী সেই মতিমান॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের জন্মিবার অগ্রে ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান ব্রহ্মার মুখারবিন্দ হইতে ব্রাহ্মণ নিঃসৃত হইয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রের অভিমত এই, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন। "ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম" এই শাস্ত্রীয় উক্তির যে কোন প্রকারেই অর্থ করা যাউক, অর্থটি সংযুক্তি সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। পরমেশ্বর অনাদি অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং সর্ব্ব-শক্তিমান। তিনি সগুণ এবং নির্গুণ, তিনি নিরাকারও বটেন আবার সাকারও বটেন; ইচ্ছা বা প্রয়োজন হইলে তিনি সগুণ অর্থাৎ সাকার হয়েন। যাঁহার শক্তির শেষ নাই, তিনি সাকার হইয়া শ্রীমুখ হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে অসম্ভবত্ব কিছুই দেখি না। তিনি কি সগুণ নহেন? ভগবান কি সর্ব্বশক্তিমান নহেন? তিনি অনন্তসামর্থ্য বলে আপনার মুখ হইতে প্রাণী সৃষ্টি করিতে পারেন ইহা অসম্ভব কথা কিছুই নয়; তিনি ইচ্ছা করিলে এক পর-মাণুর কোটি অংশের একাংশ হইতে অনন্ত কোটি বিশ্বসংসার সৃজন করিতে পারেন, সুতরাং ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের জন্মের কথায় চমৎকৃত হইবার কথা কিছুই দেখি না। যদি অন্যভাবে ইহার অর্থ করা যায়, তাহাহইলেও অর্থটা সংযুক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। দেহের মস্তিক হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়, তদ্ব্যতীত যাহা কিছু তাহা কর্ম্মেন্দ্রিয়। তাহাহইলেই, বুঝা গেল, ব্রাহ্মণের জন্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যে। বস্তুতঃ জ্ঞানই ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব। ব্রাহ্মণের অন্য নাম জ্ঞান এবং জ্ঞানের অপর নাম ব্রাহ্মণ। এক্ষণে আর একদিক দিয়া, অর্থাৎ তৃতীয় ভাবে, কথা-টির বিচার করা যাউক। হৃদয়ে, মনে ও মস্তিষ্কে যে কিছু চিন্তা ও ভাবের উদয় হয় তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায়; বাক্যের শক্তি কণ্ঠে, কণ্ঠের শক্তি জিহ্বায় এবং জিহ্বার স্থান মুখে। মুখ না থাকিলে বাক্য কহা যায় না। ব্রাহ্মণের কার্য্য বাক্যে; যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, উপদেশ দান, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতি বাক্য-দ্বারা সম্পন্ন হয়; বাক্যের স্থান মুখ; সুতরাং ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ নিঃসৃত হইয়াছেন ইহা রূপক স্থলেও বিচার করিলে শাস্ত্রের উক্তি অযুক্তি সঙ্গত হয় না। সুতরাং যে কোন ভাবেই বিবেচনা বা বিচার কর, সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ নিঃসৃত হইয়াছেন, এই শাস্ত্রীয় বচন সম্পূর্ণ সত্য ও সম্পূর্ণ সঙ্গত।

আমার বোধ হয়, বর্ণশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রতি বর্ষে হ্রাস হইয়া আসিতেছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহাঁদের প্রভুত্ব ও প্রতি-পত্তি অত্যন্ত হীণ হইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতিমধ্যে আর পূর্ব্বকালের গুণ গরিমা নাই। যে সকল বরণীয় ও প্রশংসনীয় গুণ বশতঃ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবৃন্দ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিত এবং ব্রাহ্মণের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবার জন্য

লালায়িত থাকিত, যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণে পৃথিবীর সভ্য ও শিক্ষিত নরবর্গ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণের যশকীর্ত্তন করিতেন, বর্ত্তমান কালে সেই সকল গুণমাহাত্ম্য দেখাইতে পারেন, এমন ব্রাহ্মণের সংখ্যা কয় জন? প্রকৃত কথা এই, উপবীতের আর মূল্য নাই; কেবল 'ব্রাহ্মণ' নামের আর গৌরব নাই; ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণাপেক্ষা একণে শতগুণে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং কুব্রাহ্মণদিগের বৃথা অহঙ্কার আর সাজে না এবং অতঃপরও সাজিবে না। ব্রাহ্মণেরা যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের নিকট হইতে তাঁহারা প্রণাম বা সম্মান পাইবার আশা করিতে পারেন না। আমি পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ব্রাহ্মণের আবার সুমতি হউক, ব্রাহ্মণগণ আবার প্রকৃত ব্রাহ্মণ হউন। দেহের শীর্ষস্থান মস্তিষ্ক; মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে মনুষ্য পাগল হয়; হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থান ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ বিকৃত হইয়াছেন বলিয়াই হিন্দুসমাজও পাগলের ন্যায় বিশৃঙ্খল ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

প্রত্যেক প্রকৃত ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও উপদেশক, এই জন্য ব্রাহ্মণের অন্য নাম আচার্য্য। এই আচার্য্য দিগকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সেবা করিলে তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া জ্ঞানোপদেশ দিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমৎ অর্জ্জুনকে ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকে কহিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন
পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং
জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

অধিকারী পদবীতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে শিষ্যকে আত্মপ্রযত্নে যে সমস্ত সদ্গুণ অর্জ্জন করিবার কথা ব্রহ্মবিদ্যাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তন্ত্রও প্রথমতঃ সেই গুলিকে লক্ষ্য করিয়া দীক্ষার পর ইষ্টমন্ত্র চৈতন্যের যে প্রয়াস—প্রকারান্তরে তাহাই অধিকারি মার্গের সাধনা। কিরূপ শিষ্য দীক্ষার অধিকারী? ইহার উত্তরে গৌতমীয় তন্ত্র ও শারদাতিলক বলিতেছেন—

শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধীতবেদকুশলঃ পিতৃমাতৃহিতে রতঃ॥
ধর্ম্মবিদ্ ধর্ম্মকর্ত্তা চ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো দৃঢ়দেহো দৃঢ়াশয়ঃ।
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্থকর্ম্মকৃৎ।
অনিত্যকর্ম্মণস্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্যো জিতমোহো বিমৎসরঃ।
এবম্বিধো ভবেচ্ছিষ্যস্ত্বিতরো গুরুদুঃখদঃ॥

গৌতমীয় তন্ত্র—৫ম অধ্যায়।

শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধিতবেদকুশলো দূরমুক্তমনোভবঃ॥
হিতৈষী প্রাণিণাং নিত্যমাস্তিকস্ত্যক্তনাস্তিকঃ।
স্বধর্ম্ম-নিরতো ভক্ত্যা পিতৃ-মাতৃ-হিতোদ্যতঃ॥
বাঙ্মনোকায় বসুভি গুরু শুশ্রূষণে রতঃ।
এতাদৃশ গুণোপেতঃ শিষ্যো ভবতি নাপরঃ॥

শারদাতিলক—২য় পটল।

ইহার মর্ম্মার্থ এই:—যিনি সদ্বংশ জাত, শুদ্ধাত্মা (নিতান্ত নির্ম্মলস্বান্তঃ—বেদান্তসার)

ও পুরুষার্থপরায়ণ (ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত—গীতা); যিনি নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে কুশলতা লাভ করিয়াছেন ও যিনি সর্ব্বদা শাস্ত্রার্থতত্ত্ব অবগত আছেন (বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থঃ—বেদান্তসার); যাঁহার চিত্ত হইতে কাম দূরীভূত হইয়াছে, যিনি ধর্ম্মবিদ্ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ও স্বধর্ম্মনিরত, যিনি দৃঢ়দেহ (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু) যিনি দৃঢ়াশয় (তত্ত্বজ্ঞানার্থনিশ্চয়—গীতা) যিনি ভক্তিপূর্ব্বক পিতা মাতার হিতে রত; যিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রাণীর হিতৈষী (অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ—গীতা) যিনি আস্তিক ও যিনি নাস্তিকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন; (অর্থাৎ যিনি গুরুবেদবাক্যে শ্রদ্ধাবান) যিনি অনিত্য কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন ও নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন (কাম্যনিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসরঃ ইত্যাদি—বেদান্তসার) যিনি পরলোকের জন্য কর্ম্ম করেন (অর্থাৎ যিনি এখনও সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন নাই; কিন্তু যে কর্ম্ম করেন, তাহা পরলোকের জন্য এবং যাঁহার কর্ম্ম ও দৃষ্টি স্থূলাতীত-গতি) যিনি ইন্দ্রিয় বিজয় করিয়াছেন (অর্থাৎ যাঁহার শম ও দম অর্জ্জিত হইয়াছে); যিনি আলস্যকে জয় করিয়াছেন ও মোহকে অতিক্রম করিয়াছেন (অর্থাৎ যাঁহার বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে); যাঁহার কোন প্রকার মাৎসর্য্য নাই (অর্থাৎ যিনি অনসূয়) ও যিনি সর্ব্বদাই শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বিত্তের দ্বারা গুরুর শুশ্রূষায় রত, তিনি (এতগুলি গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই) শিষ্য। যাহার এই সমস্ত গুণ নাই, সে ব্যক্তি শিষ্য হইবার যোগ্য নহেন;—হইলেও কেবল গুরুর দুঃখদায়ক হইয়া থাকেন।

এইরূপ গুণবিশিষ্ট শিষ্য দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তন্ত্রোক্ত প্রণালীতে যে সাধনা আরম্ভ করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা অধিকারি মার্গের (Probationary Path) সাধনা; অর্থাৎ সেই সাধনাদ্বারা সাধন চতুষ্টয় অর্জ্জিত ও অধিকারিতার পূর্ণতা সমাধান হইবে। যথা তন্ত্রসারে সিদ্ধিলক্ষণ প্রকরণে—

বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষুত্বং ত্যাগিতা সর্ব্ববশ্যতা।
অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যসনং ভোগেচ্ছাপরিবর্জ্জনং॥
সর্ব্বভূতেষনুকম্পা সর্ব্বজ্ঞাদি গুণোদয়ঃ।
ইত্যাদি গুণসম্পত্তি র্মধ্যে সিদ্ধেস্তু লক্ষণম্॥

অর্থাৎ বৈরাগ্য, মুমুক্ষুতা, ত্যাগিতা, সর্ব্ববশ্যতা, অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস, ভোগেচ্ছা পরিবর্জ্জন, সর্ব্বভূতে অনুকম্পা, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণের উদয় ইত্যাদি গুণসম্পদ্ সিদ্ধির মধ্যাবস্থার লক্ষণ। সিদ্ধির মধ্যাবস্থা অর্থাৎ এই অবস্থার ভিতর দিয়া সিদ্ধির চরমাবস্থা পরমাত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়।

ভক্ত্যাস্পদা শ্রীমতী এনি বেশান্ত প্রণীত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকারি-মার্গে (Probationary Path) সাধনার সময় সাধকের চিত্তশুদ্ধির ও চিত্তের একাগ্রতা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের কোষসমূহ মার্জ্জিত হয়; সাধকও স্বপ্নাবস্থায় অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন ও স্থূল শরীরের নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্মশরীরে অন্য লোকে বিচরণপূর্ব্বক গুরুর নির্দেশ মতে লোকহিতকর বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এ বিষয়ে গৌতমীয় তন্ত্রে দেখিতে পাই—

ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃতনিত্যক্রিয়ো গুরুঃ।
কৃতকৃত্যোঽপি শিষ্যস্তু নিষীদেদ্‌গুরুসন্নিধৌ॥
কথয়েদ্রাত্রি বৃত্তান্তং শুভং বা যদি বাশুভং।
সুমঙ্গলীভির্নারীভিঃ সহ সংভোজনং মিথঃ॥
গিরিশৃঙ্গারোহণঞ্চ হস্ত্যশ্বরথারোহণং।
আরোহণং সৌধগেহে দেবোৎসব নিরীক্ষণম্॥
মঙ্গলঞ্চ স্ববামাংশ দর্শনং স্পর্শনং তথা।
মন্ত্র সিদ্ধস্য লিঙ্গানি প্রোক্তানি তব সুব্রত॥
অনাকুলানি কথয়ে শৃণু নিন্দ্যানি সর্ব্বতঃ।
কৃষ্ণবর্ণৈর্ভটৈঃ স্বপ্নে প্রহারৈস্তৈললেপনং॥
বিপ্রাণাং রোষবাদেচ পরস্ত্রীণাং নিষেবনং।
সিদ্ধি বিঘ্নানি চোক্তানি অশুভানি নিন্দিতানি চ॥

অনন্তর গুরু প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্যক্রিয়াদি সম্পাদন করিবেন। শিষ্যও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক গুরুর নিকট উপবেশন করিবেন ও তাঁহার নিকট রাত্রির শুভাশুভ বৃত্তান্ত বর্ণন করিবেন। অতিশয় মঙ্গল চিহ্ন-ধারিণী নারীগণের সহিত একান্তে সংভোজন, গিরিশৃঙ্গারোহণ, হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ, সৌধগেহে আরোহণ, দেবতাদিগের উৎসব দর্শন, নিজের বামাংশ দর্শন ও স্পর্শন মন্ত্রসিদ্ধি হইবার পক্ষে শুভ চিহ্ন। কৃষ্ণবর্ণ ভট কর্ত্তৃক প্রহার, ব্রাহ্মণগণের প্রতি সক্রোধ বাক্য প্রয়োগ, পরস্ত্রী নিষেবণ ইত্যাদি মন্ত্রসিদ্ধির বিঘ্নকর অশুভ চিহ্ন। এই সকল চিহ্ন শিষ্যের অব্যক্ত অথচ মহত্তর প্রজ্ঞা Subliminal selfএর অবস্থা ও গতি ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করে। এতদ্দ্বারা তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্থিরীকৃত করিতে পারা যায়।

সাধনা করিতে করিতে নিত্যবস্তু লাভের জন্য যখন ব্যাকুলতা হয়, তখন গুরুর করুণা হয়। গুরুর করুণা না হইলে অধিকারিতার পূর্ণতা হয় না ও তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় না।

যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবৎ তত্ত্বকথা কুতঃ?
কুলার্ণব।

কিন্তু এ গুরু কে? রাত্রিশেষে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্রই যে গুরুদেবের ধ্যান করা তন্ত্র-শাস্ত্রের আদেশ, "ধ্যায়েৎ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং" ইত্যাদি মন্ত্রে যাঁহার ধ্যান করিতে হয়, সেই নরাকৃতি পরব্রহ্ম, সেই মানব ও ভগবানের সন্ধিস্থল ও সম্বন্ধ-স্থাপক, সেই পরম কারুণিক পুরুষ যাঁহার করুণা অনুক্ষণ জগৎকে প্লাবিত করিতেছে বলিয়া তন্ত্রে যাঁহাকে সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন স্মেরা-নন ও সাধকের অভীষ্টদায়ক বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, সেই পরম পুরুষই সেই গুরু।

গুরুর করুণা লাভের দ্বারা অধিকারিতার পূর্ণতা সাধন হইলে, অধিকারীর যে অবস্থা হয়, গান্ধর্ব্ব তন্ত্রে তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন।

আস্তিকোঽথ শুচির্দ্দান্তো দ্বৈতহীনো জিতে-ন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবাদী চ ব্রহ্মী ব্রহ্মপরায়ণঃ॥
সর্ব্বহিংসাবিনির্মুক্তঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতেরতঃ।
সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারী স্যাৎ তদন্যো ভ্রম-সাধকঃ॥

[যিনি আস্তিক অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে, গুরুতে ও পরতত্ত্বে যাঁহার শ্রদ্ধা অচলা, যিনি শুচি অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা বাহ্য ও আভ্যন্তর সর্ব্ব-প্রকার শৌচসম্পন্ন, এবং যাঁহার উপাধি সকল সুগঠিত হওয়ায় নির্ম্মল এবং সত্ত্বগুণ প্রবল, যিনি দান্ত অর্থাৎ দমগুণযুক্ত, যাঁহার

উপাধি সকল অনুষ্ঠিত প্রজ্ঞার বশে নীত, যিনি দ্বৈতহীন অর্থাৎ "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" এই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, যিনি জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ শমাদি গুণসম্পন্ন, যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ যিনি বহুপরিমাণে অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ ব্রহ্মতেই অবস্থান করিতেছেন, যিনি ব্রহ্ম-বাদী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা ভিন্ন যিনি অন্য কথা বলেন না, যিনি ব্রহ্মী অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্বস্ব ধনই ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্মপরায়ণ অর্থাৎ ব্রহ্মই যাঁহার পরমগতি এইরূপ সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ, যিনি হিংসা বিনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্ব প্রাণি হিতে রত, তিনিই এই তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী; অন্য যে সমস্ত সাধক তাহারা ভ্রমসাধক। উপরে অধিকারিতার পূর্ব্বাবস্থা, অধিকারিতার সাধনাবস্থা ও অধিকারিতার পরিপাক অবস্থাত্রয়ে সাধকের যে যে গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, পাঠক দেখিবেন তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষণা একটি অপরিহার্য্য গুণ বটে। তান্ত্রিক সাধক জানেন যে পরিমাণে তিনি বিশ্বহিতব্রত সাধন করিতে পারিবেন, সেই পরিমাণে সেই বিশ্বাত্মা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন; যথা মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পরমগুরু শ্রীসদাশিব কহিতেছেন :—

কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রয়ম্॥

হে দেবি, হে পরমেশ্বরি, বিশ্বহিত সাধন করিতে পারিলে বিশ্বের আত্মা বিশ্বেশ্বর প্রীত হয়েন, কেন না বিশ্ব তাঁহাতেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

তান্ত্রিক সাধক জানেন সেই পরম দেবতা, জীবের মঙ্গল সাধন জন্য বিশ্বময় মহামঙ্গলব্রত অনুষ্ঠান করিয়া বসিয়া আছেন, যে সেই বিশ্বমঙ্গল ব্রতে যোগ দান করিতে পারিবে, সেই ধন্য, সেই কৃতকৃত্য। তাই তন্ত্রের শাসন, সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত হও; নতুবা অধিকারিত্বের বাগোদয়টিও হইবে না।

তাই জিজ্ঞাসা করি, যে শাস্ত্রের অধিকারী হইতে হইলে, সর্ব্বপ্রাণিহিতেরত ও ব্রহ্মিষ্ঠ, ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মী ও ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হয়, সে শাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যা নহে ত কোন্ শাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যা? এই ব্রহ্মবিদ্যাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য দিনে দিনে যে লোপ পাইতেছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণেরা নিজের দোষেই নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। এখনও সময় আছে, এখনও তাঁহারা সাবধান হইলে তাঁহাদের গৌরব ও সৌরভ রক্ষা হইতে পারে। রঘুবংশ কাব্যের চতুর্দ্দশ সর্গে মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

উত্তিষ্ঠবৎসে ননু সানুজো সৌ।
বৃত্তেন ভর্ত্তা শুচিনা তবৈব॥

অর্থাৎ বাল্মীকি মুনি সীতাকে কহিতেছেন "হে বৎসে! উঠ; তোমারই বিমল চরিত্রগুণে তোমার স্বামী তাঁহার ভ্রাতার সহিত বিপদ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।" আমিও ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছি "হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা পাপসাগর হইতে সমুত্থান কর, ভদ্রের ন্যায় জীবন যাপন কর, এবং এক সময়ে তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের যে দেবদুর্লভ চরিত্রে

সমগ্র ভারতবর্ষ, সমগ্র জগৎ আলোকিত হইয়াছিল, সেই চরিত্র আবার দেখাও, সেই মহত্ব, সেই শৌর্য্য, বীর্য্য, ধর্ম্মবল ও দেবোপম স্বভাব আবার দেখাও, আবার মহৎ হইবার চেষ্টা কর।"

সমাপ্ত।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

তত্ত্বচিন্তা।

(জীব ভাগ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

২৬। অভ্যাস।—

অনবরত যুক্ত হইতে হইতে Magnatised হওয়া প্রযুক্ত যোগীতে ঐশগুণ (শক্তি, চৈতন্য ও আনন্দ ভাব) আসে। এই গুণের নাম বিভূতি।

২৭। যোগীরা চতুর্বিধ।—

(১) চৈতন্যস্বরূপকে ধ্যান করিয়া চৈতন্য লাভ করেন।

(২) শক্তিস্বরূপকে ধ্যান করিয়া শক্তি লাভ করেন।

(৩) আনন্দস্বরূপকে ধ্যান করিয়া আনন্দ (প্রকাশভাব) লাভ করেন।

(৪) স্বরূপ ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া শক্তি-চৈতন্য-আনন্দ লাভ করেন।

১ম দৃষ্টান্ত। বশিষ্ট।
২য় ,, বিশ্বামিত্র।
৩য় ,, নারদ।
৪র্থ ,, জনক।

২৮। অযথা প্রয়োগে বিভূতি হ্রাস পায়। বিশ্বামিত্রাদির পতন ইহার দৃষ্টান্ত। এইজন্য যাহাতে বিভূতি প্রয়োগ না করিতে হয়, অনেক ঋষি এই ভাবে চলিয়া থাকেন।

২৯। ভক্তি – জ্ঞান।—ভক্তিমার্গী বলিয়া তিনি জ্ঞানালোচনা করিবেন না, এমন কথা নহে। জ্ঞানমার্গী বলিয়া তিনি ভক্তদিগকে "অজ্ঞান" মনে করিবেন অথবা ভক্তদিগের আরাধ্যদিগকে অবজ্ঞা করিবেন, এমন কথাও নহে। ভক্তিমার্গী হইয়া জ্ঞানালোচনা হেতু তপস্বীদিগের শরণাগত হয়েন। আবার, জ্ঞানমার্গী ঋষিরাও দেবতাদিগের যথার্থ সম্মান করিয়া থাকেন। দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া ভক্তদিগের ন্যায় জ্ঞানমার্গীও দেবতাকে প্রণাম করেন। নিজের কুশলার্থে না করুন, লোকশিক্ষা হেতু এবং দেবের সম্মান রক্ষা হেতু করিয়া থাকেন।

৩০। গুরুরা বলেন, ভক্তিমার্গী হইয়া জ্ঞানালোচনা করা শ্রেয়। ভক্তিতে আরাধ্য দেবতার যত নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে, জ্ঞানসংযুক্ত ভক্তিতে তদপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়। মনে কর, কোন ভক্তের উপাস্য দেবতা "কালী"। তিনি কালী অর্থ অথবা কালীমূর্ত্তির অর্থ কিছু জানেন না। কেবল অঙ্কিত বা রচিত প্রতিমা পূজা করিয়া এবং মনে মনে জপ করিয়া, তিনি বিপদে রক্ষা করিবেন, তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ দিবেন—ভাবিয়া আসিতেছেন। যদ্যপি তিনি জ্ঞানালোচনায় কালী প্রতিমার অর্থ বুঝিতে পারেন, তখন তিনি জানিবেন যে, অজ্ঞানাবস্থায় যাঁহাকে

পূজা করিতে ছিলেন, তিনি শুদ্ধ তাঁহার "কালী"নন, কিন্তু ব্রহ্মের একটী গুণ।

৩১। তপস্যা।—কি জ্ঞানমার্গী, কি ভক্তিমার্গী উভয়ই তপস্বী। প্রতি কর্ম্মের পূর্ব্বে কর্ম্মী তপস্বী। সঙ্কল্পও তপস্যা, অনুষ্ঠানও তপস্যা। তবে ভক্তের তপস্যায় পার্থিব সুখ ত্যাগ করিতে হয় না, জ্ঞানমার্গীর তপস্যায় পার্থিব সুখ আকাঙ্ক্ষিত হয় না, উপভোগও হয় না। উভয়ের তপস্যার এই টুকু বিভিন্নতা। জ্ঞানমার্গীরা দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, উদাসী ইত্যাদি।

৩২। আরাধ্যের রূপ।—ব্রহ্মের রূপ নাই, ঈশ্বর, ভগবান, হরির রূপ আছে। ভক্তের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্ম আরাধ্য রূপ ধরেন। ভক্ত যে রূপ কল্পনা করিয়া সাধনা করেন, আরাধ্য সেই রূপ ধরিয়া দেখা দেন।

আরাধ্য দর্শনে ভক্ত-কল্পনা হইতে কি ব্রহ্মের কি দেবতার আভাস ও প্রতিমা প্রকাশ পাইয়াছে। যাঁহার যে ভাব (তপস্যা কালে প্রকৃতি), তিনি সেই ভাবরূপী আরাধ্য প্রতিমা কল্পনায় দেখিতে পান। সেই কল্পনা-উদ্ভূত প্রতিমা হইতে অঙ্কিত, ক্রমে গঠিত, প্রতিমার প্রকাশ হইয়াছে।

কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রত্যেকই অপর হইতে বিভিন্ন, পৃথক্, ভিন্ন গুণ ও প্রকৃতিধারি। কিন্তু কালীতে দুর্গা-ভাব নাই, অথবা দুর্গাতে কালী-ভাব নাই, অথবা একে অন্য ভাব নাই, তাহার প্রমাণ কোথা? বরঞ্চ কালী-দুর্গা-জগদ্ধাত্রী মহাশক্তি রূপা হইয়া পরম বৈষ্ণবী। রাজসিক পূজা উপলক্ষে ছাগ মহিষাদি বলিদান গ্রহণ সত্ত্বেও উঁহারা বৈষ্ণবী বলিয়া উক্ত। এক ভক্ত যাঁহাকে কালী রূপে দেখিতেছেন, অপর ভক্ত তাঁহাকেই শিব রূপে দেখিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য—বস্তু একই। যাঁহার যেরূপ দৃষ্টি, রুচি ও তপস্যা, তিনি সেইরূপ দেখিতেছেন।

মনে কর, একজন ভক্ত কোমল প্রকৃতি, অথচ ভীরু নহে, পরের কথায় থাকে না, ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে পারে না, সর্ব্বাবস্থার দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করে। সে ভক্ত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। তাহার কল্পনায় আরাধ্যের শক্তি থাকিবে, শান্ত ভাব থাকিবে, হাস্যবদন থাকিবে, তিনি কোমল প্রকৃতি হইবেন, অথচ সর্ব্ব দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবেন। উক্ত গুণগুলি কল্পনায় যে ভক্ত যাহা দর্শন করিবে, তাহা হইতেই কি দুর্গা প্রতিমা রচিত নহে? কোমল প্রকৃতি হেতু—স্ত্রীজাতি, দশ দিক্ প্রতিপালন-শক্তিসম্পন্না বলিয়া দশভুজা, কর হস্তে অস্ত্র, কর হস্তে শাসন ও পালন, এক হস্তে অভয় দান। দুর্গা প্রতিমা হাস্য বদনা—শান্ত ভাব প্রদর্শিকা। তাহার পর দুর্গতি (মোহ) নাশিনী বলিয়া মোহরূপ কৃষ্ণবর্ণ পশুজাত মহিষাসুররূপী দুর্গতিকে পশুরাজ সিংহবাহিনী হইয়া নাশ করিয়া ভক্ত কামনা পূর্ণ করিতেছেন। ভক্ত কল্পনায় যে ঠিক দুর্গাপ্রতিমাই দেখিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না, কেন না কল্পনা হইতে বর্ণনা, বর্ণনা হইতে চিত্রাঙ্কন, এবং চিত্র হইতে স্থূল গঠনে একটু ত্রুটীও হইতে পারে, একটু অলঙ্কারবৃদ্ধিও হইতে পারে।

৩৩। এইরূপে দেবতা রূপ কল্পনা হইতে

প্রতিমা রচনা হইয়াছে সম্ভবতঃ কোন ভক্ত ব্রহ্ম ভগবান বা ঈশ্বরের নামে সাধনা করেন নাই, নচেৎ উঁহাদেরও প্রতিমা প্রকাশ পাইত। নয়ত ব্রহ্ম ভগবান ও ঈশ্বরের রূপ নাই বলিয়া উঁহাদের ভক্তও নাই। যাঁহার রূপ নাই তাঁহার ভক্ত কে কি প্রকারে হইবে? কেন না যে সম্বন্ধ বশতঃ ভক্ত, সে সম্বন্ধ নিরাকার ও নিগুণের সহিত সম্ভব হয় না।

৩৪। তাই বলিয়া ব্রহ্ম ভগবান বা ঈশ্বরের ভক্ত নাই, একথাও নহে। উঁহাদের নাম জপ করা, উঁহাদিগকে স্মরণ করা, উঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উঁহাদের অনুগত থাকা, কলিতে বিলক্ষণ প্রচলিত রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য—সত্য ধারণা অভাবে ব্রহ্মকে দেবতা বলিয়া আর দেবতাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছে। সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় "যে কালী সেই শিব, সেই কৃষ্ণ, সেই ভগবান" ইত্যাদি। বক্তা যদি সত্যবাদী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এতগুলি নামকরণে তাঁহার প্রয়োজন কি? তিনি একজনের উপাসক হইয়া অপরকে অবজ্ঞা করুন, তাহা বলি না, তবে কতকগুলিকে আরাধ্যের সমতুল ভাবিলে তপস্যা জনিত "একাগ্রতা" তাঁহার লাভ হইবে না, কোনটাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, সিদ্ধও হইতে পারিবেন না। বস্তু একমাত্র। ভিন্ন ভিন্ন নাম ভিন্ন ভিন্ন গুণ বাচক। যিনি গুণাতীত, তাঁহাতে গুণারোপ করাও সত্যজ্ঞানবর্জ্জিতে সম্ভব হইয়াছে।

৩৫। সিদ্ধি লাভের জন্য "একাগ্রতা" অভ্যাস প্রয়োজন। অনন্যমন হইয়া এক বিষয় ধরিয়া থাকিতে থাকিতে "একাগ্রতা" অভ্যাস হয়। অভ্যাস কালে বিবিধ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। অপর বিষয় সম্বন্ধীয় বৃত্তি সমুদায় স্থির থাকে না, তাহাদিগের উদয়ে চিত্ত স্থির থাকে না, তাহাতে মন কর্ম্মী সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট, সর্ব্বদাই চঞ্চল, সর্ব্বদাই বিষয়ান্তরবিহারী। কতকগুলি ব্যাঘাতের উল্লেখ করিতেছি।

(১) সিদ্ধি লাভ সম্বন্ধে সংশয়।
(২) বিষয়ান্তরে আপাততঃ সুখাসক্তি।
(৩) অলসতা।
(৪) পরাঙ্মুখতা।

৩৬। দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসে, সংশয় উদয় হইতে না দেওয়া কর্ত্তব্য, সংশয় উদয় হইলে, নির্ভয়ে উহাকে অগ্রাহ্য করিতে হয়। সুখের বাসনা নিঃসত্ত্বেও পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম হেতু সুখদ বিষয় মনমধ্যে উদয় হইলে, উহাতে অনুরাগ দেখাইতে নাই। "প্রত্যাহার" দ্বারা উহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। বিরোধী প্রবৃত্তি উদয়ে, অটল সংকল্প ধরিয়া একটু স্থির থাকিতে হয়। তাহার পর পুনরায় পূর্ব্ব ব্রতে ব্রতী হইতে হয়। অলসতা হেতু সকল কর্ম্মের পূর্ব্বানুরাগ হ্রাস পায়, পরে পরাঙ্মুখতা আসিয়া পড়ে।

এইরূপে সকল ব্যাঘাত এড়াইয়া যিনি একাগ্রচিত্ত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত একাগ্রচিত্ত হয়েন।

৩৭। লক্ষ্য।—

কি একাগ্রচিত্ততা অভ্যাসে, কি ঈশ্বরস্মরণে, কি আত্ম তপস্যায়, এমন কি, চিন্তায়, "লক্ষ্য" স্থির করা বিধি। লক্ষ্য স্থির না

করিলে মন স্থির হয় না, মন স্থির না হইলে উপরোক্ত কোন কার্য্যই হয় না। লক্ষ্য [illegible]র করিতে কল্পিত বিন্দু ধরা সুবিধা ভ্রূমধ্যে লক্ষ্য স্থির করা যায়। স্থূল পদার্থের মধ্যে শালগ্রাম শিলায় যেরূপ বিন্দু স্থির- সুতরাং লক্ষ্য স্থির অভ্যাস হয়. [illegible]ন আর কিছুতে হয় না। তদ্রূপ পরিমাণে সূর্য্যে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে ও দীপালোকে সম্ভব। তদ্রূপ পরিমাণে দূরস্থিত রক্তবর্ণে।

৩৮। সমাধি।—

কি তপস্যায়, কি যোগে, মনুষ্য যেন দেহ হইতে পৃথক্ থাকে। ইন্দ্রিয়গণ ও উহাদের নেতা মন কার্য্য করে না, নয়ত যদিও কার্য্য করিতে থাকে, দেহী উহা অনুভব করে না। দেহীর এই অবস্থা "সংকল্প" হইতে "তপস্যা বা যোগ" ক্রিয়ার অবসান পর্য্যন্ত থাকে। তাহার পূর্ব্বেও থাকেনা, পরেও থাকে না। এই অবস্থাকে "সমাধি" বলে। এই অবস্থায় দেহীর লক্ষ্য ব্রহ্ম বা কল্পিত ব্রহ্ম, দেহীর অবলম্বন জ্ঞান। স্বয়ং "জ্ঞাতা" রূপে "জ্ঞান" দ্বারা "জ্ঞেয়" অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকে। আপাততঃ বিষয় পরিত্যক্ত দেহীর জ্ঞান তখনও কলুষিত থাকে। সুতরাং জ্ঞাতাবৎ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয়কে ধরিতে পারে না। এই সময় চিত্ত দুলিতে থাকে—অনুষ্ঠান ঠিক্ হইয়াছে, লক্ষ্য ঠিক্ হইয়াছে, কি, না সন্দেহ উপস্থিত হয়। অভ্যাস দ্বারা জ্ঞান মার্জ্জিত অর্থাৎ কলুষচ্যুত হইলে সিদ্ধি লাভ সম্ভব হয়।

আমরা অমূলক চিন্তায় রাজা হইয়া কত আজায় ন্যায় মনে মনে যেন কত কার্য্য করিয়া ফেলি—ইহা যেমন সহজ, তপস্যায় বা যোগে সিদ্ধি লাভ ততোধিক সহজ।

৩৯। জ্ঞানমার্গীদিগের অধিকাংশই "পুরুষকার" বাদী এবং ভক্তিমার্গীদিগের সকলেই "দৈব" বাদী। জ্ঞানমার্গীরা বিবিধ পার্থিব সুখে পরাঙ্মুখ হইয়া (আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়া) আত্ম সংযমে ও বিচারে অনুষ্ঠান করেন। দৈববাদীরা শ্রেষ্ঠ প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগ রক্ষা করিয়া স্বীয় স্বীয় ব্রতে নিযুক্ত থাকেন।

৪০। উল্লিখিত আছে "অভিমান" ত্যাগ না হইলে দৈব কৃপা লাভ হয় না। আমিই "কর্ত্তা" জ্ঞান গর্ব্বে দৈব কৃপা প্রার্থনা সঙ্গত নহে। আবার দৈবে যাঁহার বিশ্বাস তাঁহাতে অভিমানও ততক্রিয়াবান নহে। পুরুষকারবাদী অক্ষম হইয়া দৈববাদী হইয়া পড়েন। আবার দৈববাদীও মোহম্পর্শে আপনাকে বড় মনে করিয়া পুরুষকারবাদীবৎ হইতে চাহেন। দৃঢ় সংকল্পে স্থির থাকা অতিব কঠিন।

৪১। আপাততঃ হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই না ভক্তিমার্গী না জ্ঞানমার্গী। বাহ্য ক্রিয়া দ্বারা ভক্তিমার্গী বলিয়া প্রচার করিলে কি হইবে? প্রকৃত ভক্তি অনুরাগ অভাবে সময় সময় অভক্তের ন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলেন। একে বিষয়ী, তাহাতে চিন্তা ও বিচার করিবার অবসর নাই, সুতরাং জ্ঞানমার্গী হইতে পারেন না বলিয়া যিনি বাহ্যে দুঃখ প্রকাশ করেন, তিনিও কপট। অনুষ্ঠান করিবার সময়াভাব হইতে পারে, কিন্তু দেবতা বা ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে স্মরণ করিতে অবসর প্রয়োজন করে না। অন্য কাজ করিতে করিতে এ কাজ করিবার আমাদের শক্তি বিলক্ষণ আছে।

উক্ত হিন্দুদিগের ঈদৃশ অবস্থা বশতঃ সনাতন ধর্ম্মের বিবিধ বিকৃত রূপ প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে। পাছে কোন ধর্ম্মবিরোধী হইতে হয়, তাই ঐ ঐ ধর্ম্মবিকৃতির উল্লেখ করিলাম না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহারাচরণ বসু।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | ১৩১৪ সাল, ১৮২৯ শকাব্দা।

ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার অনুশীলন।

২০। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, যথা,—২য় অঃ।

(১) ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং।
হৃদীন্দ্রিয়াপি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥ ৮॥
প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্ত চেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণেনাসিকয়োচ্ছ্বসীতঃ।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিববাহমেনং
বিদ্বান্ মনোধারয়তো প্রমত্তঃ॥ ৯॥
সমেশুচৌ শর্করা বহ্নিবালকা
বিবর্জ্জিতে শব্দ জলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোহনকূলে নতু চক্ষু পীড়নে
গুহা নিবাতাশ্রয়নে প্রযোজয়েৎ॥১০॥

(২) বক্ষ, গ্রীবা ও মস্তক, উন্নত ও শরীরকে সরল করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক হৃদয়ে ইন্দ্রিয় সকলকে মনের সহিত সংযোগ করতঃ সংসার-সাগরে ভয়াবহ স্রোত সকল ব্রহ্মরূপ ভেলক দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তি অতিক্রম করিবেন। (শ্বে ৮। ব্রাহ্মধর্ম্ম ৭। ১৬।)

(৩) প্রাণাপান বায়ুকে সংযম করিবেন। আহার বিহারাদি দেহচেষ্টাকে নিয়মিত করিবেন। প্রাণবায়ু ক্ষীণ হইলে নাসাপুট দ্বারা অল্প অল্প বায়ুত্যাগ করিবে। দুষ্টাশ্বযুক্ত রথকে সংযমের ন্যায় বিদ্বান অপ্রমত্ত ভাবে মনকে ধারণ পূর্ব্বক মননে নিযুক্ত হইবেন। শ্বে ৯॥

(৪) কঙ্কর ও তপ্ত বালুকা বর্জ্জিত সমান ও শুচিদেশে; উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে; প্রতিবাদীর অনভিমুখে; মন্দ মন্দ বায়ুসেবিত বিরল স্থানে পরমাত্মাতে চিত্তসমাধান করিবেক। শ্বে ১০। ব্রাহ্মধর্ম্ম ৭। ১৫॥

২১ এই শ্রুতিগুলি, প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি এবং ব্রহ্মচিন্তন সংযুক্ত ব্রহ্মোপাসনার প্রতিপাদক। প্রথম শ্রুতিটীতে "ব্রহ্মোড়ুপ" শব্দ আছে। শঙ্কর কহেন তাহার অর্থ প্রণব। "ব্রহ্মশব্দং প্রণবং"। ইহা প্রণবরূপ অবলম্বন। প্রণব যে ব্রহ্মোপাসনার অবলম্বন, তাহা সর্ব্বোপনিষৎ-সিদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে উক্ত প্রথম ও তৃতীয় শ্রুতি দৃষ্ট হয়। ফলে এই সমস্ত উপদেশে যোগরূপ ক্রিয়া-লক্ষণ বিদ্যমান। গুরুর উপদেশ ব্যতীত তাহার অনুষ্ঠান সহজ নহে।

২২। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মধ্যান বা ব্রহ্মচিন্তনরূপ যোগের মন-প্রাণাদি যে সকল অবলম্বনের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা মনোবৃত্তির ব্যাপাররূপ ক্রিয়াধর্ম্মী, এবং সোপাধিক ও পরোক্ষ উপাসনার উপায় মাত্র হইলেও, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, সাধক, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধিক এবং অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, ঐরূপ উপাসনা ও ধ্যানাদি ক্রিয়া করিবেন। তাহাতে ক্রমে নিরঞ্জন ব্রহ্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিবেন। নতুবা অন্ধবিশ্বাসে ঐরূপ ক্রিয়া করিবেন, এমন উদ্দেশ্য নহে। ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া, উপাধি ও অজ্ঞানের অতিক্রান্ত এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রকাশক। কি জানি সাধক যদি মনের ধর্ম্মকেই ব্রহ্মরূপে মনে করেন, কি জানি যদি প্রাণাদি বায়ুগণের বৃত্তিকেই ব্রহ্মভাবে গ্রহণ করেন, যদি প্রণবকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করেন, যদি গায়ত্রীকেই ব্রহ্মপদে অভিষিক্ত করেন, যদি আকাশকেই ব্রহ্মের প্রতিমা মনে করেন, যদি অগ্নি, বৈশ্বানর, সূর্য্য, চন্দ্র, প্রভৃতি অবলম্বনে ব্রহ্মধ্যান করিতে গিয়া সেই অবলম্বন গুলিকেই ব্রহ্মপদস্থ ভাবিয়া, তাহাতেই সোপাধিক ও অজ্ঞভাবে চিরবদ্ধ হইয়া থাকেন এই সম্ভাবিত ভ্রমগুলি নিবারণের নিমিত্তে উপনিষদে, ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে, এবং আচার্য্যদিগের ভাষ্য, টীকা ও গ্রন্থসমূহে পদে পদে প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। তুমি বলিতে পার, যদি অবলম্বন গুলিতে তোমার ব্রহ্মবুদ্ধিরূপ বিশ্বাস থাকে, তবে তুমি তাহাতেই তরিয়া যাইবে; কিন্তু তোমার বুঝা উচিত যে, ব্রহ্মোপাসনা, বিধিবিহিত মন্ত্রসমবায়ী দেবার্চ্চনা নহে যে, মন্ত্র ও বিশ্বাসের বলে অভিলষিত আলৌকিক ফল লাভ করিবে। ইহার উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্যা। এ সমস্তই জ্ঞান মাত্র এবং বিশ্বাসের অতিক্রান্ত। বিশ্বাস ও জ্ঞানে প্রভেদ এই যে, বিশ্বাস অজ্ঞাত-শক্তি ও অলৌকিক ফল-নিষ্ঠ; কিন্তু জ্ঞান প্রত্যক্ষ। শাস্ত্রে, অবলম্বন সমূহের যে তাৎপর্য্য বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

(১) মন। "নপ্রতীকে নহিসঃ" (ব্র স্থ ৪।১।৪) মন বা আদিত্যাদিকে ব্রহ্মের প্রতীক (প্রতিমা) জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদে তৎসমস্তের উপাসনা করিবেক কি না? কেননা বেদে আছে "মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত"। মনঃ ব্রহ্ম, তাহার উপাসনা করিবেক? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ব্রহ্ম মন হইতে স্বতন্ত্র এবং মহান্। অতএব মন আদির অবলম্বনে ব্রহ্মেরই উপাসনা অভিপ্রেত। নতুবা মন আদির উপাসনা নাই।

(২) প্রাণ। "প্রাণস্তথানুগমাৎ" (ঐ ১।১।২৮) প্রাণবায়ু বা জীব (জীবাত্মা) উপাস্য নহে। এখানে প্রাণশব্দে বায়ু নহে; কিন্তু ব্রহ্ম। অতএব যেখানে যেখানে প্রাণের উপাসনা অথবা প্রাণাবলম্বিত উপাসনার উপদেশ আছে, সেখানে ব্রহ্মোপসনাই তাৎপর্য্য।

(৩) প্রণব। প্রণবাবলম্বিত ব্রহ্মোপাসনার সহিত ছান্দোগ্যোপনিষৎ উপক্রান্ত হইয়াছে। যথা—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত"। এই উদ্গীথরূপী ওঁকার অক্ষরের উপাসনা করিবেক। "বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ" (যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)। এই অক্ষর পরমাত্মার বাচক, এবং পরমাত্মা ইহার বাচ্য। কিন্তু বাচকরূপ এই অক্ষরটী যে, বাচ্যস্বরূপ পরমাত্মার সহ এক, উদ্দেশ্য তাহা নহে। উক্ত উপনিষদে এ সম্বন্ধে এই বিশেষ উপদেশ আছে যে, "তেনোভৌ কুরুতে যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানাতু বিদ্যাচাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি" (১।১।১০) দুই প্রকার লোকে এই উদ্গীথরূপী প্রণব অক্ষর দ্বারা ক্রিয়া করে। কেহ অর্থ বুঝিয়া (ধ্যান, ধারণা, উপাসনাদি দ্বারা) ব্রহ্মচিন্তা করে, কেহ বা এই প্রণব মন্ত্র-উচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞদেবার্চনাদির অনুষ্ঠান করে, কিন্তু উহার অর্থ জানে না। কিন্তু অর্থ বোধই বিদ্যা, আর অর্থানবগতিই অবিদ্যা। যদি অর্থজ্ঞানের সহিত উপাসনাদি অনুষ্ঠিত না হয়, তবে কেবল মাত্র ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানফল লাভ হয় না। কেননা বিদ্যা আর অবিদ্যা পরস্পর ভিন্ন। সুতরাং সমফলজনক নহে। কেবল সেই ক্রিয়া যাহা বিদ্যাদ্বারা, ক্রিয়ার স্বরূপজ্ঞান দ্বারা, শ্রদ্ধাসহকারে, উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানে লক্ষ্যস্থির রাখিয়া কৃত হয় তাহাই বীর্য্যবত্তর। পরমারাধ্য ব্যাসদেব, ব্রহ্মসূত্রে (৪।১।৮) এই শ্রুতির বিচার করিয়াছেন, যথা—"যদেব বিদ্যয়েতি হি।" যে উপাসনাকর্ম্ম আত্মবিদ্যাতে যুক্ত, তাহাই জ্ঞানসাধনে বীর্য্যবত্তর। অতএব উদ্গীথাবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনাই উদ্দিষ্ট।†

(৪) গায়ত্রী। ছান্দোগ্য (৩।১২।৬) "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" গায়ত্রীকে ব্রহ্মস্বরূপ কহিয়া তদপেক্ষা ব্রহ্মকে মহান্ কহিয়াছেন। ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে (১।১।২৫) কহেন "ছন্দোভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণ নিগদাত্তথা হিদর্শনং" ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রীই কেবল উপাস্য নহেন। যে হেতু গায়ত্রীতে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান লোকের চিত্ত অর্পণের জন্য কথিত হইয়াছে। এইরূপ অর্থ বেদে (উপরি-উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়)। অতএব

† সামবেদের কোন বিশেষ অংশে প্রণব মন্ত্রের গান উদ্গীথ-সঙ্গীত নামে বিখ্যাত ছিল। তাহা সোমযাগে গীত হইত। তদনুসারে এস্থানে প্রণব অক্ষরের নাম উদ্গীথ শব্দে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত যাগে ইহা কর্ম্মাঙ্গ অবয়বরূপে ব্যবহৃত হইলেও এখানে ইহা পরমাত্মার উপাসনার অবলম্বন স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। "স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টম যদুদ্গীথঃ" (ছা ১।১।৩) এই উদ্গীথরূপী ওঁকার সকল রসের রসতম। ইহা পরমাত্মার বোধক। ইহা পরমাত্ম চিন্তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবলম্বন।

গায়ত্রী ধ্যান দ্বারা সাধক পরম পুরুষ ব্রহ্মের যে মহিমা চিন্তা করেন তদপেক্ষা সেই পুরুষই মহান্।

(৫) আকাশ। "আকাশোহর্থান্তরত্বাদি ব্যপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্রে ১।৩।৪১)। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে (৮। ১৪। ১) 'আকাশো বৈ নাম রূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি"। আকাশ, নাম ও রূপের নির্ব্বাহক। সেই নাম ও রূপ যাঁহার আশ্রয়ে স্থিত, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা। শঙ্করাচার্য্য লেখেন যে, ব্রহ্মকে উপাসনা বা চিন্তা করিবার অবলম্বন নিমিত্তে শ্রুতিতে তিনিই আকাশ নামে সংজ্ঞিত হইয়াছেন। কেন না তিনি আকাশের ন্যায় নিরাকার এবং সূক্ষ্ম। ফলে তিনি নাম, রূপ এবং ভূতাকাশ হইতে ভিন্ন। তাঁহার নামও নাই, রূপও নাই। কিন্তু তাঁহার মায়া-শক্তিতে নাম ও রূপ সর্ব্ব পদার্থের বীজরূপে লগ্ন থাকায়, তিনিই নাম-রূপের প্রকাশক এবং নির্ব্বাহক। "নির্ব্বাহক" শব্দের অর্থ নিয়ন্তা। †

(৬) অঙ্গ। "অঙ্গেষু যথাশ্রয় ভাবঃ" (ব্রহ্মসূত্রে ৩। ৩। ৬) অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি বিরাট পুরুষের অঙ্গ স্বরূপ। এই সমস্ত অঙ্গ পদার্থের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাসনা উদ্দিষ্ট নহে। কিন্তু সে গুলির অবলম্বনে অঙ্গী-পুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনাই অভিপ্রেত।

(৭) জ্যোতিঃ। "জ্যোতির্দর্শনাৎ" (ঐ ১। ৩। ৪০) যেখানে জ্যোতিকে উপাস্য করিয়া কহিয়াছেন, সেখানে বাহ্য জ্যোতির উপাসনা অভিপ্রেত নহে। ব্রহ্মোপাসনাই উদ্দেশ্য। সূর্য্যজ্যোতিঃ অবলম্বন মাত্র।

(৮) অধিদৈবত। "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" (ঐ ১। ১। ২০) যিনি সূর্য্যান্তর্বর্ত্তী অধিদৈবত পুরুষ, তিনি ব্রহ্ম। তিনি সূর্য্য নহেন। সূর্য্য মণ্ডলাবলম্বনে সেই ব্রহ্মেরই ধ্যান কথিত হইয়াছে। "য এষোহন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ ইতি" (ছান্দোগ্যে ১। ৬। ৬।) এই আদিত্যের অন্তরে যে হিরণ্ময়, হিরণ্য শ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ পুরুষ দৃষ্ট হয়েন, তিনি ব্রহ্ম। এস্থানে "হিরণ্য" কেশাদি শব্দ উজ্জ্বল বোধক। নতুবা সুবর্ণ-ধাতু বোধক নহে। ইহা অধিদৈবত উপাসনা।

(৯) বৈশ্বানর। (ব্রহ্মসূত্রে ১। ২। ২৪) বেদে বৈশ্বানর অগ্নির উপাসনার বিধি আছে। কিন্তু তাহা সামান্য অগ্নি নহে। কেননা বৈশ্বানর পরমেশ্বর। †

---

† ছান্দোগ্যোপনিষদে এই ব্রহ্ম আকাশ মহান্ উদ্গীথরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যথা। (১। ৯। ২) স এষ পরোবরীয়ানুদ্গীথঃ স এষোহনন্তঃ পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকাঞ্জয়তি য এতদেবং বিদ্বান পরোবরীয়াং সমুদ্গীথমুপাস্তে"। ইনি (এই ব্রহ্মরূপ পরম আকাশ) মহোচ্চ এবং উৎকৃষ্ট উদ্গীথ স্বরূপ। ইনি অনন্ত। যিনি ইহা জানেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্যাতে বিদ্বান। ইহা জানিয়া যিনি এই মহোচ্চ ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মরূপ মহান্ উদ্গীথের উপাসনা করেন, তিনি ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ, স্বর্গলোক জয় করেন।

† "বৈশ্বানর" শব্দের ব্যবহারিক অর্থ "জঠরাগ্নি"। কিন্তু জঠরাগ্নি উপাস্য নহে।

২৩। অতএব সর্ব্বপ্রকার অবলম্বন বিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মচিন্তা, এবং ব্রহ্মধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি যোগের চরমোদ্দেশ্য নিরঞ্জন নিরাময় জ্ঞানস্বরূপ অদ্বয়ব্রহ্ম। অনেক শ্রুতি, যেমন সুস্পষ্ট নির্গুণ নিরূপাধিক ব্রহ্মবোধক, সেইরূপ অনেক শ্রুতি, সোপাধিক সগুণ অস্পষ্ট ব্রহ্মবাচক এবং ধ্যান উপাসনাদি ক্রিয়াপ্রতিপাদক। কিন্তু সমুদয়ের অন্তিম তাৎপর্য্য নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্যা। তাহাই পরমারাধ্য ব্যাসদেব কর্ত্তৃক সার্দ্ধ-পঞ্চশত বেদান্তাখ্য ব্রহ্মসূত্রে স্থাপিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে

সর্ব্ব প্রাণীর জঠরাগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যিনি ভুক্তান্ন পরিপাকে প্রাণ অপান প্রভৃতি শরীরস্থ বায়ুগণের (vital airs) সহিত উক্ত অগ্নিকে নিয়মিত করেন, তিনি ব্রহ্ম। "বৈশ্বানরঃ সাধারণ শব্দবিশেষাৎ" (বেদান্তসূত্র ১।২।২৪) যদিও সাধারণতঃ "বৈশ্বানর" শব্দ জঠরাগ্নিকে এবং সামান্য অগ্নিকে বুঝায়, কিন্তু উপাসনার নিমিত্তে পরমাত্মাকেই বৈশ্বানর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। ছান্দোগ্যে বৈশ্বানর বিদ্যাতে ৫।১১।১) বৈশ্বানর আত্মার উপাসনার বিধি দিয়াছেন। "আত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্ত ইতি" (ঐ অধিকরণমালা) বৈশ্বানররূপ আত্মার উপাসনা করিবেক। প্রশ্নোপনিষদে প্রজাপতির মিথুনরূপ উক্ত হইয়াছে। একটী স্ত্রী আকার, তাহার এই কয়েকটী নাম, যথা রয়ি (পৃথিবী) সোম (চন্দ্র) এবং অন্ন। দ্বিতীয়টী পুরুষ-আকার এবং তাহার নাম প্রাণ, অগ্নি, আদিত্য ও অত্তা (ভোক্তা) এই উভয় যুগলের মধ্যে যিনি প্রাণ, অগ্নি, ও আদিত্য, তিনিই "বৈশ্বানর"। পরমাত্মা সর্ব্বজগতে প্রবিষ্ট। প্রাণিগণের জঠরস্থ যে পরিপাক শক্তি, তাহা অগ্নি ও আদিত্যের প্রভাব এবং প্রাণ অপানাদি সমাযুক্ত বৈশ্বানরাখ্য অগ্নি। সেই অগ্নিই সমগ্র ভুক্তান্নের "অত্তা"। "অত্তা" শব্দে ভোক্তা-জীর্ণকারী। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সেই আধ্যাত্মিক অগ্নি আদিত্য ও প্রাণাপান বায়ু প্রবাহিত অন্ন-পরিপাক যন্ত্রে যিনি যন্ত্রীরূপে আরূঢ়, তিনি পরমাত্মা; অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই 'বৈশ্বানর'। বেদে বৈশ্বানর আত্মার যে উপাসনার বিধি দৃষ্ট হয়, সে তাঁহারই উপাসনা। সামান্য জঠরানল ও প্রাণাপানাদি বায়ুর উপাসনা নহে। অন্ন পরিপাক যন্ত্রস্থ যে অগ্নি ও আদিত্যরূপধাতু তাহার মিথুনাত্মক প্রজাপতির পুরুষাকৃতি তেজোময়রূপ। অতঃপর অন্ন ও চন্দ্ররূপ স্ত্রী আকৃতি যে ধাতু, তাহাই ভোগ্যপদার্থরূপী। যাঁহারা জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মবান, তাঁহারা আদিত্যোপলক্ষিত দেবযান স্বর্গে এবং যাঁহারা প্রজাকামী তাঁহারা চন্দ্রোপলক্ষিত পিতৃযান স্বর্গে গতিলাভ করেন। (প্রশ্নোপনিষৎ ১ প্রশ্ন। গীতাতে ভগবান কহিয়াছেন (১৫।১৪) "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং। আমি বৈশ্বানররূপী হইয়া প্রাণি সকলের দেহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জঠরাগ্নির উদ্দীপক প্রাণাপান বায়ু সমাযুক্ত হইয়া প্রাণিগণের ভুক্ত চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি। মাণ্ডুক্যোপনিষদে (৩) এই বৈশ্বানর আত্মাকে "স্থূলভুক্" বিশেষণ দিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি প্রাণিগণের স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া ভুক্তান্ন জীর্ণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মাই বৈশ্বানর আত্মা। বৈশ্বানরাত্মার এই বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাৎপর্য্যতঃ পরমাত্মজ্ঞান। ব্রহ্মবিৎ পুরুষ এই জ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎ মোক্ষ লাভ করেন। কিন্তু বেদবিহিত অগ্নিহোত্র যাগে অগ্নির পূজা হইয়া থাকে। তাহাতে সমস্ত দেবতার উদ্দিষ্ট হোম অগ্নি-মুখে আহবনীয়। সামান্যতঃ যজমান ও পুরোহিতগণ সেই অগ্নিকে অগ্নি-দেবতা এবং প্রাণ-অপানাদিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা মনে করেন।

সাধককে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যাহাতে জ্ঞানালোকসমুজ্জ্বলিত ব্রহ্ম-বিদ্যাকে অলৌকিক ফলজনক ক্রিয়াঙ্গরূপে গ্রহণ না করেন। অধিকাংশ লোকেই অলৌকিক ক্রিয়া, ক্রিয়ার অলৌকিক ফল, এবং ক্রিয়ার অলৌকিকগুরু ও অলৌকিক অনুষ্ঠাতা এবং তাঁহাদের কৃত অপ্রত্যক্ষ ফলজনক ধ্যান, ধারণা, যোগানুষ্ঠানাদিতে যত মোহিত হন, বিশুদ্ধ-ব্রহ্মবিদ্যা-সমুৎপন্ন অদ্বয় ও নিরঞ্জন জ্ঞানালোক তত পসন্দ করেন না।

২৪। ব্রহ্মসূত্রসম্মত শ্রুত্যর্থই প্রত্যক্ষ আত্মদর্শনের জ্ঞান-নেত্র। সে দর্শনলাভে দেহাদি অনাত্মা পদার্থে অজ্ঞানকৃত অনাদি ভ্রম বিগত হয়। যেরূপ অনুশীলন দ্বারা সে সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়, তাহারই নাম ব্রহ্ম-বিচার। সে বিচারে কিছুমাত্র অপ্রত্যক্ষ, অসম্ভধর্ম, এবং সংশয় তিষ্ঠিতে পারে না। যেমন আতত নেত্রে স্বয়ম্প্রকাশ সবিতৃমণ্ডল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ উক্ত সংস্কৃত জ্ঞাননেত্রে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্ম দর্শন হয়। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন দিবসে যেমন বিধিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কালে "জবাকুসুম-সঙ্কাশং" বলিয়া

ফলে সেরূপ মনে করা ভ্রম। এই জন্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৫।২৪।১—৫) অনুশাসন করিয়াছেন, যথা—যিনি এই বৈশ্বানররূপ পরমাত্মতত্ত্ব না জানিয়া হোম করেন, তিনি ভস্মেতে হোম করেন কিন্তু যিনি তাহা জানিয়া অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির আহুতি সকল সর্ব্বভূতে ও সকল আত্মাতেই অর্পিত হয় এবং সমস্ত বিশ্বকে তৃপ্ত করে। কেননা পরমাত্মাই বিশ্বদেবতা। তিনি সেই যজ্ঞের অন্নদ্বারা আপনার ও ব্রাহ্মণগণেরই সেবা করেন না, কিন্তু চণ্ডালেরও সেবা করিয়া থাকেন। তাহাতে সেই সমস্ত অন্ন তাঁহার স্বীয় বৈশ্বানর আত্মাতেই—সুতরাং সর্ব্বভূতেই অর্পিত হয়। সেই জন্য বেদে এইরূপ উক্তি আছে। "যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসত এবং সর্ব্বাণি ভূতানি অগ্নিহোত্র মুপাসত ইতি (ঐ ৫)" যেমন গৃহস্থাশ্রমে ক্ষুধিত বালকেরা মাতাকে বেষ্টন করে, সেইরূপ সকল প্রাণী অগ্নিহোত্রকে অপেক্ষা করে। এইরূপে ছান্দোগ্যে প্রায় সকল ক্রিয়াতেই আত্মবিদ্যার অনুশাসন দৃষ্ট হয় এবং সূর্য্য, অগ্নি, সোম, প্রাণ, অন্ন, সমস্তই ব্রহ্মরূপ উপাস্য দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি চাক্রায়ণ কোন রাজার যজ্ঞেতে বেদগানকারী ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন, যিনি এই সমস্ত বেদগণের উদ্দিষ্ট দেবতা, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তোমরা বেদগান কর, তবে তোমাদের মস্তক বিপতিত হইবে (খসিয়া পড়িবে)। এই কথাতে উক্ত ব্রাহ্মণেরা গান স্থগিত করিলেন। পশ্চাৎ চাক্রায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই উদ্দিষ্টদেবতা কে? তাহাতে চাক্রায়ণ একে একে উত্তর করিলেন, "প্রাণ", "আদিত্য" এবং "অন্ন"। অর্থাৎ তত্তৎ পদার্থে উপস্থিত ব্রহ্ম। (ছাঃ ১।১০) ফলে শঙ্করাচার্য্য কহেন—(এ ১।১০।৯) যে সকল পুরোহিতের যজ্ঞীয় দেবতার তত্ত্বজ্ঞান বা মন্ত্রার্থ বোধ নাই, কেবল মাত্র ক্রিয়ার পদ্ধতি জানা আছে, তাঁহারাও চিরকাল ক্রিয়া করিয়া আসিতেছেন এবং তাহা বেদও অনুমোদন করেন। অতএব শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে, যে সকল পুরোহিত কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি জানেন, তাঁহাদের ক্রিয়া করাইবার অধিকার আছে। তবে ফলের তারতম্য উক্ত হইয়াছে। "ভস্মে হোম" ও "মস্তকপাত" কথাগুলি নিন্দার্থবাক্যমাত্র।

বিনির্ম্মিত সূর্য্যদেবকে প্রণাম করা যায়, প্রকৃত সূর্য্যের অপেক্ষা করা যায় না ; ব্রহ্ম-দর্শন সেরূপ "বিধিতন্ত্র" বা "মন্ত্রতন্ত্র" নহে ; কিন্তু বর্ত্তমান সূর্য্য দর্শনবৎ সম্পূর্ণ "বস্তুতন্ত্র।" ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মনিরপেক্ষ হইতে পারে না, এবং কোনরূপ ধ্যান, সমাধি ও উপাসনায় তাঁহার পরিবর্ত্তে কোন অলৌকিক জ্যোতি, আকাশ, হিরণ্যবর্ণমূর্ত্তি, মায়াশক্তি প্রভৃতি, ব্রহ্মরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ আত্মস্বরূপে গ্রহণই সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন।

২৫। সমগ্র উপনিষদে ও ব্রহ্মসূত্রে এই প্রত্যক্ষ দর্শন প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাহাতে সাধকেরা অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ না করেন এবং যোগ,যাগ ধ্যান, সমাধি আদি ক্রিয়ালক্ষণ ব্রহ্মানুষ্ঠানেও, শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ন্যায়সঙ্গত ব্রহ্মজ্ঞানে আদর্শ স্থির রাখিতে পারেন, তাহার বিচার ও সিদ্ধান্ত ঐ সমস্ত মহা শাস্ত্রের সর্ব্বত্রে দৃষ্ট হয়। তাহাই ব্রহ্মবিদ্যার উজ্জ্বল নিদর্শন। জ্ঞানপথারূঢ় ধীরেরা সেই সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধ বিচারের অসকৃৎ অনুশীলন করতঃ দেহাদি পদার্থে আত্মভ্রম পরিত্যাগ এবং পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ আত্মত্বে গ্রহণ করেন।+ এইরূপ সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান-সাধনে অসমর্থ ব্যক্তি-গণের পক্ষে ঐ সমস্ত ক্রিয়াপদ্ধতি ব্রহ্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা। কিন্তু আত্মজ্ঞানই তাহার উদ্দেশ্য।

২৬। ব্রহ্মবিচার ও ধ্যানাদি সম্বন্ধে পঞ্চদশী শাস্ত্রে অনেক সিদ্ধান্ত আছে। তাহার কতিপয় বাক্য এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ সাঙ্গ করিব।

(১) ব্রহ্ম যদ্যপি শাস্ত্রেষু প্রত্যক্ত্বেনৈব বর্ণিতং। মহাবাক্যৈস্তথাপ্যেতৎ দুর্ব্বোধমবিচারিণঃ। (ধ্যাঃ দী ২০) শাস্ত্রেতে মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মারূপে বর্ণিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বিচারাক্ষম ব্যক্তি দিগের পক্ষে তাহা দুর্ব্বোধ্য। কেন দুর্ব্বোধ্য ? তাহার উত্তর দিতেছেন।

(২) দেহাদ্যাত্মত্ব বিভ্রান্তৌ জাগ্রত্যাং ন হঠাৎ পুমান্। ব্রহ্মাত্মত্বেন বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে মন্দধীত্বতঃ। (ঐ ২১) সামান্য লোকের বুদ্ধিতে দেহাদি জড় বস্তুতে আত্মভ্রম জাগ্রত থাকায় মন্দবুদ্ধি প্রযুক্ত পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ আত্মারূপে গ্রহণে তাহাদের সহসা ক্ষমতা হয় না। কেন না বিচার ব্যতিরেকে সে ক্ষমতা জন্মে না।

(৩) বিচারাজ্জায়তে বোধোহনিচ্ছা যং ন নিবর্ত্তয়েৎ। বোধোৎপত্তি মাত্রাৎ সংসারে দহত্যখিল সত্যতাং (ঐ ১৫।) বিচার হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় (বস্তুতত্ব বিচারা-বোধো জায়তে।) তাহা একবার দৃঢ়তর হইলে অনিচ্ছাতেও আর নিবারিত হইবার নহে। তাহা উৎপত্তি মাত্রে, সংসারে অখিল মিথ্যাতে যে সত্যজ্ঞান, তাহা দহন করে।

+ যাঁহাদের দেহাদি পদার্থে আত্মভ্রম পরিত্যক্ত হইয়া পরমাত্মা সাক্ষাৎ আত্মত্বে গৃহীত হয়েন, তাঁহাদের ঔপাধিক অবস্থার উপাস্য শিব, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বর ও ঈশ্বরীগণ তখন রূপ-নামবিহীন নিরঞ্জন আত্মস্বরূপে প্রকাশ পায়েন। যেহেতু "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বা" (মনু ১২।১১৯) সমস্ত দেবতা আত্মাই।

(৪) অত্যন্ত বুদ্ধিমান্দ্যাদ্বা সামগ্র্যা-ভাপ্যসম্ভবাৎ। যো বিচারং ন লভতে ব্রহ্মো-পাসীত সোঽনিশং। (ঐ ৫৪।) কিন্তু বুদ্ধি-মান্দ্য প্রযুক্তই হউক বা চিত্তশুদ্ধির অভাব বশতই হউক, যে ব্যক্তি সেই বিচারে অসমর্থ হয়, তাহার পরোক্ষরূপে নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা করা অতি কর্ত্তব্য।

(৫) উপাসকস্তু সততং ধ্যায়ন্নেব বসেৎ যতঃ। ধ্যানেনৈব কৃতং তস্য ব্রহ্মত্বং বিষ্ণু-ত্বাদিবৎ॥ (ঐ ১৩।) উপাসক ব্যক্তি সর্ব্বদাই ধ্যানেতে তৎপর হইবেন। যে হেতু বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির ন্যায় ধ্যান দ্বারাই তাঁহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

(৬) ধ্যানোপাদনকং যত্তদ্ধ্যানাভাবে বিলীয়তে। বাস্তবী ব্রহ্মতা নৈব জ্ঞানাভাবে বিলীয়তে॥ (১১৭) ধ্যান যাহার কারণ, ধ্যানাভাবে সুতরাং তাহার (ধ্যানকৃত বা উপাস্য ব্রহ্মতত্ত্বের) লয় হইতে পারে। অতএব উপাসকের সর্ব্বদাই ধ্যান করা আবশ্যক। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ বস্তুস্বরূপ যে ব্রহ্মসদ্ভাব, তাহা জ্ঞানালোচনার অভাব হইলেও বিলীন হইবার নহে।

(৭) ইতিপূর্ব্বে (এই প্রবন্ধের ১১ক্রমে) ধ্যানদীপের ১২১ ও ১২২ শ্লোক উদ্ধৃত করা গিয়াছে। তাহাতে আছে, অশাস্ত্র-আচার অপেক্ষা বিধিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সগুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা নিগুর্ণোপাসনা শ্রেষ্ঠ। নিগুর্ণোপাসনাই ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হয়। নিম্নে "ক্রমশঃ" শব্দের তাৎপর্য্য পাওয়া যাইবে।

(৮) নিগুর্ণোপাসনং পক্কং সমাধিঃ-স্যাৎ শনৈর্ভবঃ। যঃ সমাধির্নিরোধাখ্যঃ সোঽনায়াসেন লভ্যতে॥ (১২৬)॥ নিগুর্ণোপাসনাই পরিপক্ক হইয়া সমাধিরূপে পরিণত হয়, অতএব তাহাতে অনায়াসে নিরোধাখ্য নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়।

(৯) নিরোধলাভে পুংসোঽন্তরসঙ্গং-বস্তু শিষ্যতে। পুনঃ পুনর্ব্বাসিতেঽস্মিন্ বাক্যাৎ জায়েত তত্ত্বধীঃ॥ (১২৭) নির্ব্বিকল্প সমাধি সুসাধিত হইলে, অন্তঃকরণে কেবল অসঙ্গ চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে, পশ্চাৎ পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা মহাবাক্য প্রতি-পাদিত তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হয়।

(১০) এই তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব একই কথা। নিগুর্ণ উপাসনা দ্বারা নির্ব্বিকল্প সমাধি এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে তত্ত্ব-জ্ঞান (আত্মতত্ত্ব) লাভ হয়। অতএব উক্ত হইয়াছে "নিগুর্ণোপাসনাই ক্রমশঃ তত্ত্ব-জ্ঞান (বা আত্মতত্ত্ববোধ) রূপে পরিণত হয়। কিন্তু শুদ্ধ নিগুর্ণ উপাসনা বা তদুত্থিত নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা চরম ফল (আত্মতত্ত্ব) লাভ হয় না, যদি আত্মতত্ত্ব-বিচারের প্রতি লক্ষ্য না থাকে। অথবা উপাসনা, যোগ, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি উপায়গুলি (means) না ধরিয়াও, বিশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষ একাএক (directly) আত্মতত্ত্বের বিচার (ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা) করিতে পারেন; তাহাতেও তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইবে। যথা—

(১১) উপাসকানামপ্যেবং বিচার ত্যাগতো যদি। বাঢ়ং তস্মাদ্বিচারস্যাসম্ভবে যোগ ঈরিত॥ (১৩১)॥ আত্মতত্ত্ব-বিচার পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়াম, সমাধি প্রভৃতি সগুণ নিগুর্ণ উপাসনাতেই রত থাকেন, তাঁহাদের

পক্ষে "পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ীতি ন্যায় আপতেৎ" (১৩০) হস্তস্থ গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া হস্ত লেহন করার দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয়। তথাপি উপাসনার ব্যবস্থা কেন? ইহার উত্তর এই যে, তাহা অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্তে করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব-বিচারের অসম্ভাবনা স্থলে উপাসনাদি উপায় (means) ঈরিত হইয়াছে। কিন্তু আত্মতত্ত্বই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ।

(১২) তৎসামর্থ্যাজ্জায়তেধীর্মূলাবিদ্যা-নিবর্ত্তিকা (১৪০)॥ যদিও নির্গুণোপাসনাও মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, তথাপি তদ্দ্বারা তাহার শক্তি হইতে অবিদ্যা নিবর্ত্তিকা ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হয়।

(১৩) উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ। নান্যঃ পন্থা ইতি হ্যেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুধ্যতে॥ (১৪২) উপাসনার সামর্থ্য বশতঃ মুক্তির কারণ উৎপন্ন হয়, অতএব জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তির আর উপায়ান্তর নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায় ইতি শ্রুতিঃ" এই শ্রুতির সহ উপাসনার আর কোন বিরোধ রহিল না। কেন না জ্ঞানই উপাসনার উদ্দেশ্য ও ফল এবং জ্ঞানেই মুক্তি।

(১৪) বিচারাক্ষম আত্মানমুপাসীতেতি সন্ততং॥ (১৫১) আত্মতত্ত্ব বিচারেতে অক্ষম ব্যক্তি সতত আত্মার উপাসনা (ব্রহ্মোপাসনা) করিবেক, আত্মধ্যান করিবেক এবং আত্মাতে সমাধিস্থ হইবেক। কিন্তু বিচারক্ষম হইলে সর্ব্বদা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিবেক। তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্গুণ ও অপরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনা।

২৭। সমস্তের তাৎপর্য্য এই যে, আত্ম-জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। তাহা সাক্ষাৎ [illegible] জ্ঞান। তাহাই বেদবেদান্ত প্রতিপাদ্য মহামোক্ষ। ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন ও আলোচনাও যাহা, আত্মতত্ত্বের বিচারও তাহা। তাহাতে যাঁহাদের রুচি নাই, বুদ্ধি নাই, পূর্ব্বসুকৃতি নাই; অথচ ক্রিয়া-ধর্ম্মী মনোবৃত্তির ব্যাপার দ্বারা যাঁহারা পরোক্ষে ও সোপাধিক উপায়ে গৌণ ও অলৌকিক ফলস্বরূপে ব্রহ্মলাভ করিতে ইচ্ছুক, শাস্ত্রে তাঁহাদেরই নিমিত্তে আত্ম-তত্ত্বের সোপান স্বরূপ নানাবিধ অবলম্বন-বিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনার বিধান দিয়াছেন। যোগ, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির নিরোধক ক্রিয়া অল্প বিস্তর তাহারই অঙ্গ। এই ব্রহ্মোপাসনা যখন নির্গুণ উপাসনায় বা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পরিণত হয়, তখন ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। প্রতিবন্ধক অভাবে তাহা ঐহিকেই সিদ্ধ হয়; নচেৎ ক্রমে জন্মান্তরে। কিন্তু যাহা আত্মতত্ত্ব, তাহা ক্রমরহিত, পারম্পর্য্যরহিত, সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত, প্রতিবন্ধশূন্য সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান মাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

কর্ম্ম ও ফলিত জ্যোতিষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ফলিত জ্যোতিষ বিজ্ঞান কি না, তাহা সময়ান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। "বরাহ মিহির" বলেন যে, এই শাস্ত্রে

"উপায়" ও "উপেয়" লক্ষণ সম্বন্ধ থাকায় ইহা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। "উপায়স্তদং শাস্ত্রম্ উপেয় যদ্বিজ্ঞানং।" অর্থাৎ এই শাস্ত্র উপায় ও তাহার বিজ্ঞান উপেয় স্বরূপ। এই শাস্ত্রে হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশ ভাগ, ত্রিংশৎ ভাগ, গ্রহ-রাশির বলাবল, অরিষ্ট, আয়ু, দশা, অন্তর্দশা, যোগাদি যথাযথ বর্ণিত আছে, তাহাতে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে কর্ম্ম-বিপাক জন্য ফলাফল জানিতে পারিয়া ইহলোক ও পরলোকে যে গতি ও সিদ্ধি লাভ হইবে, তাহা জানিতে পারা যায়, তজ্জন্য এই শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা।

পূর্ব্বে যে সকল নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে ২৭টী নক্ষত্রের সহিত আমাদের সম্বন্ধ। যথ ;—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী উত্তর ফল্গুনী হস্ত, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ; উত্তর ভাদ্রপদ ও রেবতী।

এই ২৭টী নক্ষত্র যে সংখ্যায় ২৭টী, তাহা নহে। তাহারা প্রত্যেকে এক, দুই বা ততোধিক নক্ষত্র সংখ্যায় গঠিত। সুতরাং নক্ষত্রের আকার বা নক্ষত্রগণের সমাবেশে তাহাদের যেরূপ আকার পরিলক্ষিত হইয়াছে, তদনুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে।

অশ্বিনী তিনটী নক্ষত্রের সংযোগে উৎপন্ন; তাহার আকার অশ্বের মুখের ন্যায়। ভরণী তিনটী নক্ষত্রে, ইহার আকার ত্রিকোণ। কৃত্তিকা ৭টী নক্ষত্রে সাধারণতঃ "সাত ভাই চম্পা" নামে বিখ্যাত। রোহিণী ৫টী ও মৃগশিরার ৩টী নক্ষত্র। আর্দ্রা একটী নক্ষত্র, ইহা অতি উজ্জ্বল ও প্রবালবৎ। পুনর্ব্বসু পাঁচটীতে এবং ধনুকাকার। পুষ্যা একটী চক্রাকার। অশ্লেষা কুকুর-পুচ্ছবৎ এবং পাঁচটী নক্ষত্র বিশিষ্ট। মঘায় ৫টী এবং হলের আকার। পূর্ব্ব ও উত্তর ফল্গুনীতে দুইটী করিয়া নক্ষত্র এবং পূর্ব্বোক্তের আকার খট্টা এবং উত্তরোক্তের আকার শস্য-গুচ্ছবৎ। হস্তার আকার হস্তের ন্যায় এবং ৫টী নক্ষত্র বিশিষ্ট। চিত্রা একটী নক্ষত্র—দেখিতে মুক্তার মত। স্বাতীও একটী নক্ষত্র—প্রবালাকার। বিশাখায় ৫টী, তোরণাকার। অনুরাধায় ৭টী, সর্পাকৃতি। জ্যেষ্ঠায় তিনটী, কুণ্ডলাকার। মূলায় ৯টী, শয্যাকার। পূর্ব্বাষাঢ়ায় ৪টী চতুষ্কোণ; উত্তরাষাঢ়ায় ৪টী শয্যাকার, শ্রবণায় তিনটী শরের ন্যায়। ধনিষ্ঠায় ৫টী মৃদঙ্গাকার। শতভিষায় একশতটী মণ্ডলাকার। পূর্ব্ব ও উত্তর ভাদ্রপদে ২৮টী—ঘণ্টাকার। রেবতীতে ৩২টী নক্ষত্র ও আকার মৎস্যের ন্যায়, জ্যোতিষ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রহাদির ন্যায় ইহাদেরও তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। যথা ;—

পৃথিবীতত্ত্বের অধিপতি—ধনিষ্ঠা, রোহিণী, জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, শ্রবণা ও উত্তরাষাঢ়া ৬টী।

জলতত্ত্বের অধিপতি—পূর্ব্বাষাঢ়া, অশ্লেষা, মূলা, আর্দ্রা, রেবতী, উঃ ভাদ্রপদ ও শতভিষা এই ৭

অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি—ভরণী, কৃত্তিকা

পুষ্যা, মঘা, পূঃ ফল্গুনী, পূঃ ভাদ্রপদ ও স্বাতী এই ৭।

বায়ুতত্ত্বের অধিপতি=বিশাখা, হস্তা, উঃ ফল্গুনী, চিত্রা, পুনর্ব্বসু, অশ্বিনী ও মৃগশিরা এই ৭।

মোট ২৭

উপরিউক্ত নক্ষত্রাদির বিভিন্ন জাতি-বিভাগ আর্য্যজ্যোতিষে উল্লেখিত হইয়াছে; তদনুসারে জাতকের জাতি নির্ব্বাচিত হয়। যথা,

১। অশ্বজাতি=অশ্বিনী ও শতভিষা।
২। হস্তী=রেবতী ও ভরনী।
৩। সর্প=রোহিণী ও মৃগশিরা।
৪। অজা=কৃত্তিকা।
৫। ব্যাঘ্র=আদ্রা, হস্তা ও স্বাতী।
৬। মেষ=পুনর্ব্বসু।
৭। ইন্দুর—পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা।
৮। মহিষ=পূর্ব্বফল্গুনী ও চিত্রা।
৯। হরিণ=বিশাখা ও অনুরাধা।
১০। কুক্কুর—জ্যেষ্ঠা।
১১। বানর—মূলা ও শ্রবণা।
১২। নকুল—পূর্ব্বাষাঢ়া।
১৩। সিংহ—ধনিষ্ঠা, পূঃ ভাদ্রপদ ও উঃ ভাদ্রপদ।

এই ২৭টী নক্ষত্র "দেবগণ" "নরগণ" ও "রাক্ষসগণ" উপাধিতে ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—

দেবগণ—অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা, স্বাতি, অনুরাধা, শ্রবণা ও রেবতী —৯

নরগণ—ভরণী, রোহিনী, আর্দ্রা, পূঃফল্গুনী, উঃফল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উঃ ভাদ্রপদ—৯

রাক্ষসগণ—কৃত্তিকা, অশ্লেষা, মঘা, চিত্রা, বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা —৯

২৭

উপরিউক্ত বিভাগানুযায়ী জন্মনক্ষত্র অনুসারে জাতকের "গণ" নিরূপিত হইয়া থাকে। যাহাদের স্বভাব ক্রুর ও খল, তাহাদের জন্ম কখন "দেবগণও" নক্ষত্রে হইতে পারে না। তাহাদের জন্ম "রাক্ষসগণ" নক্ষত্রেই সম্ভবপর এবং শরীরের তাপ, খাদ্যাদির প্রখরতা তদনুরূপ হইবে। যাঁহারা ধার্ম্মিক, কৃপালু ও সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, তাঁহাদের "দেবগণ" নক্ষত্রেই জন্ম হইবে। শরীরের স্নিগ্ধতা, আকৃতির সৌন্দর্য্য ও হৃদয়ের উচ্চতা দেবোপম হইবে। স্বভাব মৃদু ও কোমল জন্য শ্বাস প্রশ্বাসাদিও স্নিগ্ধ ও হ্রস্ব হইবে। সুতরাং রাক্ষস ও দেবগণে বিবাহ হইলে কখন "উত্তম মিলন" হইতে পারে না। অহরহঃ দেবাসুরের ন্যায় বিবাদ ও নিধন সম্ভব। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে—স্ত্রীপুরুষের "গণ" এক হইলে "উত্তম মিলন"—"দেবগণ" ও "নরগণ" "মধ্যম মিলন", দেবগণ ও রাক্ষসগণ মিলন "অধম মিলন"।

বিবাহকালে দম্পতীর কোষ্ঠী বিচারে জন্ম বর্ণের বিচার হইয়া থাকে। বর্ণ রাশি অনুসারে হইয়া থাকে। জ্যোতিষে বলে "বর্ণশ্রেষ্ঠা চ যা কন্যা বর্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্। তয়োর্ব্বিবাহে মৃত্যুঃ স্যাৎ যথাশে

মৃত্যু সংশয়ঃ॥ বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যার সহিত হীনবর্ণ পুরুষের বিবাহ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তাহার ফল ছয় মাসে মৃত্যু, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

কোন্ নক্ষত্রে কোন্ কর্ম্ম প্রশস্ত, তাহা প্রদর্শনার্থ জ্যোতিষশাস্ত্রে উপরি-উক্ত নক্ষত্রাদিকে প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছে। যথা "ঊর্দ্ধমুখ" "অধঃ-মুখ" ও "তির্য্যক্‌মুখ" নক্ষত্র। বৃক্ষ, স্তম্ভ ইত্যাদি রোপণ, নক্ষত্রাদি দর্শন ইত্যাদি যে সকল কর্ম্ম ঊর্দ্ধমুখে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা "ঊর্দ্ধমুখ" নক্ষত্রে প্রশস্ত। খননাদি কর্ম্ম যাহা অধোমুখে করিতে হয়, তাহা "অধোমুখ" নক্ষত্রে বিধেয়। আর "তির্য্যকমুখ" নক্ষত্রে বস্ত্ররয়ন, বাঁধবন্ধন ইত্যাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়।

ইহা ব্যতীত উদ্যানকর্ম্ম, ঘাতকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম, শস্ত্রাদি প্রয়োগ যজ্ঞ ইত্যাদি যাবদীয় কর্ম্ম কোন্ নক্ষত্রে প্রশস্ত, এতৎ সম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্রে সবিশেষ বর্ণিত আছে। ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে "ক্রয়র্ক্ষে বিক্রয় নেষ্টো বিক্রয়র্ক্ষে ক্রয়োপিন। পৌষ্ণাম্বুপাশ্বিনী বাতঃ শ্রবশ্চিত্রা ক্রয়শুভঃ॥" "ক্রয়" নক্ষত্রে বিক্রয় করা নিষেধ এবং "বিক্রয়" নক্ষত্রে ক্রয় করা অবিধেয়। পৌষ্ণ (রেবতী) অম্বুপ (পূর্ব্বাষাঢ়া) অশ্বিনী, বাত (স্বাতী) শ্রব (শ্রবণা) ও চিত্রানক্ষত্রকে "ক্রয়" নক্ষত্র কহে। তদ্ব্যতীত অবশিষ্টকে "বিক্রয়" নক্ষত্র কহে।

পূর্ব্বোক্ত ভাগত্রয় ব্যতীত চর, ধ্রুব, মৃদু, ক্ষিপ্র ইত্যাদি নানা ভাগে নক্ষত্রগণ বিভক্ত হইয়াছে।

চর নক্ষত্রে বিচরণাদি, অশ্ব-গজাদি আরোহণ ইত্যাদি কর্ম্ম; ধ্রুব বা স্থির নক্ষত্রে দেবস্থাপন ইত্যাদি স্থির কর্ম্ম ও বপনাদি বীজকর্ম্ম প্রশস্ত। ক্রুর বা উগ্র নক্ষত্রে ঘাতকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম, বিষ ও শস্ত্রাদি প্রয়োগ ইত্যাদি ক্রুর কর্ম্ম; মৃদু নক্ষত্রে গীত বাদ্য ও বিভূষণাদি কর্ম্ম বিধেয়। ক্ষিপ্র বা লঘু নক্ষত্রে পণ্য, রতি, শিল্প কলাদি কর্ম্ম; আর তীক্ষ্ণ বা দারুণ নক্ষত্রে ঘাত, ছেদ, অভিচারাদি উগ্রকর্ম্ম অনুষ্ঠেয়।*

অনতিকায়াদি গঠন, মুদ্রাপাতন, বস্ত্র প্রচ্ছাদন ইত্যাদি কর্ম্ম, এমন কি অনতি-কায়ের বিভেদ অনুসারে তাহার নির্ম্মাণ কর্ম্ম কোন্ নক্ষত্রে আরম্ভ করা বিধেয়,

---

১। উত্তর ত্রয় অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরাষাঢ়া ও রোহিণী,—"ধ্রুব" বা স্থির নক্ষত্র"।

২। স্বাতি, অদিতি (পুনর্ব্বসু) শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা "চল" বা "চর নক্ষত্র"।

৩। পূর্ব্বত্রয় অর্থাৎ পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্ব-ভাদ্রপদ ও পূর্ব্বাষাঢ়া ভরণী ও মঘা,—"ক্রুর" বা "উগ্র" নক্ষত্র।

৪। বিশাখা, কৃত্তিকা ও মৃগশিরা "মিশ্র" বা "সাধারণ" নক্ষত্র।

৫। হস্তা, অশ্বিনী ও পুষ্যা "ক্ষিপ্র" বা "ক্রুর" নক্ষত্র।

৬। মৃগশিরা, রেবতী, চিত্রা ও অনু-রাধা "মৃদু" বা "মৈত্র" নক্ষত্র।

৭। মূলা, জ্যেষ্ঠা, আর্দ্রা ও অশ্লেষা "তীক্ষ্ণ" বা "দারুণ" নক্ষত্র।

(মুহূর্ত্ত চিন্তামণি, নক্ষত্র প্রকরণ)

অভিজিৎ নক্ষত্রের সহিত আর্য্যজ্যোতিষে মানবজীবনের সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। (লেখক।)

তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে উল্লেখিত হইয়াছে।

আর্য্যজ্যোতিষে অভিজিৎ সহ ২৮ আটাইশ নক্ষত্রের ২৮টী অধিষ্ঠাতা দেবতা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাদের নামোল্লেখে নক্ষত্রাদিরও বোধ হইয়া থাকে। অশ্বিনীর অধিষ্ঠাতা দেবতা অশ্বিনীকুমার, ভরণীর যম, কৃত্তিকার অগ্নি, রোহিণীর ব্রহ্মা, মৃগশিরার চন্দ্র, আর্দ্রার শিব, পুনর্ব্বসুর অদিতি, পুষ্যার বৃহস্পতি, অশ্লেষার অনন্ত, মঘার পিতৃলোক, পূর্ব্বফল্গুনীর যোনি, উত্তরফল্গুনীর অর্য্যমা, হস্তার সূর্য্য, চিত্রার ত্বষ্টা, স্বাতীর বায়ু, বিশাখার শক্র, অনুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার ইন্দ্র, মূলার নৈঋতি, পূর্ব্বাষাঢ়ার তোয়, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্ব, অভিজিতের বিধি, শ্রবণার বিষ্ণু, ধনিষ্ঠার বসু, শতভিষার বরুণ, পূর্ব্বভাদ্রপদের অজৈকপাত, উত্তরভাদ্রপদের অহির্ব্রধ্ন, ও রেবতীর পূষা অধিষ্ঠাতা দেবতা।

(মুহূর্ত্ত চিন্তামণি)

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে।

বিশ্ব-প্রেম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

একণে আমাদিগের মধ্যে একপ্রাণতা ও ভ্রাতৃভাব শিক্ষা করিতে হইলে অগ্রে স্বীয় স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। অনেকে হয়ত এই স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইবেন, তাঁহারা বলিবেন স্বার্থ ব্যতীত উন্নতি অসম্ভব; বাণিজ্য, কৃষি, বিজ্ঞান জনিত সমস্ত উন্নতির এবং একতার কারণ বা মূলই স্বার্থ। ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে যে সমাজের একতা আছে, উহা কি স্বার্থশূন্য? তবে নীচ স্বার্থ না বলিয়া উচ্চ স্বার্থ বলিতে পারেন। এ কথার উত্তর এই, পুরাকালের আর্য্য মহর্ষি, রাজর্ষি ও বর্ত্তমান কালের হিমালয়বাসী আর্য্য মহাত্মগণের মহাপ্রাণতা ও বিশ্বপ্রেমিকতার সহিত পাশ্চাত্য দেশের একতার অনেক প্রভেদ আছে। আর্য্যদিগের মহাপ্রাণতা ও বিশ্বপ্রেমিকতার দ্বারা আত্মার স্থায়ী উন্নতি হয়। ক্ষুদ্র জ্ঞান, বৃহৎ জ্ঞানে ও ক্ষুদ্র আমিত্ব বৃহৎ আমিত্বে বা বিরাটত্বে পরিণত হয় এবং আধ্যাত্মিক বা অন্তর্জগৎ আলোকিত হয়। আর পাশ্চাত্য প্রদেশের একতা দ্বারা জাতির বা সমাজের ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, রাজ্য, সম্ভ্রম ও ক্ষমতা লাভ হয়, তদ্দ্বারা বাহ্য জগৎ আলোকিত হয়। আর্য্যগণের একপ্রাণতা দ্বারা বহু আমি এক আমিত্বে পরিণত হয়। উহার সহিত স্বার্থের কোন সংস্রব নাই। উহা নিঃস্বার্থ প্রেম। জীব জন্তু উদ্ভিদ্ প্রভৃতি সকলের উপর সমান স্নেহ। ঐ দেখ ঋগ্বেদে কি আছে। আর্য্য ঋষিগণ সমিধ ও পুষ্পচয়ন কালে বৃক্ষের নিকট যোড় হস্তে প্রার্থনা করিতেছেন,—"দেব এবং পিতৃকার্য্যার্থে তোমাদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ পুষ্প ও সমিধ ভিক্ষার প্রয়োজন, তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে উহা আমাকে দান কর। আজ কাল নব্য বাবুদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন

যে উহা পাকামী, কিন্তু উহাতে যে বিশ্বজনীন প্রেম ও মহাপ্রাণতা আছে, তাহা তাঁহারা কি বুঝিবেন? এ দিকে আর্য্যদিগের কাব্য নাটকের মধ্যে মহাপ্রাণতা দেখিতে পাইবে। কণ্বঋষি শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময় পুষ্পবৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, যথা—

কাশ্যপঃ, ভো ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনোতরবঃ।

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা।
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্॥
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতি সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ।
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাং॥

"যে শকুন্তলা তোমাদিগকে জলপান না করাইয়া নিজে জলপান করিতেন না, যিনি অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়া হইলেও স্নেহ বশতঃ তোমাদের একটী পল্লবও গ্রহণ করিতেন না, যখন তোমাদের প্রথম পুষ্পউদ্গম হইত, তখন যাঁহার আনন্দ উৎসবের সীমা থাকিত না, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।"

কি বিরাট প্রেম! এই বিরাট প্রেমের অর্থ কেবল সেই আর্য্যঋষিগণই বুঝিয়াছিলেন। হায়! সেই আর্য্যঋষিগণই বা কোথায়, আর তাহাদের অযোগ্য বংশধরগণ এই নরকের বিষয়-কীট আমরাই বা কোথায়? কি পাপে যে আজ আর্য্যভূমি মহাপ্রাণতাশূন্য,—পূতিগন্ধময় শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, জানিনা। এক্ষণে আর্য্যভূমি আবার কি ধর্ম্মজীবন লাভ করিবে? জানিনা বিধাতার মনে কি আছে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য জগতের একতা অন্যরূপ, তদ্দ্বারা প্রাণের সহিত প্রাণের মিল নাই। দুইটী আমি কখনই এক হয় না। পরস্পরের জীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাদের একতা, স্বার্থের অনুরোধে। অবশ্য তাহাদের এক এক জাতীর মধ্যে বৈষয়িক একতা অতি চমৎকার আছে। তাঁহারা জাতীয় বৈষয়িক স্বার্থের নিমিত্ত আত্মবলি পর্য্যন্ত দিতে পারেন, আবশ্যকমত তাঁহাদের স্বীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের অন্তর্ভূত করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের মূল উদ্দেশ্য স্বীয় স্বাধীনতা। তাঁহাদের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা হইলে, তাঁহাদের নিজের স্বাধীনতাও রক্ষা হয়। তাঁহাদের জাতীয় ধনসম্পত্তি, রাজ্য-সমৃদ্ধি, ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইলে, তাঁহাদের নিজেরও ধন, সম্পদ, সমৃদ্ধি, ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। তাঁহাদের রাজা কেবল তাঁহাদের কার্য্যনির্ব্বাহক মাত্র। সকল জাতির মধ্যে রাজাও নাই, তাঁহারা জাতীয় সভা সংস্থাপন করিয়া ঐ সভা দ্বারাই রাজ্য শাসন হয়। ঐ সভার সভাপতিই রাজার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। প্রকৃত পক্ষে মূলে এক বংশোদ্ভব বা এক জাতীয় লোক অন্য জাতির প্রতিযোগী স্বরূপ তাহাদের জাতির উচ্চতা, ধন, মান ও গৌরব বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাঁহারা একতা সংস্থাপনের চেষ্টা করেন। তজ্জন্য জাতীয় স্বার্থের নিকট তাঁহাদের স্বীয়

স্বার্থ স্থান পায় না। তাঁহাদের একতার স্রোত তাঁহাদের জাতীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত। ঐ সীমার দুইদিকে দুইটি প্রহরী আছে, এক দিকের প্রহরী ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া জাতীয় একতা রক্ষা করে, অন্যদিকের প্রহরী উহা জাতীয় সীমার বাহির হইতে দেয় না। প্রকৃতপক্ষে উহাকে বিশ্বজনীন্ ভ্রাতৃভাব বা মহাপ্রাণতা বলা যায় না। উহা স্বার্থমিশ্রিত একতা। উহা অস্থায়ী। যেহেতু ভৌতিক পদার্থ মাত্রেই যখন অস্থায়ী, তখন ধনসম্পদের জন্য যে একতা, তাহা অস্থায়ী ব্যতীত কি হইতে পারে? কিন্তু উহা অস্থায়ী হইলেও ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে কতকটা স্থায়ী বটে। যেহেতু ধনসম্পত্তি বা স্বার্থের নিমিত্ত জড় বিজ্ঞানের এবং বিষয় সংমিশ্রিত—অর্থাৎ বৈষয়িক জ্ঞান, বুদ্ধি, যুক্তি, ব্যবস্থা, নির্ব্বাচন, নীতি বিচার প্রভৃতির যে উন্নতি সাধিত হয়, তাহা সমাজের পক্ষে দীর্ঘকাল স্থায়ী বটে। রোম ও গ্রীস ধ্বংস হইলেও তাহাদের বিষয়নীতি ও বিষয়বিজ্ঞান প্রভৃতি একেবারে ধ্বংস হয় নাই। সেই সকল নীতি ও বিজ্ঞানের মাল মসলা হইতে ইয়োরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সমাজ-ভিত্তি সংস্থাপিত ও জাতীয় অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদিগের ন্যায় উদ্দেশ্যশূন্য মৃত প্রাণ, অকর্ম্মণ্য, স্বজাতিহিংসক জাতির অপেক্ষা, পাশ্চাত্য একতা যে শ্রেষ্ঠ, তাহার আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। ঐ একতার গুণে তাঁহারা ভৌতিক জগতের উপর অনেক আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহারা নিতান্ত দীন। তাঁহারা যদ্রূপ জাতীয় ও রাজনৈতিক জীবন লাভ করিয়াছেন, ধর্ম্মজীবন তদ্রূপ লাভ করিতে পারেন নাই। এখনও এই মৃতপ্রায় অধঃপতিত দীন হীন জাতির নিকট অধ্যাত্ম ধর্ম্মজীবনের কার্য্যকলাপ অনেকাংশে শিক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে জাতীয় একতা আছে বলিয়া, অন্তর্ব্বিবাদ, চৌর্য্য, দস্যুতা, নরহত্যা ও অন্যান্য পাপ তাঁহাদের মধ্যে বা সমাজে যে নাই, ইহা কেহ মনে করিবেন না; তাঁহারা সচরাচর জাতীয় জীবনের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিগণ নৈতিক জীবনও কিছুমাত্র লাভ করিতে পারেন নাই। ঐ নিকৃষ্ট সম্প্রদায় মধ্যে পাপস্রোত এতই প্রবল যে, তাহা শুনিলে লোমহর্ষণ হয়। তাহার কারণ ধর্ম্মজীবনের অভাব। ঐ সকল লোমহর্ষণ চিত্র যিনি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিবি বেসেণ্টের প্রদত্ত কলিকাতার কয়েকটী লেক্‌চার পাঠ করুন। তাহাতে সমস্ত দেখিতে পাইবেন। তাঁহাদের যে সকল সদ্‌গুণ আছে, তাহার অধিকাংশই আমরা প্রাপ্ত হই নাই; কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের চাতুরী ও নিকৃষ্ট দোষগুলি শিক্ষা করিয়াছি এবং আড়ম্বরপ্রিয় ও বাহ্যিক সুখসম্পদপ্রয়াসী হইয়া পড়িয়াছি। আবার কৌশলে পরদ্রব্য হরণ ও পরকে বঞ্চনা করিতে পারিলে আমরা বাহাদুরী বলিয়া মনে করি। তাঁহাদের মধ্যে ঐ সকল দোষ থাকিলেও তাঁহারা স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতীয় জীবন লাভ

করায়, প্রত্যেক ব্যক্তিই কার্য্যদক্ষ, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। এমন কি, পিতা-মাতা পুত্রেরও মুখাপেক্ষী হইয়া রহেন না। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের ও কার্য্য-দক্ষতার অভাব হেতু আমরা আত্মনির্ভর শক্তিহীন হইয়াছি। তাহাতে পরমুখা-পেক্ষিতা অথচ অনুকরণপ্রিয়তায় আমরা ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছি। তবে সুখের বিষয় এই যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মবীজ একেবারে ভারত হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। পাশ্চাত্য একতা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হওয়ায়, স্বগৃহস্থিত গুপ্তধন জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ক্ষেত্রান্তরেও গুপ্তবীজ আছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে বীজ (যখন একেবারে নষ্ট হয় নাই, তখন) নিশ্চয়ই অঙ্কুরিত হইবে। এখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, পাশ্চাত্য প্রদেশে মহাত্মা যীশু আর্য্যদিগের আদর্শে বিশ্ব-প্রেমিকতার বীজ আর্য্যদিগের নিকট হইতে লইয়া স্বক্ষেত্রে বপন করিয়াছিলেন, সে বীজের ফল ফলে নাই কেন? এখন পাশ্চাত্য দেশে ভূমি কর্ষণের যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তবে সে বীজের উপযোগী ফল হয় না কেন? তাহার কারণ, ঐ বীজ তাঁহার দেশের ক্ষেত্রের উপযোগী নহে। সিলেটের কমলার বীজ এদেশের ক্ষেত্রের উপযোগী নহে। সিলেটের কমলার বীজ এদেশের ক্ষেত্রে বপন করিলে, সিলেটের কমলার ন্যায় কখনই হয় না। অন্যরূপ হইয়া যায়। এই জন্য যীশুর মহাপ্রাণতা লোকের বৈষয়িক ক্ষেত্রে সাল মসলার গুণে উহা স্বার্থমিশ্রিত জাতীয় একতায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রও অন্যরূপ, আমাদের স্বদেশীয় ক্ষেত্রে অন্য জাতীয় বিদেশীয় মালমসলা সংমিশ্রিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ক্ষেত্রের স্বাভাবিক গুণ ভ্রষ্ট হইয়া ক্ষেত্র এক পক্ষে আশুবিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারই ফলস্বরূপ সমাজের অধিকাংশ (এমন কি, শতকরা নবতিতম্) লোকের মধ্যে স্বার্থান্ধতা, বিবাদ, কলহ, মামলা, মোকদ্দমা প্রভৃতি আমাদিগকে আক্রমণ করায়, সমাজ ঘোর-তর বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় হইয়াছে। মহাজন খাতকের সর্ব্বনাশ করিতে, খাতক-মহাজনকে ডুবাইতে, জমিদার প্রজার অনিষ্ট-করিতে ও প্রজা জমিদারকে ফাঁকী দিতে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে বঞ্চনা করিতে কৃতসংকল্প হইতেছে; তাহাতে মোকদ্দমার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে; তাহা নিবারণের নিমিত্ত কুইনাইনের ন্যায় নূতন নূতন আইন, আদালত ও সভা-সমিতির যতই বিস্তার হইতেছে, ততই ঐ অশান্তি দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। অন্যপক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা বুদ্ধি মার্জ্জিত হওয়ায় ও পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি দৃষ্টে আমাদের অমূল্য গ্রন্থাদির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় এবং মহাত্মাগণের সময়োচিত শিক্ষা দৈববাণীর ন্যায় সেই পুরাতন বিশ্বজনীন প্রেমের কথা সমাজের অতি অল্পাংশ (অর্থাৎ দশ সহস্র জনের মধ্যে একজন) লোকের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু বুদ্বুদের ন্যায় একবার উত্থিত হইয়া, তৎপশ্চাৎ বিলীন

হইতেছে। তাহারাই ফলস্বরূপ এই বর্ত্তমান হতভাগ্য দেশে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিবার জন্য সেই অমূল্য মহাপ্রাণতা ভ্রাতৃভাব ও বিশ্বজনীন প্রেমের কথা তুলিয়া আজ স্বয়ং কাঁদিতে ও ভ্রাতাগণকে কাঁদাইতে দাঁড়াইয়াছি। ইহাতে যদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে কাহারও বিন্দুমাত্র অশ্রুপতন হয়, তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান হইবে। ভ্রাতৃগণ! জগতে এমন কোন ঔষধ নাই, যাহা একবার মাত্র সেবন করাইয়া কেহ পূর্ব্বোক্ত ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশের সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীর রোগ আরোগ্য করিতে পারে। আপাততঃ ঔষধ যাহাতে গলাধঃকরণ হয়, তাহাই আবশ্যক; কিন্তু তাহা করিতে হইলে অগ্রে এক এক বিন্দু জল গলাধঃকরণ করাইয়া রোগীর শুষ্ক কণ্ঠ ও হৃদয় একটু সরস করিয়া অন্তিম কালের রসসিন্দূর প্রয়োগান্তে রোগীকে একটু চেতন করিয়া অল্প অল্প উত্তেজক ঔষধ দ্বারা ক্রমে বলাধান করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন একেবারে উত্তেজক ঔষধ দিলে রোগী মারা যাইতে পারে। এইজন্য বলি ভ্রাতৃগণ! বিশ্বজনীন প্রেম শিক্ষার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে স্বীয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয় স্বজনের উপর প্রেম শিক্ষা কর; আত্মসুখ ভুলিয়া গিয়া ন্যায়-উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা তাহাদের সুখী করিতে চেষ্টা কর; তদনন্তর স্বগ্রামবাসী ও নিকটবাসী জনগণের হিতের ও সুখের নিমিত্ত নিজের ও আত্মীয় পরিবারের সুখ ভুলিয়া গিয়া কায়মনোবাক্যে তাহাদের হিত ও উন্নতির চেষ্টা কর। ঐরূপ এক একটী ক্ষুদ্র আমিকে বিস্তার ও বৃহৎ আমিতে পরিণত কর। তোমার আমিটুকু দুইজন, দশজন, বিশজন, ক্রমে সহস্র সহস্র জনের অন্তরে মিশাইয়া তাহাদের সহিত একপ্রাণ হইতে চেষ্টা ও শিক্ষা কর। হে ধনিমহাশয়গণ! দরিদ্রগণকে সন্তানের ন্যায় পালন করিতে শিক্ষা করুন। প্রথমতঃ আপনারাই অগ্রে স্বার্থ ত্যাগ ও ক্ষমা শিক্ষা করিয়া সমাজকে শিক্ষা দিউন। কিন্তু যাহাদিগকে আপনারা দয়া অনুগ্রহ ও ক্ষমা করিবেন, তাহারাই ক্রমেই আপনাদের বশীভূত হইবে। তাহারা যতই পাষণ্ড হউক না কেন, কৃতজ্ঞতা মানুষের একটী স্বাভাবিক বৃত্তি। দয়া, ক্ষমা, অনুগ্রহ করিতে থাকিলে নিশ্চয়ই তাহারা কৃতজ্ঞতায় গলিয়া আপনাদের দাসানুদাস হইবে।

ঋষিগণ যখন তপোবনে সিংহ, ব্যাঘ্র দিগকে বশীভূত করিয়া তপোবনের শান্তি স্থাপন করিতেন, তখন আপনারা কিঞ্চিৎ স্বার্থের ক্ষতি স্বীকার করিয়া, দয়া, প্রেম, ক্ষমা দ্বারা মনুষ্যকে অবশ্যই বশীভূত করিতে পারিবেন, এবং আপনাদের আদর্শে তাহাদের চরিত্রও নিশ্চয় গঠিত হইবে। তাহাদের মধ্যে অন্তর্ব্বিরোধ হ্রাস ও ক্রমেই ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইবে। বিবাদ, কলহ, অশান্তি সমাজ হইতে ক্রমেই তিরোহিত হইবে। এই যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা আদালতে ব্যয়িত হইতেছে, উহা দ্বারা জগতের অনেক সংকার্য্য সাধিত হইতে পারিবে। যদি আমরা এইরূপ সমাজে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন ও প্রেম বিস্তার করিতে পারি, তবে আমরা ক্রমেই আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণের সেই বিশ্ব-

জনীন বিরাট প্রেমের অধিকারী হইতে পারিব। মর্ত্ত্যভূমির পুতিগন্ধ দূরীভূত হইবে। অর্থাৎ সত্যযুগ পুনরাগমন করিবে। স্বর্গীয় সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইবে। ভ্রাতাগণ, এই শুরু কার্য্যক্ষেত্র—তোমাদের হিন্দুস্থান। জগৎগুরু মহাত্মাগণ তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ, তোমাদের আত্মাশক্তির জন্মভূমি হিমাচল, সেই হিমাচলে তাঁহারা বাস করেন। তোমরাই তাঁহাদের প্রকৃত শিষ্যের উপযুক্ত। হে ভ্রাতৃগণ, আর আত্মবঞ্চিত হইও না, ক্রমে ক্ষেত্র প্রস্তুত কর, নিশ্চয়ই বীজ অঙ্কুরিত হইবে, এবং ধর্ম্ম বৃক্ষের আধ্যাত্মিক ফল তোমরা বা তোমাদের বংশধরগণ ভোগ করিয়া সমগ্র জগতে ঐ আধ্যাত্মিক ফল বিতরণ করিতে পারিবেন। তোমাদের আদর্শে ভিন্ন দেশে ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং ধর্ম্ম ফলের বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও ধর্ম্ম বৃক্ষে পরিণত হইয়া সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিধর্ম্ম বা বৌদ্ধদর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিজ্ঞান স্কন্ধ।

সংজ্ঞা ও বিজ্ঞানের ভেদ প্রদর্শন স্থলে বিজ্ঞান কতক লক্ষিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের সম্যক্ লক্ষণা বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ অভিধর্ম্মের লক্ষণ কেবল কতক গুলি সধাতুক প্রভিশব্দের উল্লেখ মাত্র। যেমন, 'ফস্সো-ফুসনা, সম্ফুসনা, সম্ফুসিতত্তং'। ইহাতে বিশেষ কিছুই অর্থগ্রহ হয় না। অট্ঠকথায় অবশ্য ঐ সমস্তের অর্থ বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমার্গে অনেক পদার্থের লক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ লক্ষণা কুত্রাপি লব্ধ হয় না। যাহা হউক, সংজ্ঞা ও বেদনার পর তাহাদের লক্ষণ প্রতিবেধ পূর্ব্বক জ্ঞান এবং যাবতীয় মনোভাবের (ইচ্ছাদি) জ্ঞানই বিজ্ঞান;* বিজ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ গৃহীত হইতে পারে। মন ও চিত্ত বিজ্ঞানের অভিবচন। ধর্ম্মসঙ্গণিতে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায়, এই পঞ্চ বিষয়ক বিজ্ঞানকে এবং মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান ধাতুকে চিত্ত বলা হইয়াছে। এই ধাতুদ্বয় না বুঝিলে অভিধর্ম্মের কিছুই বুঝা হয় না; তজ্জন্য উহাদের বিবরণ করা যাইতেছে-"সম্পটিচ্ছন কিচ্চা মনোধাতু। সন্তীরণাদি কিচ্চা মনো বিঞ্ঞাণ ধাতু" (বি। ১৪); চক্খু বিঞ্ঞাণাদিনং অনন্তরা রূপাদি বিজননং লক্খণা মনোধাতু"। "মনোধাতু পঞ্চসুপি রূপাদিসু পবত্ততি;" "মনোবিঞ্ঞাণ ধাতু ছসুতি।" "তথ চক্খু বিঞ্ঞাণাদি পুরে চর রূপাদি বিজানন মনোধাতু"; অর্থাৎ

---

* অভিধর্ম্মের পারিভাষিক শব্দ দিয়া পালিতে বিজ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ হইতে পারে—'লক্ষণ পতিবেধতো ছব্বিধারম্মণঞ্ঞাণং বিজানন লক্খণং বিঞ্ঞাণং।' অর্থাৎ রূপাদি পঞ্চ ও ধর্ম্মারম্মণ এই ষড়্বিধ আরম্মণের যে লক্ষণ ও প্রতিবেধ পূর্ব্বক জ্ঞান, তাহাই বিজ্ঞান।

পুরে চর প্রত্যক্ষ রূপাদির † সম্পটিচ্ছন-কারক অর্থাৎ রূপাদিরা যথায় একত্র মিলিত ভাবে গৃহীত হয়, তাহাই মনোধাতু। উহা রূপাদি পঞ্চ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়, এই উক্তির দ্বারা উহা সাংখ্যের প্রত্যক্ষ বিষয়ের তুল্য হইল ‡। মনোবিজ্ঞান ধাতুর কার্য্য সন্তীরণ ও তদারম্মণ। "সম্মা তীরেতী যথা সম্পটিস্থিতং রূপাদিং আরম্মণং বীমংসতীতি সন্তীরণং" অর্থাৎ মনোধাতুর দ্বারা সম্প্রতীচ্ছিত (সম্প্রতীক্ষিত) রূপাদি বিষয়কে মীমাংসা করা বা গবেষণার দ্বারা নিশ্চয় করা সন্তীরণ। যখন সন্তীরণ হইলে তাহার আরম্মণে (বিষয়) জবন (জবমানস্সবির পবত্তি) অর্থাৎ প্রবৃত্তি বা চিত্তের গতি হয়; তখন সেই জবনের বিষয়কে—অর্থাৎ যাহাতে চিত্তের প্রবৃত্তি হয়, এরূপ স্ফুট বিষয়কে তদারম্মণ বলে। ইংরাজেরা মনোবিজ্ঞানকে representative intellection বলিয়া অনুবাদ করেন।

এই মনোবিজ্ঞান ধাতু, মনোধাতু ও চক্ষুরাদি পঞ্চ বিজ্ঞান লইয়াই চিত্ত বা বিজ্ঞান স্কন্ধ। অর্থাৎ সংজ্ঞা, বেদনা, রূপ ও সংস্কার স্কন্ধের বিমিশ্র জ্ঞান এবং বিজ্ঞানেরও পুনর্জ্ঞান (re-representation) বিজ্ঞান স্কন্ধ বা চিত্ত হইল। মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে বিজ্ঞানের এইরূপ উপমা আছে, যেমন নগর মধ্যস্থ সিঙ্ঘাটকে (চতুষ্পথে) স্থিত নগররক্ষক উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এই চতুর্দ্দিক হইতে আগত সমস্ত পুরুষদের দেখিতে পায়, সেইরূপ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায়ের দ্বারা যথাক্রমে রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস ও স্প্রষ্টব্য বিষয়ের, দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদ ও স্পর্শন হয় এবং পরে উহাদের বিজানন বা বিজ্ঞান হয়। অন্যত্র "যঞ্চ মনসা ধর্ম্মং বিজানাতি তং পিরিঞ্ঞানেন বিজানাতি" অর্থাৎ মনের দ্বারা যে ধর্ম্ম জানা যায়, তাহাও বিঞ্ঞানের দ্বারা বিজানন হয়।

এই বিজ্ঞান স্কন্ধ ৮৯ অথবা ১২১ ভাগে বিভক্ত হয়। ঐ বিভাগের দ্বারা কিন্তু চিত্তের স্বভাবের বিষয় কিছুই অধিক জানা

† "পঞ্চবিঞ্ঞাণ গহিতং রূপাদি আরম্মণং সম্পটিচ্ছতি তদাকার পবত্তিয়াতি" (বিভা) । ১) । অর্থাৎ চক্ষুরাদি পঞ্চ বিজ্ঞান ভাবে গৃহীত রূপাদি বিষয়কে সেই সেই রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া যে সম্প্রতীচ্ছন বা সমনয়ন করা, তাহাই সম্পটিচ্ছন। পঞ্চ বিষয় ইহা দ্বারা একত্র মিলিত করিয়া গৃহীত হয়। (Sensorium commune)

‡ সাংখ্যের প্রত্যক্ষ আলোচন জ্ঞানের পর হয়। বৌদ্ধের নীল পীত সংজ্ঞা প্রথমে হয়, পরে নীল পীত বিজ্ঞান হয়, পরে সেই নীল পীত ধর্ম্ম একত্র লইয়া কোন পদার্থে বিজ্ঞান হয়। শেষোক্ত বিজ্ঞান মনোধাতুর কার্য্য। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই সব বিষয়ের উদাহরণ না থাকাতে এবং বর্ত্তমান বৌদ্ধ পণ্ডিতগণেরই পুস্তকের বাহিরে একপদও যাইবার সামর্থ্য না থাকাতে, এই বিষয় কতক অনিশ্চিত। সাংখ্যের প্রত্যক্ষ শুদ্ধ জানা মাত্র নহে, কিন্তু উহা প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞায়মান বিষয়ের সত্তা নিশ্চয়। বৌদ্ধের মনোবিজ্ঞান ধাতু কতক প্রমাণ। নীলতা (নীলের ভাব অর্থাৎ অভেদে ভেদার্থক শব্দজ্ঞান) সাংখ্যের বিকল্প। "নীল আকাশ আছে, ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বৌদ্ধের সংজ্ঞাকে percept রূপাদি বিজ্ঞানকে sense perception এবং মনোধাতুর কার্য্যকে রূপাদি বিষয়ক conception বলা যাইতে পারে।

যায় না এবং এক সঙ্গে নানাদিক্ হইতে বিভাগ করাতে, উহা অনর্থক জটিল হইয়াছে।

ভূমি, জাতি, সম্প্রয়োগ (সহগতভাব), সংস্কার, ধ্যান, আলম্বন ও মার্গ, এই সপ্ত পদার্থানুসারে চিত্ত বা বিজ্ঞান স্কন্ধ বিভাগ করা হয়। বিজ্ঞানের স্বরূপ, লক্ষণ ও বিশ্লেষ্য অঙ্গ সকল স্পষ্ট করিয়া বলিয়া, পরে যথাযোগ্য প্রসঙ্গ স্থলে ধ্যান আদির অবতারণা করিলে অভিধর্ম্মের জটিলতা অনেক হ্রাস হইত। বস্তুতঃ বৌদ্ধদের যে ৮৯ বিভাগ, তাহা সর্ব্বতোব্যাপী চরম বিভাগ নহে এবং উহা নির্ব্বাণতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্ব বুঝিবারও তত স্পষ্ট উপায় নহে। যাহা হউক, সংক্ষেপতঃ ঐ বিভাগ-প্রণালী দেখান যাইতেছে :—

(১) ভূমি—কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর এই চারি। সাধারণ দেব-মনুষ্যাদির যে কাম্য বিষয়, তদাত্মক লোক সকল কামাবচর। "হেটঠিতো অবীচিনিরয়ং উপরিতে পরিনির্ম্মিত বসবত্তি দেবে" (ধ) ইত্যাদি হইতে জানা যায়, অবীচি নরক হইতে পরিনির্ম্মিত বশবর্ত্তী দেবলোক পর্য্যন্ত (যোগমতের মাহেন্দ্র লোক পর্য্যন্ত) সমস্ত লোক কামাবচর। সাংখ্যের ভৌতিক বিষয়ের সহিত কামাবচর ঠিক মিলে।

রূপাবচর ভূমি নিম্নে ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধে অকনিষ্ঠ দেবলোক পর্য্যন্ত। যাঁহারা কাম্য বিষয় ত্যাগ করিয়া "রূপ" ধ্যান করেন, তাঁহাদের গতি ও স্থিতির লোকই রূপাবচর লোক। যোগমতে মহঃ, জন ও তপলোক। বৌদ্ধের রূপ ধ্যান সাংখ্যের ভূত-তত্ত্ব ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের তত্ত্ব ধ্যানের প্রায় তুল্য। অরূপাবচর ভূমি নিম্নে আকাশানন্ত্যায়তনুপগ দেব হইতে উপরে সংজ্ঞাসংজ্ঞী দেব পর্য্যন্ত। ইহা অরূপধ্যায়ীদের গতি ও স্থিতির লোক। ইহা যোগের সত্যলোকের অন্তর্গত। তন্মাত্র-তত্ত্ব, সানন্দ ও সস্মিত সমাধি বৌদ্ধের অরূপধ্যানের প্রায় তুল্য।

লোকোত্তর ভূমি নির্ব্বাণের সাক্ষাৎ সাধন মার্গ। এই মার্গের সাধকেরা চারি ভাগে বিভক্ত—স্রোত আপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ। যোগের সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগের ইহা প্রায় তুল্য।

কামাবচরাদি চারি প্রকার ভূমিভেদে—সত্ত্ব সকলের যে চিত্তভেদ হয়, তাহাই বিজ্ঞানের ভূমিভেদ।

(২) জাতি—কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত, ইহারা সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্ম্মনস্য ও উপেক্ষা সহগত হয়।†

(৩) সম্প্রযোগ—যে সমস্ত ভাব কোন একপ্রকার চিত্তে সহভাবী রূপে থাকে, ...

† অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ কুশলমূল এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহ অকুশলমূল। এই কয়টির নাম হেতু। সহেতু বলিলে ইহার কোনটি মূলে আছে, বুঝিতে হইবে। বিপাক ও ক্রিয়া অব্যাকৃত। বিপাক অর্থে কর্ম্মের ফল। ক্রিয়া অর্থে "করণ মত্তং" অর্থাৎ কেবল মনে করা মাত্র, যাহার ফলে বিশেষ কোন সুখদুঃখ হয় না। সাংখ্যের স্বরসবাহী তথারূঢ় ভাব এই ক্রিয়ার সদৃশ। এই কয়টি বিষয় বিশেষ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

তাহারাই সম্প্রযুক্ত ভাব। যেমন—দৃষ্টি (মিথ্যাজ্ঞান), প্রতিঘ বা দ্বেষ, বিচিকিৎসা বা সংশয়, উদ্ধচ্চ বা ঔদ্ধত্য (বিক্ষেপাবস্থা) ও জ্ঞান।

(৪) সংস্কার অর্থে এ স্থলে চিত্তের উৎসাহ ভাব বা সপ্রযত্ন ভাব। "সঙ্খারোতি তিকৃথ ভাবসঙ্খাত থ গুন বিসেসেন সজ্জেতি .... তথ পথ কিচ্চে সংসীদমানস্স চিত্তস্স অনুবলপ্পদানেন" ইত্যাদি (বিভাবিনি টীকা) অর্থাৎ অবসন্ন বা অনুৎসাহিত চিত্তকে তীক্ষ্ণ ভাবে সজ্জিত করাই সংস্কার। পর হইতে অনুবল প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহপূর্ব্বক কোন কার্য্য করাই সংস্কারপূর্ব্বক করা।

(৫) ধ্যান—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা, এই পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ। এই পঞ্চ অঙ্গযুক্ত ধ্যান প্রথম দ্বিতীয় বিতর্ক-বর্জ্জিত চারি অঙ্গ। তৃতীয় ধ্যান বিতর্ক, বিচার, প্রীতি (মানস সুখ) বর্জ্জিত। চতুর্থ ধ্যান সুখ ও একাগ্রতাযুক্ত। পঞ্চম ধ্যান উপেক্ষা ও একাগ্রতাযুক্ত।

(৬) আলম্বন—আরূপ্যধ্যানের বিষয়। তাহারা চতুর্ব্বিধ, যথা—আকাশানন্ত্যায়তন বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন আকিঞ্চন্যানন্ত্যায়তন, নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞানন্ত্যায়তন। নির্ব্বাণ প্রসঙ্গে ইহাদের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইবে।

(৭) মার্গ বা লোকোত্তর মার্গ পূর্ব্বোক্ত স্রোতআপন্ন আদি।

এই সপ্ত পদার্থ অনুসারে চিত্তের ভেদ করা হয়। তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন। কামাবচর কুশল চিত্ত (অলোভাদি হেতুক)

(১) সৌমনস্য সহগত+জ্ঞান সম্প্রযুক্ত +অসংস্কারিক।

(২) সৌমনস্য সহগত+জ্ঞান সম্প্রযুক্ত +সসংস্কারিক।

(৩—৪) সৌমনস্য সহগত+জ্ঞান বিপ্র-যুক্ত অসংস্কারিক এবং সসংস্কারিক।

(৫—৮) উপেক্ষা সহগত ঐরূপ।

সহেতুক কামাবচর কুশল চিত্ত এই অষ্ট প্রকার। বিশুদ্ধি মার্গে ইহাদের এক একটি উদাহরণ আছে। এতন্মধ্যে ১ম চিত্তের উদাহরণ এইরূপ—যখন কেহ দান ধর্ম্মের সুফল জানিয়া অথবা অন্য কোন সৌমনস্যের কারণে হৃষ্ট প্রহৃষ্ট হইয়া দান করিলে মহাফল হয়, ইত্যাদি যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক, পরের দ্বারা অনুৎসাহিত হইয়া দানাদি করে, তবে সেই সময়কার তাহার সেই চিত্তের (thought complex) বিজ্ঞানই প্রথম চিত্তের উদাহরণ।

আর অমুককে দান কর—এইরূপে পরের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া দানাদি করা দ্বিতীয় চিত্তের উদাহরণ।

কোন শিশু যদি স্বীয় জ্ঞাতিদের দানাদি দর্শনে দানাদি ভাল জানিয়া সৌমনস্য পূর্ব্বক কোন ভিক্ষুকে সহসা হস্তস্থিত কিছু দেয় বা প্রণাম করে, তবে সেই চিত্ত তৃতীয়।

যখন "দাও" "বন্দনা কর" ইত্যাদি প্রকারে উৎসাহিত হইয়া শিশু দানাদি করে, তখন সেই চিত্ত চতুর্থ।

উপরোক্ত চারি ভাব সৌমনস্যসহগত, কিন্তু যখন সৌমনস্যের কারণ না থাকাতে উপেক্ষা পূর্ব্বক ঐরূপ দানাদি করে, তখন উপেক্ষা সহগত চারি চিত্ত হয়। ইহারা সহেতু কুশল কামাবচর চিত্ত।

কুশল রূপাবচর চিত্ত পঞ্চ প্রকার।

কামাবচর যেমন অকুশল হয়, রূপাবচর অরূপাবচর ও লোকোত্তর, সমাধি-সাধ্য বলিয়া অকুশল হয় না। ইহারা হয় কুশল না হয় অব্যাকৃত, এই দ্বিবিধ হয়।

কামলোকের ভাব ত্যাগ করিয়া কেবল নীলাদি রূপধর্ম্ম ধ্যানই রূপাবচর চিত্তের স্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত বিতর্কাদি পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ ভেদে ঐ রূপাবচর-ধ্যানাত্মক চিত্তের পঞ্চ ভেদ হয়। প্রথমটি পঞ্চ ধ্যানাঙ্গযুক্ত, অবশিষ্টেরা এক এক অঙ্গহীন। পঞ্চমটি উপেক্ষা ও একাগ্রতাসহিত।

অরূপাবচর কুশলচিত্তে পূর্ব্বোক্ত আকাশ-অনন্তায়তনাদি চারি অরূপ্য আলম্বনে সমাহিত চিত্ত।

লোকোত্তর কুশল চিত্ত ও পূর্ব্বোক্ত স্রোত আপনাদি চারি লোকোত্তর মার্গ বিষয়ক।

এইরূপে কামাবচরাদি ভূমিভেদে কুশল চিত্ত একুশ প্রকার হইল। অকুশল চিত্ত লোভাদি ত্রিহেতুক এবং উহা কামাবচর মাত্র হয়। লোভমূলক হইলে সৌমনস্য ও উপেক্ষা সহগত হয়। প্রতিঘ বা দ্বেষমূলক হইলে, তাহাতে দৌর্ম্মনস্য সংগত থাকে ও তাহাকে মোমূহচিত্ত বলে। অকুশল (সহেতু) কামাবচর, লোভমূলক চিত্ত অষ্টবিধ।

(১—২) সৌমনস্য সহগত+দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত *+অসংস্কারিক এবং ঐরূপ সসংস্কারিক।

(৩—৪) দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত ঐ ঐ রূপ।

(৫—৮) উপেক্ষা সংগত ঐ ঐ রূপ চারি।

অকুশল কামাবচর দ্বেষমূলক বা প্রতিঘ চিত্ত দ্বিবিধ।

(৯—১০) দৌর্ম্মনস্য সহগত, প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক এবং ঐ রূপ সসংস্কারিক।

অকুশল কামাবচর মোমূহ চিত্তও দ্বিবিধ।

(১১) উপেক্ষা সহগত, বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত।

(১২) উপেক্ষা সমগত উদ্ধচ্চ সম্প্রযুক্ত।

একুনে এই দ্বাদশ চিত্ত সহেতু কামাবচর অকুশল চিত্ত হইল।

এ বিষয়েও বিশুদ্ধি মার্গস্থিত উদাহরণ অনুবাদিত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

১ম অকুশল চিত্তের উদাহরণ যথা:—যখন কেহ কামে দোষ নাই, এইরূপ মিথ্যা দৃষ্টি পূর্ব্বক হৃষ্ট তুষ্ট হইয়া কাম্য বিষয় পরিভোগ করে, অথবা দৃষ্ট মঙ্গলাদিকে সার রূপে মনন করে; আর তাহা যদি পরের দ্বারা উৎসাহিত না হইয়া স্বাভাবিক তীক্ষ্ণভাবে করে, তখন তাহাকে প্রথম অকুশল চিত্ত (সৌমনস্য সহগত, দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত, অসংস্কারিক) বলা যায়।

সেইরূপ যদি মন্দ বা অতীক্ষ্ণচেতা পুরুষ সমুৎসাহিত হইয়া ঐরূপ কার্য্য করে, তবে তাহা দ্বিতীয় অকুশল চিত্ত (অসংস্কারিক)।

যখন মিথ্যা দৃষ্টির বশ না হইয়া কেবল

* দৃষ্টি অর্থে মিথ্যাজ্ঞান বা বিপরীত জ্ঞান। সুখের বিষয়ে লোভ হয় বলিয়া এই চিত্তে দৌর্ম্মনস্য থাকে। অথবা স্থলবিশেষে উপেক্ষা বা সুখ-দুঃখশূন্য ভাবও থাকে।

হৃষ্ট তুষ্ট হইয়া মৈথুনধর্ম্ম সেবা করে বা পর-সম্পদে লোভ করে বা পর-ভাণ্ড চুরি করে; আর তখন স্বভাব তীক্ষ্ণ, পরের দ্বারা অনুৎসাহিত চিত্ত হইলে, তাহা (দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত) তৃতীয় অকুশল চিত্তের উদাহরণ।

যখন মন্দ বা অতীক্ষ্ণচেতা সমুৎসাহিত হইয়া উপরোক্ত রূপ কুকার্য্য করে, তখন তাহা চতুর্থ (অসংস্কারিক) চিত্তের উদাহরণ।

যখন কাম্যের অসম্পত্তি হেতু বা অন্য কোন দৌর্ম্মনস্তের কারণ না থাকিলে উপরোক্ত চারি প্রকার ভাব দৌর্ম্মনস্যশূন্য হয়, তখন তাহারা (উপরোক্ত ৪ চিত্ত) উপেক্ষা সহগত চারি চিত্ত হয়।

ইহারা অষ্টবিধ লোভমূল চিত্তের উদাহরণ।

দ্বিবিধ দ্বেষমূল অকুশল চিত্ত যথা—প্রাণাতিপাতাদিতে যখন তীক্ষ্ণ প্রবৃত্তি হয়, তখন পঞ্চম চিত্ত (অসংস্কারিক) হয়।

আর যখন মন্দ চিত্ত সমুৎসাহিত হইয়া প্রাণাতিপাতাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাই ষষ্ঠ (দৌর্ম্মনস্য সহগত প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক) চিত্ত।

দ্বিবিধ মোহমূলক চিত্তের প্রথমটী সংশয়কালে হয় ও দ্বিতীয়টী বিক্ষেপ কালে হয়।

দ্বাদশ প্রকার অকুশল চিত্ত এইরূপ। [কুশল ও অকুশলের আবার বিপাক ও ক্রিয়ারূপ অব্যাকৃত ভাব আছে। অব্যাকৃত চিত্ত জাতিভেদে দ্বিবিধ, বিপাক ও ক্রিয়া। কামাবচরাদি চারি ভূমির চিত্তেরই বিপাক হয়। ক্রিয়া চিত্ত বস্তুতঃ ত্রিভৌমিক, কিন্তু যাঁহারা লোকোত্তর ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও কামাবচরাদি বিষয়ক ক্রিয়া চিত্ত হয়।*

বিপাকের মধ্যে কামাবচর কুশলের বিপাক দ্বিবিধ—অহেতুক ও সহেতুক। তন্মধ্যে অহেতুক কামাবচর বিপাক অষ্ট প্রকার যথা—উপেক্ষা সহগত চক্ষুর্বিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, সুখসহগত (ইহা স্ফুট সুখ নহে) কায়বিজ্ঞান, সৌমনস্য সহগত সন্তীরণ এবং উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ ও সম্পটিচ্ছন।

সেইরূপ সহেতু কুশল বিপাক চিত্ত আছে। তাহারা অষ্ট কুশল চিত্তের অনুরূপ। তবে ইহারা বিপাক বলিয়া ইহাদিগকে কর্ম্মের ফলরূপে অনুভূয়মান চিত্তভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

রূপাবচর বিপাক বা পঞ্চবিধ রূপাবচর বিপাকের অনুরূপ। তাহারা পঞ্চ রূপাবচর ধ্যানের ফলভাবে উৎপন্ন চিত্তভাবের বিজ্ঞান স্বরূপ।

অরূপাবচর বিপাকও ঐরূপ চতুর্ব্বিধ। লোকোত্তর বিপাকও ঐরূপ চতুর্ব্বিধ।

* অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহে লোকোত্তর ক্রিয়া উক্ত হয় নাই। তট্টীকাকার বলেন অনুত্তরের ক্রিয়া অসম্ভব, কারণ মার্গ সকল এক চিত্ত ক্ষণিক; মার্গচিত্ত পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইলে ক্রিয়াভাগ হইত। উহা ক্লেশসমুচ্ছেদক বলিয়া অশনিপাতে বৃক্ষ যেমন একেবারে ধ্বংস হয়, সেইরূপ। তাহার ফলে নির্ব্বাণ হয়, তজ্জন্য আর্য্য মার্গীদের স্বভূমির ক্রিয়াচিত্ত উপলব্ধ হয় না। তাহাদের কামাবচরাদি বিষয়ক ক্রিয়া চিত্ত যে হইতে পারে, তাহা অগ্রে উক্ত হইবে

অতএব কুশল বিপাক (চাতুর্ভৌমিক) চিত্ত একুনে একোনত্রিংশ সংখ্যক হইল। [অহেতুক ক্রিয়া চিত্ত ত্রিবিধ। উপেক্ষা সহগত পঞ্চদ্বারা বর্জ্জন *, উপেক্ষাসহগত মনোদ্বারা বর্জ্জন এবং সৌমনস্যসহগত হসিতুৎপাদ।

সহেতু কুশল ক্রিয়াচিত্ত কামাবচর কুশল চিত্তের অনুরূপ অষ্টবিধ *

রূপাবচর ক্রিয়াচিত্ত তদ্ভূমিক পঞ্চচিত্তের অনুরূপ পঞ্চসংখ্যক।

অরূপাবচর ক্রিয়াচিত্তও সেইরূপ চতুর্বিধ।

অতএব চাতুর্ভৌমিক ক্রিয়া বিজ্ঞান একুনে বিংশ সংখ্যক হইল।

অতএব অব্যাকৃত জাতীয় বিপাক ও ক্রিয়া (প্রাচীন পালি ভাষায় ইহাকে কিরিয়া বলা হয়) চিত্ত মোটে উনপঞ্চাশ সংখ্যক হইল। ইহার সহিত কুশল ২১ অকুশল ১২ যোগ করিলে, সর্ব্বশুদ্ধ চিত্তের বা বিজ্ঞানস্কন্ধের ৮৯ ভেদ হইল।

মূল অভিধর্ম্মে ইহার এক একটী চিত্তের পঞ্চস্কন্ধের কি কি পদার্থ উদ্ভূত থাকে, তাহা (তাহাদেরও যথাযোগ্য উপবিভাগ সহ) প্রদর্শিত হইয়াছে। সদৃশ প্রত্যেক চিত্ত সম্বন্ধে ঐরূপ বিবরণ থাকাতে অভিধর্ম্মে পুনরাবৃত্তি অতি অধিক। সাংখ্যে যেরূপ সাধারণ কয়েকটী মৌলিক পদার্থ দিয়া চিত্ত বুঝান হয় এবং সমাধি আদি বুঝাইবার সময় অতিরিক্ত ভেদ দর্শিত হয়, বৌদ্ধ দর্শনের সেরূপ প্রণালী না থাকাতে ইহা অনর্থক জটিল হইয়াছে।

এ স্থলে ধম্মসঙ্গনি হইতে একটু উদাহরণ দিয়া বৌদ্ধ-প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে।

কামাবচর কুশল যে প্রথম চিত্ত, তাহাতে পঞ্চস্কন্ধের কি কি উৎপন্ন হয়, তাহা সম্যক্

*আবর্জ্জন অর্থে আভোগ। "চক্ষ্বাদি পঞ্চদ্বারে ঘটিত সারম্মণং আবজ্জেত্বা আভোগং করোতি" (বিভা)। অর্থাৎ মনোধাতু দ্বারা চক্ষুরাদি পঞ্চদ্বারে অভিহত বিষয়কে আভোগ করা বা তদভিমুখ ভাবে থাকা পঞ্চদ্বারা বর্জ্জন। মনোদ্বারের আরম্মণ ধর্ম্মেও তথাভাবে মনোদ্বারা আবর্জ্জন। অর্থাৎ দৃষ্ট-শ্রুত মত যে সব আরম্মণ গোচর হয়, তাহাতে আবর্জ্জন। মনোদ্বারা বর্জ্জন সন্তীরিত বিষয়কে পঞ্চদ্বারে বোত্থাপিত বা ব্যবস্থাপিত বা অভিনিবিষ্ট করে। ইহাকে বোত্থাপন বলে।

ক্ষীণাস্রব অর্হতের পূর্ব্ব সাধনাদির কোন নিদর্শন দেখিয়া যে প্রহৃষ্ট হন, তাহা সৌমনস্য সহগত হসিতুৎপাদ চিত্তের উদাহরণ। ইহাই লোকোত্তর ভূমিস্থদের কামাবচরাদি বিষয়ক ক্রিয়া চিত্ত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ক্রিয়া চিত্ত কেবল মনে করা মাত্র। ইহা ইষ্টানিষ্ট ফলদায়ক কর্ম্মস্বরূপ নহে।

উন্নতি অবনতিকর কোন হেতু না থাকিলে যে স্বাভাবিক বা স্বরসবাহী চিত্ত ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়াভিনিবেশ হয়, তাহাই "ক্রিয়া" চিত্ত।

* কেবল কুশলচিত্ত শৈক্ষ (অর্হত্ত ব্যতীত ত্রিমার্গস্থ) ও সাধারণ মনুষ্যের উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই কুশল ক্রিয়াচিত্ত কেবল অর্হৎদের উৎপন্ন হয়, এই বিশেষ দ্রষ্টব্য (বি)।

সেইরূপ রূপাবচর এবং অরূপাবচর ক্রিয়া বিজ্ঞানও কেবল অর্হৎদের হইয়া থাকে। কেবল রূপাবচর ও অরূপাবচর কুশলের সহিত এই এই ক্রিয়াচিত্তের এববিধ ভেদ আছে।

বর্ণান হইয়াছে। তাহার এইরূপ বিবরণ আছে।

"তস্মিন্ সময়ে কামাবচরং কুশলং চিত্তং উৎপন্ন হোতি সোমনস্স সহগতং ঞান সম্পযুক্তং রূপারম্মণং বা সদ্দারম্মণং বা গন্ধারম্মণং বা রসারম্মণং বা ফোট্‌ঠব্বারম্মণং বা যং যং বা পন আরব্ভ ইত্যাদি"।

(ধম্মসঙ্গনি চিত্তুপ্পাদকণ্ডং)।

অর্থাৎ সেই সময় রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস স্প্রষ্টব্য বা অন্য কোন আরম্মণ অবলম্বন করিয়া কামাবচর, কুশল, সৌমনস্য সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত, চিত্ত উৎপন্ন হয়। তখন এই সমস্ত হয়:—স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্য্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, মনেন্দ্রিয়, সৌমনস্যেন্দ্রিয়, জীবিতেন্দ্রিয়, সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্‌সংকল্প, সম্যক্‌ব্যায়াম, সম্যক্‌স্মৃতি, সম্যক্‌সমাধি, শ্রদ্ধাবল, বীর্য্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল, হ্রীবল ও ভয়বল (হ্রী নিজ হইতে কুকর্ম্মে নিবৃত্তি আর—ভয় পরনিন্দাদির ভয়ে কুকর্ম্মনিবৃত্তি), অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, অনভিধ্যা (অলোলুপতা) অব্যাপাদ (অদ্রোহ) সম্যক্‌দৃষ্টি, হ্রী ও ভয়, কায় ও চিত্তের প্রশ্রদ্ধি (সাত্ত্বিক ভাব), লঘুতা, মৃদুতা, কর্ম্মণ্যতা, প্রাগুণঃ (অগ্লানি); স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, সমথ (শান্তি). বিপশ্যনা, প্রগ্রাহ (ধারণা) এবং অবিক্ষেপ হয়, অথবা অন্য কোন প্রত্যয়যুক্ত ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

পরে এই সমস্ত পদার্থেরও আবার বিবরণ করা হইয়াছে। কিন্তু বিবরণ কেবল উপসর্গ ও প্রত্যয়-ভেদ ভিন্ন সমানধাতুক শব্দের দ্বারা (যেমন তর্ক, বিতর্ক, সতর্ক, ইত্যাদি) করা হওয়াতে উহার সতঃ অর্থ বোধ হওয়া দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ উহারা প্রায়ই abstract terms, তাহাদের concrete example প্রায়ই পাওয়া যায় না। তজ্জন্য অনেক পদার্থের স্ফুট ধারণা হইবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন, উহা অভিধর্ম্মের এক গুণ; কারণ মানস পদার্থের ধারণা কিছু বিলুপ্ত থাকা ভাল। পাশ্চাত্য ধরণের দর্শনচর্চায় উহা গুণ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা নির্ব্বাণ সাধন করিবেন, তাঁহাদের নিকট উহা গুণ নহে।

এতাবতা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, অভিধর্ম্ম কেবল অনুভূয়মান ধর্ম্ম (phenomena) সকল লইয়া। তাহার বিশ্লেষ মূল তত্ত্ব নিষ্কাশনার্থ নহে, কিন্তু শ্লিষ্ট পদার্থের জাত্যাদিভেদ অনুসারে তাহার বিশ্লেষ। ধর্ম্ম সকল মূলতঃ কি, তদ্বিষয়ে বৌদ্ধ নীরব। সেই মূলকে বৌদ্ধেরা 'শূন্য' বলেন। শূন্য অর্থে সে বিষয় ধারণার অযোগ্য। মূল অভিধর্ম্মের শূন্য ঐরূপ অর্থেই ব্যবহৃত বলিয়া বোধ হয়, এবং কেবল ঐরূপ অর্থেই উহা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা শূন্যকে মৌলিক ধর্ম্ম রূপে স্থাপিত করিতে যাইয়া আর্য্য দার্শনিকদের নিকট পরাজিত হন। বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধ আধিভৌতিক বা metapysics বিদ্যার বিষয় মোটেই বলেন নাই। বৌদ্ধদর্শনকে Phychology of Nirvanic

Ethics বলা যাইতে পারে। বুদ্ধ দশটী প্রশ্নকে অব্যাকৃত বলিতেন, তাহা যথা (১+২) লোক সকল শাশ্বত কি অশাশ্বত, (৩+৪) লোক সকল অন্তবান্ কি অনন্ত; (৫+৬) জীব ও শরীর এক কি ভিন্ন; (৭+৮) তথাগত (কেহ কেহ বলেন তথাগত অর্থে এস্থলে জীব—"তথাগতো সত্তং নাম") মৃত্যুর পর থাকে কিনা। (৯) তথাগত মৃত্যুর পর থাকে ও থাকেনা। (১০) তথাগত থাকেনা ও না থাকেনা।

বুদ্ধ এই সকল প্রশ্নের কোন একান্ত পক্ষের উত্তর দিতেন না +। এই সমস্ত প্রশ্নই আন্বীক্ষিকীর মূল। বুদ্ধ বলিতেন—উহার বিচারে কালক্ষেপ না করিয়া নির্ব্বাণ সাধন করাই শ্রেয়ঃ। যদি কোন নির্ব্বাণ-সিদ্ধ পুরুষ বর্ত্তমান থাকেন, তবে ইহা সত্য ও অধিকতর ফলোপধায়ক। কারণ পৃথিবীর অতি অল্প লোকেই তত্ত্বগবেষক হয়; অধিকাংশ মনুষ্যই পর-প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধি।

তজ্জন্য অন্ধবিশ্বাসমূলক সম্প্রদায় সকলের প্রসার অধিক হয়। কিন্তু যখন বুদ্ধের চরিত্র নানা কাল্পনিক আখ্যায়িকায় বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, যখন বৌদ্ধদের কেবল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—কিন্তু সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি-শূন্য নির্ব্বাণ মার্গ ছিল, পরন্তু যখন অসংকীর্ণচেতা ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষের সংখ্যা বৌদ্ধ সমাজে অল্প হইয়া গিয়াছিল, যখন dogmaর সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ শৃঙ্খলিত হইয়াছিলেন, তখনই উহা উন্নত আর্ষদর্শনের দ্বারা ও নবধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ আর্য্য সম্প্রদায়ের দ্বারা ভারত হইতে অপসারিত হয়। অভিধর্ম্ম যে বুদ্ধ স্বয়ং প্রণয়ন করেন নাই, তাহা বুদ্ধ ঘোষ একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—"ইদং তাব অভিধম্মো পদভাজনীয় নয়েন খন্ধেসু বিত্থাব কথা মুখং। ভগবতা পন যং কিঞ্চিরূপং অতীতানাগত পচ্চুপ্পন্নং অজ্ঝত্তং বা বহিদ্ধা বা ওলারিকং বা সুখুমং বা হীনং বা পণীতং বা যং দূরে বা সন্তিকে বা তদেক জ্ঝং অভি-সংযুহিত্বা অভিসঙ্খিপিত্বা অয়ং বুচ্চতি রূপক্খন্ধো।" ইত্যাদি। (বি। ১৪) অর্থাৎ

+ কিন্তু পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা উহার কোন কোন বিষয়ে একান্তবাদী হইয়াছিলেন। বুদ্ধ ঘোষ বলেন—অবিদ্যা অনাদি, তাহা হইতে লোক সকল পরম্পরা ক্রমে অনাদি বা শাশ্বত। সাংখ্যেরও তাহাই মত। বৌদ্ধের সবর্ত্ত বিবর্ত্ত সাংখ্যের প্রলয় ও সর্গ। তবে বর্ত্তমান ভাবে লোক সকল অবশ্য শাশ্বত নহে। লোক সকলকে বুদ্ধ ঘোষ অনন্ত বলেন। বুদ্ধের জ্ঞান, লোক ধাতু প্রভৃতি বৌদ্ধ মতে অনন্ত।

বস্তুতঃ এই প্রশ্নগুলি কতকটা হেঁয়ালির মত। জীব ও শরীর এক কি না, ইহা শুনিয়া অনেকে মনে করিবেন, জীব যখন মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরকে গমন করে ও কর্ম্ম-ফল ভোগ করে, তখন শরীর হইতে পৃথক্ বলাইত বৌদ্ধ মতের অনুকূল হইবে। কিন্তু ইহা তত সহজ নহে। মৃত্যুর পরই জীবের অন্তঃশরীর (সূক্ষ্ম) ধারণ হয়, অতএব তখনও প্রশ্ন হইবে জীব ও শরীর কি এক? ফলতঃ "কাহার নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়" এই পর্য্যন্ত সেই প্রশ্ন চলিবে।

তথাগত সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ভিন্নবাদীদের ছিল। উহার অর্থ জীব না হইয়া বুদ্ধও হইতে পারে। উহার উত্তরেও আন্বীক্ষিকী বিদ্যার অবতারণা হয়।

অভিধর্ম্মে এইরূপ পদভাজনীয় নয় পূর্ব্বক স্কন্ধের বিস্তার কথা বলা হইল। ভগবান্ কিন্তু যে কিছু 'রূপ' অতীত, অনাগত বা প্রত্যুৎপন্ন, আধ্যাত্মিক বা বাহির, ঔদারিক (স্থূল) বা সূক্ষ্ম, হীন বা পূর্ণ, দূরে বা সন্তিকে, তাহা সমস্ত একভাবে সংক্ষেপ ও অধ্যাহার পূর্ব্বক বলিয়াছেন "ইহাকে রূপ-স্কন্ধ বলা যায়, ইহাকে বেদনা-স্কন্ধ বলা যায়" ইত্যাদি। বস্তুতঃ বর্ত্তমান বৌদ্ধদর্শন বুদ্ধের পরে উদ্ভাবিত এবং প্রায় সহস্র বর্ষব্যাপী কাল বৌদ্ধ পণ্ডিতদের চিন্তার ফল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য।

তত্ত্ব-চিন্তা।

(জীব ভাব।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৪২। শিক্ষা। জলে সাঁতার দেওয়া যায়—এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া যথা প্রণালীতে সাঁতার দেওয়া অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যাসে জ্ঞান জন্মে—জলে সাঁতার দেওয়া যায়। অতএব এই জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে বাক্যে বিশ্বাস, তাহার পর যথা প্রণালীতে অভ্যাস প্রয়োজন।

মনুষ্য ব্রহ্মকে জানিতে পারেন—এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে—

(১) বাক্যে বিশ্বাস।

(২) শাস্ত্র-উক্ত প্রণালীতে অভ্যাস প্রয়োজন।

অভ্যাস অন্তে বুঝিতে পারা যায় "মনুষ্য ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।"

যাঁহারা পূর্ব্বে জ্ঞান, পরে শিক্ষা বা দীক্ষা-পরীক্ষা ও বিশ্বাস করিতে চাহেন, তাঁহারা অজ্ঞান। অদৃষ্টকে যদি প্রথমেই দেখিতে পাই, তবে দেখিবার প্রণালী বা প্রয়াসের প্রয়োজন কোথা?

৪৩। বিশ্বাস রাখিয়া শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষা করা বরং ভাল। কেননা বিশ্বাস অটল থাকিলে, পরীক্ষার পূর্ণমনোরথ না হইলেই কেহ উহা ছাড়িয়া দেয় না। আর একটু অগ্রসর হইলে হয়ত তাহার কামনা পূর্ণ হইবে। বিশ্বাস সত্ত্বে বিনা অনুষ্ঠানে কেহ কখন কৃতকার্য্য হয় না।

৪৪। এক এক জনকে অনুষ্ঠান না করিয়া ফল লাভ করিতে দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য, ঐ ফললাভ পূর্ব্বজন্মকৃত অনুষ্ঠান হেতু। যথা কোন বালক কবে কোথায় একটা বীজ ফেলিয়া গিয়াছিল, এখন উহাতে বৃক্ষ হইয়াছে। বীজ ফেলা বালকের মনে নাই। সেই বৃক্ষ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—কে সে বৃক্ষ রোপণ করিল? সে বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, আমরা বুঝিতেছি, ঐ বৃক্ষ তাহার পূর্ব্বকৃত অনুষ্ঠানের ফল। অতএব অনুষ্ঠান প্রয়োজন। যখন হউক, উহার ফল ফলিবেই ফলিবে।

অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্প থাকিবে। অনুষ্ঠানে ফল ফলিবে, এই বিশ্বাস থাকিবে।

৪৫। যাঁহার বিশ্বাস সহজে অঙ্কুরে

তাঁহাতে তত্ত্বজ্ঞান, তদ্দীক্ষা বা শিক্ষা পূর্ব্ব হইতে হইয়াছে, ধরিতে হয়। তাঁহার বিশ্বাস বিপরীত অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত, ইহা ধরিয়া লইতে হয়। ইঁহার পক্ষে দীক্ষা-প্রয়োজন।

৪৬। যোগ। জীব চৈতন্যযুক্ত, জীব বুদ্ধিধারী, জীবাভিমানী অহং-এর "বৃহৎ অহং" বা "পূর্ণ অহং" বা "ব্রহ্মে" যুক্ত হওয়ার নাম "যোগ"। যোগ দুই প্রকার। শরীরকে এবং শারীরিক ক্রিয়া সমুদয়কে বশীভূত করিয়া যে যোগে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহার নাম হঠযোগ (হঠ অর্থে শরীর) বা কায়যোগ। শরীরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মন লইয়া যে যোগ আরম্ভ করিতে হয়, তাহার নাম "রাজযোগ"

৪৭। কথিত আছে, উপস্থিত কালে পূর্ব্বের মত শরীর নহে, শরীর দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। সকল পূর্ণ করিতে আয়ুতে কুলান হয় না বলিয়া হঠযোগ অপ্রয়োজন মনে করিয়া রাজযোগের আদর। হঠযোগে প্রাণবায়ুকে স্থির করা যেমন আবশ্যকীয়, রাজযোগে মনকে স্থির করা তেমনি প্রয়োজনীয়। প্রাণের সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ, অর্থাৎ শরীর অসুস্থ হইলে প্রাণ অস্থির এবং প্রাণ ব্যাকুল হইলে শরীরের ভাবান্তর ঘটে; প্রাণের সহিত মনের প্রায় সেই প্রকার সম্বন্ধ। "প্রায়" কথা প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, শরীর অসুস্থ, প্রাণ স্থির অথবা প্রাণ ব্যাকুল, শরীরে ভাবান্তর নাই, এরূপও দেখা যায়। কিন্তু মন ব্যাকুল, প্রাণ স্থির অথবা প্রাণ ব্যাকুল, মন স্থির আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগাভ্যাসে উভয় সম্বন্ধ একই প্রকার হইয়া আইসে অর্থাৎ শরীর অসুস্থ অথচ প্রাণ স্থির, প্রাণ ব্যাকুল অথচ মন স্থির বা মন চঞ্চল—প্রাণ স্থির হইয়া আইসে। যোগের অবস্থাবিশেষে শরীর বোধ থাকে না, প্রাণ বহমান হয় না, মন নিষ্ক্রিয় বিশেষ, যেন মৃত ইন্দ্রিয়গণ লইয়া শুধু বিদ্যমান বোধ হয়; আবার কোন বোধই থাকে না। যোগ অভ্যাসে এই এই লক্ষণ হইয়া থাকে, অভ্যাস করিতে করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

৪৮। কেহ কেহ কহেন "প্রাণায়াম" শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা অভ্যাসের প্রয়োজন নাই; যে মনকে স্থির করিতে সক্ষম, তাহার প্রাণায়াম আপনা আপনি হইয়া আইসে। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রাণায়াম ব্যতীত মন স্থির হয় না; তবে যাহার মন স্থির হয়, তাহার প্রাণায়াম পূর্ব্বজন্মে অভ্যস্ত ছিল। এ বিচার প্রয়োজন কি না, ইহা না ভাবিয়া, সাধক কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, অনুষ্ঠানে বুঝিতে পারেন। রাজযোগীদের অনুষ্ঠান-কালে চিত্তের অবস্থা চতুর্ব্বিধ ঘটিয়া থাকে। লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদন॥

(১) লয়—অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য না হইয়া নিদ্রা যায়। ইহা অলসভাবব্যঞ্জক।

(২) বিক্ষেপ—এক ধরিতে অন্য আসিয়া পড়ে। ইহা চিত্তচাঞ্চল্যব্যঞ্জক।

(৩) কষায়—ধরিতে ধরিতে স্তব্ধ হইয়া আইসে, আর অগ্রসর হয় না। ইহা সামর্থ্যা-ভাবব্যঞ্জক।

(৪) রসাস্বাদন—নিষ্ক্রিয় স্তব্ধ, কিন্তু

নির্ব্বিকল্পকে ধারণ করিতে না পারিয়া সবিকল্পে নামিয়া পড়ে। এই অবস্থায় পূর্ব্বউল্লিখিত ভোগ্যজ্ঞেয়কে ধরিতে না পারায় চিত্ত দুলিতে থাকে। এ অবস্থা ভাগ্যবানের, সন্দেহ নাই—তথাপি ইহা শেষ নহে। কেননা শেষ অবস্থা "মুক্ত" অবস্থা।

৫০। কোন্ অবস্থায় কি করা প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে গুরুরা বলেন—লয় অবস্থায় "বিচার"।

বিক্ষেপ ঐ "শান্ত হওয়া।"
কশায় ঐ "নিবৃত্ত হওয়া।"
রসাস্বাদনে "দৃঢ়তর অভ্যাস।"

৫১। ধারণা।—উল্লিখিত আছে, জ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থার নাম ধারণা। জানা পাত্রস্থ হইলে উহাকে ধারণা বলে। পাত্রস্থ হইয়া বিকল্পরহিত থাকিলে, উহাকে জ্ঞান বলে।

অপহরণ করা ভাল কাজ নহে। ইহা জানিতে না পারা—ইহার নাম "না জানা" "অজ্ঞান"। ভাল কাজ নয়, ইহা শুনিলে ইহাতে "শ্রবণ" হইল। শুনিয়া মনে ভাবিলে, ইহাতে "মনন ও ধ্যান" হইল। ভাবিয়া কথাটা চিত্তে বসাইবে, ইহাতে "ধারণা" পূর্ণাক্ত হইল। কিন্তু ঐ ধারণা রহিল না, উহা ভুলিয়া গেলে। ধারণা হইয়া রহিল না—সরিয়া গেল অর্থাৎ "জানা" হইয়া আবার "অজানার" মত হইল। ইহাকে "জ্ঞান" বলে না। দুই চারিবার এইরূপ করিতে করিতে যখন আর সরিয়া গেল না, তখন প্রকৃত "জানা" হইল—অর্থাৎ জ্ঞান হইল। সুতরাং জানিয়া যাহা ভুল হয়, তাহাতে ধারণা স্বরূপ জ্ঞান হয় নাই। জানিয়া যাহা ভুল হয় না, তাহাতে ধারণা অবিকল্প জ্ঞান প্রকৃত।

অনভ্যাসে ধারণা অপসৃত হয়। "জানা" ও "না জানার" মধ্যস্থিত বলিয়া "জানার" দিকে অভ্যাস শিথিল হইলেই ধারণা "না-জানায় ডুবিয়া যায়।" "না জানার" বিপরীত—জ্ঞান ধারণার পরস্থিত বলিয়া শেষ বলিয়া—"না জানায়" ডুবে না। অর্থাৎ জ্ঞান আর "না জানা" হয় না।

শিশু জননীকে "মা" বলে, ইহাই সাধারণ। কোন শিশু "মা"ও বলে এবং পিতামহীর সম্বোধন শুনিয়া "বউ মা" বলে। ক্রমে তাহার জ্ঞান হইতে লাগিল, তখন সে আর জননীকে "বউ মা" বলিল না। পূর্ব্বে যে ধারণা ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন হইল বলিয়া তাহার জ্ঞানেরও পরিবর্ত্তন হইল। যদি তাহার পূর্ব্বধারণা বিকল্পতাশূন্য হইত তাহাহইলে তাহার "মা" ও "বউ মা" বলা বন্ধ হইত না।

৫২। ধারণা ত্রিগুণ-শক্তির অধীন। এক গুণশক্তি-প্রসূত ধারণা অন্যগুণ শক্তি-প্রসূত ধারণার সমান হয় না।

মাংসাশী ও ফলমূলভুক্। একের ধারণা—মাংস না খাইলে শরীর ভাল থাকে না, অপরের ধারণা মাংসে শরীর নষ্ট হয়। রজস্তম-সম্ভব ধারণায় মাংস প্রয়োজন, সত্ত্ব-সম্ভব ধারণায় মাংস অপকারী। যতকাল রজস্তমগুণী মনুষ্যের চিত্ত সত্ত্বে পরিণত না হইবে, ততকাল ধারণাও পরিবর্ত্তন পাইবে না।

"বুঝাইলেও বুঝেনা" কথাটী সত্য, সরস্বতী বিঃসূত্রে, এক জনের ধারণা অপরের

শ্রবণ বা ধারণা করিতে অক্ষম। ইহাই বুদ্ধি বিভিন্নতার হেতু। এই হেতুই "বুদ্ধি-ভেদ" নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৫৩। ধারণার পূর্ব্ব ও পর অবস্থার বা ক্রিয়ার উল্লেখ আছে—

১মশ্রেণী—শ্রবণ	২য় শ্রেণী—শ্রবণ
মনন	মনন
ধ্যান	ধ্যান
ধারণা	নিদিধ্যাসন ধারণা
	(আত্মরূপ সমাধি ও লয়।)

দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিদিধ্যাসনের উল্লেখ আছে। উহা কাহারও কাহারও প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ মনন হইতে ধারণা যে মুহূর্ত্ত কাল—তৎ অন্তর্গত।

শ্রবণে—মন আকাঙ্ক্ষী এবং অনন্তবিষয়ী।

মননে—মন কর্ত্তা এবং সংযক্ত। (বিষয়'-ন্তর-বিস্মৃতবিশেষ)।

ধ্যানের আরম্ভে—কর্ত্তা মন অনুষ্ঠাতা, শেষার্দ্ধে নিষ্ক্রিয় সাক্ষীস্বরূপ।

চিত্ত তখন জাগ্রত।

ধারণায়—নিষ্ক্রিয় মন স্থির ও চিত্তগত, চিত্ত প্রস্ফুটিত—বুদ্ধির জ্যোতি প্রাপ্ত।

জ্ঞানে—মনগত প্রস্ফুটিত চিত্ত—বুদ্ধিলাভ।

সমাধিতে বা লয়ে—স্বরূপযুক্ত বা স্বরূপতত্ত্ব প্রাপ্ত।

জ্ঞানলাভে—বুদ্ধির প্রসাদ, চিত্তের উপযো-গিতা, মনের আগ্রহ ও অনুষ্ঠান প্রয়োজন।

শ্রবণ হইতে ধারণা পর্য্যন্ত কি প্রকার অনুষ্ঠান, তৎসম্বন্ধে গুরুরা বলেন—

(১) শ্রবণ। শুধু শ্রবণ করাকে "শ্রবণ" বলে না। যেমন শোনা, তেমনি যদি মননে গিয়া পরিণত হয়, তবেই "শ্রবণ" হইল।

(২) মনন। শুধু মনে করাকে "মনন" কহে না। যেমন মনন হইল, তেমনি যদি ধ্যানে গিয়া পরিণত হয়, তবেই মনন হইল।

(৩) ধ্যান। শুধু কল্পনা করাকে 'ধ্যান' বলে না। যেমন ধ্যান হইল, তেমনি যদি নিদিধ্যাসনে (অর্থাৎ সেই ভাবে অচল অবস্থিতিতে) পরিণত হয়, তাহা হইলেই ধ্যান হইল।

(৪) নিদিধ্যাসন অর্থ নিত্য এক ভাবে থাকা। যাঁহার নিদিধ্যাসন হইয়াছে, তিনি কিছুতেই বিরক্ত হন না। ত্রৈলঙ্গ স্বামী নিদিধ্যাসন-সিদ্ধ বলিয়া উক্ত হই-য়াছেন।

(৫) ধারণা। ধারণা ও নিদিধ্যাসন একই বলিয়া বোধ হয়। ধারণা হইবা মাত্র জ্ঞান হয়। জ্ঞান হইলেই উহা হইতে অবিচলিত থাকাই নিদিধ্যাসন।

বিষয় জ্ঞান লাভে প্রথম শ্রেণীর কয়টী, আত্মজ্ঞানে—অর্থাৎ স্বরূপ—দর্শনে—দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়টী পর পর অবস্থা।

প্রকৃতি (স্থানান্তরে উল্লিখিত) অনু-সারে ধারণার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কাহারও অল্প কালে, কাহারও দীর্ঘ কালে ধারণার উদয় হয়।

শান্তপ্রকৃতি ব্যক্তির হয়ত পূর্ব্বসংস্কার না থাকা হেতু ধারণার বিলম্ব ঘটিল, আবার উগ্রপ্রকৃতি ব্যক্তির পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ হয়ত মুহূর্ত্ত মধ্যেই ধারণার উদয় হইল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা নহে।

৫৫। শ্রবণ-ইচ্ছা কার্য্যকরী হওয়া অবধি বাঞ্ছিত বস্তু লাভ পর্য্যন্ত একাগ্র-চিত্তে নিযুক্ত থাকাকে "তপস্যা" কহে। যদিও চিত্ত সম্বন্ধে একাগ্রতার অধিক প্রয়োগ আছে, তথাপি উহা মনেও ঘটিয়া থাকে। শ্রবণ হইতে ধ্যানের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত মনের একাগ্রতা ঘটিয়া থাকে। উহার অনু-পস্থিতিতে মন ধ্যানে সক্ষম হয় না।

মনের একাগ্রতাকে বিষয়ান্তর স্মৃতি—বিষয়ান্তর চিন্তা—বিষয়ান্তর-পিপাসা নষ্ট করিয়া থাকে।

চিত্তের একাগ্রতাকে অন্যান্য বৃত্তি নষ্ট করিতে পারে।

৫৬। শাস্ত্রবাক্য বা গুরুবাক্য শ্রবণ করিতে এই প্রণালী অবলম্বন করিলে, জ্ঞান জন্মে। সুধু শ্রবণে কাহারও শ্রবণ হয় না, কাহারও শ্রবণ হয়, মনন হয় না, কাহারও মনন হয়, ধ্যান হয় না; আবার অতি অল্প জনের ধ্যান হয়, তাঁহারাই ধারণা লাভে নিদিধ্যাসনে অনাসক্ত ভাবে অবস্থিতি করেন।

পূর্ব্বসংস্কার (অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস) হেতু কাহারও শ্রবণ মাত্রই ধারণায় ও জ্ঞানের উদয় হয়। অর্থাৎ চিত্ত তৎ তৎ অবস্থায় পরিণত হয়। এ স্থলে মনন ও ধ্যান যে হয় না, তাহা নহে, উহা তড়িৎ-বৎ হইয়া ধারণায় পরিণত হয়।

৫৭। স্থূল পদার্থ ধারণা হেতু যেমন একটী প্রশস্ত উপায় দর্শন, সূক্ষ্ম বিষয় ধারণা হেতু তেমনি প্রশস্ত উপায় চিন্তা। চিন্তা করিতে করিতে অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহা দ্বারা দর্শন লাভ হয়। অতএব চিন্তা করা প্রয়োজন। এই চিন্তার পূর্ব্বে শ্রবণ ও মনন হইয়া যায়; চিন্তায় ধ্যান হয়, ধ্যানান্তে নিদিধ্যাসন সম্ভব।

যাহা দেখিয়াছ, তাহার কথা কহিতেছি না। যাহা শুন নাই, তাহা তোমার মনে আসিবে না; যাহা মনে আসিবেনা, তাহা আবার কি প্রকারে ধ্যান করিবে? শুনিয়া থাক, মনে করিয়া থাক (মনে রাখিয়া থাক), তবেই উহার চিন্তা করিতে পারিবে। এই হেতু ধ্যান ও চিন্তা তুল্য বলিলাম। কিন্তু সাধারণতঃ চিন্তায় অনুরাগ বা ভক্তি থাকে না, ধ্যানে বিশ্বাস, অনুরাগ ও ভক্তি বিদ্যমান থাকে।

একটী উদাহরণ দিতে ইচ্ছা হইতেছে। স্বদেশী আন্দোলন। এত দিন শুন নাই, উহার চিন্তাও কর নাই। প্রথম যখন শুনিলে, হয়ত শুনিলে মাত্র, মনে করিলে না, মনে রাখিলে না, সুতরাং তাহার প্রকৃত চিন্তা করিলে না। তাহার পর যখন মন দিয়া শুনিলে—অর্থাৎ মনে রাখিলে, তখনও ঠিক চিন্তা করিলে না। আবার যখন মন দিয়া শুনিয়া, মনে রাখিয়া, চিন্তা করিয়া দেখিলে, তখন বুঝিতে পারিলে, উহাকে ধরিয়া থাকা ভাল; ইতি ধারণা।

৫৮। মুক্তিপ্রার্থী দলের পক্ষে তিনটী প্রয়োজন। শাস্ত্র বিশেষে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও অবরোধির উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু তাহারা কি বা কি প্রকার, তাহা বলা হয় নাই। জ্ঞান অর্থে জানা, বৈরাগ্য—বিষয়ে অনাসক্তি এবং অগ্রাহ্যতা ও অবরোধি কার্য্যান্তে বিস্মরণ (ইহার পূর্ব্বে সঙ্কল্প থাকে না, পরে অনুশোচনা থাকে না)

রাজর্ষি জনকের জ্ঞান, বৈরাগ্য, অবরোধি, তিনই সমান ছিল।

জ্ঞান লাভের উপায়—শিক্ষা, দীক্ষা ও দর্শন।

বৈরাগ্য লাভের উপায়—"প্রত্যাহার" দ্বারা পরিত্যাগ—অর্থাৎ "আমার প্রয়োজন নাই," "হয় হউক, না হয় না হউক" ইতি ভাব।

অবরোধির * উপায়—ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া পরেচ্ছায় কার্য্য করা। সুতরাং তাহাতে সঙ্কল্প থাকে না, আর উহাতে ভালই হউক, মন্দই হউক, ভোগান্তে চিন্তিত হইতে হয় না।

৫৯। বৈরাগ্য—বিষয়ত্যাগ নহে, বিষয়ে স্বার্থত্যাগ। বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ হইলে বিষয়মুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং যিনি বিষয়মুক্ত, তিনি অনাসক্ত। অনাসক্ত অবস্থায় ভোগ থাকে, কিন্তু সে ভোগ অনুভূত হয় না। সে ভোগ হেতু বাসনা, সঙ্কল্প বা প্রয়াস থাকে না; আবার সে ভোগান্তে তৎচিন্তা—অনুশোচনা হয় না এবং তদ্ধেতু ভাবান্তর হইতে হয় না।

চৈতন্ত বা বোধ সম্বন্ধে—বাসনা ও শক্তি সম্বন্ধে—ভোগার্থ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বিষয়বৈরাগ্যই প্রকৃত বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের উদয়ে মহাজনের আত্মচিন্তা—আত্মদর্শন সুলভ হইয়া থাকে; কেননা তাঁহার বিষয়চিন্তা থাকে না, অথচ চিন্তা থাকে; বিষয়বাসনা থাকে না, অথচ বাসনা থাকে; বিষয়-শক্তি থাকে না, অথচ শক্তি থাকে; সুতরাং চিন্তা, বাসনা, শক্তি তাঁহার স্বরূপ দর্শনে সাপেক্ষ হয়। আবার যাঁহার হৃদয়ে আত্মচিন্তা বলবতী থাকে, তাঁহার বিষয়-বৈরাগ্যও ঘটিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবামাচরণ বসু।

* "অবরোধি"-তত্ত্ব পরিষ্কার বিবৃত হইল না। "অবরোধি" কোন্ শাস্ত্রের উক্তি, তাহার উল্লেখ আবশ্যক। প্রয়োজন স্থলে প্রচল-প্রমাণাদির উদ্ধৃতি ব্যতীত শাস্ত্রীয় দুর্নিরূপ বিষয়ের উদ্দেশ্য প্রয়োজনানুরূপ সিদ্ধ হয় না। (হিঃ সঃ)

অদৃষ্ট।

—০—

(১)

কে তুমি, নেপথ্য-বাসি! চক্ষু-অগোচর!
স্বর্গ-মর্ত্ত্যে করিছ বিহার!
অপ্রিয়-দর্শন কিংবা মধুর সুন্দর!
দেখি নাই, কেমন আকার!

(২)

কখন কাহার প্রতি হও যে সদয়,
জানিনা, কি তোমার নিয়ম:—
ভালবাস, স্বেচ্ছাচার—কলঙ্ক-নিলয়;
অথবা সে আচার, সংযম!

(৩)

যাহ'ক, যেমনি তুমি হও মহাশয়,
চির বাম আমার উপর;—
সমস্ত জীবনব্যাপী সাধ্য সাধনায়
গলিল না পাষাণ-অন্তর!

(৪)

হে মায়াবি! আর তোমা নাহি দিব 'মন'।
চিনিয়াছি, আসল সন্ধান!
শেষ উপহার শুধু করিব অর্পণ,
উপেক্ষিয়া জগৎ-পাতায়!!

শ্রীগোপালচন্দ্র [illegible]।

শ্রীহরিঃ

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩১৪ সাল, ১৮২৯ শকাব্দা।

মন জড় কি অজড় ?

আদ্যাশক্তি সৃজন-কামনায় জ্ঞানরূপী মহেশ্বরের শরণাপন্না হন; কিন্তু তাঁহার গুণ-ক্ষোভে অর্থাৎ সাম্যাবস্থার বিকার প্রথমতঃ তমোগুণেরই প্রাদুর্ভাব হয়, এই জন্য এই তমোগুণ মহাকাল ও নিয়ত ক্রিয়াশীলা তমোপ্রধানা শক্তি মহাকালী নামে উক্ত হইয়া থাকেন। সাংখ্যকার ইঁহাকে পুরুষ-প্রকৃতি ও বেদান্ত ব্রহ্ম ও মায়া নামে বিশেষিত করেন। ইহার তামসিক পরিণাম "বীজ" হইতে যথাক্রমে "বিয়ৎ পবন তেজোম্বু ভূব ভূতানি জজ্ঞিরে।" সূক্ষ্মাকাশ, সূক্ষ্ম বায়ু, সূক্ষ্মজ্যোতিঃ, সূক্ষ্ম জল ও সূক্ষ্ম ক্ষিতি উৎপন্ন। ইহারা তামসিক গুণ হইতে সমুদ্ভূত হইলেও ইহাদের জননী সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী; সুতরাং ইহারাও সেই ত্রিগুণসম্পন্ন।

ইহাদের সাত্ত্বিক অংশ হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এবং রজ-অংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদি উৎপন্ন হইয়াছে। যথা,—

আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে	——	শ্রবণেন্দ্রিয়।
বায়ুর	ঐ	স্পর্শনেন্দ্রিয়।
তেজের	ঐ	দর্শনেন্দ্রিয়।
জলের	ঐ	রসনেন্দ্রিয়।
ক্ষিতির	ঐ	ঘ্রাণেন্দ্রিয়।
	মোট	৫

এই সকল সত্ত্বাংশের সমষ্টি অন্তঃকরণ; তাহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত; বিমর্ষাত্মা মন * ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। ২

---

* "ইদমিত্থমেব রূপমিতি যো বিচারঃ স বিমর্শ ইত্যুচ্যতে।"

"ইহা এইরূপ" ইত্যাকারে যে বিচার, তাহাকেই বিমর্ষ কহে।

আকাশের রজ-অংশ হইতে——বাক্।
বায়ুর ঐ পাণি।
তেজের ঐ পাদ।
জলের ঐ উপস্থ।
ক্ষিতির ঐ পায়ু।

মোট ৫

এই সকল রজ-অংশের সমষ্টি হইতে পঞ্চ-প্রাণ। ৫ *

১৭

এই পঞ্চদশ সমষ্টি আমাদের সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ।

আকাশের তামসিক অংশ হইতে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্য্য।
বায়ুর ঐ ঐ ধারণ, প্রসারণ, উল্লম্ফন, চাঞ্চল্য ও সংকোচন।
তেজের " " ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা ও ক্লান্তি।
জলের " " রেতঃ, পিত্ত, স্বেদ, রস ও রক্ত।
ক্ষিতির " " অস্থি, মাংস, নাড়ী, ত্বক্ ও রোম।

* ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় এই পঞ্চ প্রাণ—আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে ক্রিয়া করিতেছে। প্রাণ—হৃদয়ে, অপান গুহ্যে, সমান নাভিতে, উদান কণ্ঠে, এবং ব্যান সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হইতেছে। ইহারা অন্তঃস্থ। ইহাদের অনুরূপ আরও পাঁচটী বায়ু আছে, তাহারা বহিঃস্থিত বলিয়া কীর্ত্তিত। যথা—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। উদগারে নাগ, নয়নোন্মীলনে কূর্ম্ম, ক্ষুৎকারে (হাঁচিতে) কৃকর, জৃম্ভনে দেবদত্ত ও সর্ব্বশরীরে ধনঞ্জয় বায়ু ক্রিয়া করিয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই পঞ্চীকরণ-প্রণালীতে এক ভূত অপর ভূতচতুষ্টয় হইতে কি কি গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(১) আকাশের স্বকীয় বিশেষ গুণ লোভ।
আকাশ—পবন হইতে পাইয়াছিল প্রসারণ
" অগ্নি হইতে " নিদ্রা।
" জল হইতে " রস।
" পৃথিবী হইতে " আলস্য।

মোট ৫

(২) বায়ুর স্বকীয় বিশেষ গুণ ধারণ।
" আকাশ হইতে পাইয়াছিল কাম।
" অগ্নি হইতে " তৃষ্ণা।
" জল হইতে " স্বেদ।
" পৃথিবী হইতে " ত্বক্।

৫

(৩) অগ্নির স্বকীয় বিশেষ গুণ ক্ষুধা।
অগ্নি—আকাশ হইতে পাইয়াছিল ক্রোধ।
" পবন হইতে " উল্লম্ফন।
" জল হইতে " পিত্ত।
" পৃথিবী হইতে " নাড়ী।

৫

(৪) জলের বিশেষ গুণ রেতঃ।
জল আকাশ হইতে পাইয়াছিল——মোহ
" পবন হইতে " চঞ্চলতা
" অগ্নি হইতে " ক্লান্তি।
" পৃথিবী হইতে " মাংস।

(৫) ক্ষিতির বিশেষ গুণ — অস্থি।
ক্ষিতি আকাশ হইতে পাইয়াছিল — মাৎসর্য্য
" পবন হইতে " — সংকোচন।
" অগ্নি হইতে " — আলস্য।
" জল হইতে " — রক্ত।

৫

মোট ২৫

কিন্তু শেষোক্ত প্রত্যেকটী হইতেই পঞ্চীকরণে একটী ভূত অপর চারিটীর অংশ গ্রহণ করায়, প্রত্যেকেরই পাঁচ পাঁচটী গুণ উৎপন্ন হইয়াছিল। যথা,—

(১) আকাশের উপরিউক্ত পঞ্চগুণ মধ্যে তাহার বিশেষ গুণ — লোভ।
পবন আকাশের পাঁচ গুণ মধ্যে পাইয়াছিল — কাম।
তেজ " " — ক্রোধ।
জল " " — মোহ।
ক্ষিতি " " — মাৎসর্য্য।

৫

(২) বায়ুর বিশেষ গুণ — ধারণ।
আকাশ বায়ুর পাঁচগুণ মধ্যে পাইয়াছিল " — প্রসারণ।
তেজ " " — উল্লম্ফন।
জল " " — চঞ্চলতা।
পৃথিবী " " — সংকোচন।

৫

(৩) তেজের বিশেষ গুণ — ক্ষুধা।
পবন অবশিষ্ট পাঁচগুণ মধ্যে পাইয়াছিল — তৃষ্ণা।
পৃথিবী " " — আলস্য।
আকাশ " " — নিদ্রা।
জল " " — ক্লান্তি।

৫

(৪) জলের বিশেষ গুণ — রেতঃ।
তেজ পাইয়াছিল — পিত্ত।
পবন " — স্বেদ।
আকাশ " — রস।
পৃথিবী " — রক্ত।

৫

(৫) ক্ষিতির বিশেষ গুণ — অস্থি।
জল পাইয়াছিল — মাংস।
তেজ " — নাড়ী।
পবন " — ত্বক্।
আকাশ " — রোম।

৫

মোট ২৫

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভূতাদির সত্বাংশের সমষ্টি—অন্তঃকরণ; তাহা দুই ভাগে বিভক্ত—মন ও বুদ্ধি। অনেকে অন্তঃকরণকে চারিভাগে বিভক্ত করেন; যথা—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। কিন্তু চিত্ত মনের ও অহঙ্কার বুদ্ধির অন্তর্ভূত বলিয়া অন্তঃকরণকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই মন, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ ও

দশেন্দ্রিয় অথবা এই সপ্তদশ সমষ্টি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ সেই পঞ্চভূত হইতেই উৎপন্ন; সুতরাং তাহারা জড় ভিন্ন কদাচ অজড় বা চৈতন্য হইতে পারে না। এমন কি, এই সূক্ষ্মদেহের কারণ বা বীজস্বরূপ যে অজ্ঞান বা কর্ম্মবীজ, তাহাও অজড় নহে। এক পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন সমুদায়ই জড়, পরিণামী ও নশ্বর। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, সেই অজ্ঞানরূপিণী প্রকৃতিও বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং জীবের পরমগতি মুক্তি লাভ ঘটিয়া থাকে। শ্রীভগবান গীতাতে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ" ইত্যাকার বাক্য এক আত্মা সম্বন্ধেই কহিয়াছেন। ইনি কখনও জন্মেন না বা মরেন না। কারণ অজ্ঞ পদার্থই মরণশীল। যাহার জন্ম আছে, তাহার অবশ্য মৃত্যুও আছে। যাহার জন্ম নাই, তাহার মৃত্যুও নাই; অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে, যাহার মৃত্যু নাই, তাহার জন্মও নাই। এইজন্য শাস্ত্র বলেন "মৃতি-বীজং ভবেজ্জন্ম জন্মবীজং ভবেন্মৃতিঃ॥" মৃত্যু-বীজ জন্মের এবং জন্ম-বীজ মৃত্যুর কারণ স্বরূপ।

সাংখ্য মতে "অপূর্ব্ব দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাত বিশেষেন সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ।" দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সংযোগের নাম জন্ম, আর বিয়োগ বিশেষের নাম মৃত্যু। আমাদের এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সংযোগই জন্ম, আর বিয়োগই মৃত্যু। সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনই ইহার কারণ। ইনি চক্ষুরাদি সূক্ষ্মেন্দ্রিয় অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর বটে, কিন্তু তাহা হইলেও জড়; কেবল মাত্রার তারতম্য মাত্র।

আর্য্য ঋষিগণ এই মনের আবাসস্থান কোথায় এবং ইহার আকার আছে কিনা, ইত্যাকার আলোচনাও যথেষ্ট করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও যথাসাধ্য আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বিখ্যাত দার্শনিক ডেকার্ট Descartes) বলেন "Mind is self knowing principle" অর্থাৎ নিজে যে নিজকে জানিতে পারে, তাহারই নাম মন। *

উইলিয়ম হ্যামিলটন্ বলেন 'Mind can be defined form its manifestation" অর্থাৎ মনেরই বিকাশ ও কার্য্য-কলাপ দেখিয়া মনের সংজ্ঞা করিতে হয়। তিনি বলেন যে "Mind itself is the universal and principal concurrent cause in every act of knowledge" মনই জ্ঞানপরিচায়ক কর্ম্মাদির একমাত্র সার্ব্বভৌমিক ও প্রধান সহকারী কারণ।

কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য পদার্থ মস্তিষ্কে নীত হইলেই মনের কার্য্য হয়। মন যেন এই দেহজালের মধ্যে

---

* আর্য্যশাস্ত্র মতে মন স্বয়ম্প্রকাশ বা জ্ঞাতা নহেন। কিন্তু মন যখন নিরতিশয় নির্ম্মল হইয়া কেবল সত্ত্ব গুণকেই আশ্রয় করেন—যখন রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত হইয়া বিষয়াকারে পরিণত হন না; তখন তিনি আপনি আপনাকে জানিয়া মোক্ষ-পথে গমন করিয়া থাকেন। তখন তাঁহাতে কেবল শুদ্ধ সত্ত্বময় চিন্ময় আত্মারই ছায়া পতিত হইতে থাকে; তখন তাঁহার আর সংকল্প—বিকল্প থাকে না; নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত বিগুণীন থাকেন।

(ক্রমশঃ)

একটী মাকড়সার ন্যায় অবস্থান করিতেছে। বস্তুতঃ মন যেন একটী উর্ণনাভ; নিজেই তন্তুজাল বিস্তারপূর্ব্বক নিজেই তাহা আবার সংহরণ করিয়া থাকে। মন এক পক্ষে মনের বিষয়ীভূত পদার্থ রচনা করে, অন্য পক্ষে মনই তাহা উপভোগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি উপলক্ষ মাত্র। এই প্রত্যক্ষীভূত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে। জ্ঞানাত্মক ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্মদেহে সংস্থিত; উহারা তত্তৎ জ্ঞানাত্মক ইন্দ্রিয়গুলির গোলক বা প্রকাশস্থান মাত্র। আমরা ইহজগতে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, তাহার মূর্ত্তিগুলি আণবিক আকর্ষণে ইন্দ্রিয়াদি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সংযোগে মস্তিষ্কে উপনীত হওয়ার পর প্রতিক্রিয়া হইলেই, আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা মস্তিষ্ক-সম্ভূত জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। মনের এই কার্য্যকে উইলিয়ম হ্যামিল্টন্ "brain consciousness" কহেন। তিনি আরও বলেন যে, "consciousness is, in fact to the mind what extension is to the matter or body"—অর্থাৎ জড়ের সহিত বিস্তৃতি গুণের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত মস্তিষ্কজ্ঞানের সেইরূপ সম্বন্ধ।*

এতৎ সম্বন্ধে মহাত্মা ডেকার্ট্ বলেন যে, আমাদের দেহে একটী অতি সূক্ষ্ম শিরা আছে, তাহার নাম (pinial gland)

---

* "To Descartes, who made extension the sole essential property of matter, and matter a necessary condition of extension, the bare existence of bodies apparently at a distance was a proof of the existence of a continuous medium between them. (Vide Psychometry &c.)

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের (cerebal hemisphere পরিমাণানুসারে জ্ঞান-বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, সভ্যজগৎ ইয়ুরোপখণ্ডে সাধারণতঃ পুরুষের মস্তিষ্ক (মস্তকস্থ) ৪৯ আউন্স এবং স্ত্রীলোকের ৪৪ আউন্স হইয়া থাকে। আর অসভ্য কাফ্রি জাতির মস্তিষ্ক কুত্রাপি ৪৪ আউন্সের অধিক দৃষ্ট হয় না। সুপ্রসিদ্ধ পদার্থবিৎ কুভিয়ার (cuvier) সাহেবের মস্তিষ্ক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তাঁহার মস্তিষ্ক ৬৪$\frac{1}{2}$ আউন্স হইয়াছিল। কিন্তু পরে জনৈক ইষ্টকনির্ম্মাতার মস্তিষ্ক তাঁহার অপেক্ষাও গুরুতর দৃষ্ট হয়। তাহা ৬৭ আউন্স। ইনি ইউনিভার্সিটী কলেজ হাসপাতালে ১৮৪৯ সালে ৩৮ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতীব প্রখরা ছিল।

তাঁহারা বলেন যে, জন্মকালে পুরুষের মস্তিষ্ক ন্যূনাধিক ১৫ আউন্স এবং স্ত্রীলোকের ১২ আউন্স হইয়া থাকে (Bastian—page 363)। সপ্তম বৎসরে পুরুষ জাতি পূর্ণ বয়স প্রাপ্তব্য মস্তিষ্কের $\frac{1}{6}$ অংশ এবং স্ত্রী জাতি $\frac{1}{6}\frac{1}{6}$ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (Bastian. page 354)

তাঁহারা বলেন—বানর শ্রেণীর মস্তিষ্ক ৯ হইতে ২০ আউন্স পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মস্তক-স্থিতের আয়তনের পরিমাণ অনুসারে ওরাঙ্ (orang) প্রথম, গরিলা (gorilla) দ্বিতীয় এবং শিম্পাঞ্জী (chimpanzee) তৃতীয়।

হিন্দুর আত্মরক্ষা।

(স্বধর্ম্ম ও 'স্বদেশী' সাধন।)

ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর আত্মা ধর্ম্মই যে সার।
ধর্ম্মরক্ষাতেই হয় আত্মরক্ষা তার।

ভগবৎকৃপায় হিন্দু চিরধর্ম্মাত্মা। এত অবনতির অধঃপাতে, এত যুগ-যুগান্তরব্যাপী বিপদ-বিভ্রাট-বিপ্লব-বিড়ম্বনার ঘাতাঘাতে এবং অধুনা দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য-মহামারী রাজরোষ প্রভৃতির প্রচণ্ড আঘাতে হিন্দুর ধর্ম্মাত্মতা অদ্যাপি জগতে অতুল! বরঞ্চ ঐহিক সর্ব্বসম্পদ্ হারাইয়া, এখন ধর্ম্মই হিন্দুর দরিদ্রের রতন, অন্ধের নয়ন, সর্ব্বস্ব ধন ধর্ম্মই হিন্দুর এখন অন্তিম আশার একমাত্র লক্ষ্য-পালক, এ বিপদ-সাগরে একমাত্র রক্ষ-ভেলক।

এখনও হিন্দুর হরিভক্তি আছে। এখনও হিন্দুর প্রাণে দয়া-শক্তি আছে। এখনও হিন্দুর সাধুসঙ্গ, ভগবৎ প্রসঙ্গ, সন্ধ্যা-আহ্নিক, শৌচ-সদাচার, ব্রত-উপবাস, দেব দ্বিজ-গুরুভক্তি, গো-অতিথিসেবা, দোল দোল-দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ তর্পণ-তীর্থভ্রমণ কিছু কিছু আছে। এখনও হিন্দু-জগতে মুনি, ঋষি, যোগী, তপস্বী, সাধু, সন্ন্যাসী, অবধূত-উদাসী, শাক্ত-ভক্ত-মুক্ত পুরুষ আছেন। এখনও হিন্দুর গঙ্গা আছেন কাশী-পুরী-অযোধ্যা বৃন্দাবন-কামাখ্যা-চন্দ্রনাথ আছেন। এখনও হিন্দুর বেদ-বেদান্ত আছেন। স্মৃতি-তন্ত্র-পুরাণ-চণ্ডী-গীতা-ভাগবত আছেন। এখনও তুলসীদাসী দোঁহা আছে, রামপ্রসাদী 'মালসী' আছে, বৈষ্ণব-কবির গুণকীর্ত্তন আছে। নগরে নগরে—গ্রামে গ্রামে মধুর খোলে—করতাল-খোলে—'হরি হরি' বোলে হরিসংকীর্ত্তন আছে! তবে আর কি না আছে? রক্ত শুকাইয়াছে, মাংস শুকাইয়াছে, তবু হাড়ের কঙ্কাল আছে। কথায় বলে—"হাড় থাকলে মাস পাওয়া যায়"—তাই আশা আছে। ফলে ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুর আজ বিংশ শতাব্দীতে ধর সাধাশই, কঙ্কাল-বিশিষ্ট, "হ'য়ে ভারিয়ে কাষ্ঠপুত্তলি"—পূর্বের তুলনায় 'নাম মাত্র' যাহা কিছু আছে, তাহা অন্যান্য ঐহিক অভ্যুন্নত জাতির তুলনায় অদ্যাপি জগতে অতুল অদ্বিতীয়—অসাধারণ।

আমাদের সব গিয়াছে, কিন্তু তবু ধর্ম্ম একেবারে যায় নাই। এখন আমরা আমাদের এই 'নিদানের কাণ্ডারী' ধর্ম্মকে প্রাণপণে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, কালে-সকলেরই আবার ফিরে আসার আশা আছে। একটা পুরাতন গল্প আছে, হয়ত অনেকেই জানেন, তবু প্রাসঙ্গিক বলিয়া এ স্থলে সংক্ষেপে বলিতেছি।—

এক সত্যবাদী ধার্ম্মিক রাজা এক নূতন বাজার বসাইয়া ঘোষণা করিলেন যে, "এই নূতন বাজারে বিক্রেতাদের অবিক্রীত দ্রব্যাদি রাজসরকারে ক্রীত হইবে।" এই ঘোষণা ও তদনুযায়ী কার্য্যের ফলে বাজার শীঘ্র জাঁকিয়া গেল। এখন একদিন এক ধূর্ত্তলোক রাজার ধার্ম্মিকতা ও সত্যবাদিত্ব পরীক্ষার্থে উঁচর মাটি, ছেঁড়া চুল, [illegible] ইত্যাদি দ্বারা এক 'অলক্ষ্মী' মূর্ত্তি গড়াইয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ আনিল; কিন্তু 'অলক্ষ্মী' কে [illegible]

ধর্ম্ম-পতিজ্ঞ রাজাকেই উহা কিনিয়া আনিতে হইল। এখন রাজপুরে অলক্ষ্মীর আগমনে রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া পুরী ছাড়িয়া চলিলেন। "বিষ্ণুবক্ষস্থলাস্থিতা" লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পিচলনে বিষ্ণু ঠাকুরটিও চলিলেন। "হরিহর একাত্মা," সুতরাং শিব ঠাকুরও বাহিরিলেন। আবার "একে তিন—তিনে এক" বলিয়া, ব্রহ্মারও আর থাকা হইল না। কাজেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, এই সর্ব্বপ্রধান ত্রিদেবের প্রস্থানে ক্রমে সর্ব্ব-দেব-দেবীই রাজপুরী ছাড়িয়া চলিলেন। সর্ব্বশেষে সমুজ্জ্বল ধবলমূর্ত্তি ধবলবেশ ধর্ম্মদেব প্রস্থানোদ্যত হইলেন। সত্যধর্ম্মানুরোধে রাজা অলক্ষ্মী কিনিয়া, সর্ব্বদেবের প্রস্থানেও বাধা না দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মদেবের প্রস্থানকালে রাজা করযোড়ে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"ধর্ম্ম দেব! আপনি যাইতে পারেন না; আপনার অনুরোধেই আমি অলক্ষ্মী কিনিয়া আনিয়া সবাইকে হারাইলাম। আমি আপনারই জন্য সবাইকে ত্যাগ করিলাম; আপনি কি বলিয়া আমাকে ত্যাগ করিবেন? আপনিই আমার চির আশ্রয়স্থল। আপনিই আমার সার ধন—শেষ সম্বল। জীবনে—মরণে আপনাকে ছাড়াছাড়ি নাই।" তখন ধর্ম্ম ঠাকুরও শক্ত হাতে ঠেকিয়া বলিলেন—"তাইত। তা আমাকে যদি তুমি কোন মতে না ছাড়, তবে আমিও তোমাকে ছাড়িতে পারি না। আমারই শাস্ত্র বলেন—"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"। ধর্ম্মকে যে মারে, ধর্ম্ম তাকে মারেন, ধর্ম্মকে যে রাখে, ধর্ম্ম তাকে রাখেন। তুমি যেখানে সর্ব্বত্যাগী হইয়াও আমাকে রাখিতেছ, সেখানে আমিও অবশ্য তোমাকে রাখিব; সুতরাং আমি থাকিলাম। ধর্ম্ম থাকিলেন। এখন—

"ধর্ম্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্ম্মাৎ প্রভবতে সুখম্।
ধর্ম্মাদ্দেবকৃপা-সিদ্ধি র্ভুক্তিমুক্তিশ্চ শাশ্বতী॥"

অর্থাৎ—

ধর্ম্মেতেই লক্ষ্মী-লাভ, সর্ব্বসুখ-সম্পাদন।
ধর্ম্মে দেবকৃপা-সিদ্ধি ভোগ-মোক্ষ-নিত্যধন॥

অতএব রাজার ধর্ম্মরক্ষা হওয়াতে, ক্রমে রাজলক্ষ্মীও ফিরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, সর্ব্বদেব-দেবী, সর্ব্বসম্পৎ—সর্ব্বসুখৈশ্বর্য্য আবার রাজপুরে বিরাজিত! এই সত্যাচারী ধর্ম্মৈকধারী রাজার অনুকারী যে হইবে, সে সব হারাইলেও আবার সব পাইবে। ধর্ম্মরক্ষাতেই তাহার সর্ব্বরক্ষা হইবে; কারণ ধর্ম্মেই জগৎ—ধর্ম্মেই সর্ব্ব। মনুষ্যের সর্ব্বস্বই ধর্ম্ম। ধর্ম্মই মনুষ্যত্ব।

এই ধর্ম্মের পূর্ণতায় হিন্দু একদিন জগতে আদর্শ মনুষ্য ছিল। আজ তাহারই ক্ষয়ে বা অপচয়ে সেই আদর্শত্বের অদর্শন ঘটিয়াছে। কিন্তু যে টুকু নিদর্শন আছে, তদনুসারিণী সাধনায় ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিলে, কালে সেই ক্ষয়াপচয়ের পূরণে সেই আদর্শত্বের পুনর্দ্দর্শন কখনই দুরাশার দুঃস্বপ্ন নহে। আমাদের আশা হয়, যেখানে এত অবনতিতে—এত ধর্ম্মক্ষতিতে—অদ্যাপি হিন্দু সর্ব্বজাতির ধর্ম্মশিক্ষাসনে আসীন হইবার অযোগ্য নহে, সেখানে সেই ধর্ম্মের পালন-পোষণ অব্যাহত থাকিলে, এই বর্ত্তমান আবর্ত্তময় বিবিধ বিপ্লবের সমবায়-সংক্ষুব্ধ তুমুল তুফানে স্বর্ণযোগ-তরীর বর্ম-হালি ঠিক

রাখিলে, হিন্দু অবশ্য অকূলে কূল পাইবে, দুর্দ্দিনে সুদিন পাইবে, পূর্ব্বগৌরবে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা পাইবে; এবং "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" বাক্যের যথার্থ সার্থকতায় হিন্দু-ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে সমুজ্জল হইবে।

'হিন্দুর আত্মরক্ষা' কথাটি এই হিন্দুস্থানের আকাশে ধ্বনিত হইলে, তাহার অর্থ হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষাই বুঝায়। "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"— এটি ব্যক্তিগত ব্যষ্টিভাবের আত্মরক্ষা-উপদেশক নীতিবাক্য; সুতরাং আপন শরীর রক্ষা বা প্রাণ-বাঁচানোই ইহার প্রধান লক্ষ্য। "চাচা আপনা বাঁচা" এই বাঙ্গালা নীতি-প্রবাদ—ভাবিয়া দেখিলে উহারই ভাবানুবাদ। আবার যদি জাতি-গত সমষ্টিভাবে উহার অর্থালোচনা করা যায়, তবে "আত্মরক্ষা" শব্দটির বিস্তৃত বিশ্লেষণে ধর্ম্মরক্ষাই ব্যাখ্যাত হইয়া পড়ে; কিন্তু উহা এই মোক্ষ-ভূমির হিন্দু পক্ষে। অন্যান্য ভোগভূমির ইহসর্ব্বস্ব জাতির পক্ষে ঐহিক বা ভৌতিক সত্তা ও স্বার্থরক্ষাই "আত্মরক্ষা" (self defence) পদের অর্থ।

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের শরীররক্ষা—প্রাণরক্ষা, কৃষি-শিল্প বাণিজ্য-রক্ষা, স্বদেশী ভাব, স্বভাব, শিক্ষা ও সভ্যতা-রক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষায় বীর্য্যরক্ষা, স্বাবলম্বন-শিক্ষায় শৌর্য্য-রক্ষা, বিপদে-সম্পদে ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য রক্ষা এবং সাধারণতঃ সাংসারিক সর্ব্ববিষয়ে যথাসম্ভব পরমুখাপেক্ষিতার অভাব ও স্বাধীন ভাবের প্রভাব রক্ষা দ্বারা "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্" এই সারবত্তা শাস্ত্রোক্তি সুপ্রমাণিত করাই কি কেবল আত্মরক্ষা? হিন্দুর পক্ষে এই স্বদেশী আন্দোলনে "আত্মরক্ষা" পদের উৎকর্ষ-অর্থে উহার উপরেও হিন্দুর আচার ও আধ্যাত্মিকতামূলক ধর্ম্মরক্ষা।

স্বদেশী আন্দোলনে কতকগুলি লোকের হিন্দুত্ব-বিরোধী মত প্রচারণে ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর আত্মস্বরূপ ধর্ম্মের আচার ও আধ্যাত্মিকতা রূপ দুটি মর্ম্ম স্থলে আঘাত পড়িতেছে, এবং এই আঘাতের ক্রমবেগ-বর্দ্ধনে হিন্দুর আত্মরক্ষার ব্যাঘাত-সম্ভাবনা বাড়িতেছে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ চিন্তাশীল হিন্দুর এই বেলা তাহা বুঝিয়া সতর্ক থাকা আবশ্যক। স্বদেশী আন্দোলন আমাদের গোড়া ধরিয়া নাড়া দিয়াছে। ইহা নিরবচ্ছিন্ন বিদেশীয়তায় সমাচ্ছন্ন আমাদের বর্ত্তমান সত্তার আমূল পরিবর্ত্তনে উদ্যত। বঙ্গ-বঙ্গ-সম্ভূত এই আন্দোলন-তরঙ্গ আজ যে বিশাল ভারতের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বদেশী ভাবে বিপ্লাবিত করিতেছে, আস্তিক স্বদেশানুরাগী হিন্দু ইহার মূলে ঐশ হস্ত দেখিতেছেন। সুতরাং ভীত বা নিরাশান্বিত হওয়ায় কোন হেতু নাই। হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের আচাররূপ শোণিত-প্রবাহ সুস্থ ও আধ্যাত্মিকতা রূপ মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ থাকিলে আর চিন্তার কোন কারণ নাই। ঐ দুটি ঠিক থাকিলেই, স্বদেশী আন্দোলন আমাদের একান্ত প্রয়ো-জনীয়, প্রার্থনীয়, সর্ব্বানর্থবাধক ও সর্ব্বার্থ-সাধক। কিন্তু ও দুটির বিনাশ বা হ্রাস ঘটাইয়া অপর সর্ব্ববিধ উন্নতি বা সর্ব্বসিদ্ধি-সমৃদ্ধি হিন্দুর বিন্দুমাত্র বাঞ্ছনীয় নহে।

স্বদেশী আন্দোলনের দোহাই দিয়া, আজ কাল কতকগুলি পাশ্চাত্যদর্শন-কর্ষিত-শীর্ষ

ন্যায়-নাস্তিকাদর্শ নব্য তার্কিক, কতিপয় একাচার-একাকার-'নিরাকার' ভ্রাতা, দুই চারি জন বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী বৌদ্ধ বাবু, আরও কতকগুলি উপধর্ম্মী, অপধর্ম্মী বিধর্ম্মী, সর্ব্বধর্ম্মী (ইব্রাহিমধর্ম্মী *) লোকের মত, যথা—

১। 'National dinner' চালাও।
২। বিধবার বর মিলাও।
৩। জাতিভেদ-বন্ধন ছুটাও।
৪। বর্ণাশ্রমাচার উঠাও।
৫। খৃষ্টান-মুসলমানের খানা খাও।
৬। ব্রাহ্মণ-চামার-ভেদ ভাগাও।
৭। একাকারে-একাচারে 'স্বদেশী' জাগাও।
৮। 'হরিবোল'-বদলেও "বন্দে মাতরম্" লাগাও।

(ইত্যাদি)

এ সব মতের উদ্দেশে হিন্দুর দূর হইতে নমস্কার! স্বধর্ম্মহীন 'স্বদেশী'তে হিন্দুর সঘৃণ-থুৎকার! হিন্দুর পক্ষে স্বধর্ম্মহীন 'স্বদেশী'ই অসম্ভব। বরং যাহাতে স্বধর্ম্মের পোষণ ও শোধন, তাহাই স্বদেশী সাধন। আর যাহাতে স্বধর্ম্মের বিকার বা সংহার, তাহা স্বদেশীর ব্যভিচার! অন্ততঃ মোটা-মুটি স্বধর্ম্মে থাকিয়া, বরং কিছু 'স্ব-বিদেশী'ও গ্রাহ্য, কিন্তু স্বধর্ম্ম হারাইয়া সেই বিড়ম্বিত 'বি-স্বদেশী' ত্যাজ্য!

স্বধর্ম্মশূন্য 'স্বদেশী' "কাঁটালের আম-সত্ত্ব" বিশেষ। হিন্দু স্বধর্ম্ম, স্বশাস্ত্র, স্ব-আচার ছাড়িয়া 'স্বরাজ' চায়না। ভূত স্বরাজের সমাধি-ক্ষেত্রে বরং বর্ত্তমান বি-রাজ স্বীকার, কিন্তু সে অদ্ভুত ভাবী স্বরাজের নামে নমস্কার! প্রকৃতপক্ষে 'স্বদেশী' হিন্দুর জীবন, 'স্বরাজ' হিন্দুর আকাঙ্ক্ষিত ধন, বিদেশী-বর্জ্জনে হিন্দুর সুদৃঢ় পণ। কিন্তু সর্ব্বোপরি হিন্দুর স্বধর্ম্মের সংস্থাপন! কারণ উহাতেই তাহার সর্ব্বারাধ্য—যুগযুগান্তর-সাধ্য—সর্ব্বস্ব-ধন—হৃদয়-রতন শ্রীভগবানের শ্রীআসন!

যদি মাথাই খারাপ হইল, তবে শরীরের পুষ্টিতে ফল কি? "লোকটা পাগল হইয়া কিন্তু বেশ মোটা গোটা হইয়াছে!" এটা কেমন খোস্ খবর! অবিকৃত মস্তিষ্কে প্রকৃতিস্থ থাকিয়া দেহ-পুষ্টি যেমন প্রার্থনীয়, স্বধর্ম্মাচার ঠিক রাখিয়া, স্বদেশীভাব ও স্বরাজ লাভ হিন্দুর তদ্বৎ বাঞ্ছনীয়। যদি স্বধর্ম্মাচারই হিন্দুর হিন্দুত্ব বা আত্মস্বরূপত্ব হয়, তবে তাহারই অব্যাঘাতে হিন্দু আত্ম-রক্ষা করিয়া 'স্বদেশী' সাধনে সমর্থ, নচেৎ আত্মঘাতী হইয়া, নরকের 'বায়না' লইয়া, ইহ-পরকাল ডুবাইয়া, জাতি-ধর্ম্ম ঘুচাইয়া যে স্বদেশী স্বীকার, তাহার উদ্দেশে (আবার বলি) হিন্দুর কোটি যোজন দূর হইতে কোটি নমস্কার!

বিদেশীবর্জ্জন, বেশ কথা। হিন্দুর ধর্ম্ম-নাশক বা আত্মনাশক—সুতরাং সর্ব্বনাশক অশুদ্ধ-নিষিদ্ধ বিদেশী বস্তুর যথাসম্ভব ও যথাশক্তি বর্জ্জন হিন্দুর অবশ্য সর্ব্বপ্রযত্ন-সাধ্য, কেননা হিন্দু তাহাতে ধর্ম্মতঃ ও শাস্ত্রতঃ বাধ্য। আর যদি সেই ধর্ম্মকে

---

* ইংরাজের ই, ব্রাহ্মের ব্রা, হিন্দুর হি, মহাম্মদীয়ের (মুসলমানের) ম—ই-ব্রা-হি-ম! অতএব যিনি দরকার মত সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাকেই বঙ্গ-ভাষায় 'ইব্রাহিম' বলা যায়। (লেখক)

হেলিয়া, শাস্ত্রকে ঠেলিয়া, সামাজিক জাতি-বর্ণাচার চরণে দলিয়া, পাশ্চাত্য ধরণের (হাল্ ফ্যাসনের) 'patriotism' মতের স্বদেশীঅর্জ্জন-সাপেক্ষ বিদেশীবর্জ্জন করিতে হয়, তবে ফলিতার্থে সে ধর্ম্মনৈতিক বিদেশীয়তা অপেক্ষা রাজনৈতিক বিদেশীয়তা বরং শ্রেয়স্কর। হিন্দুর বিচারে সেরূপ স্বধর্ম্মপরিপন্থী বিদ্বেষগন্ধী বৈদেশিক 'বয়কট্' (বর্জ্জন) অপেক্ষা কর্জ্জনের বঙ্গভঙ্গও বহনীয়, মর্লী-মিণ্টোর শাসন-রঙ্গও সহনীয়, কৃষ্ণাঙ্গ-ঘৃণী শ্বেতাঙ্গ-সঙ্গও গ্রহণীয়!

মোক্ষপ্রদ স্বধর্ম্মই হিন্দুর যুগ-যুগান্তর-সেবিত—জন্ম-জন্মান্তর-সাধিত, অন্যান্যদেশ-দুর্লভ, প্রকৃত ভারত-বৈভব—ভারত-গৌরব, প্রকৃত স্বদেশী বস্তু। এই আসল স্বদেশীই কলিত পক্ষে কর্ম্মভূমি ভারতে হিন্দুর কর্ম্মযোগের ফল, অন্তর-বাহিরের বল, ইহ-পরকালের শান্তিস্থল, অনন্ত জীবন-সম্বল। কিন্তু এই "বয়কট্"-আখ্য বিদেশী বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সেই, আসল স্বদেশীটির‌ও বর্জ্জন এবং কেবল কতিপয় অস্থায়ী, ঐহিক, ভৌতিক ও সাময়িক 'স্বদেশী' অর্জ্জন হিন্দুর একান্ত অস্বীকার্য্য ও অসহ্য। যাহা হিন্দুর আত্মরক্ষার বাধক, বরং আত্মহত্যার সাধক, আত্মবান হিন্দু তাহাতে আস্থাবান হওয়া অসম্ভব ও অস্বাভাবিক।

আসল 'স্ব' হারাইয়া, কি লইয়া আমরা স্ব-তন্ত্র বা স্ব-অধীন (স্বাধীন) হইব? কতিপয় অনিত্য জড়াত্মক বস্তু,—কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য—বিত্তাদি, কাপড়-লবণ-চিনি ইত্যাদি;—বড় জোর—স্বদেশী সমাজ-পরিষৎ (সামাজিক শাসন-যন্ত্র-সভা), স্বদেশী বিচারালয় (সালিসী বৈঠক), স্বদেশী বিদ্যালয় (National school) মিলনালয় (Fedaration hall), স্বদেশী জাহাজ, স্বদেশী রেল; অধিকন্তু স্বদেশের বাঁশঝাড়ের স্বদেশী লাঠী, আর স্বদেশের মাঠের উর্ব্বরা মাটি! বর্ত্তমান সময়োপযোগী অবস্থানুসারে এই সমস্ত স্বদেশী অর্জ্জনই বিশেষ বাঞ্ছনীয় হইলেও, হিন্দুর সর্ব্বস্ব আধ্যাত্মিক সাধনার কর্ম্মতন্ত্রাধার যে শাস্ত্রোক্ত স্বধর্ম্মাচার, তাহার অবিরোধে ও অব্যাঘাতেই উক্ত বাঞ্ছনীয়ত্ব স্বীকার্য্য ও সাদর শিরোধার্য্য; অন্যথা—অগত্যা অগ্রাহ্য।

হিন্দু সব সহিতে পারে, কিন্তু আত্ম-সত্বের অবনতি, ধর্ম্মের ক্ষতি—সুতরাং হিন্দুত্ব বা জাতীয় বিশেষত্বের বিকৃতি বা অধোগতি হিন্দুর অসহ্য। সাধক হিন্দু ঐহিক সুখ-সম্পদকে মূত্র-পুরীষবৎ—এমন কি, অনিত্য জীবনকেও নখাগ্রবৎ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু তাহার স্বধর্ম্ম-স্পৃষ্ট, স্বশাস্ত্রনিষ্ঠ সদাচার-পুষ্ট, নিত্যসম্পদ্ আত্মসত্ব হিন্দুত্ব সে কিছুরই বিনিময়ে বিসর্জ্জন করিতে পারে না। হিন্দুর সর্ব্বধনাধিক প্রাণাধিক সেই স্বধর্ম্ম-সত্ব বা হিন্দুত্ব রক্ষার্থে—অর্থাৎ আত্মরক্ষার্থে হিন্দু ঐহিক উচ্চতার তুচ্ছকারী, কিন্তু পারমার্থিকতার দীন ভিখারী; বাহ্যভোগে বিরাগী, অন্তর্যোগেই অনুরাগী। ঐ অর্থে হিন্দু অট্টালিকার অনভিলাষী, কুটীর-কন্দর-তরুতলবাসী। ক্ষীর-সরে অনিচ্ছুক, কন্দ-মূল-ফলভুক্! ধুতি-চাদরেও আদর-হীন, কৌপীনেই সুখোধীন! হিন্দুভক্ত-চূড়ামণি তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"এক টুক্‌রা কৌপীন ঔর্ ভাজি বিন্ লোণ,

রামরঘুবর উর্‌ বৈঠে—ইন্দ্রপুর বা কোন্‌॥"

এক টুক্‌রা কৌপীনের স্থাকড়া, আর রামায় ছুটো ভাজা-ভুজো, তাতে নুণেরও দরকার নাই; দেহধর্ম্মার্থে ঐটুকুই যথেষ্ট। যদি রঘুবর শ্রীরামচন্দ্র হৃদয়ে থাকেন, তবে ইন্দ্রপুরীর সুখ-সম্ভোগ তার কাছে কোন্‌ ছার? ভগবদ্‌ভজন, স্বধর্ম্মাচার-সেবন হিন্দুর সর্ব্বাগ্র মুখ্য সাধন। আর ধন-ধান্য, বসন-ভূষণ, শিল্প-বাণিজ্য, বল-বীর্য্য, স্বদেশ-স্বজাতি-স্বজন, স্বরাজ-স্বায়ত্তশাসন, এ সব অত্যাবশ্যক হইলেও, পূর্ব্বোক্ত মুখ্যের তুলনায় গৌণ। প্রয়োজনস্থলে মুখ্যের রক্ষার্থ গৌণও বর্জ্জনীয়, কিন্তু গৌণের অপেক্ষায় মুখ্যে উপেক্ষা-অপরাধ অমার্জ্জনীয়। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু-পক্ষে এই মুখ্য-গৌণের বিরোধিতার স্থলগুলি সাবধানে অতিক্রম করিয়া স্বদেশ-সেবাব্রত চালাইতে হইবে। ফলে স্বদেশ-সেবনে বা 'স্বদেশী' সাধনে হিন্দুর প্রাণান্ত-পণ; কিন্তু হিন্দুর আত্মরক্ষার অনন্ত অবলম্বন স্বধর্ম্মাচারই তাহার প্রাণাধিক ধন।

"সগৌরবে স্বধর্ম্ম-আচার শিরে রয়।
সপ্রেমে স্বদেশ-সেবা হৃদয়ে উদয়॥
স্বধর্ম্ম মস্তকে ধরি—স্বদেশ হৃদয়ে।
জাগ হিন্দু! ওঠ হিন্দু! অরুণ-উদয়ে॥"

এই কবি-গীতি রূপ বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য-নীতি-সূত্রটি যেন আমরা কুত্রাপি কাহারও কোন কথার ঝোঁকে বা কোন লেখার কুহকে কদাচ না ভুলি।

ভাবিয়া দেখিলে, ভারতীয় হিন্দুর তত্ত্ববিচারে হিন্দুর স্বধর্ম্মাচার-সাধন-শুদ্ধ চিত্তেই চরমোৎকর্ষ-উপাসনার পরমোৎকৃষ্ট ফল শ্রীহরির শ্রীচরণ-কৃপাশ্রয়স্থল! উহাই হিন্দুর প্রকৃত স্বদেশ! কোন পরমার্থ-প্রসঙ্গসেবী ভক্ত বঙ্গকবি গাহিয়াছেন—

"মন! চল নিজ নিকেতনে॥
সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে?"

তত্ত্বদৃষ্টি-পূত নেত্রে এ মর্ত্ত্য-সংসারক্ষেত্র বিদেশ বৈ কি। অথচ এই বিদেশেই সেই স্বদেশযাত্রার পথের সম্বল কর্ম্মযোগের ধর্ম্ম-বল সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। উহা আর কুত্রাপি মিলিবে না। এই জন্যই এই মর্ত্ত্যসংসার কর্ম্মভূমি। স্বর্গ-নরক দুইই জীবের ভোগভূমি। ইষ্টচরণাশ্রয়ই কেবল মোক্ষভূমি। মুক্তের আর পুনরাবৃত্তি নাই। এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান গাহিয়াছেন—
"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"
অর্থাৎ—

যথা গেলে নাহি প্রত্যাগতি।
সে মম পরম ধাম অতি॥

কর্ম্মফলের বীজস্বরূপ বাসনার ধ্বংস হইলে তবে জীব মোক্ষপ্রাপ্ত বা মুক্ত হয়; সুতরাং পুনঃ বাসনা-বীজোদ্ভূত অদৃষ্ট-বৃক্ষ-জাত কর্ম্ম-ফল ভক্ষণার্থে মোক্ষধাম ছাড়িয়া আর কর্ম্মভূমি মর্ত্ত্যধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। ভগবচ্চরণ-কৃপাশ্রয়-স্থান—সেই পরম-প্রেম-রসাবিষ্ট ইষ্টধামই তত্ত্বদৃষ্টরূপে মর্ত্ত্য-মানবের যথার্থ স্বদেশ। বৈকুণ্ঠ, গোলোক, সূর্য্যলোক, গাণপত্যলোক, দেবী-লোক, শিব-লোক বা কৈলাস, পঞ্চ ইষ্টোপাসনা-ভেদে যে কোন পৌরাণিক মোক্ষধামের নাম করুন না কেন, ফলকথা "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" বাক্যের বিষয়ীভূত ইষ্টপ্রেমাশ্রয়

রূপ চিরবিশ্রামস্থলই পরমার্থসাধকের যথার্থ স্বদেশ। অতএব অবশ্য-গন্তব্য সেই স্বদেশের একান্ত আবশ্যকীয় ধর্ম্ম-পাথের সংগ্রহের অপেক্ষাতেই কর্ম্মভূমিকেও 'বিদেশ' বলিয়া উপেক্ষা করার যো নাই। সুতরাং স্বদেশী আন্দোলনে এই তত্ত্বজ্ঞানীর "সংসার-বিদেশে" যদি ইহলৌকিক সর্ব্ববিধ উন্নতিরই সত্য মাত্র করিতে হয়, তবে তাহাও সামান্ত কথা নয়। ফলতঃ হিন্দুত্বের অব্যাঘাতে স্বদেশী আন্দোলনের শুভফল হিন্দুর ঐহিক-পারত্রিক, উভয়বিধ সিদ্ধি-সমৃদ্ধিরই যথার্থ সম্বল হইতে পারে। স্বধর্ম্মাচারের অব্যাহতিতে হিন্দুর আত্মরক্ষার অবিরোধী স্বাবলম্বন-নিষ্ঠ স্বদেশী সাধন হিন্দুর বাহ্যোন্নতির সঙ্গে ২ আত্মোন্নতিরও প্রকৃষ্ট অবলম্বন। স্বদেশী অর্জ্জনের সঙ্গে ২ বিবিধ অশুদ্ধ নিষিদ্ধ বিদেশী বস্তু বর্জ্জনে হিন্দুর ধর্ম্মাচার রক্ষার মর্ম্মগত ফল আধ্যাত্মিকতারও যে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে চিন্তাশীল হিন্দুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব সতর্ক—অথচ সুদৃঢ় স্বদেশী সাধনে আত্মরক্ষার্থী হিন্দুর স্বার্থবুদ্ধি, সহানুভূতি—ফলে একান্ত রতি-গতি-মতি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্বধর্ম্মাচারের অপ্রতিকূলে—সুতরাং আত্মরক্ষারই অনুকূলে যে সাত্ত্বিকতাশিষ্ট অবিদ্বেষ-বিশিষ্ট নিষ্কাম স্বদেশী সাধন, তাহা আমাদের জগদিষ্ট কৃষ্ণবাক্য—জগন্মান্য গীতা-শাস্ত্রেরই উপদেশানুসরণ মাত্র। এতাবতা এবম্বিধ আত্মরক্ষক স্বদেশী আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করিতে হিন্দু যথাসাধ্য ধর্ম্মতঃ বাধ্য ৮

উপসংহারে, আমরা অত্র প্রবন্ধ-প্রতিপাদ্য বিষয়ে একটি মাত্র আদর্শ উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের নিবেদন শেষ করিব। প্রাচ্য পৃথিবীর মুখোজ্জ্বল—ইউরোপ্-আমেরিকাও ঈর্ষ্যাস্থল ক্ষুদ্র জাপানরাজ্য—এই বহু ও বিবিধ জাতি-ধর্ম্ম সমাকীর্ণ প্রকাণ্ড ভারত ভূখণ্ডের তুলনায় কত ক্ষুদ্র! উহা মহাদেশপ্রায় ভারতের একটি প্রত্যন্তবিশেষ প্রদেশতুল্য। কিন্তু এই প্রশান্ত মহাসিন্ধুর দ্বীপ-বিন্দু জাপানেও অন্ন ২ লোক লইয়া অনেকগুলি জাতি-ধর্ম্ম সন্নিবিষ্ট। প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্ম, সিণ্টো ধর্ম্ম, কঙ্ফুসিয়ান্ ধর্ম্ম, আদিম বৌদ্ধধর্ম্ম, আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, ইত্যাদি। এই সমস্ত জাতিধর্ম্ম-ভেদে সামাজিক আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়া-কর্ম্মেরও অল্প-বিস্তর ভেদ আছে। কিন্তু তথাপি দেশের কাজে সব এক প্রাণ! এক জাপান-মাতৃভূমির সন্তান! তাই স্বদেশীয়তার সেই মায়ের সেবায় সকলেই সমকর্ত্তব্যকারী ও সমদায়িত্বধারী ভ্রাতা।—সামাজিক অনেকত্ব সত্ত্বেও, রাজনৈতিক ও প্রজানৈতিক একত্বে গাঁথা। সুতরাং জাপের জাতীয় জীবন রাজশক্তি ও প্রজা-শক্তির সুসম্মিলনে ঐক্যে সখ্যে সমলক্ষ্যে একসূত্রে বাঁধা। তাই জাপান আজ আদর্শ দেশ, সার্থক অরুণোদয়-দেশ (Land of rising Sun)—এসিয়ার গৌরব-ভূমি—আশার খনি, পূর্ব্ব-পৃথিবীর মুকুট-মণি! জাপানের এই জলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্ত দৃষ্টি করিয়াও কেহ কেহ বলেন, "এক দেশস্থ বিভিন্ন জাতি-ধর্ম্মীগণের সামাজিক সম্মিলন অর্থাৎ—আহারে আচারে, আদান-প্রদানে একীকরণ ভিন্ন

একতাসংস্থাপন ও স্বদেশীয় জাতীয় জীবন সংগঠন অসম্ভব ; অতএব ভারতে সব 'এক ঢালাও' একাচার—একাকার চালাও। * হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, শিখ, পার্শী, প্রভৃতি পরস্পরের আদান-প্রদান ও ভোজ্যান্নতা বিধান দ্বারা সকলেরই স্বধর্ম্মাচারিত্ব—জাতীয় বিশেষত্ব একত্রে মিলাইয়া গুলাইয়া, এক প্রকাণ্ড খিঁচুড়ী প্রস্তুত করিয়া, ভারত-মাতার ভোগ লাগাও! তারপর সেই ভোগের প্রসাদ পাও এবং ভারই বলে—তারই ফলে 'স্বদেশী' সাধনে সুসিদ্ধ হও।" হিন্দুর আত্মরক্ষার প্রতিকূল—বরং আত্ম-হত্যারই অনুকূল এই মোহাক্রান্ত মতে হিন্দুর একান্ত অমত। আত্মবিশেষত্ব হারাইয়া, বাহ্ লাভের অশেষত্বও কার্য্যতঃ কিছুই নয়। স্বার্থের সমত্বস্থলে, ধর্ম্মাচারের বিভিন্নত্বেও ঐক্য সখ্য অসম্ভব নয়। আবার সমধর্ম্মী জাতিদেরও স্বার্থের সংঘর্ষে ঘোর সংগ্রামও সংঘটিত হয়। অতীতসাক্ষী ইতিহাসে উদাহরণের অভাব নাই। কৌরব-পাণ্ডব, মোগল-পাঠান, রাজপুত-মহারাষ্ট্র, চীন-জাপ, বুয়র-বৃটিশ, ইহারা এক হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান রূপে সম-জাতিধর্ম্মী হইয়াও, শুধু স্বার্থ-সংঘর্ষেই পরস্পর ঘোর সংগ্রাম করিল। 'হেগ' নগরের শান্তি সমিতি ত কালি বসিয়াছে, কিন্তু পরশু পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য খৃষ্টান রাজারা স্বার্থ সংঘর্ষে সজাতি সধর্ম্মীর সঙ্গে রণরঙ্গে মাতিয়াছেন। ভারতে বহুবিভিন্ন জাতি ধর্ম্মীর একত্র বাস থাকি-লেও, অধুনা এক রাজতন্ত্রে, এক শাসন-যন্ত্রে, প্রায় একরূপ বিধি-ব্যবস্থায় ও প্রায় একরূপ নৈসর্গিক অবস্থায়, স্বার্থ-সাম্যস্থলে একতাসংস্থাপন ও ভারতীয় প্রজানৈতিক জাতীয় জীবন সংগঠন অসম্ভব বা অসাধ্য নহে। অথচ কিন্তু সুসম্ভব ও সুসাধ্যও নহে। তবে কিনা, স্বদেশানুরাগী আস্তিক হিন্দু আশা করেন যে, ভগবৎ-কৃপায় এই স্বদেশী আন্দোলনে ভগব-দিচ্ছাই 'স্বদেশী' বেশে এদেশে অবতীর্ণ; অতএব অসম্ভবও সুসম্ভব হইবে, অসাধ্যও সুসাধ্য হইবে। সর্ব্ব-শক্তিমান্ বিশ্বাত্মা ভগবানের সানুগ্রহ সহায়তায়, তাঁহার চিরচরণাশ্রিত হিন্দুজাতি আত্মরক্ষা করিয়াই 'স্বদেশী' স্বার্থরক্ষায় সমর্থ হইবে।—অন্তর্বাহ্যনির্ব্বিশেষে—ইহ-পরত্র উভয় স্বদেশে 'স্বদেশী' সাধনায় সিদ্ধ হইবে।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

---

* অল্পদিন পূর্ব্বে আমাদের "স্বদেশী" ব্রতের বিকট ও নির্লজ্জ বিরোধী "ইংলিস্-ম্যান্" পত্রে এই ভাবের একটি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে যে,—স্বদেশী আন্দো-লনে ভারতীয় জাতিভেদ ও আচার কুসংস্কার শিথিল হইলে, তদ্দ্বারাই এই 'স্বদেশী' হুজুগ্ কমিবে; কেননা বিলাতী কাপড়, লবণ, চিনি প্রভৃতি ধর্ম্মাচার-বিরুদ্ধ অশুদ্ধ বস্তু বোধে তৎসমস্ত ত্যাগের তীব্র ইচ্ছা ও আবশ্যকতা-বোধ থাকিবে না, ইত্যাদি।—কথাটা 'একাকার'-বাদীদের ভাবিবার বিষয়। ফলে হিন্দুর কোন ভয় নাই। ভগবৎকৃপায় হিন্দুর ধর্ম্মাচার বহুবিপ্লবাগ্নি-পরীক্ষাপূত।

(হিঃ সং)

বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ।)

(ক) লোকনাথ বুদ্ধ বলিয়াছেন "ইমে খোতে ভিক্খবে ধম্মা, গম্ভীরা, দুদ্দশা, দুরনু-বোধা সন্তা, পনীতা অতক্কাবচরা, নিপুণা, পণ্ডিতবেদনীয়া, যে তথাগতো সয়ং অভি-ঞ্ঞায় সচ্ছিকত্বা পবেদেতি"।

ব্রহ্মজালসুত্তং ।

হে ভিক্ষুগণ! এই যে ধর্ম্ম সকল (লোকুত্তর) ইহারা গম্ভীর, দুর্দ্দশ, দুরন্ধবোধ, শান্ত, পনীত বা পূর্ণরূপে মধুর, তর্কমাত্রের অগোচর, নিপুণ বা সূক্ষ্ম ও পণ্ডিতবেদনীয়। তথাগত ইহা স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া প্রবেদন বা উপদেশ করিতেছেন। অতএব বুদ্ধই লোকুত্তর ধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তা।

(খ) বৌদ্ধদের সীলব্বত পরামাস নামক সংযোজন বা বন্ধনের বিবরণ আছে "ইতো বহিদ্ধা সমন ব্রাহ্মণানং ইত্যাদি"।

ধম্মসঙ্গনি ; নিক্খেপকাণ্ড।

অর্থাৎ এই শাস্ত্রের (বৌদ্ধ শাস্ত্রের) বাহিরে যে সীল ব্রতের দ্বারা শুদ্ধি ইত্যাদি, তাহাই উক্ত বন্ধন। অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রের বহির্ভূত অন্যশাস্ত্রের দ্বারা বন্ধন মোচন হয় না, অর্থাৎ তাহাতে নির্ব্বাণের প্রকৃত মার্গ নাই।

(গ) বৌদ্ধশাস্ত্রে সাংখ্য যোগী-ঋষি-গণের উল্লেখ নাই। যদি তাঁহারা পারদর্শী হইতেন, তবে অবশ্য উল্লেখ থাকিত। এত-দুত্তরে বক্তব্য এই যে—আর্ষশাস্ত্রের যোক্ষ যে ব্রহ্মলোকে গমন পর্য্যন্ত, লোকাতীত নির্ব্বাণ মুক্তি যে আর্ষশাস্ত্রে নাই, ইহা অজ্ঞতা মাত্র। পূর্ব্বেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধদের প্রথম যুক্তিতে যে "তথাগত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ করিতেছেন" এই বাক্য আছে, তন্মধ্যস্থ 'স্বয়ং' শব্দের অর্থে কেবল তথাগতই উহার আবিষ্কর্ত্তা, এরূপ নহে। উহার অর্থ—তথাগত নিজে সাক্ষাৎ করিয়া বলিতেছেন; শুনিয়া বা না অনুভব করিয়া বলেন নাই।

বৌদ্ধদের "দিট্ঠুপাদান" (মিথ্যা দৃষ্টি গ্রহণ করিয়া থাকা) নামক দোষের বিব-রণে আছে :—"ন থ লোকে সমন ব্রাহ্মণা যে সম্মগ্গতা সম্মাপটিপন্না। যে ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সয়ং অভিঞ্ঞায় সচ্ছিকত্বা পবেদেন্তীতি।" (ধম্মসঙ্গনি। উপাদান গোচ্ছকং।) এস্থলে 'সয়ং' শব্দের অর্থ ঠিক উপরের ন্যায়। বিশেষতঃ কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যে সর্ব্বোচ্চপদ লাভ করিয়া তদ্বিষয়ে উপদেশ করেন নাই, ইহা দুষ্ট মত। এই দুষ্ট মত (দিট্ঠুপাদন) অবশ্য বুদ্ধদেবের ছিল না, অর্থাৎ তিনি অবশ্যই পারদর্শী সমন ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন ও তাঁহাদিগেতে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

বৌদ্ধদের তৃতীয় যুক্তিতে বক্তব্য এই যে—নির্ব্বাণ ধর্ম্ম যে পূর্ব্বকাল হইতে প্রচ-লিত ছিল, এই বিশ্বাসে সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই কতক-গুলি সাধারণ বাক্য পাওয়া যায়। সেই সমস্ত stock passages বা সাধারণ বাক্য সর্ব্বত্রই উদ্ধৃত দেখা যাওয়াতে, তাহা অতি

প্রাচীন এবং বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। তাঁহাদের তৃতীয় ধ্যানের লক্ষণে আছে, "যন্তং অরিয়া আচিক্খন্তি উপেক্খকো সতিমা সুখবিহারীতি" অর্থাৎ ধ্যান বিষয়ে আর্য্যেরা বলেন "উপেক্ষক, স্মৃতিমান্ সুখবিহারী।" এই আর্য্যেরা*কে, বুদ্ধদেব কোন্ আর্য্যদের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন? অবশ্যই তৎপূর্ব্বেকার যোগাচার্য্যদের বাক্য। তাঁহাদেরই বুদ্ধদেব আর্য্য বা পারদর্শী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ধ্যানচর্চ্চা যে পূর্ব্ব হইতেই ছিল, বুদ্ধের শিক্ষক আড়ার কালাম, (যাঁহাকে অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে সাংখ্যমতাবলম্বী বলিয়াছেন,) তিনি যে ঐ সব ধ্যানে পারদর্শী ছিলেন, বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহার স্পষ্টই উল্লেখ আছে। মজ্ঝিমনিকায়, অথপালিনি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ইহাতে কোন কোন বৌদ্ধেরা বলিবেন যে, উহা পূর্ব্বতন বুদ্ধদের উক্তি অনুসারে বলা হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী বচনে বলিলে That is looking too far back, কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী কাশ্যপ বুদ্ধের ২০,০০০ বৎসর পরমায়ু ছিল। তাঁহার ধর্ম্ম ৭০,০০০ বৎসর বর্ত্তমান ছিল; পরে লোপ হইবার বহু বহু সহস্র বৎসর পরে গৌতম বুদ্ধ হন।

প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধের কথাবার্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ অধিকাংশ বৌদ্ধশাস্ত্রই তাঁহার অনেক পরে রচিত। মনে কর, ব্রহ্মজাল সূত্র; ইহার শেষে আনন্দ বক্তা থাকাতে, উহা আনন্দের পরবর্ত্তী কোন লোকের দ্বারা রচিত। বিশেষতঃ যখন বুদ্ধ ঐ সূত্র বলেন, তখন দশ হাজার লোকধাতু কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইত্যাদি অলীক কথা থাকাতে, যখন তাদৃশ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, যখন তাহার জীবিত সাক্ষী ছিল না, তাদৃশ উত্তর কালে উহা রচিত বলা যাইতে পারে। সেইরূপ যে সমস্ত সূত্রে বুদ্ধ, পূর্ব্ববুদ্ধ বা স্বীয় পূর্ব্বজন্মকাহিনী বলিয়াছেন, সেই সব সূত্রও কাল্পনিক। বস্তুতঃ তাহারা উত্তর কালে বুদ্ধের মাহাত্ম্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা† একটি একটি ধর্ম্ম-নীতি ব্যাখ্যার জন্য রচিত হয়।

একথা নিশ্চয় ছিল যে, বুদ্ধ তাঁহার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত যোগচর্চ্চা অবলম্বন পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার ধর্ম্ম মূলতঃ পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্মের অধমর্ণ। কিন্তু পাছে তাঁহার মাহাত্ম্যের হানি হয়, পাছে প্রচলিত শাস্ত্রসকল হইতে তাঁহার পৃথগত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের হানি হয়, ইত্যাদি কারণে তাঁহার অধমর্ণতা বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বস্তুতঃ পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতার ভক্তগণ নিজেদের আদর্শ পুরুষকে ঐরূপ করিয়া গিয়াছেন।†

* কতমো চ পুগ্গলো অরিয়ো? অট্ঠারিয় পুগ্গলা অরিয়া অবসেসা পুগ্গলা অনরিয়া। অর্থাৎ বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধাদি আট প্রকার পুরুষ আর্য্য।

(পুগ্গল পঞ্ঞত্তি। একক)

† বৌদ্ধশাস্ত্রে অশেষ প্রকারে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার যেরূপ মুখ্য ও গৌণ সুকৌশল দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, বৌদ্ধেরা উহাকে অতি উচ্চ দরের fine art করিয়া তুলিয়া ছিলেন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এই বিষয়ে কেহ তাঁহাদের পরাজয় করিতে পারে নাই।

বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ প্রাচীন কোনও প্রকৃত ব্যক্তির নাম করেন নাই, কেবল স্বীয় স্বীয় ধারণার অনুরূপ কতকগুলি প্রাচীন শাস্তা কল্পনা করিয়া গিয়াছেন এবং স্বর্গলোককেও গোঁড়া বৌদ্ধের দ্বারা অধিবাসিত করিয়া গিয়াছেন। † এ বিষয়ে দুই একটি উদাহরণ দিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। দীর্ঘ নিকায়ের মহাপদান সূত্রে, বুদ্ধ কতকগুলি পূর্ব বুদ্ধের বিবরণ বলিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধদের এই প্রচলিত ভদ্রকল্পের পূর্ব্বে ৯১তম বিপস্সী (সংস্কৃত বিপশ্চিৎ), ৩১ তম কল্পে সিখী, এই কল্পে ককুসন্ধো (ক্রকুসন্ধ) কোণগমনো (কণকমুনি) ও কশ্যপ বুদ্ধ হইয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধের মত ঠিক তাঁহাদের সমস্তই ছিল, মায় সিদ্ধ হইবার এক একটি 'বোধিদ্রুম' পর্য্যন্ত। তাঁহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতীয় (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত কেহ বুদ্ধ হয় না) এবং কাশ্যপাদি গোত্রীয় ছিলেন। তবে কেহ রাজগৃহে, কেহ বারাণসীতে, কেহ পাঞ্চালদেশে জন্মগ্রহণ করেন; আর তাঁহাদের আয়ু ৮০,০০০ বৎসর হইতে ২০,০০০ পর্য্যন্ত! এমন কি, গৌতমের ন্যায় তাঁহাদের শরীরের ভস্মাবশেষ রাখিবার এক বা অধিক চৈত্যেরও উল্লেখ আছে। (ইহা "আর্য্যভদ্রকল্পিক" নামক মহাযান সূত্রে আছে; ঐ সূত্রে আরও ১০০৩ ভবিষ্য বুদ্ধের উল্লেখ আছে।)

আর এক উদাহরণ মহাসুদর্শন সূত্র; তাহাতে বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে কুশীনারার ঐ নামীয় চক্রবর্ত্তী রাজা থাকার বিবরণ বলিয়াছেন। কুশীনারার নাম তখন কুশাবতী ছিল। তাহা অতি সমৃদ্ধ নগর ছিল। তাহাতে স্বর্ণ, রৌপ্য, স্ফটিক, বৈদূর্য্য, লোহিতাঙ্ক (Bloodstore?) ও সর্ব্বরত্নময় সাত প্রাকার ছিল। প্রাকারে চারি চারি ঐ ঐ রত্নময় দ্বার ও দ্বারে ঐ ঐ রত্নময় সাত সাত, দশ মানুষ উর্দ্ধস্তম্ভ ছিল। আর কুশাবতীতে সপ্ত তাল-পংক্তি ছিল; ঐ সকল তাল ঐ ঐ রত্নময়। কোনটার সোনার স্কন্ধ, রূপার পাতা, মণির ফল, কোনটার বা রূপার স্কন্ধ, সোনার পাতা, মণির ফল ইত্যাদি। আর মহাসুদর্শন রাজার পক্ষীরাজ হাতী ও ঘোড়া ছিল এবং তাঁহার ৮৪০০০ করিয়া স্ত্রী, প্রাসাদ, পালংখাট; রথ, মন্ত্রী আদি ছিল। তিনি ৮৪০০০ বৎসর বাল্য, ৮৪০০০ বৎসর যৌবন ইত্যাদি পরিমিত আয়ুষ্ক ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। *

বুদ্ধদেব অবশ্য ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু যিনি সত্য এবং বাক্, কায় ও মনের ঋজুতার বিষয় এত উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তিনি

---

† "মোদন্তি বত ভো দেবা তাবতিংসা সইন্দকা। তথাগতং নমস্সন্তা ধম্মস্স চ সুধম্মতন্তি॥ মহাগোবিন্দ সুত্তং।

* এই স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি আদি লইয়া বালোচিত কল্পনার পর এই সূত্রে যে সুন্দর নির্ব্বাণধর্ম্মনীতি আছে, অবশ্য তদ্বিষয় কোন কথা নাই। তাহা যথা—

অনিচ্চা বত সংখারা উপ্পাদবয় ধম্মিনো। উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বূপসমো সুখোতি॥ অর্থাৎ অনিত্যাবত সংস্কারা উৎপাদ ব্যয় ধর্ম্মিনঃ। উৎপদ্য নিরুধ্যন্তি তেষাং ব্যুপশমঃ সুখঃ॥

যে এরূপ বালোচিত কল্পনার দ্বারা স্বীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাস্য নহে। ফলতঃ তাঁহার ভক্তগণ কয়েক শতাব্দীপরে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন জন্য ঐ সব গল্প রচনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন কোন প্রকৃত ব্যক্তি তাঁহার অধমর্ণতা স্বীকার করেন নাই, কতকগুলি কাল্পনিক উপাখ্যান সৃজন করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

বৌদ্ধগণ আরও বলেন, ভগবান্ যদি স্বীয় শিক্ষকদের নিকট নির্ব্বাণধর্ম্ম সম্যক্ শিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বোধিমূলে ছয় বৎসর 'দুষ্ক্রিয়া' বা কঠোর আচরণ করিতে হইত না। বোধিমূলে গৌতম যে সাধন করিয়াছিলেন, তাহার যে বিবরণ অধুনা পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধের অনেক পরে লিপিবদ্ধ হয় এবং তাহা বহু পরিমাণে অলীক কল্পনামিশ্রিত। সহস্রবাহু মার, মারবধূ, মারানুচর প্রভৃতির সহিত বুদ্ধ, গৌতম মনে কি কি চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ, ব্রহ্মাদি দেবগণের আগমন ও অনুরোধ ইত্যাদি বিষয় যে অলীক কল্পনা, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন। তাদৃশ কাল্পনিক আখ্যায়িকার রচয়িতারা বুদ্ধের অধমর্ণতার অপলাপ করিয়া মৌলিকতা সম্যক্ প্রতিপাদিত করিবার জন্য ঐরূপ কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ মোক্ষমার্গের জ্ঞান হইলেই নির্ব্বাণ সিদ্ধ হয় না, কঠোর সাধনের দ্বারা উহা সিদ্ধ হয়। গৌতম ছয় বৎসর প্রযত্নের দ্বারা সমাধি-সিদ্ধ ও বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকে আছে "ন তত্র দক্ষিণা অস্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ" অতএব গৌতম যদি মোক্ষবিরোধী কোন কঠোর তপঃ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বপ্রচলিত মোক্ষ-বিদ্যায় কতক অনভিজ্ঞ ছিলেন, ইহা বলিতে হইবে। আর যদি তিনি পূর্ব্বপ্রচলিত ঔপনিষদ মোক্ষ মার্গে সুশিক্ষিত ছিলেন, স্বীকার করা যায়, (বৌদ্ধেরা বলেন, তিনি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন) তাহা হইলে তিনি উপনিষদুক্ত প্রথায় "অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম" হইয়া 'পরম, অজর, অমৃত' পদে সমাহিত হইতে পারিয়াছিলেন। পরে দেখাইব যে, উপনিষদুক্ত পরম পদকে তিনি অতিক্রম করেন নাই এবং কেহ করিতেও পারে না। তবে তিনি যে প্রাকৃত ভাষায় মৌলিক ভাবে মোক্ষতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় এবং সেই সূত্রাবলম্বন করিয়া তদীয় ভক্তগণ পরে তাঁহাকে মোক্ষমার্গের অদ্বিতীয় আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ সাংখ্য ও যোগকে অপ্রাচীন মনে করিয়া বৌদ্ধদের প্রাচীনতা স্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ দেখা যায়:—

(১) বৌদ্ধশাস্ত্রে ৬২ প্রকার মত নিরসিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সাংখ্য মতের উল্লেখ বা নিরসন নাই।

(২) সাংখ্যীয় পুস্তক সকল অপ্রাচীন বৌদ্ধ মত হইতে গৃহীত।

অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায়ের মত ঠিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নির্ব্বাণ ধর্ম্মের আলোচনা করা। তাঁহাদের ভাবার্থ

নির্ব্বাণধর্ম্মশাস্ত্রের কোন শব্দ নাই বলিলেই হয় এবং তাঁহারা উহার বহিস্তর ব্যতীত অন্তরের কিছুই বুঝেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের দার্শনিক মত বিচার পূর্ব্বক কোনও তত্ত্ব স্থির করা যে সর্ব্বতোভাবে ভ্রমপূর্ণ হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যাহা হউক, তাঁহাদের যুক্তি কতদূর সঙ্গত, তাহা দেখা যাউক।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যে ৬২ প্রকার মত নিরসিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই মোক্ষধর্ম্মের প্রতিপক্ষ। তাহারা যেমন বৌদ্ধদের হেয়, সেইরূপ আর্য মোক্ষশাস্ত্রেরও হেয়। সুতরাং এরূপ হইতে পারে যে, যোগমত বুদ্ধদেবের নিকট অনবদ্য ছিল বলিয়া, তাহাই তাঁহার অবলম্বিত ছিল; সুতরাং তিনি উহার সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই এবং তজ্জন্য পরবর্ত্তী বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণও সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন নাই। ব্রহ্মজাল সূত্রে আছে যে, "পূর্ব্বপ্রচলিত কোন কোন অবৌদ্ধেরা আতপ্প, পধান, অনুযোগ, অপ্রমাদ সম্যক্ মননিরোধের দ্বারা সমাধিসিদ্ধ হন, তাহাতে তাঁহাদের চিত্ত পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গন ও উপক্লেশশূন্য হয়"। এই পূর্ব্বপ্রচলিত সাধন বৌদ্ধেরাও অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা উহার দ্বারা ক্ষুদ্র সিদ্ধিলাভ করিয়াই কৃতার্থম্মন্য হন, তাঁহাদেরই বৌদ্ধেরা নিন্দা করেন। অতএব পূর্ব্বপ্রচলিত যোগ-সাধন যে বৌদ্ধেরা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়।

ফলতঃ ব্রহ্মজাল সূত্র, যাহাতে ঐ ৬২ মত হেয় রূপে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ "ন ইতো বহিদ্ধা" এই বাক্যের দ্বারা আর তাহা ছাড়া অন্য কুমত নাই, এরূপ বলা হইয়াছে। যেমন শাশ্বতবাদী যাহারা আছে, তাহারা সেই গ্রন্থোক্ত চারি প্রকারের। তদ্ব্যতীত আর কোনরূপ শাশ্বতবাদী নাই, ইত্যাদি।

কিন্তু আবার পাশ্চাত্যগণের মতে যাহা বুদ্ধাপেক্ষা বহুপ্রাচীন উপনিষৎ *, সেই বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির

---

* পাশ্চাত্যদের মতে-প্রাচীন যে দশ বার খানি উপনিষদ্ আছে, তাহার কতকগুলি বুদ্ধের পূর্ব্বতন বা pre Buddhistic যেমন বৃহদারণ্যকাদি এবং কতকগুলি বুদ্ধের পরবর্ত্তী যথা মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর আদি। দুই একটি ক্ষীণ সূত্রাবলম্বন করিয়া ম্যাক্স্ মূলরাদির যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাই এ বিষয়ে যুক্তি। আর সেই সব ধারণাকে ধ্রুব সত্য মনে করিয়া এ দেশের পল্লবগ্রাহী অনেক লোক গ্রহণ করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। মুণ্ডকোপনিষৎ কেন বুদ্ধের পরে? না উহা মুণ্ডকদের উপনিষৎ, আর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মুণ্ডিত হইতেন, অতএব উহা বৌদ্ধদের পরে। কিন্তু উহাতে যে যজ্ঞের অবরতা উক্ত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে গৃহীত।

এই সব হাস্যাস্পদ যুক্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, মুণ্ডক-আশ্রয় বুদ্ধের বহু পূর্ব্ব—অনির্দ্দেশ্য কাল হইতে প্রচলিত ছিল। বুদ্ধও তৎপ্রথা অনুসারে মুণ্ডকাশ্রম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। আর মুণ্ডকোপনিষদের মত বৃহদারণ্যক হইতে কিছুই পৃথক্ নহে। আর যে সমস্ত শম-দমাদি নির্ব্বাণ ধর্ম্মের আচরণ বুদ্ধদের সহিত মিলে, তাহাও বুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, ইহা বৌদ্ধশাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উক্ত হইয়াছে এবং pre Buddhistic উপনিষদেও আছে।

প্রত্যুত সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া

উপদেশ আছে, বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহার মোটেই উল্লেখ নাই। নপুংসকলিঙ্গ ব্রহ্ম শব্দ, তত্ত্বমসি, ওঙ্কারমূলক সাধন, আত্মা বৌদ্ধদের মতেও স্থানিক বা স্থূল, মনোময় এবং সংজ্ঞাময়, এই ত্রিবিধ আত্মা আছে," কিন্তু উহার অতিরিক্ত ঔপনিষদ আত্মার উল্লেখ

খ্যাত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ও বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা পাশ্চাত্যগণের যুক্তি-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রমাণীকৃত হইতে পারে। শ্বেতাশ্বতরে "কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ কবয়ো বদন্তি" ইত্যাদি যে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান প্রধান মত উক্ত হইয়াছে, ইহার কোনওটি বৌদ্ধ মত নহে। বুদ্ধের সমসাময়িক আজীবকাদি সম্প্রদায়ের সহিত ইহার কোন কোন মতের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তাহা যে সেই সময় উদ্ভাবিত, তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাহা পূর্ব্বে সহস্র বৎসর হইতেও প্রচলিত থাকিতে পারিত। আর শ্রুতির মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই প্রাণায়ামের বিশেষ উপদেশ আছে। বুদ্ধও প্রথমে প্রাণায়াম করিয়াছিলেন। মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেও প্রাণায়াম গৃহীত দেখা যায়। মনুর (ক) ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ (যাহাতে বৌদ্ধ মতের বিন্দু মাত্রও আভাস নাই), শ্রুতিই যাহার একমাত্র প্রমাণ, তাহা যে বেদবিহিত না হইলে প্রাণায়াম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং উহা শ্বেতাশ্বতর হইতেই গৃহীত হইয়াছে বলিতে হইবে। বুদ্ধ ও তৎসময়ের আর্য মতাবলম্বী প্রাণায়ামীগণের অবশ্য ঐ শ্রুতিই প্রমাণ ছিল।

পাশ্চাত্যদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন যে বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, তাহাতে যে মোক্ষ ও তদাচরণ উক্ত হইয়াছে, বৌদ্ধেরা তাহার অধিক কিছুই বলেন নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সমাধি ও সম্যক্ বিরাগ মুক্তির কেবল মাত্র উপায়। বৌদ্ধেরাও তাহাই করেন, ঋষিরাও তাহাই করেন। মোক্ষধর্ম্ম বৃহদারণ্যকে এইরূপ আছে, যথা—"শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিবে" "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যস্য হৃদি শ্রিতাঃ," "অকামঃ নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ," "পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা, ইত্যাদি ত্যাগ"। ফলতঃ যিনি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু হইয়া কেবল অন্তরে সমাহিত হন, আর যাঁহার হৃদয় সম্যক্ কামনাশূন্য, তাদৃশ পুরুষাপেক্ষা বৌদ্ধেরা কিছুই উত্তম আচরণ করেন না। হৃদয়ের সমস্ত কামনা ত্যাগ অপেক্ষা আর উচ্চ আচরণ কি হইতে পারে? বৌদ্ধদের শাস্ত্রে যে ৬২ প্রকার কুমত আছে, ইহা তাহার অন্তর্গত নহে। সেই ৬২ প্রকার কুমত কেন হেয়, তাহার কারণ বৌদ্ধেরা এইরূপ বলেন—"সর্ব্বে তে ছহি ফস্সায়তনেহি ফুস্স ফুস্স পটিসংবেদেন্তি। তেসং বেদনা পচ্চয়া তণ্হা। তণ্হা পচ্চয়া জাতি জাতি পচ্চয়া জরা মরণং সোক পরিদেব দুক্খ দোমনস্স্ উপায়াসা সম্ভবন্তি"।

ব্রহ্মজাল সুত্ত।

অর্থাৎ সেই ৬২ প্রকার কুমতাবলম্বীদের সকলেরই ছয় স্পর্শায়তনের (রূপাদি আয়তনের) সংস্পর্শে পটিব বা অভিমুখজ বোধ উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে সুখ-দুঃখ বেদনামূলক তৃষ্ণা হয়। তৃষ্ণা হইতে উপাদান বা গ্রাহভাব হয়। উপাদান হইতে ভব বা জন্মের বীজ হয়। ভব হইতে জন্ম হয়। জন্ম হইতে জরা, মরণ শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, উপায়াসা বা নৈরাশ্য হয়।

কিন্তু উপনিষদুক্ত প্রণালী সর্ব্বকামনাশূন্য হইয়া বাক্য ও মনের অগোচর পরম পদার্থে সমাহিত হইলে, বাহ্যসংস্পর্শও হয় না, এবং তৃষ্ণাও হইতে পারে না।

নাই), দহর পুণ্ডরীক বিদ্যার (বৌদ্ধেরা ইহারও কিছু গ্রহণ করিয়াছেন) প্রভৃতির ব্রহ্মজালাদি বৌদ্ধ সূত্রে নামগন্ধও নাই। অতএব বৌদ্ধ সূত্রে সাংখ্যমতের উল্লেখ না থাকাতে, উহার অপ্রাচীনতা প্রমাণ হয় না; কিন্তু উহা বুদ্ধ যে তের পক্ষে নিক্ষেপ করেন নাই, ইহাই অনুমিত হয়।

আর অন্য কোন দোষও হয় না। তবে ঋষিগণ বলেন, তখন ব্রহ্ম বা আত্মায় স্থিতি হয়, আর বৌদ্ধগণ বলেন, তখন নির্ব্বাণে বা অসংস্কৃত ধাতুতে স্থিতি হয়। ঐ দুই পদের ভেদাভেদ "বৌদ্ধ দর্শন ও আত্মা" প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকে অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক এক প্রকার সংসার-মোক্ষ বা অপুনরাবৃত্তি স্বীকৃত আছে। আর "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" এই পক্ষের বিদেহকৈবল্য রূপ সর্ব্বোচ্চ পদ স্বীকৃত আছে।

বৌদ্ধদের অনাগামিত্ব এবং (অর্হতের) পরিনির্ব্বাণ উহারই অনুবর্ত্তন।

(ক) মনুর প্রাচীনতার দুই একটি যুক্তি এ স্থলে নিবদ্ধ হইতেছে। মনুতে সহমরণ প্রথার কিছু মাত্রও প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু মহাভারতের মূল ঘটনা অনুসারে মাদ্রী পাণ্ডুর সহিত অনুমৃতা হন। গ্রীক্—দূত মেগেস্থিনিস্ খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে মগধে ঐ প্রথা সম্পূর্ণ প্রচলিত দেখিয়া যান। চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক যে মূল ভারত বেদব্যাস রচনা করেন, তাহা অতি প্রাচীন। আশ্বলায়ন, পাণিনি প্রভৃতির পূর্ব্বে যে মহাভারতের মূল আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে জানা যায়।

যখন সহমরণের ন্যায় এক প্রাচীন বিষয় মনুতে নিবদ্ধ নাই, কিন্তু মহাভারতের মূল ঘটনায় নিবদ্ধ রহিয়াছে, তখন মনু যে তদপেক্ষা বহু প্রাচীন, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

বেদের মন্ত্র ব্রাহ্মণভাগ হইতে জানা যায় যে, মনুষ্য শত বর্ষ পরমায়ু, এই বিশ্বাসই তৎকালে প্রচলিত ছিল পূর্ব্ব মনুষ্যের দশ বিশ সহস্র বর্ষ পরমায়ুর বিষয় কুত্রাপি দেখা যায় না।

কিন্তু পুরাণে ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে ঐরূপ অত্যধিক মনুষ্যের আয়ুর উল্লেখ দেখা যায়। মনুতে ৮০০ বৎসর কৃতযুগের পরমায়ুর সংখ্যা লিখিত আছে। সুতরাং মনু বৈদিক যুগ ও বুদ্ধযুগের মধ্যবর্ত্তী সময়ের, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

মনুতে ত্রিগুণ, পুরুষ, প্রকৃতি আদি সাংখ্যীয় পদার্থের প্রসঙ্গ আছে। আর মনুতে যে সন্ন্যাস চর্য্যা আছে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শীল তাহাকে কোন অংশেই অতিক্রম করে না।

গৌতম স্বকালে অপর সব শাস্ত্রাপেক্ষা সম্যক্ শীলসম্পন্ন হইতে পারিতেন, কিন্তু ঐ "শীল পারিপূরিতার" তিনি আবিষ্কর্ত্তা নন। অনেকে মনে করেন, অহিংসা ধর্ম্ম বৌদ্ধদেরই আবিষ্কার; ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। বস্তুতঃ বৌদ্ধ শাস্ত্রে অহিংসা শব্দের ব্যবহার মোটেই নাই। "পানাতিপাত প্রটিবিরত" "অব্যাপাদ" এই শব্দদ্বয় অহিংসা স্থলে ব্যবহৃত দেখা যায়। হিংসাভয়ে গলিত পত্র ফল ভক্ষণ প্রভৃতি কঠোর নিয়ম গৌতমের বহু পূর্ব্ব নিয়ম হইতে প্রচলিত ছিল। কি পূর্ব্বে কি পরে বৌদ্ধাপেক্ষা আর্হমতাবলম্বীগণ অধিকতর অহিংসাপরায়ণ ছিলেন। কৃত, কারিত ও অনুমোদিত, এই ত্রিবিধ হিংসার বিষয় বৌদ্ধেরা জানেন না। দেবদত্তের সহিত মাংসভক্ষণ-বিরতি,

পাশ্চাত্যদের দ্বিতীয় যুক্তিতে থাকেনা এই যে—প্রচলিত সাংখ্য গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা, সাংখ্য সূত্র ও

সভাষ্য যোগসূত্র, এই তিন পুস্তক প্রধান। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাংখ্যকারিকার চীন ভাষায় একখানি অনুবাদ হয়, অতএব ঐ গ্রন্থ তাহার পূর্ব্বে কোন সময়ে রচিত। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে উহা রচিত। উহাতে উক্ত আছে যে, কপিল * হইতে আসুরি আদিশিষ্য পরম্পরা ক্রমে ঈশ্বরকৃষ্ণ উহা শিক্ষা করিয়া গ্রথিত করিয়াছেন; আর উহা আখ্যায়িকা ও পরবাদবর্জ্জিত। ইহাতে বোধ হয়, বর্ত্তমান সাংখ্য-সূত্রের ন্যায় এক গ্রন্থ ঈশ্বরকৃষ্ণের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। শঙ্করাচার্য্য উহা হইতে কোনও সূত্র উদ্ধৃত করেন নাই বলিয়া যে উহা শঙ্করাপেক্ষা অপ্রাচীন, তাহা যথার্থ নহে। বস্তুতঃ শঙ্কর দুই এক স্থলে মাত্র সাংখ্য-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বহু বহু উদ্ধৃত করিলে বরং ঐ মত সম্ভবপর হইত। তবে ঐ সূত্রগ্রন্থে পরবর্তী অনেক আচার্য্য যে স্বকালে প্রচলিত পরবাদের খণ্ডনার্থ স্বীয় সূত্র সকল প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু উহাতে প্রাচীন সাংখ্যমতের যে অধিকাংশ রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। অনেক সূত্র কারিকার সহিত অবিকল মিলে।

প্রচলিত সাংখ্য গ্রন্থের মধ্যে যোগভাষ্যই প্রধান। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন "সাংখ্যাদি দর্শনান্তেব অন্যৈবাংশেষু কৃৎস্নশঃ" বেদব্যাস-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ এই পুস্তক অতি প্রাচীন; এমন কি, প্রচলিত বৌদ্ধ শাস্ত্রাপেক্ষাও প্রাচীন। ইহার প্রাচীন অপ্রচলিত শব্দপূর্ণ সরল ভাষা, প্রাচীন ও অধুনা লুপ্ত পুস্তক হইতে বচন উদ্ধার প্রভৃতি ইহার প্রাচীনতার সম্যক্ প্রমাণ। "শ্রামণ্য ফল-সূত্র" একখানি অতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ, তাহাতে এই যোগভাষ্যের বচন প্রায় অবিকল উদ্ধৃত দেখা যায়, যথা প্রাকাম্য ও প্রাপ্তি সিদ্ধি সম্বন্ধে যোগভাষ্য :—"ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে। অঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমসম্।" ৩। ৪৫।

শ্রামণ্যফল সূত্র যথা—"পঠবিয়াপি উম্মুজ্জ নিমুজ্জং করোতি সেয্যথাপি উদকে।" ইমেপি চন্দিম সূরিয়ে এবং * * * * * পাণিনা পরামসতি পরিমজ্জতি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য।
(কাপিলাশ্রমঃ।)

লইয়া বুদ্ধের মতভেদ হয়। গৌতম ভিক্ষুদের মাংস-ভক্ষণ নিষেধ করেন নাই। বৌদ্ধ উপাসকেরাও অবশ্য পশুবধ করিয়াই ভিক্ষুদের আহার করাইত। সুতরাং অনুমোদিত-হিংসাবিরতি বৌদ্ধদের নাই।

* বৌদ্ধদের আখ্যায়িকায় বুদ্ধের পূর্ব্ব-পুরুষ ইক্ষ্বাকু (পালি-ওক্কাকু) রাজার সময় এক কপিল বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার সম্মানার্থে 'কপিলবস্তু' নাম হয়। আবার মতান্তরে কপিল বর্ণের মৃত্তিকা ছিল বলিয়া কপিলবস্তু নাম হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ।

(১)

সাধে কিগো ভালবাসি ব্রজেশ্বর ?
ব্রজেশ্বর বিনে, এ ব্রজ-বিপিনে,
সকলি বিরস—বিষাদ-জর্জ্জর।

সব রেখে গেছে, তবু যেন তার
পিছে পিছে গেছে সর্ব্বস্ব সবার!
মন নাই মনে, গেছে তারি সনে;
সে যে সুচতুর চিরচিত্তহর!

(২)

বেণু-রবে আর ধেনু নাহি ধায়,
গোঠে আর নাহি ছোটে উভরায়,
দরশন আশে,
আঁখি-নীরে ভাসে,
ফিরি ফিরি চায় দূর যমুনায়।

(৩)

শুষ্ক তমালের উচ্চ শাখা-পরে
শুক-শারী দোঁহে ডাকে সকাতরে।
নৃত্য নাহি করে,
পেখম না ধরে;
শিখী নহে সুখী হেরি জলধরে।
নবজলধর-বরণ-বিরহে,
পশু-পাখী-সব, কেহ সুখী নহে।

(৪)

ফুলে ফুলে আর মধুপনিকরে,
মধুর গুঞ্জনে মধু না আহরে;
বিরহ-ব্যাকুল
তরু-লতাকুল,
শিশিরে সবার শোক-অশ্রু ঝরে—
কৃষ্ণ-প্রেমভরে!

(৫)

কালিন্দীর জল, মলয়-মিলনে
সান্ধ্য রবি-করে, উষার কিরণে,
ভাব-প্রেমোচ্ছ্বাসে,
উদ্বেল উল্লাসে
খেলেনা, কেবল কাঁদে মৃদুরোলে—
করুণ কল্লোলে!

(৬)

তাই বলি সখি! মাধব-অভাবে,
এই ব্রজপুরে কে আছে স্বভাবে?
ক্রমে পরিণাম
আরো যে কি হবে,
এ ভাবনা যার জাগিছে সদাই,
তার ভাগ্যবলে
যদি কভু মিলে
সে নীলরতন
গোপিনী-মণ্ডলে;
বৃথা তা না হলে
বাঁচিয়া সকলে,
এই ভূমণ্ডলে, হারায়ে কানাই!

(৭)

সে ব্রজ-জীবন আসিলে আবার,
হবে ব্রজে পুনর্জ্জীবন-সঞ্চার,
নতুবা হইল
ছিল যা হবার
ভাগ্যে গোপিকার!
ব্রজ বিনাশিতে, বাঞ্ছা যদি ছিল,
আসার আশা সে কেন দিয়ে গেল?
হইত সবার
ভাগ্যে যাহা ছিল—
বিরহে তাহার।

(৮)

যাই থাকে তার মনের বাসনা,
বলো ব্রজকান্তে একান্ত যাতনা,
ব্রজে সবাকার।
সব শবাকার
কেশব বিহনে!
বলো একবার দেখা দিতে তার
বিরহ-বিকারে অন্তিমে সবার।

যদি বা দয়ায়
বারেক বাঁচায়
অমিয়-দর্শনে !

(৯)

তাহা'লে তাঁর দয়াময় নামে
কলঙ্ক রটিবে, এই ব্রজধামে ;
ব্রজ গোপিনীর
যা থাকে অন্তরে,
কে রোধিবে তায় ?
বরঞ্চ মরিলে কৃষ্ণ-ভাবনায়,
গোপিনীর শেষ আশা পূরে তায় !
স্বর্গ সুখ ছার,
তার ভাবনার
তুল্য ভাবনায় !

(১০)

এক গেলে আর, অন্য ভাবনার
হয় অধিকার, হৃদয়-আগার,
তাই ভাবি কৃষ্ণ
আসিলে নিকটে,
কৃষ্ণ সমাধির
ব্যাঘাত বা ঘটে
পাছে আমাদের !
সেথা সেথা সখি ! সুখে থাক্ শ্যাম,
ভাবনা তাহার, যেন অবিরাম
হৃদয়ে আগারে
রাখিবারে পারি,
মুখে যেন সদা
রটে হরি হরি !
তারি রূপধ্যান,
তারি গুণ গান,
নামামৃত পান
সম্বল সবের !
থাকে ভাগ্যে—পাব দেখা মাধবের ।

শ্রীঅটলবিহারী দাস ।

দুর্গোৎসব-চিন্তা

"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম ।
আগতাসি যতো দুর্গে মহেশ্বরি মদাশ্রয়ম্ ॥"

মা দুর্গার আগমন হয়েছে এবার
গজ-আরোহণে ;
"গজে চ জলদা দেবী"—কিন্তু বিন্দুধার
গলেনা গগনে !
কন্যা-মাসে বন্যা-গ্রাসে ধান্য উড়িষ্যায়
বুড়ে নষ্ট হ'ল ।
বৃষ্টি বিনা সৃষ্টিনাশ-ভয় বাঙ্গালায়,—
পুড়ে ধান ম'ল ॥
শুধু বঙ্গে নয়, প্রতি অঙ্গে ভারতের
দুর্ভিক্ষ-অনল—
কোথা ধূমায়িত, কোথা জ্বলিত ভাবের
প্রকাশ প্রবল !
ধান্যদা কমলা নিজে অন্নদার বামে
সহাস্য বদনে ;
ধান্য নষ্ট, অন্নকষ্ট তবু এ ভূ-ধামে
বাড়ে দিনে দিনে !

দুর্গোৎসবে দক্ষজার দক্ষিণে পূজিত
বাণী-সরস্বতী ;
রাজাদেশে দেশে কিন্তু হ'ল প্রচারিত
বাণী-রোধ-বিধি !
শক্তি পূজি শক্তিহীন, লক্ষ্মী পূজি হায় !
হৈনু লক্ষ্মীছাড়া !
পেয়েছিনু কিছু শুধু বাণীর পূজায়
সাফল্যের সাড়া ;

ধন-বল-জ্ঞান-গুণ গিয়েছিল ;
সম্বলাবশেষ—
কণ্ঠে ও লেখনী দণ্ডে যাহা কিছু ছিল—
বাণী-কৃপালেশ !
নামরক্ষা—মানরক্ষা ছিল কিছু তায় ;
তাহাতেও বাদী—
রাজরোষে—ভাগ্যদোষে হ'ল আজি হায় !
বাক্‌রোধ-বিধি !

বিঘ্নহর গণপতি, অগ্রে পূজা তাঁরি,
তাই বুঝি তাঁর
বাহনটি সর্ব্বদেশে 'প্লেগ্' মহামারী
করেন বিস্তার !
সিদ্ধিদাতা -বিঘ্নত্রাতা বিশ্বে গজানন,
কিন্তু পদে পদে—
অসিদ্ধি, অশান্তি, বাধা, বিঘ্ন অগণন—
উন্নতির পথে !

দুর্গোৎসবে এক পূজা, অচিরে আবার,
দেখি বাঙ্গালার,
সাত্ত্বিক ও রাজসিক কার্ত্তিকপূজার
ধূম লেগে যায় !
বল-বংশ বৃদ্ধি হয় কার্ত্তিকের বরে,
কিন্তু কি রহস্য !
নিরন্নের বংশবৃদ্ধি, সম্পন্নের ঘরে
পুত্র প্রায় 'পোষ্য' !
বলের বিষয়ে আর বলিব কি ছাই ?
যুবা বঙ্গ-বীর—
ভগ্ন পঞ্জ—মগ্ননেত্র—'তাল্‌পত্র-সিপাই' !
যৌবনে স্থবির !
রণাস্ত্রবলাধিদেব দেব-সেনাপতি,
পূজিয়া তাঁহারে,
আত্মরক্ষার্থেও হায় ! নাহিক শকতি
অস্ত্র-ব্যবহারে !
অস্ত্র-আইনের ফলে অস্ত্র আধুনিক
দা-কুড়ালি-বঁটি !
রণ-রঙ্গ রঙ্গালয়ে, বঙ্গাস্ত্র পৈত্রিক
লাঠিটিও মাটি !

মায়ের বাহন সিংহ, তাঁরো পূজা করি—
মোরা ফেরুপাল !
সাক্ষাৎ-শক্তি-বাহন বৃটিশ্-কেশরী—
ভারত-ভূপাল।
আত্মশক্তি—স্বাবলম্ব—পৌরুষে যাদের
স্বভাব-সাধনা,
অতএব শক্তিপূজা সিদ্ধ তাহাদের,
বাহপূজা বিনা।
কার্য্যসিদ্ধি চাই ফলে বাহ্য সাধনার,
পাই যে নিরাশা ;
শক্তি নাই মৃণ্ময়ীতে চিন্ময়ী-পূজার,
তাই এ দুর্দ্দশা !
সে বাহ্যপূজাও নাহি শুদ্ধোপকরণে
হ'ত সম্পাদিত ;
অশুদ্ধ নিষিদ্ধ চিনি-বস্ত্রাদি-লবণে
অনাচারান্বিত !
অশুদ্ধি ও অনাচারে পূজা-অর্চ্চনায়
ব্যর্থ—বিড়ম্বিত ;
ব্যভিচারে শুভকার্য্য 'অভিচার' হয়,
শাস্ত্রে সুবিদিত।
হিতে হয় বিপরীত ! প্রমাণ প্রচুর—
দেখ বঙ্গে হায় !
বর্ষে বর্ষে শক্তি পূজি, শক্তি থাক্ দূর,
প্রাণ যায় যায় !
অনাচার দোষে পূজা পূজ্যে নাহি তোষে ;
বরঞ্চ কেবল—
ব্যর্থ সে দেব-সেবার্থী—পড়ি দেব-রোষে,
লভে অমঙ্গল।
দুর্ব্বুদ্ধি-দুর্ভাগ্য-দোষে ঘটেছে ভারতে
আমাদেরো তাই।
শুদ্ধ স্বদেশীয় শুভ উপকরণেতে
দেব-সেবা চাই॥
যা হ'ল তা হ'ল, যেন না হয় আবার,
এবে দিব 'ইতি'।
লজিবনা মূঢ়তায়, ভজিবনা আর
বিদেশী—বিলাতী॥

ভারতে শরতে শুধু ত্রিদিন-উৎসব
নাহি হবে আর ;

মাতৃভূমি-প্রতিমায় নিত্য-দুর্গোৎসব
হবে মা দুর্গায়!
দেশভক্তি-শক্তিপূজা নিত্য হবে দেশে—
'স্বদেশী'-সম্ভোগে;
ত্রিদিন-উৎসব হবে শরতে বিশেষে—
বাহ্যপূজা-যোগে।
তৎপ্রভাবে সিদ্ধিলাভে—শক্তি-সাধনার
শুদ্ধ দুর্গোৎসবে,—
দীন হীন ক্ষীণ যত সন্তান মাতার,—
বীর ধীর হবে।
জগন্মাতা-রূপান্তরা জন্মভূমি-মাতা,
এ তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত—
সিদ্ধ সত্য রূপে নিত্য চিত্তে রবে গাঁথা—
ভবে আপ্রাণান্ত।

স্বাবলম্বে স্ব-সাহায্যে সাধে যে স্বকার্য্য,—
কর্ম্মযোগ-ভরে,
জগন্মাতা তারে সদা সদয় সাহায্য
করেন স্বকরে।
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" মাতৃভূমি-মায়
সেবে যে সন্তান,
সেই সেবা মাতৃরূপা তাঁরি প্রতিমায়
জগন্মাতা পান॥
'স্বদেশী'-সাধক যেবা স্বজাতি-স্বধর্ম্মে—
মাতৃভক্তিমান্,
সন্তানবৎসলা দুর্গা সমস্ত দুর্গমে
দেন তারে ত্রাণ।

'কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়',
সত্য—পূত এ চির প্রবাদ;
কুপুত্রে [illegible]ণী করি, ক্ষমিবেন ক্ষেমঙ্করী
[illegible] শত শত অপরাধ।
বর্ণা[illegible] করি পূজা মহাশক্তি দশভুজা,
দশমীতে মানস-সাগরে,—
বিসর্জ্জি মূরতি আ'র, বিজয় সে বিজয়ায়—
এ 'স্বদেশী'-সাধন-সমরে—
লভিব বিদেশী-মোহ-রাবণে সংহারি;
আনিব ভারত-লক্ষ্মী-সীতায় উদ্ধারি!
মহাশক্তি-মহোৎসব দুর্গোৎসব ভবে—
শুদ্ধ সত্ত্বে সত্য তত্ত্বে নিত্য সিদ্ধ হবে।
ধন্য ধন্য পূর্ণপুণ্য পূজক কৃতার্থ;
পাপ চূর্ণ করি তূর্ণ পূর্ণ পরমার্থ!
ঐহিকেতে শক্তি-সিদ্ধি, পারত্রিকে ভক্তি-
মুক্তিদাত্রি! জগদ্ধাত্রি! জয় মহাশক্তি!
অভয়া-অভয়পদ-নির্ভরে নির্ভয়—;
দুর্গোৎসবানন্দ-রব জয়দুর্গা জয়!
ভাব দুর্গা, জপি দুর্গা, লভি দুর্গে জয়;
দুর্গোৎসব-চিন্তা ফল শিব-ভাবময়!
জয় দুর্গা! জয় শিব! হর হর বম্!
দুর্গোৎসবানন্দে গাই বন্দে মাতরম্!

বেদ ও বেদান্তের জন্ম।

(২য় প্রস্তাব।)

বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথমাংশে চারিটি বর্ষের উল্লেখ করা গিয়াছে। পূজ্যপাদ ঋষিবর্গ তৎকালের পরিজ্ঞাতা পৃথিবীকে চারি বর্ষে, সপ্তদ্বীপে এবং সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত খণ্ডের নাম এবং পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সপ্ত বর্ষের (মতান্তরেণ) আখ্যাগুলি বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহাদের ভৌগোলিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। সপ্তবর্ষের নাম এই——কিম্পুরুষ বর্ষ, ভারতবর্ষ, হিরণ্যবর্ষ, নাভিবর্ষ, কুরু, হিম এবং গিরিবর্ষ। এই বর্ষসপ্তকের মধ্যে প্রথম বর্ষচতুষ্টয়ের পরিচয় আমরা পরিজ্ঞাত আছি। যাঁহারা ভারতের সুদূর দক্ষিণ সীমান্থিত ত্রিবাঙ্কুড় ও কোচিন রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা "ভারতপর্ত্তী" নামে এক জনশ্রুতি

নদী দর্শন করিয়া থাকেন। ত্রিবাঙ্কুড় ও কোচিনের ভাষার নাম মালয়লী, এই ভাষায় 'পডী' শব্দের অর্থ নদী। পুরাণ-প্রসিদ্ধ পরশুরাম এই নদী হইতে আরম্ভ করিয়া, নেপাল ও সিকিম পর্য্যন্ত এবং তদনন্তর সমগ্র হিমাদ্রি, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ও মানস সরোবর পর্য্যন্ত 'ভারতবর্ষ' নাম দিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুড় ও কোচিন এবং সমুদয় মালাবার উপকূল, পুরাণ-মতে, ভারতান্তর্গত নহে, উহা গিরিবর্ষের অন্তর্গত।* এই সকল স্থানের ভাষা, আচার, ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম, শাস্ত্রানুযায়ী দীক্ষা ও শিক্ষা ভারতবর্ষের কোন হিন্দু-জাতির সহিত মিলে না; ইহারা বর্ত্তমান যুগে নানা সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া, আর্য্য হিন্দুর অনুকরণ করিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু-সমাজ হইতে এখনও সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে। ত্রিবাঙ্কুড় ও কোচিন-প্রবাহিত ভারতপডী ভারতবর্ষের শেষ সীমা। আসিয়া মহাদেশের মধ্যবর্ত্তী গিরিমালা ও প্রান্তরসমূহ পুরাকালে হিমবর্ষ বলিয়া আখ্যাত হইত। পণ্ডিত মোক্ষমূলর প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক ও তার্কিক নিচয়ের অভিমতানুসরণকারীদিগের ধারণা এই যে, হিমবর্ষই মানব জাতির জন্ম ও আদিলীলাস্থল; কিন্তু এ বিষয়ে এখনও সন্দেহ মিটে নাই। বর্ত্তমান কালে অনেকে অন্তবিধ অভিমত প্রদান করেন। যাহাহউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রথমোক্ত চারিটি বর্ষের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, আমি এই নির্দিষ্ট বর্ষ-চতুষ্টয় লইয়াই আলোচনা করিব। ভারতবর্ষের কথা ইতিপূর্ব্বে কহা হইয়াছে। অপর তিনটি বর্ষ কোথায়, এক্ষণে তাহার আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এস্থলে একটা প্রয়োজনীয় কথা কহিয়া রাখা আবশ্যক; বর্ত্তমান কালে আমরা যাহাকে ভারতবর্ষ বলি, পুরাকালে ভারতের চতুর্দ্দিকস্থ বহুদেশ প্রদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল এবং এই সনাতন হিন্দুজাতি প্রাচীনকালে কেবল ভারত-দেশ মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র তাঁহাদের গতিবিধি ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকাও তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মানস সরোবর ও কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ, তাহার পরে তির্ব্বত দেশ। তির্ব্বত অতি প্রাচীন ও পবিত্র দেশ, ইহা ঋষিদিগের অতীব প্রিয় ও মনোহর স্থান। অতি প্রাচীন শাস্ত্রেও তির্ব্বতের উল্লেখ আছে। সমুদয় তির্ব্বত এবং তাহার পরবর্ত্তী সার্দ্ধ দুই শত ক্রোশ পর্য্যন্ত কিম্পুরুষ বর্ষ। এই বর্ষ কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত, তন্মধ্যে তির্ব্বত একটি খণ্ড মাত্র। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রখ্যাত আচার্য্য শ্রীমৎ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রাচীনাবস্থায় ব্রাহ্মমত পরিবর্ত্তন করিয়া, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের ন্যায় পুনরায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। পরে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া 'রামানন্দ ভারতী' নামে আখ্যাত হয়েন এবং নানাস্থান পরিব্রজন করিয়া তির্ব্বত দেশে উপনীত হয়েন।

---

* আরব্য সাগর মধ্যস্থ অনেক দ্বীপ এবং ইহার তটস্থ বহুদেশ ঐ বর্ষের অন্তর্গত।—লেখক।

"সাহিত্য" নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্রে তাঁহার তিব্বতভ্রমণের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; এই বিবরণ সম্পূর্ণভাবে লিখিবার অবকাশ বিভারত্ন মহাশয়ের ছিল না, কিন্তু তথাপি যাহা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতীব নূতন ও প্রয়োজনীয়। এই বিবরণে তিনি কিম্পুরুষ বর্ষের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিব্বত সম্বন্ধে তিনি মুখে মুখে যে সকল বৃত্তান্ত বলিতেন, তাহা আরও মনোহর ও কৌতুকোদ্দীপক। কিম্পুরুষ বর্ষ সম্বন্ধে তিনি একদা যাহা কহিয়া ছিলেন, তাহা অবিকল এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বন এবং পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আমি মানস-সরোবর-তটে পৌঁছিয়া পরমানন্দ অনুভব করিলাম। আমার দেহ ও মন পবিত্র হইল। আমি এমন সুন্দর সরোবর আর কোথাও আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না; ইহা যেন স্বর্গের অমৃতভরা সরোবর। মানস সরোবরের তটে আমার মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইল; ভগবান যেন আমার বহুকালের বহু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিলেন! আমি দুই দিবস মাত্র এই স্বর্গপ্রতিম নিষ্কলঙ্ক সরোবর-তটে বিশ্রাম লাভ করিয়া, তিব্বতাভিমুখে যাইতে ছিলাম, কিন্তু সত্বরেই অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম; তথনও এই সুপবিত্র সরোবরের সুন্দর সীমা অতিক্রম করিতে পারি নাই; সুতরাং এক অত্যুচ্চ—অথচ অজ্ঞাতনামা তরুবরের তলে পুনরায় শ্রান্তি দুরীকরণ জন্ত শ্রান্ত হইয়া উপবেশন করিলাম। স্বল্প সময় অতিবাহিত হইলে, যথন ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি, তথন দেখিলাম, মহর্ষিসমতুল্য দুইটি সুদীর্ঘকায় সুন্দর পুরুষ মানস সরোবরের একপার্শ্বে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিয়া ভূমে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদের মস্তকের কেশ ও ভ্রূ এবং শ্মশ্রু ও গুম্ফ শুভ্রবর্ণ; সমুদয় দেহ হুতাশনদগ্ধ বিমলরজতের ন্যায় শুভ্রাধিক শুভ্র; যেন অপূর্ব্ব ত্রিদিবসঞ্জাত নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্যে জ্যোতির্ম্ময়! এমন দীর্ঘাকার প্রবৃদ্ধ—অথচ বলবান ও যৌবনের সৌন্দর্য্যভরা মানব-মূর্ত্তি আমাদের পাপ মনের কল্পনাক্ষেত্রও আসে না। আমি ঝটিতি দৌড়িয়া গিয়া মহানুভবদ্বয়ের পবিত্র পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম। তাঁহারা সুমধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে'? আমি তাঁহাদের কণ্ঠস্বরকে মধুর হইতে মধুরতরবৎ শ্রবণ করিলাম! সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিবার পরে, তাঁহারা পুনরপি কহিলেন "কি চাও?" আমি বলিলাম "শ্রীচরণ ভিন্ন আর কিছুই চাইনা"। ইঁহাদের মধ্যে একটি ঋষি সত্বরে নিকটবর্ত্তী একস্থানে গমন করিয়া, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ঐ স্থানে পুনরাগমন করিলেন এবং আমাকে যাহা খাইতে দিলেন, তাহা পদ্মের মৃণালের ন্যায় কোমল, রুচিকর ও মধুর। তাহা ভক্ষণ করিয়া আমার ক্ষুধা ও পিপাসার শান্তি হইল, উদর ভরিয়া গেল, আর কিছু খাইতে ইচ্ছা হইল না; কিন্তু আহার-সমাপ্তির পূর্ব্বেই দেখিলাম, তাঁহারা অন্যদিক্ দিয়া গমন করিতেছেন। আমি তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করায়, তাঁহারা

জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোথা যাও?" আমি কহিলাম "আপনাদের এই দাস আপনাদেরই অনুবর্ত্তী।" তাঁহারা বলিলেন— "আমরা তোমার অজ্ঞাত কিম্পুরুষ বর্ষবাসী। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই হিমরাশিতে তোমার দেহ জমিয়া যাইবে, তুমি ভবলীলা সম্বরণ করিবে। সে দেশে যাইবার তুমি এখনও উপযুক্ত হও নাই।" অগত্যা আমি ঋষিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম, প্রয়োজন বশতঃ তাঁহারা কৈলাস পর্ব্বতে গিয়াছিলেন, তথা হইতে কিম্পুরুষ বর্ষে প্রতিগমন করিতেছেন। ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয়দিগকে, রামানন্দ ভারতী মহাশয়ের কথা শুনাইলাম। কিম্পুরুষ বর্ষ সম্বন্ধে আমি নিজে যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ ভাবে অবগত আছি, তাহা বারান্তরে বর্ণন করিব। পরবর্ত্তী বিবরণে এই অজ্ঞাত বর্ষ সম্বন্ধে আরও কিছু পরিষ্কার বিবরণ প্রাপ্ত হইবার আশা করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শক্তি-পূজা।

—০:*:০—

শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা, অভয়াচরণে
নম্রশির,
ডরি না রক্ত ঝরিতে, ঝরাতে, দৃপ্ত আমরা
ভক্তবীর,—
শুধু মায়ের চরণে নম্রশির!

জননী মোদের জগদ্ধাত্রী,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্রী,
ঈপ্সিত-বর-অভয় দাত্রী,
অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোকীর!

আবাহন মা'র মুক্ত-গগনে;
তৃপ্ত, তপ্ত-রক্ত-ক্ষরণে;
পশুবল আর অসুর দমনে
মায়ের খড়্গ ব্যগ্রাসীর!

স্বর্ণ-খচিত অতুল আস্য,
নিরাশা-ধ্বান্তে বিনাশি হাস্য,
রাতুল চরণ দেব-উপাস্য
সিংহ-পৃষ্ঠে অটল-স্থির!

[শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ইত্যাদি]

কিরীট দীপ্তি ক্রুদ্ধ গগনে
ক্রত-বিদ্যুৎ স্ফুরিছে সঘনে,—
যেমনি বহ্নি-জলধি মথনে
জ্বালা জ্বলছে জয়শ্রীর!

করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি,
ভরিয়া আশীষে নিখিল সৃষ্টি,
সার্থক করি মানব দৃষ্টি,
রচি রোমাঞ্চ ধরিত্রীর!

গৌরবময় পুণ্য দৃশ্য!—
উচ্ছ্বাস-ভরে স্তব্ধ বিশ্ব!—
ভরা বিশ্বাসে, শক্তি-শিষ্য,
ধরায় লুটাও স্বশরীর!

[শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ইত্যাদি]

মায়ের আরতি, অরাতি-নাশন;
পদে অঞ্জলি, বাঞ্ছা পূরণ;
দুর্নিশি-হরা সোনার বরণ
ঊষা জাগে শিরে হেমাদ্রির!

মায়ের করুণা বড় নির্ম্মম,—
আহুতি-তৃপ্ত-হুতাশন-সম;

হতে নির্ম্মল, দহন প্রথম,—
অস্তে বিশ্ব-বিজয়ী বীর!
কর পদাঘাত বিপদ-মাথায়,
ভর ধরাতল বিজয়-গাথায়,—
হর হর হর!—বিঘ্ন কোথায়?—
শমন ভৃত্য জননীর!
[শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ইত্যাদি]
দর্পে উড়িছে রক্তনিশান;
ক্রূর বিজলি ঝলসে কৃপাণ;
নিদ্রা বিদারি, সমর-বিষাণ
ঘোষে "ধিবো জহি,"মথি সমীর!
অভয়োল্লাসে জননী দপ্ত,
হৃদে কল্লোলি ছুটুক মত্ত
বহ্নি-সদৃশ শোণিতাবর্ত্ত,
রক্ত-আঁখিতে ভক্তি-নীর,—
স্বার্থ ও রিপু নির্দ্দয়ে দলি,
দাও যুগপৎ ও শ্রীপদে বলি,—
রুধির ধারায় চরণাঙ্গুল
রঞ্জি. লুটুক্ ছিন্ন শির!—
মাগো! জবার বদলে ছিন্ন শির!
[শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত ইত্যাদি]

শ্রী:——

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

উপনিষদের উপদেশ।—শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ-প্রণীত। পুস্তকখানি খর্ব্বাকৃতি হইলেও পত্র-সংখ্যায় বৃহৎ। কাগজ উৎকৃষ্ট, মুদ্রণ পরিপাটি। বর্ণাশুদ্ধি বা মুদ্রা-প্রমাদ ও অত্যল্প। পুস্তকখানি হাতে লইলেই, ইহা যে বেশ সযত্নে, সাবধানে ও সৌষ্ঠব-আয়োজনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। পাঠ করিলে, প্রতি পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে লেখকের পাণ্ডিত্য, গবেষণা, বিচার-যুক্তি ও শাস্ত্রীয়তা-শক্তি দেখিয়া আশ্বাসিত ও আনন্দিত হইতে হয়। কোকিলেশ্বর বাবু অনেক দিন হইতেই বঙ্গসাহিত্য-সমাজে প্রত্নতত্ত্ব ও শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ লেখকতার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। "নব্যভারত" প্রভৃতি পত্র অনেক দিন হইতেই তাঁহার প্রবন্ধমালায় অলঙ্কৃত। তবে এ যাবত্ আমাদের "হিন্দু-পত্রিকা" তাঁহার গৌরবময়ী লেখনীর লিপি-সাহায্য লাভ করে নাই। আশা আছে, ভবিষ্যতে করিতে পারে। হিন্দু-শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ-লেখকগণের সুলিপি-সাহায্য "হিন্দু-পত্রিকার" স্বতঃ সাদর-প্রার্থনীয়। হিন্দু-শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ প্রকাশ "হিন্দু-পত্রিকার" জীবনব্রতের নামানুরূপ মুখ্য লক্ষ্য।

সে যাহা হউক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই পুস্তক তাঁহার পূর্ব্বপ্রথিত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার অনুরূপই হইয়াছে। ইহা আমাদের জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটি মহার্হ রত্ন হইয়াছে। আশা করি, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্রমশঃ প্রধান ও প্রামাণিক সমস্ত উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির জ্ঞানতত্ত্ব-ব্যাখ্যা এইরূপ পুস্তকাকারে খণ্ডশঃ প্রকাশ করিবেন। ভারতের বেদান্ততত্ত্ব জগতের মানবজাতির একটি প্রধান আধ্যাত্মিক সম্পত্তি। জাগতিক প্রত্যেক সভ্যজাতির প্রচলিত ভাষায় ইহার চর্চ্চা, ব্যাখ্যা ও অনুশীলনাদি যথা-

ধিকার হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ স্ব স্ব শিক্ষা-সংস্কারানুরূপ ইহার দার্শনিক অংশেই আস্বাদন করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত পারমার্থিক অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্বরস ভারতীয় স্বাধ্যায়-শক্তি-সন্দীপ্ত সাধুসুধী সমাজেরই অনন্যসম্ভোগ্য। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ভাষ্য-টীকাদির দ্বারায় বর্ত্তমানে বেদান্ততত্ত্বের সময় ও অধিকারোপযোগী সৌলভ্য সম্পাদন সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ স্বাধ্যায়-সেবার্থী সামাজিক-ব্যক্তিবর্গের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রচলিত ভাষায় এতদ্বিষয়ক এবম্বিধ গ্রন্থাদির প্রচার প্রার্থনীয়। কোকিলেশ্বর বাবু বঙ্গদেশে এই বঙ্গভাষা-ভাষিণী ব্যাখ্যার সে অভাব ও আবশ্যকতা পূরণের সূত্রপাত করিলেন। এইজন্য তিনি জাতীয় সাহিত্য-সমৃদ্ধিকামী শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

তবে কিনা, গ্রন্থকারের সকল মত-ব্যাখ্যার সহিতই অস্মদীয় মতের ঠিক অভিন্নতা নাই। স্থানাল্পতায় আবশ্যকীয় উদ্ধৃতিসহ উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। ফলে কোন ২ স্থলে গ্রন্থকারের আত্মসংস্কার ও বিশ্বাসগত মত যেন শঙ্করাচার্য্যের মতরূপেই তদীয় উক্তি-উদ্ধৃতির সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অর্থাৎ যেন তাঁহার আত্ম মত শঙ্কর-সিদ্ধান্তরূপ মহাযন্ত্রের ভিতরে ফেলিয়া, বৈদান্তিকতার উপযোগী-ভাবে পরিশোধিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাও কম ক্ষমতার কথা নহে। যাহাহউক, আমরা কোকিলেশ্বর বাবুর বর্ত্তমান ও ভাবী কৃতীত্বে আনন্দিত ও আশান্বিত রহিলাম।

গন্ধবণিক তত্ত্ব।—শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত; শ্রীনটকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। সার্দ্ধ শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহদাকৃতির গ্রন্থ। ছাপা-কাগজ উত্তম। ভুলচুকও কম। গোপাল বাবু একজন প্রথিতনামা প্রবীণ লেখক। তাঁহার "যৌবনে যোগিনী" প্রভৃতি নাট্যকাব্য আমরা যৌবনে পড়িয়াই প্রমোদিত হইয়াছি। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার পূর্ব্ব খ্যাতির অতীত হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে নাট্যকাব্য-কবি বলিয়াই আদর করিতাম; তিনি যে এমন শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ, তাহা এই গ্রন্থ পাঠে বিদিত হইয়া, বিস্মিত, আনন্দিত ও আশ্বাসিত হইলাম। আমরা গোপাল বাবুর কাছে কাব্য অপেক্ষা এইরূপ জিনিসেরই আরো অনেক আশা করি। এখন প্রাচীন স্বদেশী সাহিত্যিক সাররত্ন সমূহ উদ্ধারের সময় পড়িয়াছে। কাব্য এখন দিন কয়েক সভ্য ভব্য হইয়া চুপ্ করিয়া থাকুন। নব্যদের কাছে বিজ্ঞান—দর্শন—ক্রমে প্রত্নতত্ত্ব—শাস্ত্রতত্ত্ব আসুন। এখন কেবল ধর্ম্ম চাই—ভগবান চাই—স্বদেশভক্তি ও স্বাবলম্ব-শক্তি চাই। ভক্তিযোগে চালিত—ভগবন্নির্ভরতায় পালিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ চাই। এইরূপ জাতিতত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্রার্থসমালোচক গ্রন্থ বর্ত্তমানে স্বদেশীয় লুপ্তরত্নোদ্ধারণে প্রধান সহায়, সন্দেহ নাই। তজ্জন্য গোপাল বাবু (গন্ধবণিক-সমাজ কর্ত্তৃক, বিশিষ্ট কৃতজ্ঞতায় অভিনন্দিত হইলেও,) সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট জাতীয় কর্ত্তব্য পালনে সময়ানুরূপ—'স্বদেশী' সাধনে

একটি সাহিত্যিক সহায় স্বরূপ এই পুস্তক প্রণয়ন ও সঙ্কলনে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বঙ্গীয় বৈশ্য শাখান্তর্গত অনেক সম্প্রদায় হইতেই প্রকাশিত স্ব স্ব জাতিতত্ত্বনির্ণায়ক, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিযোগে বৈশ্যত্বপ্রতিপাদক অনেক পুস্তক আমরা পাইতেছি। অবশিষ্ট অন্যান্য শাখা বৈশ্যবর্ণীয় শূদ্রাচারপ্রাপ্ত বঙ্গীয় সম্প্রদায়সমূহের শিক্ষিত ও সম্পন্নগণের চেষ্টায়, গোপাল বাবুর ন্যায় যোগ্যপাত্র দ্বারা এইরূপ স্বজাতি-তত্ত্ব গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করা প্রার্থনীয়। ফলে জাতীয় উন্নতি সাধনে ঐরূপ গ্রন্থাদিই প্রধান সাহিত্যিক সহায়।

এই "গন্ধবণিকতত্ত্ব" পুস্তকে বৈদিক প্রমাণ হইতে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাব্যসাহিত্যিক প্রমাণ-পর্য্যন্ত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়া, বঙ্গীয় "গন্ধবণিক" জাতির বিশুদ্ধ বৈশ্যত্ব বিশদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কতিপয় শাস্ত্রপারদর্শী প্রথিতনামা পণ্ডিতের গন্ধবণিক-বৈশ্যত্ব-বিধায়ক মতবিধি ('পাতী') গুলি এই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। ফলে এতৎ পাঠে বঙ্গীয় গন্ধবণিক্ জাতির মূলতঃ বিশুদ্ধ বৈশ্যত্ব বিষয়ে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছি। বঙ্গীয় অনেক ব্যবসায়ী জাতিই খাঁটি বৈশ্যবর্ণ-সম্ভূত, কিন্তু বঙ্গে 'বল্লালী' জাতি-বিপ্লব-ফলে যজ্ঞোপবীতভ্রষ্ট ও শূদ্রাচার-বিশিষ্ট। শাস্ত্রীয় জাতিতত্ত্ব-গ্রন্থাদির প্রচারে ক্রমে তাহা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইয়া, তত্তৎ সম্প্রদায়ের জাতীয় উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতেছে ও করিবে। এইজন্য আমরা জাতিতত্ত্ব-গ্রন্থাদির বিশেষ আদর ও আবশ্যকতানুভব করি। আলোচ্য গ্রন্থখানির সর্ব্বশেষে একটি সুবিস্তীর্ণ বর্ণসঙ্কর-জাতি-পরিচয়-তালিকা সন্নিবেশিত হওয়ায়, ইহার গুরুত্ব অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে।

"চিন্তা-নির্ঝরিণী"—শ্রীযুক্ত কুমার বিক্রম মজুমদার-প্রণীত। বৃহৎ পুস্তক। মূল্য ৸৹ মাত্র। হিন্দু পত্রিকার গ্রাহকগণের জন্য ॥৹ মাত্র। কাগজ ও ছাপা উত্তম। মুদ্রণ-প্রমাদাদি সামান্য। পুস্তকখানি একাধারে দর্শন ও গদ্যকাব্যের সুন্দর সংমিশ্রণ। গ্রন্থকার অল্পবয়স্ক ও আমাদের ঘরের ছেলে হইলেও, সত্যের অনুরোধে বলিতে পারি যে, তাঁহার শিক্ষা, চিন্তাশীলতা, ইংরাজী সাহিত্যে অভিজ্ঞতা ও বঙ্গসাহিত্য-ভাবুকতা অন্ততঃ তাঁহার বয়স অনুসারে আশাপ্রদ ও আশানুরূপ। ক্রিয়াপদের যথাসম্ভব অল্প-ব্যবহারের সহিত উদ্দীপনাময়ী ভাষার একটা নূতন ভঙ্গি সাহিত্য-রসিক পাঠক এই পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। কতিপয় স্বনামধন্য সাহিত্যাসনে অগ্রগণ্য প্রধান ব্যক্তি "চিন্তানির্ঝরিণী"র বিবিধ প্রশংসা করিয়া নবীন লেখককে উৎসাহিত করিয়াছেন। ফলে এবারে এই প্রথম উদ্যমে যে কিছু ত্রুটি, প্রমাদ, অপক্কতা বা অসম্পূর্ণতাদি ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে ক্রমানুশীলনে তাহা পরিশোধিত পরিপক্ক ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, আশা করি।

শ্রীহরিঃ

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। কার্ত্তিক। ১৩১৪ সাল, ১৮২৯ শকাব্দা।

বিজয়া-সম্ভাষণ।

প্রণম্য দুর্গাং শিবদাং শিবপ্রিয়াং
শুভায় সর্ব্বৈ বিজয়োৎসবাধিবৈঃ।
বিধেয়মার্য্যৈঃ পরিরভ্য সাদরং
পরস্পরং প্রেমসম্ভাভিবাদনম্।

শ্রীদুর্গা-শ্রীপদদ্বন্দ্ব সর্ব্বাগ্রে বন্দন।
সর্ব্ব-প্রতি বিজয়ার শুভাভিবাদন॥
প্রণিপাত-নমস্কার-শুভাশীষরাশি—
যথাযোগ্য গ্রহণ করুন দেশবাসী।
আলিঙ্গন—বিজয়ার শুভ সম্ভাষণ
উদ্দেশে উৎসর্গি, দুর্গা-পদে নিবেদন,
বিজয়া মা দুর্গা করি কৃপা-কণা দান,
করুন সবার শুভ বিজয়-বিধান।
দর্শনে, প্রণামে ও প্রসাদ পেয়ে মা'র,
সম্ভোগি বিজয়ানন্দ শুভ বিজয়ার,
অভয়া-অভয়পদে লভিয়া আশ্রয়,—
আত্মশক্তি-মাতৃভক্তি-নির্ভরে নিশ্চয়-
এ 'স্বদেশী'-সাধন-সমরে দেশবাসী—
'বিষো জহি'-প্রার্থনা-পূরণে দ্বিষ নাশি,
নব বলে অগ্রসর হউন নির্ভয়,—
প্রতি পদে নিরাপদে লভুন বিজয়।

পাঠক-গ্রাহক-অনুগ্রাহক-বান্ধব,
সহানুভাবক—পৃষ্ঠপোষক যে সব,
সানুগ্রহে—সাগ্রহে তাঁহারা পূর্ব্ব ভাবে
করুন কৃপানুকূল্য, এ প্রার্থনা এবে।
তাঁদেরি সাহায্যে সদা তাঁদেরি পালিতা,
তাঁদেরি আয়াস যত্ন-আদরে লালিতা;
তাঁদেরি-পোষণে তোষে তাঁদেরি তোষিকা-
অধ্যাত্ম-পরিচারিকা এ "হিন্দু-পত্রিকা"।

অর্থে ও সামর্থ্যে স্বার্থে সহায়তা-কার্য্য;
সদয় সহানুভূতি—সুলিপি-সাহায্য,—
করুন কুশলে থেকে পুনঃ সর্ব্বজন,
বিজয়ার এ বিনীত শুভ সম্ভাষণ।
স্বদেশী সাহিত্য-সেবা স্বদেশ-বিকাশে
প্রধান-সাধন-শক্তি, ব্যক্ত ইতিহাসে।
পালুন সে ব্রত সবে লভি নবোদ্যম;
বলুন বিজয়ানন্দে বন্দে মাতরম্!

ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার অনুশীলন।

২৮। যোগবল, উপাসনার সামর্থ্য, ধ্যান-সমাধির বৃত্তি-নিরোধ ও অলৌকিক প্রভাব এবং তপস্যার শক্তি, আত্মতত্বজ্ঞ বা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনকারী বা আত্মতত্বের বিচারক্ষম পুরুষের অবশ্যম্ভাবী গুণ বা অলঙ্কার নহে। কেন না, আত্মজ্ঞান তন্নিরপেক্ষ। যদি তাদৃশ কোন আধারে তাহার কোনটী দৃষ্ট হয়, তবে মনে করিতে হইবে যে, তাহা সেই সমস্ত বা তাহার অন্যতর সাধনের স্বতন্ত্র ফল; নতুবা আত্মতত্বের ফল নহে। সামান্য লোকে আত্মতত্বের আলোচনাকারী পুরুষকে নির্গুণ ও অলৌকিক সাধনে অক্ষম দেখিয়া উপহাস করিতে পারে, কিন্তু তিনি তাহার সাধনে মতি দেন নাই। যে হেতু তাঁহার মতি, জ্ঞান ভিন্ন কোন অবান্তর ফলনিষ্ঠ নহে। পুনশ্চ, এ সম্বন্ধে পঞ্চদশীর বিচার উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) উপমৃদ্নাতি চিত্তং চেদ্ধ্যাতাসৌ নতুতত্ত্ববিৎ। নবুদ্ধিং মর্দ্দয়ন্ দৃষ্টোঘটতত্বস্য বেদিতা॥ [ধ্যাঃ দী ৯১] যিনি ধ্যান বা চিন্তাদ্বারা চিত্তবৃত্তি বিলীন করেন, তিনি তত্বজ্ঞানী নহেন। তাঁহাকে ধ্যাতা বলা যায়। ঘট পট আদি বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিমিত্তে অন্তঃকরণ-বৃত্তি বিলীন (বা নিরোধ) করিতে হয় না।

(২) সকৃৎপ্রত্যয় মাত্রেণ ঘটশ্চেদ্ ভাসতে তদা। স্বপ্রকাশোয়মাত্মা কিংঘটবচ্চ নভাসতে॥ (ঐ ৯২)॥ কেবল একবার অন্তঃকরণ-বৃত্তির সংযোগ মাত্রেই ঘটাদি বস্তুর জ্ঞান হয়, তদ্রূপ স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ আত্মা, চিত্তের বিলয় ব্যতিরেকে কেননা প্রকাশিত হইবেন?

(৩) ধ্যানস্বৈচ্ছিকমেতস্য বেদনান্মুক্তি সিদ্ধিতঃ। জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যমিতি শাস্ত্রেষু ডিণ্ডিমঃ॥ (ঐ ৯৭)॥ তত্বজ্ঞানী ব্যক্তির ধ্যান ঐচ্ছিক মাত্র। নতুবা জ্ঞান দ্বারাই তাঁহার মুক্তি সিদ্ধ হয়। জ্ঞানেই কৈবল্য, ইহা শাস্ত্রের ঘোষণা।

(৪) তত্ত্ববিদ্ যদি ন ধ্যায়েৎ প্রবর্ত্তেত তদা বহিঃ। প্রবর্ত্ততাং সুখেনায়ং কোবাধোস্য প্রবর্ত্তনে॥ (৯৮)॥ তত্বজ্ঞানী যদি ধ্যান না করেন এবং বাহ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে বাধা নাই।

(৫) শাপানুগ্রহসামর্থ্যং যস্যাসৌ তত্ত্ববিদ্ যদি। নতৎ শাপাদি সামর্থ্যং ফলং স্যাত্তপসো যতঃ॥ (ঐ ১০৮)॥ অভিসম্পাত ও অনুগ্রহ করিতে যাঁহার সামর্থ্য আছে, তাঁহাকেও তত্বজ্ঞানী বলা যায় না। কেননা সে সব সামর্থ্য তপস্যার (তপস্যা বিশেষের)

ফল মাত্র। তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে। (তপস্যা অনেক প্রকার—তাহার কতকগুলি চিত্ত-শুদ্ধিজনক, কতক ফলার্থ, কিন্তু যাহা জ্ঞানেতে উদ্দিষ্ট, জ্ঞানই তাহার ফল।)

(৬) বহুব্যাকুল চিত্তানাং বিচারাত্তত্ত্বধী র্নহি। যোগো মুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি॥ (ঐ ১৩২)॥ বহু ব্যাপারে যাঁহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত, বিচার দ্বারা (অথবা শ্রুতি-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা) তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় না। অতএব তাঁহাদের মনস্থিরের নিমিত্তে যোগ (উপাসনা) মুখ্যরূপে উক্ত হইয়াছে। তাহাদ্বারা অন্তঃকরণের দোষ সকল নষ্ট হয়।

২৯। এই ছয়টী বচন কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা ব্যতীত বিনা সংশয়ে বুঝা সহজ নহে। অতএব নিম্নে তাহা প্রদান করিতেছি।

(১) ঘটজ্ঞানের সহিত আত্মজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু দৃষ্টান্ত সর্ব্বাঙ্গীন হয় না। উভয়ত্র কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, এই তিন তিনটী পদ উহ্য। জীবাত্মাই ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত দেহের স্বামী। অতএব তিনিই ঘট দর্শনের ও ঘটের জ্ঞান গ্রহণের কর্ত্তৃপদ। চক্ষু ও মনের সংযোগে তাঁহারই ঘট-রূপ-বস্তুর জ্ঞান হয়। অতএব ঘট-রূপ যে দৃশ্যবস্তু, তাহাই কর্ম্মপদ এবং চক্ষু ও মনের সংযোগে ঘটদর্শন রূপ কার্যটীর নাম ক্রিয়াপদ। এস্থানে জীব রূপ কর্ত্তা, ঘটবস্তু রূপ কর্ম্মপদ এবং দর্শনরূপ ক্রিয়াপদ, এই তিনটী পদার্থ পৃথক্ পৃথক্।

(২) কিন্তু আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে আত্মাই আত্মসাক্ষাৎকারের কর্ত্তা, আত্মাই পরম-দর্শনীয় বস্তুরূপ কর্ম্মপদ, এবং আত্মপ্রত্যয়ই ক্রিয়াপদ। অতএব এ ক্ষেত্রে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ নহে। আত্মা স্বয়ম্প্রকাশবস্তু, অন্য কিছু তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; তিনি আত্ম অস্তিত্ব-প্রত্যয়-মাত্র দ্বারা আপনাকে জানেন এবং "তস্য স্বপ্রকাশত্বেন ঘটাদপি স্পষ্টত্বাৎ চিত্তরোধনং নৈবাপেক্ষ্যতে ইত্যাহ সকৃৎপ্রত্যয় মাত্রেণেতি"। আত্মা স্বপ্রকাশ, সেজন্য ঘট অপেক্ষা তাঁহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। সুতরাং তাঁহার প্রকাশিত হইবার নিমিত্তে চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা বিলয় অথবা মন ও চক্ষুর সংযোগ অপেক্ষিত নহে। তাহা একমাত্র আত্মপ্রত্যয়-সার।*

---

* দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিবিশিষ্ট রূপে আত্মার স্বকীয় সত্তার যে জ্ঞান, তাহার নাম দেহাত্মজ্ঞান অথবা কর্ত্রাত্মক জ্ঞান। তাহা আত্মজ্ঞান নহে। কিন্তু দেহাদি প্রকৃতি-সম্বন্ধ ব্যবচ্ছেদক আত্মার নিরুপাধিক অবস্থায় আপনার স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপের যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান জাগ্রত হয়, তাহারই নাম আত্মজ্ঞান। আত্মা আপনিই আপনার সেই চৈতন্যস্বরূপের দ্রষ্টা। অতএব স্বয়ং আত্মাই আত্মজ্ঞানের বিষয় (object)। তাঁহাকে বিভিন্ন বাদিগণ ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্যে গ্রহণ করেন। সাংখ্য-দর্শন বলেন, ভিন্ন ভিন্ন দেহে আত্মা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তাঁহারা উক্ত শাস্ত্রে 'পুরুষ' নামে উক্ত হন। অতএব যত পুরুষ কৈবল্যরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব আত্মজ্ঞানের বিষয়। বেদান্তমতে ব্রহ্মই সর্ব্বাত্মা—সকলের আত্মা; অতএব তিনিই সমস্ত মুক্ত পুরুষের আত্মজ্ঞানের বিষয়। একমাত্র সাগর-গর্ভে যেমন নদী সকল

(৩) অতএব ঘটজ্ঞানে ও আত্মজ্ঞানে এই প্রভেদ। উক্ত বচনে উভয়ের বস্তু-অংশের তুলনা মাত্র দিয়াছেন। অর্থাৎ ঘট, একটি বস্তু (substance)। তাহার অস্তিত্ব-জ্ঞান লাভার্থে চক্ষু মুদ্রিত ও চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া ধ্যান-সাধন করিতে হয় না। কিন্তু চক্ষু ও অন্তঃকরণবৃত্তির অবভাসন মাত্রে সে জ্ঞান জন্মে। সেইরূপ আত্মা ও

নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞ বিদ্বান পুরুষ সকল, সেই অদ্বয় ব্রহ্মেতে, অবিদ্যাকৃত নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, প্রবেশ করেন। এই প্রবেশ, অমৃত এবং অদ্বয় পরমানন্দের ব্যঞ্জক; কিন্তু সেই মুক্ত পুরুষগণের বিনাশ বোধক নহে। অতএব মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মেতে মুক্ত পুরুষগণের এই পরম শান্তিরূপ অন্তর্ভাব বশতঃ ব্রহ্মই আত্মজ্ঞানের বিষয়। তিনি আত্ম-স্বরূপে গৃহীত হইলে, প্রতিপুরুষের আত্ম-স্থিতি সিদ্ধ হয়। এই আত্মজ্ঞান, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি রূপ অবস্থাত্রয়ের অতিক্রান্ত। ঐ তিন অবস্থাই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক। কিন্তু আত্মার যে অবস্থায় সাংসারিক জাগ্রজ্জ্ঞান অতিক্রান্ত হয় এবং তৎসহ তাহার বাধস্বরূপ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি রহিত হয়, তাহাই নির্গুণ আত্মা। সেই আত্মা অবাধিত ও অপরিলুপ্তচৈতন্য। প্রত্যেক মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মাত্মাতে অন্তর্ভাব বিধায় ব্রহ্মাত্মাই আত্মজ্ঞানের বিষয়। এই অন্তর্ভাব, কেবল নদীগণের সাগরে অন্তর্ভাবের ন্যায় জড় সম্বন্ধ নহে; কিন্তু পিতা-মাতাতে সন্তানগণের অন্তর্ভাবের ন্যায় পরমাত্মীয় সম্বন্ধ। এই যে নির্ম্মল ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান, ইহা মোক্ষাধিকার। ইহাই তুরীয় পদ—চতুর্থ। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অতি-ক্রান্ত; অতএব চতুর্থ। যাঁহারা মোক্ষ চান, তাঁহাদের পক্ষে ঐ তুরীয় ব্রহ্মাত্মাই আত্মা। তিনিই বিজ্ঞেয়। (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)। তিনি একস্বরূপী, অমৃতস্বরূপ, শিবস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অশরীরী, শান্ত এবং একাত্মপ্রত্যয়-সার মোক্ষপদ। তিনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, নিরঞ্জন, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং নিত্য। এই সমস্ত লক্ষণ অন্য কোন পদার্থে নাই। সমস্ত পদার্থই আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতির বিকার। অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্গলোক, সূক্ষ্ম কলেবর, দেবদেহ, মায়ারচিত দেহ, জ্যোতির্ম্ময় রূপ সমস্ত, প্রকৃতি বা মায়া-সম্পাদ্য আনন্দ সম্ভোগ, কল্পকোটি স্থায়ী পরমায়ু এবং কালগতি—এ সমস্তই প্রকৃতির বিকার। ইহার কিছুতেই ঐ সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান নাহি। কিছুরই স্বরূপ একত্ব নহে। সমস্তই প্রাকৃতিক অবয়ব-সংঘাত-সংশ্লিষ্ট, সুতরাং কালেতে বিশ্লেষ্য; অতএব অমৃত, অদ্বিতীয়, অশরীরী, অরূপ, নিরঞ্জন, বিভু, অবিকারী এবং নিত্যকালস্থায়ী নহে। সুতরাং অমৃত, আনন্দ, মঙ্গল, জ্ঞানস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ নহে। অতএব যিনি তুরীয় ব্রহ্মাত্মা, তাঁহাতেই প্রবেশ করিয়া মুক্ত পুরুষেরা ধ্রুব, সত্য, অন্যযোগব্যবচ্ছেদক, অরূপ, অব্যয়, অনন্ত, নিরঞ্জন, অমৃত, আনন্দ, মঙ্গল ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। এতাবতা ঐ তুরীয় পদই একত্ব ও অমৃতত্ব প্রভৃতির নিলয়। সেই পদই মহামোক্ষ পদ। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানী ব্যতীত অন্যের তাহাতে অধিকার নাহি। কেননা কেবল ব্রহ্মাত্মজ্ঞানীই রূপ, নাম, প্রাকৃতিক গুণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পরিত্যাগ করতঃ তাহাতে প্রবেশ করেন। যে সকল পুণ্যাত্মা, রূপ, নাম শরীরাদি চান, তাঁহাদের পুণ্য-লোকে গতি হয়। অমৃতত্ব স্বরূপ—আত্ম-জ্ঞানের বিষয় স্বরূপ—মায়ারাজ্যের অতি-ক্রান্ত স্বরূপ তুরীয়পদ লাভ হয় না। পক্ষান্তরে, যাঁহারা তাহা লাভ করেন, তাঁহারা একত্ব সম্ভোগ করেন। সেই একত্ব, প্রকৃতির বিকার রূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সংঘাত দ্বারা, অথবা পরমাণু পুঞ্জ দ্বারা, অথবা দেশকাল দ্বারা, অথবা অনাদি অদৃষ্ট, কর্ম্ম

একটি বস্তু (substance of object) অথচ স্বয়ম্প্রকাশ (self-illuminating) এবং আপনিই আপনার দ্রষ্টা।+ তাঁহার প্রকাশ রূপ বস্তু ধর্ম্মটী, ধ্যান বা চিত্তনিরোধ এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবরোধন বা সাহায্য অপেক্ষা করে না।

(৪) কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসিতে পারেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিই তো স্বীয় স্বীয় শরীরে আপন আপন আত্মার অস্তিত্ব অনু করেন; সে অনুভব কি আত্মজ্ঞান নহে? যদি তাহা হয়, তবে আত্মজ্ঞান তো সাধারণ কথা এবং প্রত্যেক শরীরাভিমানী ব্যক্তিরই কৈবল্য রূপ মুক্তি সদা সিদ্ধ। এমত অবস্থায় আত্মজ্ঞান লইয়া এত বিচার কেন?

(৫) একথার উত্তর এই যে, উহা ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ বেদান্তবিজ্ঞান-প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান নহে। রজ্জু একটী বস্তু। তাহার অবলম্বনে দ্রষ্টার মনের মিথ্যাধর্ম্ম অধ্যস্ত হইয়া রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। আত্মা সেইরূপ, স্বপ্রকাশ সত্যবস্তু। তাঁহার অবলম্বনে ও আশ্রয়ে, জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-সাধক অনাদি কর্ম্ম ও অবিদ্যা জন্য দেহ, ইন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধ্যাদি অনাত্ম পদার্থ সকল অস্তি ভাতিরূপে প্রকাশিত ও আলোকিত হয়। বিচারহীন অবিশুদ্ধ দ্রষ্টা সেই গুলিকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করেন; কিন্তু ভ্রম-সর্পের ন্যায় সেগুলি তাঁহার অবিদ্যা-পোষিত অনাত্মধর্ম্মী মনের জগৎ এবং পরিণামে অবস্তু এবং মিথ্যা।

ও অবিদ্যা দ্বারা গঠিত নহে। সুতরাং অবিভাজ্য, অবিনশ্বর, অপরিবর্ত্তনশীল, ভেদ-বিচ্ছেদ ও বিচ্যুতিশূন্য। এই হেতু সেই একত্ব লাভে, বৈকারিক, পরমাণুসমবায়ী, কর্ম্মজনিত, অবিদ্যা ও মায়ার রচিত দেহাদি পদার্থের ভঙ্গ, স্বজন ও বান্ধবাদির বিয়োগ এবং দর্প, শোক, মোহময় ভবসাগরের ভয়ানক তরঙ্গ নিঃশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। "তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ" (ঈশ ৭) যে সময় পুরুষের আত্মদর্শন হয়, তখন তাঁহার মোহই বা কোথা? শোকই বা কোথা? অতএব বিশুদ্ধ গগনোপম এক আত্মতত্ত্ব রূপ একত্ব দর্শন হইলে, শোক-মোহাদির অন্ত হয়।

+ "প্রকাশতস্তৎসিদ্ধৌ কর্ম্মকর্তৃবিরোধঃ" কপিল সূত্র ৬। ৪৯। "There is no contradiction here between patient (কর্ম্মপদ object) and agent (কর্ত্তৃপদ subject), because the soul (আত্মা), through the property of light which is (innately) lodged in it, can itself furnish the relation to itself,—just as the Vaiseshikas declare, that through the intelligence ledged in it, it is itself an object to itself."

(Dr. J. R. Ballantyne's translation 1865).

(2) "অস্মৎ প্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ অপরোক্ষত্বাচ্চ" (বেদান্ত সূত্রের শাঙ্করভাষ্য ১।১।১) "The soul is the object of the first personal pronoun and self erident."

অপরঞ্চ। "অতো ন পুরুষব্যাপার পারতন্ত্র্যা ব্রহ্মবিদ্যা, কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিষয় বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্রৈব" ঐ ১।১।৪। "Therefore the science of Brahma is not dependent on personal acts. What then? Like the knowledge of a substance (the object of perception and other proofs) it is dependent on the substance (আত্মা) itself."

(Translation by Revd. K. M. Banerji) Biblistheca Indica.

(৬) সেগুলি অনিত্য অনন্ত জড়ধর্মী শত-সহস্র বেদনা-সঙ্কুল এবং জন্ম মৃত্যুর প্রবাহরূপী। বিচারহীন বালক যেমন চিম্‌নী ও ডোমকে আলোক মনে করে, তাহার অন্তরস্থ সূক্ষ্ম জ্যোতির তত্ত্ব লয়না, সেইরূপ বিচারহীন পুরুষ আত্মার খোঁজ লয়না, কেবল দেহাদিকে আত্মা ভাবিয়া অনাদি অধ্যাস বশে জন্ম-জরা-মরণস্রোতে ভাসমান হয়। অতএব বিচারহীন অবিশুদ্ধ পুরুষদিগের যে আত্মজ্ঞান, তাহা সাধারণ-ব্যবহার বটে, কিন্তু তাহা বেদান্ত, বেদ বা সাংখ্য-প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান বা মোক্ষজনক তত্ত্বজ্ঞান নহে।

(৭) অপরে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আদি পদার্থকে কিজন্য অনাত্মা বলা যায়, এবং কেনই বা তাহারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-সাধক হইয়াও জন্ম মৃত্যু ও বেদনার হেতু হয়? একথার উত্তর এই যে, আত্মা স্বরূপতঃ অসঙ্গ ও নির্ম্মল পদার্থ। শাস্ত্রমতে, তাঁহাতে প্রকৃতি বা অবিদ্যা, ঐ সকল অনাত্ম সম্বন্ধ কল্পনা করে, যদ্রূপ জবাকুসুম স্ফটিক-পাত্রেতে স্বীয় রক্তবর্ণ আভা প্রক্ষেপ করে। এই কল্পিত সম্বন্ধ অনাদি। তৎকৃত সূক্ষ্ম-দেহ ও স্থূল দেহাদির বীজ ও কর্ম্মফল অনাদি এবং তৎসম্বন্ধবশাৎ আত্মার কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, শুভাশুভ ফলভোগ, সংসই অনাদিকাল হইতে আবহমান হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তৎসমস্তই আত্মাতে আরোপিত হইয়াছে মাত্র। তাহারা আত্মার স্বরূপগত নহে। স্বরূপগত হইলে, তাহাদিগকে ছাড়ান অসম্ভব হইত।

(৮) কিন্তু আত্মা তাহাদিগকে কেন ত্যাগ করেন না? ইহার উত্তর এই যে, তিনি উহাদিগের আরোপিত সম্বন্ধে চির-কাল মোহিত হইয়া আছেন। তাহাতে আত্মস্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন। উহারা যে তিনি নন, এ বিবেকজ্ঞান জন্মে নাই। এই কারণে তিনিও উহাদিগকে ছাড়েন না, উহারাও তাঁহাকে ছাড়ে না। এই অবি-বেকতা ও অজ্ঞান অনাদি, সেজন্য জগৎও অনাদি অনন্ত-প্রবাহে আসা যাওয়া করি-তেছে। কিন্তু বহু জন্মের অন্তে শুভ কর্ম্ম দ্বারা, শম-দমাদির সাধন দ্বারা, সাধুসঙ্গ দ্বারা যখন আত্মাতে প্রকৃতি বা অবিদ্যা-ব্যবচ্ছেদক বিবেকজ্ঞান জন্মে অথবা আত্ম-দর্শন হয়, তৎক্ষণাৎ ঐ সকল কল্পিত সম্বন্ধ সরিয়া যায় এবং আত্মা মোক্ষানন্দ অনুভব করেন।

(৯) ঐ সকল সুখ দুঃখপ্রদ, পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর ঘটনাকারী সম্বন্ধ কল্পিত না হইলে, উহারা আত্মার চিরবন্ধন স্বরূপ হইত। কোন উপায়ে উহাদিগকে পরি-ত্যাগ সম্ভব হইত না। হইলেও আত্মার অঙ্গচ্ছেদ হইত। তাহাতে আত্মার অখণ্ড একরস স্বরূপ আত্মজ্ঞান সমুদিত হইত না। এই জ্ঞানযোগের উপদেশ কেবল হিন্দু-শাস্ত্র ও হিন্দুধর্ম্ম হইতেই পাওয়া যায়।

(১০) এই জন্য উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন, সাংখ্যদর্শন, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে আত্মজ্ঞান সাধনের এত উপদেশ ও বিচার। সেই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন, আত্মানাত্ম-বিবেক দ্বারা আত্মতত্ত্বের বিচার, এবং আত্মজ্ঞান লাভার্থ সাধকের অভিরুচি

অনুযায়ী যোগ, ধ্যান, তপস্যা,যজ্ঞদেবার্চনাদি সদনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ফলে সাধক আত্মানুসন্ধান রূপ মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট না হন, ইহাই সমস্ত মোক্ষশাস্ত্রের অভিপ্রায়।

(১১) ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র যে, আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান প্রভৃতি একই কথা। প্রত্যেক আত্মাই চৈতন্যময়। তিনি যেমন অবিদ্যাদোষে দেহ মন আদি প্রাকৃতিক কার্য্য দ্বারা বদ্ধ, সেইরূপ স্বীয় চৈতন্য-শক্তি দ্বারা শাস্ত্রদৃষ্টিতে এবং গুরুর উপদেশে তৎসমস্তকে দমন পূর্ব্বক বশীভূত করিতে পারেন, এবং ক্রমে জানিতে পারেন—তিনি স্বতন্ত্র। এই আত্মস্বাতন্ত্র্য জ্ঞান সমুদিত হইলেই প্রত্যেক আত্মাই সাংখ্য মতে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কৈবল্য-রূপী ব্রহ্ম; এবং বেদান্তমতে, প্রত্যেক আত্মাই একমাত্র ব্রহ্মাত্মাতেই আত্মস্থ হয়েন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে উভয় দর্শনের এই আত্মসাক্ষাৎকার রূপ দৃষ্টিভেদ মনোহর।

(১২) প্রত্যেক আত্মাই স্বরূপতঃ মুক্ত ও সর্ব্বব্যাপী। প্রত্যেকের অনাদি অবিদ্যাকৃত ও অনাদি কর্ম্মজন্য স্থূল সূক্ষ্ম শরীরই সেই স্বরূপের আবরণ। তাহারই নাম উপাধি। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর নিমিত্তক আত্মা সমূহের যোনিভ্রমণ ও স্বর্গাদি লোকান্তরে গমনাগমন। যথা, আকাশ স্বরূপতঃ মুক্ত ও সর্ব্বব্যাপী পদার্থ। সুতরাং তাহার গমনাগমন নাই। কিন্তু ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের গমনাগমন হইতে পারে। বাহকের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক ঘটের সহিত তন্মধ্যস্থ আকাশ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে। সেইরূপ সূক্ষ্মশরীরাভিমানী অমুক্ত ও পরিচ্ছিন্ন আত্মা সমূহ স্ব স্ব কর্ম্মনিবন্ধন, লোকান্তরে, সূক্ষ্মশরীরের সহিত অভিবাহিত হয়েন এবং তদ্‌বীজবশাৎ অন্য স্থূলকলেবর বা দেবদেহ ধারণ করেন।

(১৩) যে সকল আত্মার ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জন্মে,তাঁহাদের স্থূল সূক্ষ্মশরীরাদিরূপ উপাধি, মূল অবিদ্যা ও অনাদি কর্ম্মবীজের সহিত ভস্ম হইয়া যায়। তখন তাঁহাদের মুক্ত ও সর্ব্বব্যাপী স্বরূপের সহিত স্ব স্ব আত্মনিহিত ব্রহ্মাত্মভাব বিকাশিত হয়। যদ্রূপ ঘটভঙ্গে, ঘটাকাশ, পরিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপীত্ব লাভ করে, তদ্বৎ। তখন তাহার আর গমনাগমন কল্পনা করা যায় না। সেইরূপ মুক্তাত্মাগণের উপাধির উপরম হওয়াতে এবং পুণ্য-পাপ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বাসনা ও মায়ার অন্ত হওয়াতে, তাঁহাদের মৃত্যুর পর লোকান্তরগতি রহিত হইয়া যায়। কেননা তখন তাঁহারা জ্ঞানতঃ মুক্ত, সর্ব্বব্যাপী ও ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে তন্ময়। তাঁহাদের আবার গতিবিধি কেন? স্বর্গাদি ভোগই বা কেন?

(১৪) এইজন্য বেদে কহেন "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীর ত্যাগের পর তাঁহার প্রাণাদি উৎক্রমণ করে না। তিনি এই-খানেই ব্রহ্মসম্ভোগ করেন।

(১৫) "প্রাণাদি"শব্দের অর্থ পঞ্চ প্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীর। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব সূক্ষ্মদেহ স্বর্গাদি লোকে লইয়া যায় না। কেননা তাঁহারা স্ব স্ব আত্মার মধ্যেই ব্রহ্মাত্মাকে এবং

ব্রহ্মাত্মার মধ্যেই স্ব স্ব আত্মাকে লাভ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মাত্মা লাভ ব্রহ্মানন্দ ভোগের ব্যঞ্জক। সেহেতু উক্ত শ্রুতিতে "অশ্নুতে" (ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করেন) এই উক্তি আছে।

(১৬) প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্মাত্মজ্ঞ মুক্ত পুরুষগণের স্ব স্ব আত্মা তো মোক্ষ কালে ব্রহ্মতে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীরসমূহ কোথায় যায়? ইহার উত্তর এই যে, মুক্তাত্মা সকল আপনারা ব্রহ্মেতে প্রবেশ পূর্ব্বক অমৃত হয়েন, প্রাকৃতিক জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত রূপ ধর্ম্ম হইতে উপরম লাভ করিয়া অপরিলুপ্ত জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, এবং নিত্য কালের নিমিত্তে ব্রহ্মেতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু তাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীর ব্রহ্মেতে চির-নির্ব্বাণরূপ লয় প্রাপ্ত হয়। "তস্মাৎ তত্ত্ববিদো, রাগাদীনাং নিঃশেষেণ পরমাত্মনি লয়ঃ।" অতএব তত্ত্ববিদ্‌গণের রাগাদি সূক্ষ্ম শরীর নিঃশেষে পরমাত্মাতে লয় পায়। তৎসমূহের আর উত্থান হয় না; কেননা তাহারা যাঁহাদের মায়ার সম্পৎ, তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন।

(১৭) মুক্তগণ এবং ব্রহ্মে কোন প্রকার উপাধিগত, রূপ, নাম ও গুণগত, বিভুত্ব এবং নিত্যতা সম্বন্ধে প্রভেদ নাহি। কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে, মুক্তাত্মাগণ অবিদ্যাধ্যারোপরূপ কারামুক্ত; কিন্তু ব্রহ্ম সদা মুক্ত। যদিও সৃষ্টির অধিকারে তাঁহাতে মায়া কর্তৃক জগৎ আরোপিত হয়, কিন্তু তাহাতে তিনি বদ্ধ হন না এবং আত্মস্বরূপ ভুলিয়া যান না। ফলে অমুক্ত আত্মারা অবিদ্যাকৃত দেহাত্মারোপ বশতঃ আত্মবিস্মৃতবৎ বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া অনাদি কাল হইতে সংসার-কারাগারে বদ্ধ থাকেন। পশ্চাৎ মুক্তি লাভ করেন। তখন মুক্তাত্মা সকল ব্রহ্মানন্দে একীভূত হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে এই প্রভেদ। ব্রহ্ম সদা মুক্ত, আর মুক্ত সকল অনাদি ভ্রম হইতে সদ্য মুক্ত। যিনি সদা মুক্ত, তিনিই গতি। যাঁহারা সদ্য মুক্ত, তাঁহারা গন্তা।‡

‡ কেহ কেহ বলেন "একমেবাদ্বিতীয়ং" শ্রুতি অনুসারে মুক্তাত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে এই প্রভেদ দাঁড়াইতে পারে না। তাঁহাদের মতে এই জগৎ সৃষ্টই হয় নাই। ইহা মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। তিনি যাহা, তাহাই থাকেন। 'মোক্ষ' নাম মাত্র, কেননা তিনি ভিন্ন অন্য আত্মা নাই, যাহার মোক্ষ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমার উত্তর এই যে, তাঁহাদের কৃত এই তাৎপর্য্য উক্ত শ্রুতির সমর্থ নহে। উহার যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা আমি স্বপ্রণীত কোন কোন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে বলিয়াছি। আসল কথা এই যে, অসংখ্য আত্মা, জড়জগৎ এবং ঈশ্বর ও ঈশ্বরীতত্ত্ব মহাবিদ্যাস্বরূপিণী মায়াশক্তির সহ নিত্যকালাবধি নিত্যকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মেতে অন্বয় ও অন্তর্ভাবাপন্ন। ইহাই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতির অর্থ। যদি এই অর্থ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আত্মাসমূহের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অভাবে জগৎ হইতে ধর্ম্ম, ভক্তি, প্রেম ও জ্ঞান সাধন উঠিয়া যায়; উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ রহিত হয়, অপরন্তু পাতা বেদান্ত পড়িয়া তৎসমস্তকে ত্রিকাল মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। স্থূল কথা এই যে, পরমাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যেমন নাস্তিকতা, জীবাত্মার অস্তিত্ব না মানাও সেইরূপ নাস্তিকতা। জীবের ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্তেই এই সৃষ্টি। জীবেরই মোক্ষ হয়। সেই মোক্ষ

(১৮) উপরিউক্ত "... যে "ব্রহ্ম" শব্দ, ... স্থানবোধক নহে ... আত্মা মাত্র। এবং তাহাতে ... এই একাত্মভাব, স্বরূপ আনন্দরূপী, দেশ-কালে অপরিচ্ছিন্ন, মনের অগম্য, সর্ব-ব্যাপী এবং ... স্থূল ... প্রভৃতি কোন প্রকার আকারের সম্বন্ধ মাত্র নাই।

(১৯) এই একাত্মভাবই জীবন্মুক্ত পুরুষের আত্মজ্ঞানের বিষয়। তাহাই পারশুদ্ধ আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞান। তাহাই ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ও তদনুশীলনের অমৃত ফল। ইহাই সাক্ষাৎ, মুখ্য, একান্তিক এবং প্রত্যক্ষ মোক্ষ।

(২০) যাঁহারা আত্মানাত্মবিচার ও ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা চিত্তেতে একতত্ত্ব-প্রবণতা ও পরমেচ্ছা আত্মপতায় উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই "সকৃৎ প্রত্যয় মাত্রেণ" একবার মাত্র চিত্তবৃত্তির অবভাসন দ্বারা প্রত্যক্ষ ঘটজ্ঞানের ন্যায় পরম বস্তু স্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকার লাভে সক্ষম হয়েন। তজ্জন্য ধ্যান, ধারণা, সমাধিরূপ —চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।

... যাঁহারা ... রূপ আত্ম-... তাঁহারা যাহাতে অন্তে সেই ... জ্ঞান লাভ করিতে পারেন তদুদ্দেশে নানা প্রকার ক্রমবিহিত যোগরূপ ক্রিয়ার উপদেশ করিয়াছেন যথা যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ঈশ্বরার্পণ কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, যোগাভ্যাস, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এবং নানা-বিধ ... ক্রম ... ক্রিয়া।

(২২) যাঁহারা এই সকল জ্ঞানাঙ্গীভূত সদনুষ্ঠান করেন "সর্ব্বএতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" তাঁহারা সকলে মৃত্যুর পর (সূক্ষ্ম দেহের সহিত) পুণ্যলোক সকল লাভ করেন। কিন্তু "ব্রহ্মসংস্থোহমৃতত্বমেতি" যিনি ব্রহ্মেতে আস্থ (resting in the Supreme Lord) কেবল তিনিই অমৃতত্ব লাভ করেন। (ছাঃ উঃ ২।২৩।১)

৩০। অসংখ্য জীবাত্মা অনাদিকাল অবধি অনাদি কর্ম্ম ও দেহবীজ ও ভোগোপকরণ-বীজ রূপ জড় ধাতু দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পরমাত্মাতে স্থিতি করেন। এই স্থিতি, পরমেশ্বরের কৃত এই চিজ্জড়াত্মক ও দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধ্যাদির চরিতার্থকর অচিন্ত্য-রচনা-বিশ্বের অনাদিবীজ। সৃষ্টি-কালে পরমাত্মার মায়াশক্তি প্রভাবে তাঁহারা, অগ্নি হইতে নির্গত বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, সহস্র সহস্র দেহোপাধির সহিত সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রলয়কালে ভাবী সৃষ্টির প্রতীক্ষায় তাঁহাতেই নিরুদ্ধ-বৃত্ত ও বিলীন হইয়া থাকেন।* (২য় মুণ্ডক ১।১ এবং মনু ১।১৫) পরমাত্মা, জীবগণের

কালে জীব, ব্রহ্মকে (অর্থাৎ প্রত্যেক মুক্তাত্মা স্ব স্ব চৈতন্য দেবতাকে নিরুপাধিক ভাবে) আত্মরূপে গ্রহণ করেন; তাহাতে মুক্তাত্মার সম্বন্ধেই কেবল জগৎ মিথ্যা হয় মাত্র। নতুবা সেই মোক্ষাবস্থায় মোক্ষানন্দ সম্ভোগের পাত্র স্বরূপ কোন একটি মুক্তাত্মার অভাব হয় না; এবং অমুক্ত জীবগণের সম্বন্ধে জগৎ ধ্রুব সত্যরূপে নিত্যকাল আবর্ত্তিত হইতে থাকে।

* ২য় মুণ্ডক ১।১ "যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।

কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, পাপ ও সুকৃতির স্রষ্টা ও সংযোজয়িতা নহেন; সে সমস্ত স্বভাবতঃ—অর্থাৎ অনাদি কর্ম্ম জন্য অবিদ্যা-লক্ষণা প্রকৃতি হইতে আসিয়া জীবগণকে আশ্রয় করে। সেই প্রাকৃতিক সংযোগ, তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্রচৈবাপিয়ন্তি॥" যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে অগ্নিবৎ রূপের সহিত সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ হে সৌম্য! "অক্ষরাৎ বিবিধাঃ নানাদেহোপাধিভেদমনুবিধীয়মানত্বাৎ ভাবাঃ জীবাঃ প্রজায়ন্তে তত্রচ এব তস্মিন্নেবাক্ষরে অপিয়ন্তি বিলীয়ন্তে।" (শাঙ্কর ভাষ্য অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে বিবিধ জীবগণ নানা দেহোপাধি অর্থাৎ আকৃতি-প্রকৃতির সহিত জগতে সৃষ্টিকালে অবতীর্ণ হন এবং সৃষ্টির বিরাম কালে অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রলয় কালে সেই অক্ষর পরমাত্মাতেই বিলীন হইয়া থাকেন এবং পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি কালে পুনঃ বার বার জগতে ঐরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মনুস্মৃতির (১২ অঃ ১৫ বচনে) এই শ্রুতির সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য পাওয়া যায়, যথা "অসংখ্যামূর্ত্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ। উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ"। এই বচনের কুল্লূক ভট্ট কৃত টীকা, যথা—"অস্য পরমাত্মনঃ শরীরাদসংখ্যা মূর্ত্তয়ো জীবাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দেনানন্তর মুক্তা লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্না বেদান্তোক্তপ্রকারেণাগ্নেরিব স্ফুলিঙ্গা নিঃসরন্তি যামূর্ত্তয়ো (জীবাঃ) উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট ভূতানি দেহরূপতয়া পরিণতানি সর্ব্বদা কর্ম্মসু প্রেরয়ন্তি।" এই পরমাত্মার দেহ হইতে অসংখ্য জীব, লিঙ্গশরীর অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর রূপ উপাধির সহিত বিনিঃসৃত হন। তাঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব স্থূল, সূক্ষ্ম দেহস্বামী বিধায় 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে উক্ত হন। তাঁহারা বেদান্তোক্ত প্রকারে নিঃসৃত হইয়া উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ভাবেতে স্থিতি করেন এবং স্ব স্ব দেহকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণ করেন।

রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় এবং স্ফটিকে জবা-ফুলের আভা প্রতিবিম্বিত হওয়ার ন্যায় আরোপিত মাত্র। জীবাত্মাগণের আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান অতীন্দ্রিয়। সুতরাং এই ইন্দ্রিয়চরিতার্থকর বিশ্বরাজ্য সে জ্ঞানের উদ্দীপনে অশক্ত। তাহা দেহাদির বীজরূপী অনাদি-অজ্ঞান (অবিদ্যা) দ্বারা আবৃত থাকায়, তাঁহারা মুহ্যমান হয়েন (গীতা ৫।)

৩১। ভগবানের সৃষ্ট এই আশ্চর্য্য রচিত ব্রহ্মাণ্ডের ইহাই প্রণালী। এই প্রণালী অনুসারে অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি-চক্র অব্যক্ত-প্রলয়-প্রাপ্ত হইতে সুব্যক্ত-সৃষ্টি-প্রাপ্ত পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে আবর্ত্তিত হইতেছে এবং অনন্ত কাল হইতে থাকিবেক। জীবাত্মাগণের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের কোন দায় দোষ পরমাত্মাতে অর্শে না। তাঁহাদের সম্মুখে অনাদিকাল হইতে দুইটী পথ পড়িয়া আছে। একটী অবিদ্যামায়ারূপিণী প্রকৃতি-বিরচিত কর্ম্মময় পন্থা; সেই পন্থার নাম প্রেয়। সেই পথবাহী হইলে, তাঁহাদের প্রিয় এবং অপ্রিয়, উভয়েরই সংযোগ হয়। সসাগরা ধরণীর রাজসম্পৎ, দেহ, দারা, পুত্র, হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব, রথ, চর্ম্মচর্ম্মা অবধি দারিদ্র্য ও রোগশোকাদি পর্য্যন্ত সেই পথের প্রাপ্তব্য ভোগপুরী। অতঃপর দ্বিতীয় পন্থার নাম শ্রেয়ঃ। ইহার দ্বারা পরমাত্মপুরী লাভ হয়।—(কঠ ২। ১-২।) সে পুরীতে কোনরূপ দেহের অথবা ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সম্বন্ধ মাত্র নাই।

৩২। জীবাত্মাগণ পরমাত্মজ্ঞান-হারা হইয়া ভোগপুরীতে বদ্ধ আছেন। তাঁহাদিগের নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক অংশেতে

প্রতিবিম্বিত দেহাদি পদার্থকে "আমি" ও "আমার" ভাবনা করিয়া তাঁহারা অনিত্য ও অসত্য সুখ-দুঃখে নিমগ্ন আছেন। প্রিয়সংযোগে সুখ এবং বিচ্ছেদে যাতনা ভোগ করিতেছেন। আশ্চর্য্য-রচনা ধন-ধান্যময়, পুত্র-কলত্রপরিবেষ্টিত জগৎ পাইয়া জগৎপতিকে ভুলিয়া আছেন। ঈশ্বরের নিয়মে এই ভোগপুরী বিরচিত। ইহার ভোগ সাঙ্গ হইলে অথবা জ্ঞানযোগে ইহার দোষ দৃষ্ট হইলে, নির্ম্মলচিত্ত বৈরাগ্য-বান্ ও আচার্য্যবান্ পুরুষের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে পরমাত্মপুরী প্রকাশিত হয়। ইহাই ভগবানের নিয়ম। নতুবা সম্মুখবর্ত্তী বাঞ্ছিত অঙ্গসৌষ্ঠব, দেহ, স্ত্রী, পুত্র, আরোগ্য, ধন, সম্পত্তি ছাড়িয়া কে বৈরাগ্যের নিকেতন সদাশিবকে প্রার্থনা করিবে? কিন্তু তাহা ভোগ করিতে করিতে যখন এই জন্মে বা জন্মান্তরে দেখিবে যে, তাহা সদাপরিবর্ত্তন-শীল এবং অশেষ বেদনা-সঙ্কুল, তখন ধীর পুরুষ শান্তিপদ পরমাত্মপুরীতে প্রবেশের নিমিত্তে শ্রেয়ঃরূপ পন্থা প্রাপ্ত হইবেন।

৩৩। এই সংসারই সেই ভোগস্থান। পরমাত্মধামের তুলনায় ইহা অবিদ্যার কারা-গার—ঘোর তমসাচ্ছন্ন এবং শতসহস্র প্রকার যন্ত্রণার প্রদেশ। এই অন্ধকারাগারে কখনও স্বর্গাদি সুখভোগ, কখনওবা জন্ম মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ভোগার্থ জীবগণ এক প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে সংসরণ করিতেছেন। সে গমনাগমনের ও যন্ত্রণার পার নাই। দেব-লোকাদি স্বর্গও এই অবিদ্যা-কারাগারের প্রদেশ বিশেষ। কেননা "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।" "পরমার্থ ভাবমপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপি অসুরা অন্ধেন অদর্শনাত্মকেন অজ্ঞানেন তমসাবৃতাঃ।" (ঈশোপনিষৎ ২) পরমাত্মভাবের তুলনায় দেবাদিলোকও অসুরলোক, অর্থাৎ অজ্ঞা-নান্ধকারে আবৃত। এমত অবস্থায় মর্ত্ত্য-লোকের তো কথাই নাই।

৩৪। শঙ্করাচার্য্য কহেন "শরীর পরি-গ্রহাদ্দুঃখং জায়তে" শরীর পরিগ্রহ করাতে জীবের এই সকল দুঃখ হয়। "সর্ব্বাত্মনা শরীর পরিগ্রহ নাশে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তি-র্ভবতি।" সর্ব্বতোভাবে শরীর পরিগ্রহ নাশ হইলেই দুঃখনিবৃত্তি হয় এবং অজ্ঞান ও তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ কর্ম্ম, রাগাদি, অভিমান, অবিবেক, নিবৃত্ত হইলে, শরীর-ধারণের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু কখন অজ্ঞানের (অবিদ্যার) নিবৃত্তি হয়? উত্তর—"ব্রহ্মা-ত্মৈকত্বজ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনাঽবিদ্যা নিবৃত্তিঃ।" ব্রহ্মেতে জীবের আত্মজ্ঞান হইলে, নিঃশেষে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। (আত্মানাত্মবিবেক। রা, মো, রা-গ্রন্থাবলি, ১৭৯৫ শক। ৪৩৫ পৃষ্ঠা)

৩৫। এই জন্য উপনিষদাদি মহামহা শাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যার ভূয়ঃ উপদেশ। ব্রহ্ম-বিদ্যাই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের নামান্তর অথবা প্রসূতি। সেই জ্ঞানই সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম, অভিমান, অবিবেকতা এবং অনাদি অবি-দ্যার সহিত স্থূলশরীর, মনোবুদ্ধি, দশেন্দ্রিয় ও পঞ্চবিধ প্রাণাদিবায়ুর সংঘাতরূপ সূক্ষ্ম শরীর, আর প্রকৃতিরূপ বীজদেহ এই ত্রিবিধ দেহ এবং জীবের সেই সকল অধ্যা-রোপিত দেহেতে আমিত্ব ও মমত্ব বুদ্ধির

নিঃশেষ ধ্বংসকারী। যদ্রূপ সূর্য্যোদয়ে নিশার ধ্বান্তরাশি নিঃশেষে ধ্বংস হয়, তদ্বৎ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু

সকাম সাধনা বা ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজনীয়তা

আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রকৃত-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সহিত পর্য্যালোচিত হইলে, ইহাই উপলব্ধ হয় যে, সাধনার প্রণালী বিবিধ। যথাকালে ও যথানির্দ্দিষ্ট পাত্র অর্থাৎ অধিকারী ব্যক্তি ঐ সকল শাস্ত্রানুযায়ী পন্থা অবলম্বন করিলেই শুভ ফল উৎপন্ন হয়; নতুবা উহাতে নানা অনর্থোৎপত্তি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স কর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥"

অর্থাৎ—মনুষ্যগণ যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে অবস্থানকারী আমাকে (পরমাত্মাকে) অবগত না হইতে পারিবে, অর্থাৎ ধ্যানাদি প্রভাবে আপন হৃদয়ে পরমাত্মার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট অনুভব করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে।

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিবে, তাবৎ অন্তঃকরণের নিশ্চলতা ও নির্ম্মলতা সাধন জন্য অনুষ্ঠ্য সাকার উপাসনা করিবে।

অপরন্তু "বেদান্তসার" গ্রন্থে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে—

"অধিকারীতু বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জন পুরঃসরং নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্ত নির্ম্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।"

যিনি যথাবিধি বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আপাততঃ অর্থাৎ স্থূলরূপে সকল বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ, এই দুই প্রকার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা, এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সকল প্রকার পাপ ধ্বংস হইয়া যাওয়াতে, অন্তঃকরণকে একান্ত নির্ম্মল করিতে পারিয়াছেন, এবং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব, এই চতুর্ব্বিধ সাধন অবলম্বন করিয়াছেন, তাদৃশ প্রমাতা অর্থাৎ মনুষ্যই ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী।

স্বর্গাদি ইষ্ট কামনায় যে কার্য্য করা যায়, তাহাকে কাম্য বলে। নরকাদি অনিষ্টসাধক কার্য্যকে নিষিদ্ধ বলা যায়। যে কার্য্য না করিলে পাপ হয়, তাহাকে (যথা—প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দনা ও পিতামাতার প্রতিপালনাদি) নিত্যকর্ম্ম বলে। কোন নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া যে কার্য্য হয় (যথা—অমুক ব্যক্তির পুত্রকামনায় যজ্ঞাদি) তাহা নৈমিত্তিক। পাপক্ষয়সাধক কার্য্যকে (যেমন চান্দ্রায়ণাদি) প্রায়শ্চিত্ত বলে। সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ সাকার

ঈশ্বরের আরাধনাকে উপাসনা কহে। কাম-ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের হীনতাকে অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা বলা যায়। ইহকালের নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং পরকালের কিছু অধিকক্ষণস্থায়ী (অনিত্য) সুখের ভোগ বিষয়ে বিরক্তিকে ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ বলে।

শম, অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, দম (ঐরূপ বাহেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), উপরতি, (কাম্য কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ), তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদি সহ্য করিতে পারা), সমাধান (ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ মননাদিতে আকর্ষিত মনের একাগ্রতা) ও শ্রদ্ধা (গুরূপদেশ ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন) এই ষড়্বিধ কার্য্যকে শম-দমাদি-সাধন-সম্পত্তি বলা যায়। মুক্তির ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলে।

অদ্বৈত মতের প্রধান প্রবর্ত্তক মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যও ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, অসংসারী-ক্রিয়া সংসারে থাকিয়া হয় না, অর্থাৎ অনিত্যের সংসর্গ-দোষে নিত্যেরও প্রভাব থাকে না। যেমন অশ্ব লঙ্ঘন করিয়া যবস্ গ্রহণ হয় না, তদ্রূপ অপরিসমাপ্তকর্ম্মা কদাচ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে পারে না। পূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ড তৎপর হইয়া শমদমাদি সাধন দ্বারা ক্রমে ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হইতে মুক্তি লাভ হইলে স্বভাবতঃই কর্ম্ম রহিত হইয়া যায়। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;—

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ো॥"

আধুনিক 'ব্রহ্মজ্ঞানী'দিগের পূর্ব্বাচার্য্য মৃত রামমোহন রায় মহাশয় জ্ঞানীদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বকৃত বেদান্তানুবাদ নামক ইংরাজী পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে, "যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধ হইলে, কর্ম্মকাণ্ডের তাদৃশ প্রয়োজন থাকে না বটে, তথাপি জ্ঞানীদিগের কর্ম্মকাণ্ড সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; উহা কোন মতে ত্যাজ্য নহে। কেন না তৎসাধনে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয়। সকাম সাধনের নাম ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, নিষ্কাম সাধনার নাম ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার বিশেষ আবশ্যকতা আছে" ইত্যাদি। বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রেও এই কথাই প্রকাশিত হইয়াছে ;—

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ॥ (বেদান্ত।)
কর্ম্মকাণ্ডানন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে।

অতএব অসংসারী ব্রহ্মজ্ঞান, সংসার-দোষ-সংস্পৃষ্ট ব্যক্তির প্রাপ্য নহে। তথাপি যে ব্যক্তি শাস্ত্রাতিক্রমে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সে জ্ঞানীদিগের নিকট অজ্ঞান, উন্মত্ত ও ভ্রষ্টাচারী বলিয়া বিবেচিত হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে,—

"ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে॥"

যে ব্যক্তি ন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবে এবং তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ বিষয়ে একনিষ্ঠ ও অতিথিসেবা-পরায়ণ হইবে, নিত্য-নৈমিত্তিক মাতৃ-পিতৃ শ্রাদ্ধাদি করিবে ও সত্য বাক্য কহিবে, এইরূপ গৃহস্থও পরিমুক্ত হয়।

এতাদৃশ শাস্ত্র-ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে গৃহস্থ

কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 'ব্রহ্মজ্ঞানী' ব'লয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে শাস্ত্র ও যুক্তিপথত্যাগী স্বেচ্ছাচারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। মিথিলার অধিপতি জনকাদিও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন ; তাঁহাদিগের দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড-প্রবাহের অবরোধ হয় নাই ; বরং তাঁহারা প্রভূত দক্ষিণা দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রনিন্দা, দেব-ব্রাহ্মণ-নিন্দা, অপসিদ্ধান্তর ও সদাচার-পরিত্যাগ, অথবা ব্রতনিয়মোপবাস এবং তীর্থস্নানাদির ব্যাঘাত করেন নাই।

মহামতি বশিষ্ঠ দেব শ্রীরামচন্দ্রকে কহিয়াছেন,—

"বহির্ব্যাপার-সংরম্ভো—
হৃদি সংকল্প-বর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্ত-
রেবং বিহর রাঘব॥"

(যোগবাশিষ্ঠ)

হে রাম! তুমি বাহিরে সকল কর্ম্ম কর, মনে সংকল্পরহিত হও, বাহিরে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জানাও, কিন্তু মনে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিও।

পরন্তু, শাস্ত্রকর্তৃগণ ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছু সংসারী ব্যক্তিগণের পক্ষে কেবল যে নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মত্যাগের নিষেধ করিয়াছেন, এমন নহে, প্রবলতর প্রত্যবায় প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ নিষেধের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা
যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥"

অর্থাৎ মনুষ্য যদি ব্যাকরণাদি ছয় অঙ্গ সহিত চারি বেদ অধ্যয়ন করেন, তথাপি আচারহীন ব্যক্তিকে বেদ সকল পবিত্র করিতে পারেন না। যেমন পক্ষীশাবকের পক্ষোদ্গম হইলে, সে আপন নীড় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ ছন্দ অর্থাৎ বেদ সকল, আচারহীন ব্যক্তিকে মৃত্যুকালে ত্যাগ করিয়া গমন করেন।

এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, মনুষ্য যে পর্য্যন্ত আপন অন্তঃকরণকে নিশ্চল ও নির্ম্মল করিতে সমর্থ না হইবে, তাবৎ সংসারে থাকিয়া বিবিধ সাকার দেব-দেবীর আরাধনা ও বহুতর কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া জিতেন্দ্রিয়তা অভ্যাস করিতে থাকিবে। ক্রমশঃ মনের পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা লাভ ও জ্ঞানালোকের প্রখরতা উপস্থিত হইলে, অল্পজ্ঞান ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্তের নিমিত্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু তাহাতে ফলকামনা ও আসক্তি পরিত্যাগ করিবে।

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥"

(গীতা)

পর শ্লোকেই ভগবান্ পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন ;—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥"

(গীতা)

পরিশেষে প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়তা, উপাস্য ঈশ্বরে ও পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস এবং সর্ব্বশাস্ত্রে নিঃসন্দেহ নির্ম্মল জ্ঞান উপস্থিত

হইলে, সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাধি অবলম্বন করিয়া জীবন-মুক্তিলাভ করিবে। তখনই হৃদাকাশে চিদাভাসে জাগ্রত হইয়া উঠিবে,—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতম্॥" (শ্রুতিঃ)

শ্রীপ্রেমানন্দ ভিক্ষু।

তত্ত্ব-চিন্তা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

জ্ঞান হইতেও বৈরাগ্যের উদয় হয়, অনবোধি হইতেও বৈরাগ্য-উদয় হয়। অর্থাৎ অনর্থক জানিয়া বিষয়াসক্তি ত্যাগ হয়, আর বিস্মৃতি হইতেও ক্রমশঃ আসক্তি-ত্যাগ হয়। জ্ঞান হইতে জাত বৈরাগ্য চির-স্থায়ী, বিস্মৃতি হইতে জাত বৈরাগ্য চিরস্থায়ী নহে, কেননা কোন সময়ে আবার আসক্তি-উদয়ের সম্ভাবনা থাকে।

আসক্তি মোহের ক্রিয়া। মোহ তিন প্রকার —

(১) বিষয়জ অর্থাৎ বিষয় সত্বে তদাসক্তি।

(২) মনোজ অর্থাৎ বিষয় নাই, কিন্তু তাহা মনে আছে; মনে উদয় হইলে তদাসক্তি জন্মিতে পারে।

(৩) সংস্কারজ অর্থাৎ বিষয় নাই, মনে নাই, কিন্তু সংস্কার বশতঃ মনে পড়িয়া গেলে আসক্তি জন্মে।

সুতরাং বিস্মৃতি হেতু বৈরাগ্য চিরস্থায়ী নহে।

সাধারণতঃ কোন কারণ বশতঃ বিষয়-ত্যাগ হইলে, তাহাকে বৈরাগ্য বলে না। (শোকে দুঃখে বা অপারকতা বশতঃ বিষয়-ত্যাগ হইলে, তাহাকে বৈরাগ্য বলে না) কেননা হয়ত তাহার তৎস্বার্থ ত্যাগ হয় নাই। আবার স্বার্থত্যাগ হইলেও, হয়ত অন্তরস্থিত আসক্তিত্যাগ হয় না। অজ্ঞান অবস্থায় অর্থাৎ মূর্চ্ছিত অবস্থায় আসক্তি-ত্যাগ দেখায়; কিন্তু অবস্থান্তরে উহার স্মৃতি ও চিন্তা উদয় হইবার সম্ভাবনা। অতএব মোহ হেতু বা মোহগত কারণ বশতঃ যে বৈরাগ্য, উহা আত্মচিন্তায় উপকারী নহে।

৬০। রিপু। রিপু অর্থে শক্র। প্রকৃতিস্থ (অহংকে) "আমিকে" যে অপ্রকৃতিস্থ করিতে পারে—সে পরাক্রান্ত শক্র। কাম, ক্রোধ, লোভাদি ষড়্বিধ বৃত্তি—সমরূপী অহংয়ের। ইহারা সময় সময় অহংকে অপ্রকৃতিস্থ করে বলিয়া "রিপু" নামে খ্যাত। বৃত্তি কখনই রিপু নহে—কেননা অহং ঐ সকল বৃত্তি লইয়াই "বৃত্তিবন্ত"। ঐ সকল বৃত্তি হইতে যে কামনার উদয় হয়, তাহাও রিপু নহে। কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য যে বেগের উদয় হয়, উহাই রিপু। সেই বেগ কাহার বা কোথা হইতে আইসে? চিত্তের বলিবে? চিত্ত কি অহং-ব্যতীত? সুতরাং উহা অহং-প্রসূত। অহং-প্রসূত হইয়া অহংয়ের শক্র, এ বিচার গ্রাহ্য কি প্রকারে? বিশেষতঃ যাঁহাতে ভোগইচ্ছা নাই, তাঁহাতে উহাদের প্রকাশ নাই—উহারা রিপুও নহে।

উহারা যে অহংয়ের বৃত্তি, সেই অহং

আত্মবিস্মৃত বশতঃ উঁহাদিগকে শত্রু বলিয়াছেন। আত্মবিস্মরণ গিয়া যখন অহংয়ের পূর্ণ ভাব হয়, তখন উঁহারা আর শত্রু থাকেনা—শত্রুতা করে না—বৃত্তিরূপে সেই অহংয়ে লীন থাকে।

তোমাতে ক্রোধ আছে—কোথায় আছে বা কি ভাবে আছে, দেখাইতে পার না। এখন তুমি পূর্ণ ভাবে অহং নও—জীবাভিমানী, সুতরাং অপ্রকৃতিস্থ। তুমি অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া তোমাকে যাহা যাহা আছে, তৎসমুদয়ই অপ্রকৃতিস্থ। তুমিই ক্রোধের উত্তেজনা করিলে—ক্রোধ প্রকাশ পাইল, তোমাকে আরও অপ্রকৃতিস্থ করিল। দোষ কার? শত্রু কে কাহার? ক্রোধের সময় ধৈর্য্য অবলম্বন বিধেয়; কেননা ঐ ধৈর্য্যের অবস্থায় তুমি পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইতে পার। ক্রোধের সময় হাসিয়া ফেলিলে, বুঝিতে পারিবে—উহা রিপু নহে—তোমারই অনুগত মাত্র।

৬১। এক্ষণে সাধারণ ভাবে কামক্রোধাদিকে রিপু ভাবিয়া দেখা যাউক। রিপুকে শাসন করিতে বা বশীভূত রাখিতে মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাভাবিক। অতএব কামক্রোধাদিকে শাসন করিতে বা বশীভূত রাখিতেও মনুষ্যের কর্ত্তব্যবোধ।

রিপুশাসন দুঃসাধ্য—কেহ করিতে পারে না—পারিবে না; কেননা যাহাকে শাসন করিবে, সে যে তুমির "তুমিই", আমির "আমিই"! অথবা তুমির "তোমার" আমির "আমার"!

রিপু বশীভূত রাখা আর আপনি প্রকৃতিস্থ থাকা, একই কথা। আপনি প্রকৃতিস্থ হও—রিপুও বশীভূত হইয়াছে, বুঝিতে পারিবে। জীবাভিমানী রিপু বশীভূত করিতে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠের অনুগত হয়। যে পরিমাণে অনুগত হয়, সেই পরিমাণে রিপু বশীভূত করিতে সক্ষম হয়। প্রথমটী আত্মসংযম, দ্বিতীয়টী আত্মউৎসর্গ। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ অবলম্বনই এক মাত্র উপায়।

জীবাভিমানী রিপুতে আসক্তি যুক্ত করিয়া অধঃপতন প্রাপ্ত হয়।

৬২। কুকার্য্যে যাহা "আসক্তি", সৎকার্য্যে তাহাই "অনুরাগ"। শব্দের বিপরীত বলিয়া এক হইতে অপর কত বিভিন্ন। আসক্তিতে যেমন আত্মবিস্মৃতি—অনুরাগেও তদ্রূপ আত্মবিস্মৃতি হয়। তারতম্য এই যে, প্রথমটীতে বিস্মৃতি প্রকৃত—দ্বিতীয়টীতে বিস্মৃতি প্রকৃত নহে—আত্মউৎসর্গ করা। অর্থাৎ প্রথমটীতে চৈতন্যলোপ—দ্বিতীয়টীতে চৈতন্যলোপ হয় না।

৬৩। ইচ্ছা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—

(১) বাসনা হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি। ইচ্ছা ব্যতীত বাসনা-স্বরূপ ক্ষান্ত থাকে। ইতি ক্ষান্ত বাসনা কার্য্যকারী নহে। যাহার কার্য্য নাই, তাহার ইচ্ছা নাই, বাসনাও ক্ষয়। যাহার কার্য্য নাই, সে অহংকার ও আত্মাভিমানশূন্য। অতএব যাহাতে অহংকার ও আত্মাভিমান আছে, তাহার কার্য্য আছে কার্য্য করিবার ইচ্ছা হয়; এই ইচ্ছা ক্ষান্ত বাসনা হইতে উদ্ভূত হয়।

ইহা হইতে বুঝাযায়, অমুক্ত ব্যক্তিরই ইচ্ছার উদয় হয়; মুক্ত ব্যক্তির কার্য্য নাই বলিয়া ইচ্ছা হয় না। সুতরাং যাহার ইচ্ছা

তব সে ব্যক্তি মুক্ত নহে—লিপ্ত বা বিকারী। বিকারীতে যাহা ব্যবহৃত, তাহারও বিকার সম্ভব।

সুতরাং ইচ্ছা বিকারীর—মুক্ত ব্যক্তির নহে।

(২) ইচ্ছা তিন প্রকার—ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা।

(১) ইচ্ছা - যথা বিকারীর কুপথ্যে ইচ্ছা। জ্বরের উপর অন্ন বা অধিক জল বা অন্য কুপথ্যে ইচ্ছা।

(২) অনিচ্ছা—যাহা অসঙ্গত বা অসম্ভব ইচ্ছা। চন্দ্রে—নক্ষত্রে বেড়াইবার ইচ্ছা, দীনদুঃখী হইয়া রাজভোগে ইচ্ছা।

(৩) পরেচ্ছা—আপনার ইচ্ছা নাই—পরের ইচ্ছায় কাজ করিতে ইচ্ছা।

প্রথমটীতে—লিপ্ততা, আসক্তি, মায়া, ভ্রম ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টীতে—কতক আসক্তি, অধিক ভ্রম, কতক মায়া উভয়।

তৃতীয়টীতে—লিপ্ততা ও আসক্তির লেশ নাই, মায়া নাই, ভ্রম কতক বিচার্য্য। না করিলে ক্ষতি-লাভ বোধ নাই, তবু কেন করি—এই ভ্রম।

(৩) উন্নতির পথে—অর্থাৎ মুক্ত হইবার পূর্ব্বে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার লোপ হয়। পরেচ্ছা তখনও থাকে। পরেচ্ছার দায়ীত্ব ভাগ অল্প; দায়ে পড়িয়া কার্য্য করিলে যেরূপ দায়ীত্ব, সেইরূপ। কার্য্য ব্যতীত অস্তিত্ব নাই, সুতরাং অস্তিত্ব সত্ত্বে পরেচ্ছায় কার্য্য করা মুক্ত হইবার পূর্ব্ব ভাব।

(৪) ইহা হইতেই বুঝা যায়—যাহার যত ইচ্ছা, সে তত লিপ্ত। যাহার ইচ্ছা যত অল্প, সে তত পরিমাণে অনাসক্ত—মুক্ত হইতেছে। অল্প ইচ্ছায় যেমন অনাসক্তি বুঝায়, তেমনি বিরক্তি অর্থাৎ "আর চাই না" বুঝায়।

(৫) আমি ইচ্ছা করিবনা, মনে করিলেই যে ইচ্ছার শেষ হয়, তাহা নহে। মনুষ্য যত অনাসক্ত, যত অল্প লিপ্ত, যত অল্প মোহ ও মায়াগ্রস্ত হইতে থাকে, তত তাহার ইচ্ছার সংস্কৃতি ও ইচ্ছার বেগ কমিতে থাকে। অতএব ইচ্ছার হ্রাস আত্মোন্নতির উপর নির্ভর করে।

দুঃখীর সুখ-ইচ্ছা স্বভাবসিদ্ধ। দুঃখে পড়িয়া সুখ চাহিব না বলিলেই যে ইচ্ছার উদয় হইবে না, তাহা নহে। যাহার দুঃখ-বোধ আছে, তাহার আত্ম উন্নতি তত হয় নাই বলিয়া, ইচ্ছা স্বভাবতঃ হইবেই হইবে। অতএব জোর করিয়া ইচ্ছার শেষ করা যায় না।

হতাশেও ইচ্ছার শেষ নহে। আশা নাই, তাই হতাশ। আশা থাকিলেই ভোগ ও কার্য্য আছে, স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং ইচ্ছাও হইবে। সেই আশা না থাকা বশতঃ ইচ্ছার শেষ হয় না। যখনই সেই আশার উদয় হইবে, তখনই ইচ্ছারও উদয় হইবে।

শোকাতুর ইচ্ছা করিয়া খাওয়া দাওয়া করে না; তাই বলিয়া তাহার ইচ্ছার শেষ হইয়াছে, বলা যায় না। শোক যত টুকু করিয়া সরিয়া যাইবে, সেই পরিমাণে ইচ্ছার উদয় হইবে।

মৃত্যুতেও ইচ্ছার শেষ নহে। ইহা দেখাইবার যো নাই।

(৬) ইচ্ছার শেষ মুধু তৃপ্তিতে সম্ভাবিত।

যথা পেট ভরিয়া ভাল খাইয়া তৃপ্ত হইলে, সেই খাদ্যে আর ইচ্ছা যায় না। এই তৃপ্তির কথা অন্যত্র আছে।

(৭) অতএব যতক্ষণ তৃপ্তি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইচ্ছা পরিত্যাজ্য নহে—পরিত্যাগ করিবার যো নাই ও উহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করা অন্যায়। কারণ, সে চেষ্টা কখনই সফল হয় না।

(৮) আবার ভোগইচ্ছা সত্বে, বিষয় সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা না করা অবিধেয়। শক্তিতে না কুলায়, শক্তির সঞ্চয় করিতে হয়। গাড়ী চড়িতে বড় ইচ্ছা—যাহাতে গাড়ী চড়া হয়, তাহাই করা উচিত। কারণ যতকাল ঐ ভোগ পূর্ণ না হইবে, ততকাল তোমার নিস্তার নাই। অর্থাৎ উহা সম্বন্ধে নির্লিপ্ত বা অনাসক্ত হইতে পারিবে না। অতএব যাহাতে গাড়ী চড়া হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। ইহ জন্মে অপূর্ণ যে কোন বাসনার পূরাণার্থেও পুনর্জন্ম সম্ভাবিত। বিষয়ের অনিত্যতাবোধসিদ্ধির দ্বারাই বাসনা-জয় বিহিত। নচেৎ বলাৎকৃত বাসনা-দমন জনন-মরণ-শৃঙ্খল-ছেদ ও মুক্তি লাভের সাধন নহে।

এই ভোগইচ্ছা—ইচ্ছা বা অনিচ্ছার অন্তর্গত; সুতরাং বিকারীরই সম্ভব। বিকার হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে, এই ইচ্ছা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না।

(৯) সংক্ষেপতঃ, যাহাতে বিকার দূর হয়, সাধুরা তাহাই করেন, জ্ঞানীরা তাহাই বলেন, শাস্ত্রও তাহাই বলিয়া থাকেন। যদি ইচ্ছা কি, বুঝিতে পার, তবে উহাকে বাড়িতে দিও না, শান্তভাবে—'হয় হউক, না হয় না হউক'—এইরূপ অনাসক্ত ভাবে অগ্রসর হও। আত্ম-উন্নতি করিব, ইচ্ছা ধরিয়া থাকিলে, অপর বাহ্য উন্নতির ইচ্ছা প্রায় হ্রাস পাইয়া থাকে অথবা ক্ষীণবল হইয়া পড়ে।

(১০) পরেচ্ছায় যেমন ইচ্ছার প্রায় শেষ বুঝায়, পরের অনুগত হইলে, সেইরূপ ইচ্ছার বেগ ও সংখ্যা হ্রাস পায়। ভক্ত অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরে ভক্তি করে, বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে—সে জানিতে পারে না, অথচ তাহার ইচ্ছার বেগ ও সংখ্যা কমিয়া আইসে। অতএব ঈশ্বরে নির্ভর করায় ইচ্ছার লাঘব হয় বলিয়া উহা কর্ত্তব্য।

২৮। সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হইতে পারে, কেননা ইচ্ছার পূর্ণতা শক্তির উপর নির্ভর করে। ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া যিনি যতক্ষণ অবস্থিতি করিতে পারেন, তাঁহার সেই পরিমাণে শক্তি লাভ হয়। যিনি নিত্যযুক্ত, তিনি নিত্যসমর্থ। নির্বাসনা হেতু তাঁহার শক্তি-প্রয়োগ নাই, সুতরাং কদাচ বাসনা হইলে উহা পূর্ণ হয়। মহাযোগী শিব কদাচ বাসনায় ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; কোন কোন ঋষির কার্য্যেও ঐশী শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে, তোমার শক্তির অভাব, ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে। ঋষিরা ইচ্ছা-পরিমাণে শক্তিসঞ্চারী—বরং ইচ্ছাত্যাগী হইয়াও শক্তিসঞ্চারী। তুমিও শক্তি-উপাসনায় শক্তি সঞ্চয় কর, ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবে—ইহাই গুরুরা বলেন।

আসক্তি।—ভোগার্থেই আসক্তি দেখা যায়।

যাহা ভোগ কর নাই, তদ্‌ভোগ মনে আইসে না। যাহা ভোগ করিবার ইচ্ছা মনে হয়, ইচ্ছার পূর্ব্বে তাহা কি—পূর্ণ মাত্রায় তাহার উপলব্ধি না থাকুক, কতক উপলব্ধি থাকে। চিনি খাইয়া-বল উহা মিষ্ট। গুড়ও মিষ্ট, কিন্তু গুড় খাও নাই; গুড়কে মিষ্ট বলিলে উহার মিষ্টতা তোমার কতক উপলব্ধি হয়; ঐ উপলব্ধি ভুক্ত চিনির মিষ্টতা-উপলব্ধি হইতে লওয়া। গুড় ও চিনি এক প্রকার মিষ্ট নহে—অথচ উভয়ই মিষ্ট। গুড় খাইতে ইচ্ছা হইলে, চিনির মিষ্টতা তোমার মনে আইসে।

যত প্রকার ভোগ-ইচ্ছা হয়, ইচ্ছার পূর্ব্বে তাহার ভাব উপলব্ধ থাকে; অর্থাৎ জান বলিয়া চাহ। এইরূপ চাওয়া-বৃত্তি মনুষ্যের কেন, প্রত্যেক জীবের আছে। এই বৃত্তি-হেতু চাওয়ার নাম ইচ্ছা। তদ্ধেতু না চাহিয়া থাকিতে না পারার নাম "আসক্তি"। ভোগ জানা থাকা দোষ নহে, জানিয়া চাওয়া কতক দোষ; কিন্তু না চাহিয়া না থাকিতে পারা গুরুতর দোষ।

যাহারা মনকে কর্ত্তা বলিয়া জানে, তাহাদের পক্ষে বৃত্তি, ইচ্ছা এবং আসক্তি, একই বলিলে দোষ হয় না, কেননা তাহারা কোনটাকেই মন্দ মনে করে না। এই সকল লোকের উক্তি "মন গেল, তাই করিলাম, ইহাতে দোষ কি?" যাহারা মনকে এক মাত্র কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারাই বৃত্তি, ইচ্ছা ও আসক্তিতে গুণ-ভেদ করে। প্রথম শ্রেণীস্থদিগের আসক্তির বিপক্ষে দাঁড়াইবার উপায় নাই। বিচার-শক্তিসম্পন্ন মনুষ্যের জন্ম বৃত্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে আসক্তি কত দোষাই, বিচার প্রয়োজন।

৬৭। বৃত্তি সকলেরই আছে।

(ইচ্ছা) সকলের হয় না।

আসক্তি তদল্প দৃশ্যমান।

হিংসা-বৃত্তি সকলের আছে।

হিংসা-ইচ্ছা সকলের উদয় হয় না।

হিংসা না করিলে থাকিতে পারে না,

এইরূপ জন-সংখ্যা অল্প।

বৃত্তি ছিল (আছে), (ইচ্ছা) কামনার উদয় হইল।

(ইচ্ছা) কামনা পূর্ণ করিলাম, ইন্দ্রিয় প্রস্তুত হইল।

ভোগান্তে—ইন্দ্রিয় শিথিল হইল, কামনা বৃত্তিগত হইল, বৃত্তি স্বরূপে লয় পাইল।

ইহাতে আসক্তি এখনও দৃষ্ট নহে।

কামনা পূর্ণ করণার্থে ইন্দ্রিয় প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও নিষ্ফলতা হেতু অননুভূত একটা "বেগ" উপস্থিত হইল—ইহাতেই আসক্তির সূত্রপাত বা ইহাই আসক্তির আদি। ফললাভ-অন্তে কামনা-বেষ্টিত থাকা এবং বৃত্তি লয় না হইয়া কামনা-পরিপোষক থাকা পর্য্যন্ত আসক্তির সীমা। অতএব আসক্তি, বৃত্তি হেতু কামনা হইতে ভোগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। অভ্যাস-জনিত বলিয়া বহুকাল স্থায়ী ও প্রবল। এক প্রকারের বৃত্তিজাত হইয়াও আসক্তি উহা অপেক্ষা অধিক প্রবল; উহা অপেক্ষা অধিক কুশল; কেন না আসক্তি-হেতু কত প্রকার কৌশল মনে আইসে।

৬৮। "চিত্তবেগ" বলিয়া প্রসিদ্ধ কথা

আছে। চিত্ত-বেগহেতু মহৎ কর্ম্ম যেরূপ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব, কুকর্ম্মও সম্পন্ন হওয়া সেইরূপ সম্ভব। ইচ্ছা নিকৃষ্ট চিত্ত-বেগ-সঞ্চিত আসক্তি ব্যতীত আর কি? ধর্ম্ম পরায়ণের চিত্তবেগবশতঃ কৃত গর্হিত কর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাই মীমাংসা।

ভোগ-উদ্দেশ্য যখন আসক্তির মূল, তখন কাহার কোন্ ভোগ উদ্দেশ্য, তাহার পক্ষে তাহাই বিচার্য্য।

"প্রত্যাহার" দ্বারা ভোগ-ইচ্ছাকে দুর্ব্বল করিতে পারিলে, বৃত্তি সত্ত্বেও আসক্তির উদয় হয় না। সুতরাং আসক্তি-শূন্য হইলেই নির্ব্বাসনাযুক্ত হইতে হয়।

৬৯। বদ্ধমূল আসক্তি পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য। উহা হইতে পরিত্রাণ লাভ মহা-ভাগ্যের কথা। দৈবকৃপা ব্যতীত অথবা কঠোর তপস্যা ব্যতীত পরিত্রাণের আশা নাই। ঘূর্ণিত জলে তৃণ পড়িলে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া উহার যেমন মগ্ন হয়, বদ্ধমূল আসক্তি জীবকে সেইমত বার বার জন্ম-মৃত্যুর অধীন করিয়া ঘুরাইয়া মারে। এই আসক্তি হইতে যে সংস্কার জন্মে, উহা আরও ভয়াবহ; কেননা আসক্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেও, সংস্কার হইতে আসক্তির কখন উদয় হইবে, কে বলিতে পারে?

৭০। সংস্কার।—সংস্কার বা মোহের উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু সংস্কার কি, তাহা বলা হয় নাই। একই কার্য্য করিতে করিতে সেই কার্য্য করা এত অভ্যাস হইয়া যায়, যেন উহা আপনা আপনি হইতে থাকে। এই অভ্যাসেরই ফল সংস্কার। বিষয়ীদিগের বিষয়-বাসনা সংস্কার। মনরূপী অহং বিষয়ী, যেন সে অহং কখনও বুদ্ধিরূপী ছিলেন না বা হইতে পারেন না। এত বিষয়ী বলিয়া মহত্তত্ত্ব অনুশীলনে তাঁহার যত্ন বা ইচ্ছা দেখা যায় না। তৎকল্পনা বা ধারণা করিতেও তিনি সক্ষম হন না।

অকস্মাৎ বিষয়ী মহত্তত্ত্বে অনুরত হইলে, বলিতে হইবে যে, মনরূপী অহংয়ের বুদ্ধিরূপী অহং হইবার ইচ্ছা হইয়াছে বা বুদ্ধিরূপী অহং হইতে মনের মনে পড়িয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের পর সে অহং কখনও বিষয়ী ছিলেন, এমন বোধ হয় না। আমরা ঈদৃশ ব্যক্তিকে প্রশংসা করি, বাহবা দিই; অহংয়ের যে অনন্ত শক্তি, তাহা ভুলিয়াই সে ব্যক্তিকে প্রশংসা করি।

কখন কাহার কি সংস্কার থাকিতেছে বা যাইতেছে, তাহা বলিতে পারা কঠিন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যতীত অপরে তাহা দেখিতে বা বুঝিতে অসমর্থ। তত্ত্বজ্ঞেরা ইহা দেখিতে পান, বুঝিতে পারেন বলিয়া সেই সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

জীবের অস্তিত্ব সংস্কারে ভাসিতেছে। সংস্কাররূপ অহং জীবরূপে জন্ম মৃত্যুর বাধ্য। অহংয়ের সংস্কার নাই; জীবরূপী অহংয়ের সংস্কারবশতঃই জন্ম-মৃত্যু—ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার পালনের অবস্থা মাত্র। মনুষ্য জীব-শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বযোনি-উদ্ভূত বহু সংস্কার লইয়া জাত। কোন্ মনুষ্য কোন্ যোনি-সম্ভূত সংস্কার বলবান, তাহা বলাও কঠিন। মহত্তত্ত্ববিৎ আপনার সংস্কার দেখিতে পান, লক্ষ্য রাখেন, এড়াইতেও কৃতকার্য্য হয়েন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামচরণ বসু।

রাস-রসায়ন।

[শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-রসাবলম্বিত পদ-কীর্ত্তন।]

—o—

(১)

রাস-রসেশ্বর শ্যামসুন্দর নাগর রায়—
(গোপীর) প্রার্থনা পূরালেন্ শ্রীরাসলীলায়।
হেরে—
শারদ পৌর্ণমাসী, গগনে পূর্ণশশী —
কিবা শোভা পায়!
(প্রেমে) গলে চাঁদ ঢলে পড়ে নীল্ যমুনায়!
(ভাবে) হেসে চাঁদ ভেসে চলে নীল্ যমুনায়!
(আহা!)
সে হাসির হর্ষভরে,
ফুটল ফুল থরে থরে!
অলিকুল গুন্ গুন্ করে!
কোকিলের কুহুস্বরে—
প্রাণ-মন মাতায়!—
(অমি)
সেই সময় রসময় বাঁশী বাজায়!

(২)

শ্যামের মধুর বাঁশরী বাজিল
কুঞ্জকানন মাঝে,—
(অমি)
স্থাবর-জঙ্গম— সবার অঙ্গ
প্রেম-তরঙ্গে নাচে!
ভূচর-খেচর— সর্ব্ব চরাচর
শিহরে মুরলী তানে!
সুখে নাচে শিখী; প্রেমে গাহে পাখী,
যমুনা বহে উজানে!
(শ্যামের বাঁশীর গানে)
(আহা!)
যোগী ছাড়ে যোগ, ভোগী ভোলে ভোগ,
গৃহী ত্যজে গৃহবাস!
জননীর স্তন ছাড়ে শিশুগণ,
সতী ছাড়ে পতি-পাশ!
(মোহন বাঁশীর তানে)
(তখন)
কামবীজ তান পূরিয়ে সন্ধান,
বাঁশী বাণ পুনঃ হানিল;
(অমি)
ব্রজবধূ-মন-হরিণ বিঁধিয়ে,
বাঁধিয়ে কাননে আনিল!
(ও সেই নিঠুর কালা)
গোপীমোহনের মোহন মুরলী
বাজিল কুঞ্জ-মাঝে;
(অমি)
গোপিকা-কুল আকুল ব্যাকুল—
ভেটিতে গোকুলরাজে।
(সবে) শ্যাম-দরশনে সাজে।
(সবে) হ'ল যেন দিশেহারা!—
(অমি)
কি করতে কি করে, কি পরতে কি পরে,
সাজিছে বাউরী-পারা!

(৩)

(কেহ) কর্ণেতে কঙ্কন পরে!
কণ্ঠে পরে তাড়!
কটিতে পেঁড়িয়া পরে
গজমতি-হার!
(কেহ) চরণে কাজল দিল!
নয়নে আলতা!

হৃদয়ে দোলায়ে দিল
'চরণ পদ্ম'-পাতা!
(গোপীর) গৃহকার্য্য গৃহে র'ল,
সবে হ'ল মুগ্ধ;
অনলে উথলি প'ল
বৈসালীর দুগ্ধ!
(গোপী) স্বামী-সেবন, শিশু-পালন
সকল ভুলে গেল;
(গোপীর) আধা অন্ন রাঁধা হ'ল,
অমনি পড়ে র'ল!

(৪)

ধেয়ে চ'ল্‌ল বনে,—
(ও সেই) বন-বিহারীর দরশনে;—
(গোপীর) হৃদ্‌বিহারীর দরশনে॥
(সবে) এল শ্যাম-পদ-মূলে;—
(অমি)
'এস এস' করি, হাসি-মুখে হরি
তুষিলেন গোপীকুলে॥
(অতি) সমাদরে তাসবায়,—
বসায়ে নিকটে, কহেন কপট
শঠ-লম্পট রায়,—
"(কেন) এসেছে গোকুল- কুলবালাকুল!
ব্যাকুল হয়ে এ বনে?
(বল) এ ঘোর নিশায়, গৃহ ত্যজে হায়!
কাননে কি কারণে?

(৫)

(আহা!)
তোমরা সতী গুণবতী পতি-পদে রতিমতী,
স্নেহবতী সন্ততিগণে;—
(বল) তবে কেন এলে হেন
ত্যজি নিজ জনে?
ত্যজে পতি গৃহবাসে, পরপুরুষের পাশে
কেবা আসে নিশাকালে বনে?
(আমি) তাই গো বলি, যাও গো চলি
সবে মিলি স্বভবনে।
সতীধর্ম্ম—গৃহকর্ম্ম সাধ গিয়ে সদনে।
পতি-পুত্র পিতা-মাতা সেব গিয়ে ভবনে॥"

(৬)

(নীরদরূপীর এই নিদারুণ বাণী—
তৃষিতা চাতকী-শিরে হানিল অশনি!)
তখন কয় গোপিনী—
"একি একি শুনি!
(অভাগীগণের ভাগ্য পরিহাসি,
শশী-করে আজি ঝরে বিষরাশি!)
হ'ল এ যে কেমন ধারা!
(মোরা) কার ডাকে কার কাছে এলাম?
কিসে হ'লাম দিশেহারা?"

(৭)

(বলে) "এই কি তোমার বিধি?
ওহে হৃদি-নিধি!
(তোমার) বিধি শুনে বিদরে হৃদি!
ওহে গুণনিধি!
মোহন বাঁশীর তানে, টেনে এনে বনে,
(ওহে বংশীধারী হরি হে!
(ওসে বাঁশীত নয়, সর্ব্বনাশী!)
(গোপীর মন মৃগী বাঁধার ফাঁসী!)
(তোমার কি যাদু যে জানে বাঁশী!)
(স্বরে মনোপ্রাণ উদাসী)—
(বলে—"বাঁশীধারীর হইগে দাসী)—
(পদে—জীবন্‌-যৌবন্‌ সঁপে আসি!")
(ও সেই) বাঁশীর তানে, টেনে এনে বনে,
(এখন) ঘরে ফিরে যেতে দিচ্ছ বিধি!
মোদের পিতা-মাতা, পতি-পুত্র-ভ্রাতা,—
(বেশি বল্‌ব কি আর বঁধু হে!)
আজি ঐ চরণে সব সঁপে দি।

মোদের মন সরেনা, নয়ন ফেরেনা,
(গোপীর প্রাণ-মন-হারী হরি হে !)
আর চরণ চলেনা ভবন-প্রতি।

(৮)

(অই—)
নবঘন-রূপ নয়নে লেগেছে,
নয়ন ফিরানো ভার।
শীতল চরণ- শরণ ত্যজিয়ে,
চরণ চলেনা আর ॥
(ঘরে ফিরে যেতে)
কিবা !
মধুর চাহনী ! মধুর হাঁসনী !
মধুর মুরলী-ধ্বনি !
মধুর আদরে, মধুর অধরে
মধুর মধুর বাণী !
(আহা ! প্রাণ-বঁধুর)
কিবা !
মধুর নয়ান ! মধুর বয়ান !
মধুর বঙ্কিমঠাম !
(আহা !)
মধু হতে কত সুমধুর নাথ !
মধুমাখা 'শ্যাম' নাম !
(প্রাণবঁধু হে ! তোমার মধুমাখা 'শ্যাম' নাম !
হেন—
মধুচক্র ছাড়ি, মন-মধুকরী—
যেতে কি চায় হে বঁধু ?
(আহা !)
সংসার-গরলে আর কি সে ভোলে—
যে পিয়ে এ প্রেম-মধু ?
মোরা—
তনু-প্রাণ-মন, জীবন-যৌবন,
সঁপেছি ও রাঙ্গাপায় !

ও রূপ ভজিতে, ও প্রেমে মজিতে,
সঁপেছি ও রাঙ্গাপায় !
(এখন) রাখ হে শ্রীপদে, বিচ্ছেদ-বিপদে
ফেল, যদি ইচ্ছা হয়।
(ইচ্ছাময় হে হরি !)
(আর) মজিব না মোহে, ভজিব না গেহে,
ত্যজিব না হে তোমায় !
(ভাগ্যে যা হয় হবে)
অই—
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিতে, অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে,
বাঁশীর সঙ্গীতে আর,—
(কি 'মোহিনী' জানহে বঁধু !)
(নিজে) এনে ধরে বেঁধে, বল ফিরে যেতে
প্রাণ বধে' অবলার !
বলি এই কিহে সুবিচার ?

(৯)

(অমি) ফিরল প্রেমময়ের ভাব !—
(আহা !) হেরে গোপীর প্রেম-প্রভাব।
(অমি) মজল মনমোহনের মন !
(দেখে) গোপীর আত্মসমর্পণ।
ভাবে লাগল ভাবময়ের ভাব !
তখন—
গোপিকা-সঙ্গে, হরষ-রঙ্গে,
দরশ-পরশ-সরসালাপ !
রসিকা-সঙ্গে, রস-তরঙ্গে !
রাসরসরাজ দিলেন ঝাঁপ !
তাহে প্রেম্-তরঙ্গ উঠ্‌ল !
অমি—
প্রেমের নীরে, প্রেম-সমীরে,
প্রেমের তুফান ছুটল !
(প্রেমময়ের প্রেম্-হৃদয়ের
প্রেমের তুফান ছুটল !

শ্যাম-নাগরের প্রেম-সাগরে
প্রেমের তুফান ছুটিল !)

(১০)

রসরাজের বেণু বাজে !
নব নাগরী গোপী নাচে !
(কিবা) বাজে নূপুর পায়ে !
(সবে) 'প্রাণনাথ' বলে, প্রেম-রসে গলে,
ঢ'লে' পড়ে শ্যামকায়ে !
(রসে) ভাসিতে রসিকরায়ে রে !—
হেসে ঢ'লে' পড়ে শ্যামকায়ে !
(আমি) নাগর-নাগরী করে কর ধরি,
নাচে রাস-রঙ্গেতে !
(সবে) ভাসে প্রেম-তরঙ্গেতে।
শ্যাম-সম্মিলনে, গোপী ভাবে মনে—
"আজি সাধনের ধন পেলাম বনে !
(গোপীর) মরমস্বধন, জীবনের জীবন,
হৃদয়-রতন পেলাম বনে !"
হয়ে —
শ্যাম আদরিণী, শ্যাম সোহাগিনী,
গোপিনী গরবিণী !—
(অরি) সে ভাব গর্ব্ব করিতে খর্ব্ব
(হরি) সর্ব্ব অন্তর্যামী—
হলেন অন্তর্হিত !—সর্ব্ব অন্তর্যামী !
(অমনি—)
"হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !
কোথা গেলে কৃষ্ণ ?
দেখা দেও কৃষ্ণ !
প্রাণে যে মরি !
(নাথ !)
তোমারি বিরহ
দুরহ—দুঃসহ,
প্রাণ মন-দেহ
দহিছে হরি !"

বলিতে বলিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে
কৃষ্ণ অন্বেষিতে ধায় গোপিনী।
কৃষ্ণ-প্রেমাতুরা, বিরহ-বিধুরা,
গোপ-বধূরা উন্মাদিনী !

(১১)

বলে—
"হে কদম্ব ! হে চম্পক !
অশোক ! কিংশুক ! বক !
(যদি) দেখে থাক,
বল কোথা হরি —
(তোমরা প্রিয়তমের প্রিয়তরু)—
আমরা অবলা বালা,
সহেনা বিরহ জ্বালা,
(ও সেই) চিকণ-কালা
না হেরিয়ে মরি !
(মোরা হরি-হারা হয়ে মরিহে !)
(আর কিসে ধৈরয ধরিহে !")
(তখন) কৃষ্ণে উদ্দেশিয়ে গোপী বলে,—
"নাথ !
জীবন-যৌবন নিলে, কুল-শীল না রাখিলে,
দেহে মাত্র প্রাণ ছিল বাকি,
(সকলই ত দিয়েছি)
(সবই পদে সঁপেছি)
নাথ !
তাও তব অদর্শনে, আজি বুঝি যায় এ বনে ;
মরণ-কালে চরণ পাবনাকি ?
(ওহে মরণ-হরণ হরিহে !)
(তোমার চরণ শরণ করিহে !)

(১২)

নাহয় চরণ দিয়োনাকো,
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ ;
নয়ন ভরি হেরি হরি ! ও রূপ-নিধি।
হায় !
দুটি মাত্র দিয়ে নেত্র,
বাদ সেধেছে নিঠুর বিধি ;

হায়! হায়! পুনঃ তায়
(পোড়া) পলক হয়েছে বাদী!
পিপাসা—মিটিলনা—নয়নের;
ঐ মধুর সহাস—ভাষ শুনিয়ে,
আশ মেটেনি শ্রবণের।—
দেখা দেও, কথা কও,
আর মেরনা বিরহ-বাণে,
আর ফিরনাহে বনে বনে—
ব্রজের—
কঠিন মাটিতে হাঁটিতে হাঁটিতে
(ব্যথা) পেয়োনাহে শ্রীচরণে।
আহা!
ভেবে যে মন কেমন করে,
পাছে বা কঠিন কঙ্করে,
আহত ব্যথিত করে ও পদ কমল!—
(মোদের)—
কঠিন হৃদে তুলে নিতে
ভয় হয় চিতে, এম্নি কোমল!
বলি তাই, (আর) কাজ নাই
খেলে লুকোচুরি—মনচোরা!
মোরা বিরহ-গরলে জরা হে!
দেহি মিলনামৃত-ধারা।
হেন বিষে—প্রাণ কিসে--বাঁচে হে?—
(ওহে প্রাণের হরি!)
(~~গোপী~~র—
জাতি-কুল-মান- তনু-মন-প্রাণ-
হারী হে হরি!)
(গোপীর—
সরবস্ব ধন! জীবনের জীবন!
হৃদয়রতন! হৃদি-বিহারি!)
আহা!
হরি-লীলা-গুণ-গীতে,
হরি-রূপ ধরি চিতে,
হরিনামামৃতে,—
এখনও প্রাণ আছে!—
আর ত রহেনা হে!
প্রাণের প্রাণ হরি তোমা বিনে,
প্রাণ আর রহে নাকো!
জ্বালা সহেনা হে!
হরি হে! নাথ হে! বঁধু হে! প্রিয় হে!
আর দুখ্ দিয়োনা।—
নিজ দাসীদেরে আর দুখ্ দিয়োনা।
ও চাঁদ--
মুখ না হেরে, বুক বিদরে,
আর দুখ্ দিয়োনাকো।—
ওহে—
প্রাণাধিক ধন! বংশীবদন!
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ॥*

(১৩)

কাঁদে গোপীকুল, বিরহে ব্যাকুল,
না হেরে গোকুলচাঁদে।
নয়নেরি জলে যমুনা উছলে,
পাষাণ গলে গোপীর খেদে॥
কেহ ভাব ভরে অভিনয় করে
কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
অবলারি বল— কেবল সম্বল—
রোদন-সাধন অবশেষে॥
আর—
গোপীর দুখ্ সৈতে নারি,
গোপী-মনোহারী হরি—
হেসে হেসে এসে দিলেন দেখা।
গোপিকা সবাকারে
প্রাণ দিলেন শবাকারে,
দেখা দিয়ে কৃষ্ণ প্রাণসখা॥

হেসে কন কৃষ্ণ তখন,
"তোম্‌রা মোর প্রেম্‌-মহাজন,
চিরবাঁধা রলেম প্রেমঋণে।
অঋণী হৈতে নারি,
অথবা হৈতে পারি,
তোমাদেরি সুশীলতা-গুণে॥"
(প্রাণসখী গো!)

(১৪)

(তখন) গোপী-সঙ্গে, রাস-রঙ্গে,
রসরাজ সাজে।
(অয়ি) স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি করে সুররাজে!
(শ্যামের) বামে রাধা বিনোদিনী ঐ নাচে।
(শ্যামের) বামে রাধা রাসেশ্বরী ঐ নাচে!
কিবা শোভা মনোলোভা বৃন্দাবন-মাঝে!
(যেন) কুসুমিতা স্বর্ণলতা তমালেরি গাছে!
(যেন) নবঘনে সৌদামিনী বিলাসে বিরাজে!
(যেন)
শ্যামল বিলে অমল জলে সোনার কমল সাজে!
(কিবা) স্বর্ণমণি-বর্ণ-বিভা নীলমণির কাছে!
(কি শোভা হ'ল রে!)
(আবার)
চৌদিকে চাঁদের মেলা সখিগণ সাজে!
(কিবা)
এক এক গোবিন্দ নাচে দু দু গোপীর মাঝে!
(আবার)
যত গোপী তত কৃষ্ণ বিহারে বিরাজে!
(যোগমায়া মা'র কি মায়ারে!)—
(তাহে)
সবে ভাবে "আমার কৃষ্ণ আমার কাছে আছে!"
(হরির)—
রাস দেখিতে অলক্ষিতে সুরগণ সাজে।
(আহা!) ইন্দ্রসহ ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাসহ ব্রহ্মাণী,
দেবী-সনে দেবগণে বিমানে বিরাজে!
(আবার) আপ্‌নি হর গৌরীসনে বৃষাসনে নাচে
(হরি-হরি-বোল্‌ বলেরে!)
(আজ্‌) যমুনারি সঙ্গ-গতি এলেন গঙ্গা-সরস্বতী;
কৃষ্ণা-গোদাবরী আদি বৃন্দাবন-মাঝে!
(এলেন্‌) সর্ব্বতীর্থময় সাগর্‌ প্রেম্‌-সাগরের
কাছে!
(এলেন্‌—)
পুরী-প্রয়াগ-অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র-কামাখ্যা,
পিতৃতীর্থ পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দারণ্য-মাঝে!
পুষ্কর-নৈমিষারণ্য বৃন্দারণ্য-মাঝে!
(আবার) শিবের কাশী এলেন্‌ ব্রজে শিবের
পাছে পাছে!
(আজি)
সর্ব্বদেব-সর্ব্বতীর্থ, সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বসত্য,
সর্ব্বপ্রেম-সর্ব্বরস-পর্ব্ব ব্রজ-মাঝে!
(আজ্‌) সর্ব্ব সুখে সর্ব্বলোকে 'হরি'বলে' নাচে
সূর্য্য-সোমে—বায়ু-ব্যোমে 'বোল হরিবোল'
বাজে!
(অই) হরিনামে রাধা-কৃষ্ণ যুগলরূপে
রাজে!
(আহা) 'হ'-এ রাধা, 'রি'-এ কৃষ্ণ 'হরি'তে
বিরাজে!
(হেরে—)
প্রেম-গগনে পূর্ণ ইন্দু, মাতল রাস-রসসিন্ধু,
যে লভে তার পুণ্যবিন্দু, ধন্য ধরা-মাঝে!
(ও তার) কৃপা-বিন্দু শম্ভুহিন্দু
করযোড়ে যাচে॥
('হরি হরি' বলে' রে!)

(১৫)

(কৃষ্ণ-) লীলারি সারাৎসার—
রাসলীলা চমৎকার!

মন মজাওরে তায়।—
(সবে) 'হরিবোল বোল্ হরিবোল'
গাও সদায় ॥

——o——

শ্রীশঃ—.

* এই পদাবলীটি সংকীর্ত্তনরূপে গান করিতে হইলে, ইহার স্তম্ভভেদ জ্ঞাপক ক্রমিক অঙ্কপাত অনুসারে বাদ্যের তালগুলি এইরূপ জানিতে হইবে, যথা—১—রূপক, ২—একতালা, ৩—ঠুংরি, ৪—একতালা, ৫—ঝাঁপতাল, ৬—গড়খেমটা, ৭—একতালা, ৮—ঝুলান, ৯—একতালা, ১০—আড়খেমটা, ১১—দশকোষী, ১২—একতালা, ১৩—গড়খেমটা, ১৪—খেমটা, ১৫—রূপক।

[লেখক]

বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বলিতে পার, 'শ্রামণ্যফল' সূত্র হইতে বিভূতিতত্ব যোগভাষ্যে উদ্ধৃত হইতে পারে; কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রকারগণ যে বেদবাহ্য বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, এ কথা সর্ব্বথা অসম্ভব। কিন্তু যোগভাষ্যে উহা উদ্ধৃত বচন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে উহা যে অবৌদ্ধদের পূর্ব্বপ্রচলিত শ্রামাণ্যফল, তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।* উহারও উপরিস্থিত যে 'লোকুত্তর' মার্গফল, তাহাকেই বৌদ্ধেরা কেবল নিজেদের আবিষ্কার মনে করেন।

চতুর্দ্দশ ভুবন ও সেই সেই ভুবনের যাহারা অধিবাসী, তাহাদের বিবরণ যোগভাষ্যে যেরূপ আছে, বৌদ্ধ শাস্ত্রেও তদনুরূপ দেখা যায়। ঐরূপ ভুবনের বিবরণ কেবল মাত্র যোগভাষ্যেই দেখা যায়। উহা যোগীসম্প্রদায়ে প্রচলিত বিদ্যা। বুদ্ধ-বচন হইতেও দেখা যায় যে, বুদ্ধের সময়ে ও পূর্ব্বে অনেকে সমাধিসিদ্ধ হইয়া ঐ সব লোকে যান বা তদ্বিবরণ অবগত হন। আর ত্রয়স্ত্রিংশদেব ইন্দ্র, ব্রহ্মাপুরোহিত, ব্রহ্মলোক প্রভৃতিও বৌদ্ধদের আবিষ্কৃত নহে। সুধর্ম্মা, দেবসভা, যম, বৈশ্রবণ প্রভৃতিও পূর্ব্বপ্রচলিত ছিল।

অতএব যেহেতু আর্ষশাস্ত্রের মধ্যে যোগভাষ্যেই ঐরূপ চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রাচীনতম বিবরণ আছে, এবং বৌদ্ধশাস্ত্রেও যখন

* বৌদ্ধেরা অনেক প্রাচীন ও পূজ্যশব্দ সকলকে নিজেদের অভিমত অর্থ দিয়া স্বীয় শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, এরূপও দেখা যায়, যথা:—

যো সীলব্বত সম্পন্নো পহিতত্তো সমাহিতো।
চিত্তং যস্স বশীভূতং একগ্গং সুসমাহিতং ॥
পুব্বে নিবাসং যো বেদী সগ্গাপযঞ্চ পস্সতি।
অথ জাতিক্খয়ং পত্তো অভিঞ্ঞা বোসি-
তো মুনি ॥
এতাহি তিহি বিজ্জাহি তেবিজ্জো হোতি
ব্রাহ্মণঃ ॥
(অঙ্গুত্তর নিকায়। তিক নিপাতে ব্রাহ্মণ-
বগ্গো)

অর্থাৎ তিন বেদের বিদ্যায় ত্রয়ীবিদ্যা-সম্পন্ন হয় না, কিন্তু যিনি শীলব্রতসম্পন্ন প্রহিতাত্মা (বীর্য্যবান) ও যিনি প্রজ্ঞাভাবিত, তিনি ঐ তিন প্রকার বিদ্যার দ্বারা ত্রয়ীবিৎ ব্রাহ্মণ হন। তাঁহাকেই আমি (বুদ্ধদেব) ত্রয়ীবিৎ বলি। অন্যেরা কেবল লপিতলাপক।

উহা গৃহীত দেখা যায়, আর যখন বৌদ্ধের নিজস্ব নহে, তখন উহা যোগভাষ্য হইতেই গৃহীত বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত।

অবশ্য বৌদ্ধেরা উহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং উহার কতকগুলিকে রূপাবচর, কতকগুলিকে অরূপাবচর ইত্যাদি নিজেদের উদ্ভাবিত সংজ্ঞায় লক্ষিত করিয়াছেন।*

* যাম্য বৌদ্ধেরা ব্রহ্মলোককেই সর্ব্বোচ্চ রাখিয়াছেন; আর উদীচ্য বৌদ্ধেরা ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মাকে নীচে নামাইয়া, বোধিসত্ত্ব-লোক ও আদিবুদ্ধ-লোককে সর্ব্বোচ্চে বসাইয়াছেন; কিন্তু পরিনির্বৃত কোন বুদ্ধকে লোক মধ্যে রাখা যাম্য বৌদ্ধশাস্ত্রের সম্পূর্ণ-বিরুদ্ধ। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, যত দিন তাঁহার শরীর আছে, তত দিনই সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। পরিনির্ব্বাণের পর আর দেব, মনুষ্য, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। এই মত যোগ-দর্শনের অনুরূপ।

পাশ্চাত্যগণ যে বলেন "Buddhism was a protest against the prevailing animism" ইহাও অসার কথা। চন্দ্রদেব, সূর্য্যদেব, দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে বুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল, তাহা "animism" হউক আর যাহাই হউক, বুদ্ধও সেইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

বায়ুদেবতা ইন্দ্র, দেবরাজ রূপে বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (প্রথম পঞ্চিকা। ১১) ইন্দ্রের "বাবতা" প্রভৃত মহিমার উল্লেখ তাহার প্রমাণ। বৌদ্ধগণও ঐরূপ ইন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ "animism" পদার্থের দ্বারা পাশ্চাত্যগণ যে ভারতীয় ধর্ম্মের ব্যাখ্যান করেন, তাহা ভ্রান্ত ধারণার উপর স্থাপিত।

যোগভাষ্যকার স্থানে স্থানে ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন (যদিও সূত্রের ভিতর ঐ বাদের কুত্রাপি প্রসঙ্গ নাই †) করিয়াছেন, ইহাতে অনেকে বলিবেন, তবে তিনি ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী নাগার্জ্জুনের

† যোগসূত্রের প্রথম পাদের ৩২। ৪৮ চতুর্থ পাদের ২০। ২১ প্রভৃতি সূত্রের ভাষ্য স্থলে ভাষ্যকার ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বস্থানেই প্রসঙ্গক্রমে উহার উত্থাপন করিয়াছেন। কোন সূত্রেই ঐ বিষয়ে স্পষ্ট নাই। তবে সেই সেই সূত্রে সূচিত তত্ত্বানুসারে ক্ষণিকবিজ্ঞান-বাদ যে অন্যায্য, তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন মাত্র।

যোগসূত্রে বৌদ্ধমত ও অন্যান্য কোন দর্শনের মতের প্রসঙ্গ না থাকাতে, উহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু সাংখ্যযোগ যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহা ভারতের চিরন্তন বিশ্বাস। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আসুরি, পতঞ্জলি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কতকগুলি নাম পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন কোন পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রণেতা। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ভগবান্ অনন্ত পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া, যোগসূত্র, চরক ও মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। অতএব যোগসূত্রকার ও মহাভাষ্যকার এক ব্যক্তি না হওয়াই সম্ভব। বিশেষতঃ যোগসূত্র ও মহাভাষ্যের মতের ভিন্নতা দেখা যায়। যিনি যোগসূত্রে জগতে অতুলনীয় চিন্তার গাম্ভীর্য্য দেখাইয়াছেন, যিনি পরমার্থতত্ত্বকে বিশুদ্ধ-ন্যায়াদৃত-নির্ম্মল যুক্তির দ্বারা অনচ্ছ ও প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনি যে ব্যাকরণ মহাভাষ্যে আবার অনর্থক অন্যরূপ মত প্রচার করিবেন, তাহা মোটেই সম্ভবপর নহে। অতএব যোগসূত্রকার, চরক ও মহাভাষ্যকার যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

(খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী) পরের লোক। এ কথাও সর্ব্বথা অসার। ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ বহু পূর্ব্বের। বিজ্ঞান পদার্থ বৌদ্ধেরা উপনিষৎ হইতে লইয়াছেন। বিজ্ঞান-পরিণামী পদার্থ, প্রতিক্ষণে তাহার ভিন্ন ভিন্ন বা (একাগ্রতায়) এক জাতীয় পরিণাম হয়। অতএব বিজ্ঞান সেই পরিণামের প্রবাহ স্বরূপ। আর্য্যেরা বলেন, বিজ্ঞানের মূলে এক অন্বিত সৎপদার্থ আছে; বিজ্ঞান-বিদ্গণ যাহার পরিণাম বা যাহার উপর বিজ্ঞান-প্রবাহ বিবর্ত্তিত। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে সেই মৌলিক সৎপদার্থ বা hypostasis স্বীকৃত নাই। তাহাদের মতে পূর্ব্বাপর বিজ্ঞানের কোন বাস্তব সম্বন্ধ নাই।

প্রাচীনতম বৌদ্ধ পিটক শাস্ত্রে এইরূপ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদের ('ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ' নামটি বোধ হয় পরে প্রদত্ত হয়। যোগ-ভাষ্যে তাহাকে 'বৈশেষিক' বলা হইয়াছে) ভূয়োভূয়ঃ প্রসঙ্গ আছে। দীর্ঘ নিকায়ের 'পোট্ঠপাদ সুত্ত' দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধ এই মতের আবিষ্কর্ত্তা অথবা ইহা পূর্ব্ব হইতে ছিল কিনা, (বৌদ্ধেরা বলেন, বৌদ্ধ শাস্ত্র পূর্ব্ব হইতে ছিল) তাহার স্থিরতা নাই। পরন্তু পিটক রচনার পূর্ব্বে এবং বুদ্ধের পরে, যে সময় ভারতে বৌদ্ধ-মতের খুব চর্চ্চা হইতেছিল, সেই সময় যে যোগভাষ্য রচিত হইয়াছে, (অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দে) তাহা উক্ত যুক্তি হইতে অনুমিত হইতে পারে।

এই যোগভাষ্য, পঞ্চশিখাচার্য্যকৃত সাংখ্যের সর্ব্বাপেক্ষা যে প্রাচীন গ্রন্থ ছিল, তাহা হইতে উদ্ধৃত বচন পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত বার্ষগণ্য আচার্য্যের বচন ও অনেক সূত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচনও পাওয়া যায়। সেই এক পঞ্চশিখ বচন হইতে জানা যায় যে, আদি বিদ্বান্ কপিল নির্ম্মাণচিত্তাধিষ্ঠান পূর্ব্বক আসুরি ঋষিকে সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। আসুরি উহা ঋষি-সমাজে প্রচার করেন। বুদ্ধের পর ভারতে যেমন ধর্ম্ম-চর্চ্চার অভ্যুদয় হয়, সেই সময়ও কপিলের সাংখ্য ঋষি সমাজে * জ্ঞানযোগের চর্চ্চার অভ্যুদয় হয়, ইহা মহাভারতের প্রাচীন সংবাদ হইতে জানা যায়। আসুরির প্রধান শিষ্য পরিব্রাজক পঞ্চশিখ মিথিলাদি দেশে পরিভ্রমণ করিতেন, তিনিই প্রধান সাংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্যক্ প্রচার করেন। তাহাতেই কোন কোন উপনিষৎ, মনু, ও মহাভারতাদি যাবতীয় আর্যগ্রন্থ সাংখ্য-মতে অনুপ্রাণিত দেখা যায়।

মহাভারত অতি প্রাচীন সংবাদসমূহের পেটিক স্বরূপ। যদিও উহাতে অনেক অপ্রাচীন ইতিহাস আছে, কিন্তু আবার যে সময় আর্যসমাজে বিবাহ-প্রথা ছিল না, স্ত্রীগণ "অনাবৃতা" ছিল, তাহারও স্মৃতি আছে (আদি পর্ব্বে ১২০ অঃ)। সেই মহাভারতের এক প্রাচীন সংবাদ হইতে জানা যায় যে, পঞ্চশিখ বিদেহপতি জনদেব জনক নরপতির শাস্তা ছিলেন।

কোশলের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ্যের নাম বিদেহ।

---

* ইহা ঋষি-যুগের কথা। বুদ্ধের সময়ে কেহ ঋষি ছিলেন না, তাহা দ্রষ্টব্য। তখনও অতি পুরা কালে ঋষি যুগ ছিল, এইরূপ লোকের ধারণা ছিল, তাহা বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে জানা যায়। বুদ্ধের ভক্তেরা তাঁহাকে সম্মানসূচক 'মহেসি' বা মহর্ষি নাম দিয়াছেন।

বেদের "বিদেঘ" নাম হইতেই সম্ভবতঃ এই নামের উৎপত্তি। এই বিদেহ রাজ্য অতি প্রাচীন। মহাভারতের মূল ঘটনা, যাহা ঐ গ্রন্থের অতি প্রাচীন অংশ, তাহাতে জানা যায়, যুধিষ্ঠিরাদির সময়ে ঐ রাজ্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বুদ্ধের সময় ঐ রাজ্য ছিল না।+ বুদ্ধের সময় এই কয়টী প্রধান জনপদ ছিল, যথা—"কাসিকোসলেসু বজ্জিমল্লেসু চেতিবংসেসু কুরুপঞ্চালেসু মচ্ছসুরসেনেসু"।

(দীর্ঘনিকায়ের জনবসভ সুত্ত)

অর্থাৎ কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু পঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেন (এই সকল দেশে এবং অঙ্গ-মগধেই বুদ্ধের প্রসার ছিল)। আর মহাসুদর্শন সুত্ত হইতে জানা যায় যে সময় চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী প্রধান নগর ছিল। উহার মধ্যে বজ্জি ও মল্ল দেশেই প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের স্থান। (মহাভারতে মল্ল দেশের নাম আছে, বজ্জির নাম নাই)।

এ দিকে শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও বিদেহপতি জনকের আখ্যান পাওয়া যায়। অতএব অন্যতম জনক রাজার শাস্তা পঞ্চশিখাচার্য্য যে বুদ্ধের বহু পূর্ব্বের লোক, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কত পূর্ব্বের, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই; তবে দেখা যায়, ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক প্রতি সহস্র বর্ষে এক একবার ধর্ম্মচর্চ্চার অভ্যুদয় হইয়াছে। বুদ্ধের সহস্র বর্ষ পরে শঙ্কর ও শঙ্করের সহস্র বর্ষ পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। অধুনা ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই প্রাবল্য। বুদ্ধও বলিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্ম সহস্র বর্ষ পরে হীনপ্রভ হইয়া যাইবে। কপিলর্ষি-প্রণোদিত হইয়া ঋষিসমাজে যে ধর্ম্মচর্চ্চা প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে ঐ সহস্র বার্ষিক কালচক্রের একাধিক চক্র পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, বোধ হয়।

ইহা আরও দ্রষ্টব্য যে, সাংখ্যের প্রচলিত গ্রন্থ সকল অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন হইলেও প্রাচীন সাংখ্যমত তাহাতে বিপর্য্যস্ত হয় নাই। সৌভাগ্যের বিষয়, সাংখ্যীয় তত্ত্ব সকল যুক্তিমূলক। অনুলোম ও বিলোম যুক্তির দ্বারা উহা সাধিত হয়; তজ্জন্য "নির্গুণ পুরুষ" ও "ত্রিগুণ" উক্ত হইলেই সাংখ্যের সমস্তই সূচিত হয়। যেমন জ্যামিতির কোন প্রতিজ্ঞা ও তাহার প্রমাণের একাংশ পাইলে, অবশিষ্টাংশ অসূচিত থাকে না, ইহাও সেইরূপ। বস্তুতঃ পঞ্চশিখাচার্য্যের প্রবচনের যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা অধুনাও সাংখ্যযোগকে সম্যক্ সূচিত করিতেছে।

অতএব প্রাচীন সাংখ্যযোগের উপর যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তবে নির্ব্বাণের সাধন সমূহ, সুতরাং তল্লভ্য পরমপদ সমান হইলেও, ঐ নির্ব্বাণ সাধন বৌদ্ধেরা ভিন্ন দিক্ হইতে বুঝাইয়া গিয়াছেন। সেই বুঝাইবার প্রণালী বা অভিধর্ম্মের সহিত সাংখ্য-প্রণালীর মোটেই সাদৃশ্য নাই। সাংখ্যে অনুভূয়মান

+ বৌদ্ধ শাস্ত্রে কোন "বেদেহিপুত্ত অজাতসত্তু" এই বাক্যে বৈদেহী নাম পাওয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধঘোষ বলেন, তিনি ঐ নামের একজন কোশল রাজকুমারী।

পদার্থের মৌলিক বিশ্লেষ ও সমবায় আছে, আর অভিধর্ম্মে কেবল অবিশ্লিষ্ট (complex) পদার্থের বিচার। আন্বীক্ষিকী বা metaphysics বৌদ্ধদের নাই। যাহা হউক, অভিধর্ম্মের বিষয় পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য।

রহস্য।

কে আমি, ছিনু বা কোন্ দেশে,
কে বলিবে তাহার সন্ধান?
কি কাজে—কি সাধিবারে এসে,
এ সংসারে লভিয়াছি স্থান?

২

কাহার আদেশ বহি শিরে,
ঘুরিতেছি অনন্তের পথে?
বিলম্বে বা যাইব অচিরে,
সাধি এই কর্ত্তব্যের ব্রতে!

৩

কিছু নাই অন্তর-বাহিরে,
অন্ধীভূত যুগল নয়ন;
নিয়তির নির্ম্মম-তিমিরে
করিয়াছে চির আচ্ছাদন!

৪

যদি কভু ক্ষণ-ভাগ্য-বশে
হেরি কোন্ আলোকের রেখা;
দ্বিগুণিত অন্ধকারে শেষে
লুকায় সে ক্ষুদ্র ক্ষীণ শিখা!

৫

এ মহা আঁধার ভেদ করি,
উঠে না ত সত্যের মিহির!
প্রাণপণে ভাঙ্গিবারে নারি—
রহস্যের কঠোর প্রাচীর!

হাসিছে গাইছে নিশিদিন,
নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন যত;
ভোগানন্দ—বিচ্ছেদবিহীন,
ভুঞ্জিতেছে কত মনোমত!

৭

বাসনা না জাগিতে অন্তরে,
অমনি তা হ'তেছে পূরণ!
সুখ তার সৌভাগ্য শিয়রে,
বিছাইছে কুসুম শয়ন!

৮

কিন্তু যারা দীনভাব-ভরে,
সাধুপথ করিয়া আশ্রয়,
চলিতেছে জীবন-প্রান্তরে,
মূর্ত্তিমান্ দাক্ষিণ্য, বিনয়;—

৯

ছড়াইছে প্রাণের সৌরভ,
পূর্ণ করি ব্রহ্মাণ্ড আবাস;
জগতের বিভব—গৌরব
করে তারে তীব্র উপহাস!

১০

পৃথ্বী প্রায় সহি বজ্রাঘাত,
অবহেলি শত অপমান,
করিতেছে দেহ-প্রাণপাত,
দধীচির হৃদয় সমান!

১১

হায়! তারা, একি অবিচার!
তুষানলে দহিয়া দহিয়া,
নীরবেতে হইয়া অঙ্গার,
যাইতেছে অনন্তে মিশিয়া!

১২

ধরিতেছে অশনি-প্রহার,
বিশুদ্ধির শান্তি-নিকেতন!
আবরিছে কুহেলি আঁধার,
সন্তঃস্নাত নির্ম্মল কিরণ!

১৩

কোথা এর বিপদ্‌নাশকরণী?
এ বেদনা পাশরিব কিসে?
কি বন্ধুর সংসার সরণি!—
কি আশা এ নিরাশার বিষে!

১৪

কে আছ এ জগতের মূলে?
কৃপা করি চাহ একবার;—
রহস্যের অর্গলটী খুলে
এ দুস্তরে করহ নিস্তার।

পথিক

কোথা হ'তে চলেছি কোথায়?
কত দিন হইবে চলিতে!
কে বুঝা'য়ে দিবেগো আমায়;—
কেহ কি তা' পারগো বলিতে?

২

চোখে কিছু দেখিতে না পাই,
চারি দিক্ ঘোর অন্ধকার!
তবু আমি চলেছি সদাই,
কাল-স্রোতে ভেসে অনিবার।

৩

কত দেশ, কত মরু-বন,
কত মাঠ, কত নদ-নদী,
লোকালয়, নিবিড় কানন,
বাহিয়া চলেছি নিরবধি!

৪

হাসি-কান্না-বিমিশ্রিত কত
সৌভাগ্যের উত্থান-পতন;—
মহামোহে অভিভূত মত—
হেরিতেছে সুখের স্বপন!

হেরিনু, উদাস—আত্মহারা,
কত জন প্রাণ করি পাত,
চিন্তাজ্বরে হইয়াছে সারা,
প্রতিদানে লভি পদাঘাত!

৬

কত শুষ্ক শ্মশান-মাঝারে
পিশাচের তাণ্ডব নর্ত্তন!
নিবিড় গভীর অন্ধকারে
গৃধিনীর পক্ষ-সঞ্চালন!

৭

তাপিতের 'ত্রাহি' আর্ত্তনাদ,
ভয়ার্ত্তের ব্যাকুল চীৎকার!
তমোময় বিরাট্ বিষাদ—
করিয়াছে পূর্ণ চারি ধার!

৮

কত রূপ-সৌন্দর্য্যের মেলা,—
বিদ্যুতের ক্ষণিক বিকাশ;
কত লুব্ধ বাসনার খেলা—
করে মোরে তীব্র উপহাস!

৯

কে আছ এ জগতের মূলে—
অধিরাজ, অনন্তের পথে!
রহস্যের আবরণ খুলে,
উদ্‌যাপন করাও এ ব্রতে!

১০

ক্লান্ত প্রাণ, অবসন্ন দেহ,
বন্ধুর, কণ্টকময় পথ;
কোথায় বিরাম-কুঞ্জ-গেহ,—
দেখায়ে পুরাও মনোরথ!

১১

দাও জ্যোতিঃ, করুণা বিকাশি,
দাও প্রেম, দাও দিব্যজ্ঞান;—
জীবনের যত প্রশ্নরাশি,
চির তরে হ'ক্ সমাধান।

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিভূষণ

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩১৪ সাল, ১৮২৯ শকাব্দা।

'স্বদেশী' সাধন।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"— ইহা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ-পূজিত প্রাচীন প্রবচন ; কিন্তু আমরা তাহার উত্তরাধিকারের কি পরিচয় দিতেছি ? তাঁহারা যে "বাস্তবে" জন্মভূমির পূজা করিতেন, স্বদেশের গৌরব বুঝিতেন, তাঁহাদের উক্ত বাক্যেই তাহা প্রমাণিত। তাঁহাদের স্বদেশ-সেবা সৎকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ-লেশ এই বাক্যটি মাত্র অধুনা আমাদের স্মৃতি-সাহিত্যে বর্ত্তমান ; কেননা আমরা এখন কেবল বাক্য-সর্ব্বস্ব, কিন্তু কার্য্য-নিঃস্ব। তবে কিনা, নানা কারণে বাক্যের স্বাচ্ছন্দ্য ও সময় আর আমাদের নাই। কার্য্যের অবসর ও আবশ্যকতা অনিবার্য্য বেগে আগত। "কথায় আর চিঁড়ে ভিজিবে না।" কাজ চাই। আপাততঃ কাজে রাজবাধা নাই। কেবল অনৈক্য ও অসহনশীলতাই বাধা। কাজে লাগিলে, সে বাধা ক্রমে কাটিবে। কেবল মাতৃভূমির দুঃখে কাঁদিবার এ সময় নহে ; ক্রন্দনত নারীত্ব মাত্র ; পরন্তু পৌরুষ-সাধনে প্রাণপণে মায়ের দুঃখ ঘুচাইবার—অশ্রুজল মুছাইবার অদম্য উদ্যমে, অটল উৎসাহে ও অবিচল অধ্যবসায়ে হৃদয় বাঁধিবার সময়।

বাঙ্গালীর বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত। বাঙ্গালী জাতি আজ জীবন-মরণ-সমস্যার সঙ্কট সন্ধি-স্থলে সশঙ্ক ভাবে সমাগত। বর্ত্তমান অবস্থানুসারে—এখন একমাত্র উপায়—এক মাত্র প্রতীকার—প্রাণপণে স্বদেশীদ্রব্য-ব্যবহার। আপাততঃ—'স্বরাজ'—জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি গৌণভাবে চলুক, কিন্তু ইহাই 'মুখ্য' সাধনা হউক্। এই মুমূর্ষ অবস্থায় ইহাই একমাত্র মহৌষধ। ঔষধটি আপাতদৃষ্টিতে সামান্য বোধ হইলেও, ইহার মহতী শক্তি। 'সূচিকা-ভরণ' ক্ষুদ্রতম বটী ; কিন্তু সুবিজ্ঞ কবিরাজ

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারের প্রবলাবস্থাতেই ইহার ব্যবস্থা করেন। আমাদের জাতির আধি-ব্যাধির প্রতিকার-ব্যবস্থাপক বিজ্ঞ বিচক্ষণ চিকিৎসকগণই একবাক্যে আমাদের এই জাতীয় জীবন-সঙ্কট-বিপ্লব-বিকারে এই 'স্বদেশী সাধন' সুচিকাভরণই ব্যবস্থা করিয়াছেন। হৃদয়-আধারে, মাতৃভক্তি-অনুপানে এই মহৌষধ মাড়িয়া, "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, পান করিতে হইবে। এই মহৌষধেই মধুসূদনের কৃপায় বিপদ কাটিবে; রোগ যাইবে, দুর্ভোগ দূর হইবে, জাতীয় জীবন রক্ষা পাইবে। এ ডোবা নাড়ী আবার উঠিবে; এ হিমাঙ্গে আবার তাপ ফুটিবে; এই শীতল শিথিল রক্তস্রোত আবার বিদ্যুৎ-বেগে ছুটিবে।

দাবা-খেলায় যেমন একটা ঘোর বিপদ্-জনক 'কিস্তী'র চোটে মাতের অবস্থায় পড়িয়া গেলে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সকল বলের ও সকল চালের বলাবল ও ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া, হয়ত এমন একটি চাল বাহির করিতে হয়, যাহাতে 'মাৎ' রক্ষা পায় এবং বাজী জয়েরও আশা হয়। আমাদের দৈব ও পুরুষকারের অনুষ্ঠিত এই জাতীয় জীবনের দাবা-খেলায় দৈব "গয়েবী" খেলোয়াড়ের ন্যায় আড়ালে থাকিয়া যে কিস্তি দিয়াছেন, আমাদের পুরুষকার 'বেচারী তাহাতে মাৎ বাঁচাইতে, কয়েক বৎসর যাবত্ ভাবিয়া চিন্তিয়া "স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার" রূপ এই চমৎকার চালটি বাহির করিয়াছেন। আমরা এখনি 'বাজী' পাই না পাই, অন্ততঃ 'মাৎ' বাঁচানো চাই, এবং তজ্জন্য এ 'প্রব্লেম্' সমাধানে এই চাল ভিন্ন আর অন্য উপায়ই নাই।

"তাঁতী-কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সুতো—জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার;
দেশী বস্ত্র-অস্ত্র বিকায়নাকো আর;
হ'ল দেশের কি দুর্দ্দিন!"

ইত্যাদি প্রবীণ-বঙ্গকবি-সঙ্গীত বঙ্গে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই গীত হইতেছে, কিন্তু বঙ্গীয় জন-সাধারণের তাহাতে ঘুম ভাঙ্গে নাই। এখন 'স্বদেশী' আন্দোলন-তরঙ্গের আঘাতে জাগিয়া বুঝিয়াছে যে, বাস্তবিক দেশের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হইতে বসিলে, তৎকালের ন্যায় দেশীয় দুর্দ্দিন আর কি হইতে পারে? এ জগতে যত দেশ ও জাতি উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে, স্বদেশীয় শিল্প-বাণিজ্যোন্নয়নই তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। ইতিহাসে উদাহরণ অন্বেষণ বাহুল্য মাত্র। এই চক্ষের উপরেই বৃটিশের উন্নতি, মার্কিনের উন্নতি, আধুনিক জাপানের এই জগৎ-বিস্ময়করী উন্নতি, এই সমস্তই শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্যোন্নতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল। ভারতের শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্যোন্নতিতেও একদিন সমগ্র জগতের বিস্ময়াবিষ্ট চক্ষু আকৃষ্ট হইত। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যপোত একদিন সুনীল জলধির ফেনিল তরঙ্গ-রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঙ্গে ভারত-প্রসাদ বিতরণ করিত। সেই ভারত আজ পর-প্রসাদ-প্রত্যাশী! যে ভারত অদ্যাপি নিজ হৃদয়োৎপন্ন অন্নে বহু বিদেশের অন্নাভাব দূর করিতেছে, সে ভারত আজ নিজে—

"অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনুক্ষীণ!"

অতএব ভারত-সন্তানের এখন নিরাশ-নিশ্চেষ্টতা—অথচ নির্লজ্জ বাহ্যবিলাস-বিহ্বলতা আর শোভা পায় না। স্বদেশ যার পরপ্রসাদভিখারী, তার আর বিদেশী বিলাসের বাবুগিরি সাজেনা। "ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটা চন্দনবিলাস!" ইহাত আমাদেরই গ্রাম্য প্রবচনে মর্ম্মভেদী উপহাস! মা যাদের পরদ্বার-ভিখারিণী, তাহারা কোন্ মুখে—কোন্ মুখে পর-প্রসাদে হাসে? ধিক্ আমাদের বিদেশী বিলাসে! ধিক্ আমাদের বিদেশানুকরণ উল্লাসে! এখনও যদি আমরা স্বাবলম্বন না ধরি, আপন পায়ে ভর দিতে শিক্ষা না করি, এখনও যদি বিদেশীর আপাত-চাক্‌চিক্য চমকে ভুলি, স্বদেশীর শিল্পকার্য্য—ব্যবসায় বাণিজ্য অবহেলি; এক কথায়—'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি'—তবে আমাদের ন্যায় আত্মহত্যাকারী, স্বদেশ-দ্রোহাচারী হতভাগ্য জাতির উচ্ছেদ যে অদূরবর্ত্তী ও অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সেই আসন্ন উচ্ছেদ হইতে আত্মরক্ষার আশাতেই আমাদের দেশের এই বর্ত্তমান আন্দোলন উথলিয়া উঠিয়াছে; আঘাতের চোটে মোহের ঘুম ছুটিয়াছে; নেশা কাটিয়াছে, আত্মদৃষ্টি ফুটিয়াছে। বিদেশী-বর্জ্জন ও স্বদেশী অর্জ্জনে এই দেশব্যাপী উৎসাহ-উত্তেজনা তাহারি নিদর্শন। আজ 'হাটে ঘাটে মাঠে বাটে' দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তাহারই আন্দোলন—আলোচন। তাই আজ 'শাপে বর' তুল্য রাজবিধির বজ্র-বিক্ষেপও ভাবান্তরে স্বর্গীয় নির্ম্মাল্যনিক্ষেপ জ্ঞানে আগ্রহে গ্রহণ। হিন্দু-মুসলমান, বালক-বর্ষীয়ান, স্ত্রী-পুরুষ, সাক্ষর-নিরক্ষর, হুজুর-মুজুর, সর্ব্বভেদ-নির্ব্বিশেষে—ভারতবাসী সবারই সেব্য এই স্বদেশী সাধন। দেশের বিপত্তি-বিনাশ-ব্যবস্থায় দেশবাসী কাহার আপত্তি? রাজারও ইহাতে আপত্তি বা অসহানুভূতির শিক্ষা-সভ্যতানুমোদিত সঙ্গত হেতু নাই। চিররাজভক্ত হিন্দুর স্বদেশী দ্রব্যানুরাগে 'উদারনৈতিক' বিদেশী গবর্ণমেণ্টের বিরূপ দৃষ্টির স্বাভাবিক আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং এতদ্দেশীয় কৃষি-শিল্পোন্নতির প্রতি ইংরাজরাজের কতকটা অনুকূল দৃষ্টিরও নিদর্শন একান্ত অদৃষ্ট নয়; তবে আর শুদ্ধ স্বদেশী-সাধনে (লার্ড মিণ্টোর মতে "Honest" স্বদেশীতে) ভয়-ভাবনার বিষয় কি? বিদেশী-বিদ্বেষ-বিরহিত শুদ্ধ 'স্বদেশী' অনুরাগের ভিত্তিতে স্থাপিত এই 'স্বদেশী সাধন' তদ্ধেতুই রাজ-বিধি-বাধিত না হইলে, ইহার সাফল্য-সম্ভাবনারইবা একান্ত অসম্ভাবনা কি? শুদ্ধ স্বদেশী দ্রব্যানুরাগের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র রাজনৈতিক নহে। ফলে বৈধ রাজবিধি-বাধ্যতার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাতক কোনও আন্দোলন ভারতের পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব ও অস্বাস্থ্যকর। রাজবিধি-বাধ্যতাই আধুনিক রাজভক্তি (Loalty)। উপদেশ বা আইনের দ্বারা আমাদের সেই রাজভক্তির শিক্ষা ও রক্ষার ব্যবস্থা বাহুল্যমাত্র। শুদ্ধ রাজভক্তি আমাদের হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুগত ও স্বতঃসিদ্ধ। আমাদেরই সর্ব্বসারতম শাস্ত্রগ্রন্থ গীতায় আমাদেরই উপাস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের উক্তিতেই ব্যক্ত হইয়াছে যে—"নরাণাঞ্চ নরাধিপম্।" অর্থাৎ নরবর্গের মধ্যে

আমাকে নরাধিপ—কি না রাজা বলিয়া জানিবে। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রানুসারে রাজশক্তিতে ঐশী শক্তির প্রকাশ। রাজা ঈশ্বরের লৌকিক প্রতিনিধি স্বরূপ। আবার সেই শাস্ত্রই বলেন—"রাজা প্রকৃতি-রঞ্জনাৎ।" অতএব প্রকৃত প্রজাবৎসল রাজার প্রতি রাজভক্তি হানিতে বিশ্বরাজ ঈশ্বরের কোপ এবং সুতরাং সর্ব্বশুভ-সম্ভাবনারই লোপ হয়, ইহাই হিন্দুর স্বধর্ম্ম-শাস্ত্র-সঙ্গত বিশ্বাস। তবে কিনা, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভারতে রাজকর্ম্মচারী-বিশেষের কোন অবিচার বা অত্যাচারাদির বিধি-সঙ্গত প্রতিবাদ কখনও রাজভক্তির বাধক হইতে পারে না। পরন্তু রাজকর্ম্মচারী-বিশেষের দোষে বা বুঝিবার ভুলে সুরাজ্য-পালনের কোন ব্যাঘাত ও তাহাতে রাজসন্তানস্থানীয় প্রজাপুঞ্জের শান্তিতে আঘাত লাগিলে, মৌনানুমোদনে তাহার সমর্থনই বরং রাজভক্তির ব্যাঘাতক বলিয়া মনে হয়। ফলকথা, খাঁটি স্বদেশানুরাগমূলক স্বদেশী দ্রব্য-ব্যবহার বিষয়ক আন্দোলনে কোনরূপ আপত্তিজনক রাজনৈতিকতারই সংস্রব নাই। প্রত্যুত আমাদের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর কৃপায় আমাদের নির্ভরশীলতায় ও বিধিবাধ্যতায় ঈশ্বরভক্তি ও রাজভক্তির অক্ষুণ্ণতাতেই আমাদের স্বদেশানুরক্তি সফল হইবে। ঈশ্বরভক্তি, রাজভক্তি ও স্বদেশানুরক্তি পরস্পর অনুস্যূত না থাকিলে, আমরা কদাচ স্বদেশসেবায় সমর্থ হইব না; হয়ত এক অচিন্তিত-পূর্ব্ব অনর্থোৎপত্তি ঘটিয়া আমাদের সব নষ্ট হইতে পারে। অতএব আমাদের এই স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন ঈশ্বর-ভক্তির আশ্রয়ে পালিত হউক, রাজভক্তির অব্যাঘাতে চালিত হউক এবং দেশভক্তির শক্তিতে ফলিত হউক, ভগবচ্চরণে ইহাই প্রার্থনা।

অবশেষে নিবেদন, আমাদের পরম-স্নেহাস্পদ—দেশের সর্ব্ব আশা-ভরসাস্থল যুবকবৃন্দ যে এই দেশ-ভক্তির নবানুরাগে কায়মনোবাক্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, ইহাতেই আমাদের অন্তরে কৃতকার্য্যতার আশা জাগিয়াছে। আমাদের বুড়ার দলের ত এখন প্রায় পলায়নের সময় আসিয়াছে। যাঁহারা দেশের ভবিষ্যনেতা, যাঁহাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার আদর্শ অনুসরণে দেশের ভবিষ্যসমাজ চালিত, পালিত, বিকাশিত বা (ঈশ্বর না করুন) বিনাশিত হইতে পারে, সেই নবীনবৃন্দকে শুদ্ধ স্বদেশানুরাগে অনুপ্রাণিত দেখিয়া যেন আমরা প্রাচীন বৃন্দ অন্তিমে আনন্দে নয়ন মুদ্রিত করিতে পারি, ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা। হায়! শত কর্ত্তব্য পদদলিত করিয়া, স্বদেশ-গৌরব ভুলিয়া, স্বজাতি-প্রেম মাহাত্ম্য না বুঝিয়া, বিলাতি বিলাসে মজিয়া আমরা এ জীবনে যে স্বদেশ দ্রোহিতা—মাতৃদ্রোহিতার কলঙ্কপঙ্কে পড়িয়াছি, তদ্বিষয়ে এই নিরক্ষর নির্দ্দেশেই নবীন পাঠশালার দলকে বলিতে পারি—বৎসগণ!—স্নেহাস্পদ বালক-যুবকগণ! আমাদের অন্তিমের অশ্রুজলে ও তোমাদের কঠোর সাধনার বলে সে কলঙ্ক অচিরাৎ প্রক্ষালিত হউক। তোমরাই দেশের সর্ব্বস্ব। তোমরা জাগিলেই দেশ জাগিবে। তোমরা উঠিলেই দেশ উঠিবে। তোমরা বাড়িলেই

সবাই মাতিবে। কিন্তু বৎসগণ!—মনে রাখিও—"ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ" অনেকেই বিদ্যার্থী তোমরা, ভারত সেবায় তোমাদের ভারতী সেবার তপস্যা অধ্যয়নাদির যেন ব্যাঘাত না হয়। মনে রাখিও—"সিদ্ধির্বৈ ব্রহ্মচর্য্যম্।" আর মনে রাখিও—"সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্।" উদ্ধত হইও না, উচ্ছৃঙ্খল হইও না, অত্যচ্ছ্বসিত হইওনা, অস্বাভাবিক হইও না। মনে রাখিও—"বিপদি ধৈর্য্যম্।" ধীর-গম্ভীর—অথচ অচল অটল ভাবে—অদম্য উদ্যম—অক্লান্ত অধ্যবসায়ে মাতৃপূজার পুষ্পাঞ্জলি লইয়া অগ্রসর হও। আরাধ্যতায় ভগবদ্‌ভক্তি, বিধিবাধ্যতায় রাজভক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততায় স্বদেশানুরক্তি, এই ত্রিশক্তি-সহায়ে শক্তিমান হইয়া, "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী জন্মভূমির প্রতি ভক্তিমান হও। সেই জগজ্জননীর নিত্যপ্রতিমারূপিণী জন্মভূমির পূজায় নিত্য অনুরক্তিমান রও।

স্বদেশী অর্জ্জন, বিদেশী বর্জ্জন ও বিলাস-বিসর্জ্জন, এই তিন মহাযোগের মহাসাধনার শুভ সুযোগ আসিয়াছে। এ সাধনার সিদ্ধিতে শবে জীবন আসুক, শুষ্কপ্রাণ আনন্দে ভাসুক; মরুতে বারি ছুটুক শ্মশানে ফুল ফুটুক, গরলে অমৃত উঠুক! মন্ত্রের সাধনে আঁধারে আলো, মন্দে ভাল, "শাপে বর" ঘটুক! ঐ দেখ, বিলাতের স্রোতে—বিলাসের স্রোতে বা আমাদের বিনাশের স্রোতে ঐ সর্ব্বস্ব ভাসিয়া চলিয়াছে! গোটা জাতিটাই ধ্বংস-সাগরের দিকে দ্রুত-বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে! ঐ অদূরে সেই সর্ব্ব-সংহার-সাগরের অনন্তপ্রসারিণী সর্ব্বগ্রাসিনী মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে! উন্মত্ত উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-গর্জ্জন শুনা গিয়াছে! আর কি নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকার সময় আছে? আসন্ন জাতীয় মৃত্যুর আতঙ্কপূর্ণ অবস্থায় স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহাররূপ অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহার কর। ইহাই আমাদের মৃতসঞ্জীবন, ইহা-তেই আমাদের আবাহন—"সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যং সুখং"; সুতরাং ইহাই আমাদের সর্ব্বার্থ-প্রদ স্বদেশীসাধন। এস নবীন-প্রবীণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন হিন্দু মুসলমান, এক মায়ের সন্তান সবাই মিলে, এক যোগে এই মহাযোগের সাধন লই। এস, মাতৃগণে—মাতৃভক্তিভরে মাতৃপূজায় মগ্ন হই।

কি ছার মিছার বিলাতী বিলাস বাজার! কেবল বাহ্যরঙ্গ ও সূক্ষ্মতার প্রলোভন-সর্ব্বস্ব বিদেশী বস্ত্রাদি-বস্ত্রসম্ভার! স্বদেশী সাদা-মাটা মোটা-সোটা বস্ত্রাদিই আমাদের ভাল। "খাবে চিকণ, পর্‌বে মোটা, ঘর বাঁধবে ছোট ছোট"—আমাদেরই দেশের এই প্রবচন কি আমরাই মানিব না? আমাদের যুগী-জোলা-তাঁতি ভাইদের হাতের তাঁতের—দেশী সূতার মোটা ধুতিই আমা-দের শ্লাঘনীয় ও শোভনীয়; কেননা সে আমাদের মায়ের প্রসাদ! অসার কাচ-এনামেল দূরে যাক; আমাদের পিতল-কাঁসা বজায় থাক। বেলোয়ারী চুড়ী বিদায় লউক, আমাদের শাঁখা-কড় অক্ষয় হউক। বিলাতী 'বুট্-স্লিপার্' ভারত ছাড়ুক, আমাদের চটী নাগরার আদর বাড়ুক। আর বিলাতী চিনি ও লুণ ত সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাজ্য; কারণ, সবাই জানিয়াছে, উহা মৃত শূকর-গরুর হাড় রক্তাদির সংস্রবে

হিন্দু মুসলমানের অখাদ্য - অস্পৃশ্য—অনস্ত-ভাজ্য। বরং কালো করকচ্‌ কালো চিনি বা খোলা গুড়ও আমাদের সাদর গ্রাহ্য; কেননা মায়ের প্রসাদই সন্তানের শিরোধার্য্য।

এই স্থানে আমরা একটি আধুনিক 'স্বদেশী' 'ছড়া' পদ্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, তদ্দ্বারাই এ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য নিবেদন করিতেছি,—

"ভারামের ছাড় চিনি নুণ,
খেয়োনা আর কোন গুণে;
চর্ব্বি মাড়ের ঐ কাপড়ে
সাজিয়ো না আর দেহ।
কাচের চুড়ী দেওহে ফেলে,
এনোনা আর এনামেলে,
সিগ্রেটে—বিস্কুটে—বুটে
মজিও না আর কেহ॥
'লিবারপুলে' লিভার ফোলে,
ম্যালেরিয়া'র মারে।
যুবা জনায় বুড়া বানায়,
যোয়ান দেহ জারে॥
ও লবণ লবনাকো, ও 'ছোপ্' ছোঁবনা;
মিট্‌চিনির ফিট্‌ শাদা সন্দেশ খাবনা।
যে চিনি না চিনি, তারে 'চিনি' বলে কেটা?
যে সন্দেশে 'দেশ' নাই, সন্দেশ কি সেটা?
পামরুটি—পাপরুটি, বিস্কুট—বিষ-কূট।
ছিগারেট্‌—ছিঃ গর্হিত! ছুট্‌ বিলাতী বুট্‌!
'লাটিমারে' লাঠী মারে;
'দশনে' দংশন করে,
'ছিটাতে' ছুই নাশে,
'ইষ্টপিড্‌' যে, বোকেম' সে!
স্বদেশই—বিদেশী-সুই
নী-ছুরী-কাঁচী।
স্বদেশী অর্জ্জন ধরি,
বিদেশী বর্জ্জন করি,
কর্জ্জন গর্জ্জনে বঙ্গ-
ভঙ্গেতে গঙ্গাজী॥"

এই ছড়ার ছন্দে ছত্রে—বর্ণে বর্ণে আমাদের সহৃদয়-সম্মতি ও সম্যক্‌ সমানুভূতি। বাস্তবিক ভগবান যদি কৃপা করেন, তবে এ জীবনে পাপ ছিগারেট্‌ আর ছোঁবনা, লবণ আর লবনা; চিনি আর চিনিব না; কাচ-এনামেল্‌ আর কিনিব না। তাঁতীর ধুতি ধরিব, মুচীর জুতা পরিব। মা যা হাতে করিয়া দেন, তাই শিরোধার্য্য করিব। এই আমাদের প্রত্যাশা, এই আমাদের পণ। এখন—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পতন।"

উপসংহারে নিবেদন, প্রতিজ্ঞা করা অপেক্ষা প্রতিজ্ঞাপালনেরই অধিক গুরুত্ব ও আবশ্যকত্ব, এ কথা যেন আমরা না ভুলি। আর কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন করিতে ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের ভারত-গৌরব ভীষ্মদেব চিরব্রহ্মচারী ছিলেন, তাই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ অস্ত্রধারণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি লোকে দৃঢ় পণের নিদর্শনে বলিয়া থাকে—"ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা"। অতএব প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যই আমাদের প্রধান সাধন, এ সত্য যেন আমরা বিস্মৃত না হই। আর এক কথা, স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন "যথাসাধ্য করিব", এরূপ প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই নহে। ঐ "যথাসাধ্য" শব্দের ফাঁক দিয়া সকল দুর্ব্বলতাই বাহির হইয়া যাইতে পারে। একটু অসুবিধা

ঘটিলেই, ঐ শব্দের আড়ালে সকল প্রতিজ্ঞার দায় এড়ান যাইতে পারে। আবার "নিশ্চয়ই করিব" এরূপ প্রতিজ্ঞাও বর্ত্তমান অবস্থানুসারে সকল বিষয়ে সম্ভব নহে। অতএব লোকের ব্যক্তিগত সাংসারিক—পারিবারিক প্রভৃতি অবস্থানুসারে কতকগুলি বিদেশী দ্রব্য নিশ্চয় পরিত্যাগের এবং অপরগুলি যথাসাধ্য পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা করাই এক্ষণে যুক্তিযুক্ত। যেমন কাশীধামের ৺বিশেশ্বরকে বা শ্রীক্ষেত্রের ৺পুরুষোত্তমকে এক একটি ফল উৎসর্গ করিয়া তাহা জন্মের মত ত্যাগ করার ধর্ম্ম রীতি অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে, তদ্রূপ আপাততঃ কতকগুলি দ্রব্য—অর্থাৎ সাধারণতঃ আমাদের বাহ্যবিলাস-দ্রব্য আমাদের মাতৃপূজায় বলি উৎসর্গ করিয়া, তাহা জন্মের মত ত্যাগ করা চাই। ক্রমে এক এক প্রতিজ্ঞা পালনের ফলে ও বলে অন্যান্য প্রতিজ্ঞা পালনেরও শক্তি পাইব, এবং কালে ভগবৎকৃপায় সর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পালনেই সমর্থ এবং সর্ব্বার্থপ্রদ 'স্বদেশী' সাধনে সিদ্ধ হইব।

শ্রীশঃ—

কর্ম্ম ও ফলিত জ্যোতিষ।

রাশিচক্র।

চন্দ্র পৃথিবীর সমধিক নিকটবর্ত্তী; তাহার পর বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি যথাক্রমে অধিকতর দূরবর্ত্তী; তাহার পর রাশিচক্র। হিন্দুজ্যোতিষ-মতে পৃথিবী হইতে চন্দ্র ৫০,৫৬৬ যোজন, বুধ ১,৮৬,০৩০, শুক্র ৪,১৪,০৮৭, সূর্য্য ৬৮৯,৩৭৭ মঙ্গল ১২,৯৬,৬০৯, বৃহস্পতি ৮,৭৬,৫৩৮, এবং শনি ২০৩১০৯০৭১ যোজন দূরবর্ত্তী। তাহার পর রাশিচক্র। রাশিচক্র পৃথিবী হইতে ৪,১৩,৬২৫৬৮ যোজন; অর্থাৎ এই পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরস্থ শনৈশ্চর যত দূরে, রাশিচক্র তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক দূরে অবস্থিত।

ইংরেজী জ্যোতিষ মতে চন্দ্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম, তাহার পর শুক্র, তাহার পর মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শনি অধিক দূরবর্ত্তী। চন্দ্র যখন পৃথিবীর অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী হয়, তখন পৃথিবী হইতে তাহার ব্যবধান ২২৫৭৯ মাইল এবং পৃথিবী হইতে যখন অতি দূরবর্ত্তী সীমায় গমন করে, তখন তাহার ব্যবধান ২,৫১,৯৪৭ মাইল। কিন্তু উপরিউক্ত ব্যবধানও সম্পূর্ণ ঠিক নহে। গ্রহগণের দূরত্ব নিরূপণ সহজ সাধ্য নহে। তাহারা নিশ্চল নহে। শূন্যমার্গে সকলেই স্বকীয় বেগানুযায়ী অহরহঃ স্ব স্ব কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করে, অন্যান্য গ্রহগণও সেইরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের দূরত্ব সকল সময়ে সমান থাকে না। অপিচ, তাহাদের স্বকীয় দেহাবর্ত্তনেও ব্যবধানের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যাহাহউক, পৃথিবী হইতে তাহারা যত অধিক দূরে যাইতে পারে এবং অতি সমীপবর্ত্তী হইতে পারে, তাহার ব্যবধান ইংরেজী জ্যোতিষ-শাস্ত্রে যেরূপ উল্লিখিত আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।—

অতি সমীপবর্ত্তী হইলে—

১। শুক্র—(Venus) ২৫,১৯৯০০০ মাইল
২। মঙ্গল—(Mars) ৪৭ ০৮২,০০০ „
৩। বুধ—(Mercury) ৫৬,০০৮,০০০ „
৪। বৃহস্পতি—(Jupiter) ৩৮৩,২৬১,০০০
৫। শনি—(Saturn) ৭৮০,৭০৮,০০০ মাঃ
৬। ওরনাস্—(Uranus) ১,৬৬০,৪২১০০০
৭। নেপচুন্—(Neptune) ২,৫৫০ ৮২১০০

অতি দূরবর্ত্তী হইলে—

১৭৫,৫৬২০০০ মাইল
২৩০,৭৪০০০০ „
১২৯,৮২৩০০০ „
৫৬৭,১২৩০০০ „
৯২৩ ৫৬২০০০ „
১,৮৮৫,২৮ ০০০ „
২,৮৩৭,৭০১০০০ „

চন্দ্র যখন সূর্য্যের অধিকতম নিকটবর্ত্তী, তখন তাহাদের ব্যবধান ২,৭০,০০০ মাইল এবং যখন অধিকতম দূরবর্ত্তী, তখন ব্যবধান ২৩৮০০ মাইল। অন্যান্য গ্রহগণ সম্বন্ধে এইরূপ—

১। বুধ সূর্য্য হইতে ৩৫ ৯১০০০ মাইল
২। শুক্র „ ৬৬,৩০০০০ „
৩। পৃথিবী „ ৯ ৪৩০০০০ „
৪। মঙ্গল „ ১৩৯৫১২০০০ „
৫। বৃহস্পতি „ ৪৭৫৬৯৩০০০ „
৬। শনি „ ৮৭২১৩৫০০০ „
৭। ওরনাস্ „ ১৭৫২৮৫১০০০ „
৮। নেপচুন্ „ ২৭৪৬২৭১০০৭ „

সকল গ্রহের সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-কাল এক-রূপ নহে। যে গ্রহ যত নিকটবর্ত্তী, তাহার ভ্রমণ-ক্রিয়া তত অল্পকালে সমাপ্ত হয়। গ্রহাদির আকার বা আয়তনানুসারে প্রদক্ষিণ-কালের বিশেষ তারতম্য হয় না। নিম্ন-প্রদর্শিত তাহাদের আয়তনের আপেক্ষিক পরিমাণ ও পরিবেষ্টন-কাল দেখিলেই তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

পৃথিবীর আয়তন (Volume or size) ও গুরুত্ব (weight) একশত ধরিলে সেই অনুপাত অনুসারে —

		আয়তন—	গুরুত্ব—
১।	পৃথিবী	১০০	১০০
২।	বুধ	৫	৭
৩।	মঙ্গল	১৪	১২
৪।	শুক্র	৮০	৭৯
৫।	ওরনাস্	৭১০০	২৩০০
৬।	নেপচুন্	৯৪০০	১৭০০
৭।	বৃহস্পতি	১৩১৭০০	৩০০০
৮।	শনি	৭৪৬০০	৯০০০

সূর্য্যপরিবেষ্টন কাল—

দিন	ঘণ্টা	মিনিট
৩৬৫	৬	৯
৮৭	২৩	১৫
৬৮৬	২৩	৩১
২২৪	১৬	৪৮
৩০৬৮৬	১৭	২১
৬০১১৮	০	০
৪৩৩২	১৪	২
১০৭৫৯	৫	১৬

পূর্ব্বোক্ত রাশিচক্রকে ইংরেজীতে Zodiacal constellation কহে। ইহা দ্বাদশটী চিহ্ন কর্ত্তৃক বিভক্ত। হিন্দু-জ্যোতিষে ইহাদিগকে রাশি কহে। চিহ্নের যেরূপ আকার পরিলক্ষিত হইয়াছে, তদনুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে।

পূর্ব্বতন চিহ্নগুলি এখন পর্য্যন্ত হিন্দু-জ্যোতিষে অবিকৃত রহিয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অবশ্য এইরূপ পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক নহে। কোন বিষয় ক্রমান্বয়ে ভাষান্তরিত হইলে অথবা আসলের পুনঃ পুনঃ নকল করিলে, কালক্রমে তাহার ভাব বা আকার নষ্ট হইয়া, তাহা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে *। আসলের আর আসলত্ব থাকে না। প্রাচীন মেষ চিহ্নের শৃঙ্গটাই পাশ্চাত্য জ্যোতিষে মেষচিহ্ন ধারণ করিয়াছে। দুইটী মৎস্য অন্যোন্য পুচ্ছাভিমুখ—অর্থাৎ একটীর শির ও অপরটীর পুচ্ছভাগ উপর্য্যুপরি স্থাপিত করিলে যেরূপ আকার হয়, তাহাই মীনরাশি। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতিষোক্ত মীন (Fish) বা অন্যান্য রাশির যেরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মেষাদি নামকরণের কোনই কারণ উপলব্ধি হয় না। ইংরেজী জ্যোতিষ-গ্রন্থে উপরিউক্ত চিহ্নগুলি যেরূপ লিখিত আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল —

R Aries (Ram) মেষ।
V Taurus (Bull) বৃষ।
U Gemini (Heavenly twine) মিথুন।
T Cancer (Crab) কর্কট।
P Leo (Lion) সিংহ।
M Virgo (Virgin) কন্যা।
A Libra (Scale) তুলা।
M Scorpis (Scorpion) বৃশ্চিক।
T Sagittarus (Archer) ধনু।
W Capricornus (He-goat) মকর।
——Aquarius (Man) কুম্ভ।
X Piesees (Fish) মীন। *

পৃথিবী-মণ্ডলে পূর্ব্ব-পশ্চিম বিস্তৃত যে রেখা কল্পিত হয়, তাহার নাম বিষুব রেখা বা নিরক্ষ বৃত্ত। ইংরেজীতে ইহাকে Equator কহে। নভোমণ্ডলে এইরূপ যে রেখা কল্পিত হয়, তাহাকেও বিষুব রেখা বা নিরক্ষবৃত্ত কহে। ইংরেজীতে ইহাকে Celestial Equator কহে। এই রেখা অতিক্রম করিয়া ২৩½ অংশ উত্তরে ও ২৩½ অংশ দক্ষিণে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্যের এই কক্ষকে "অয়নান্ত বৃত্ত" কহে। সূর্য্য এই রেখার মধ্যেই গমনাগমন করে। উত্তর বা দক্ষিণ ২৩½ অংশের অধিকতর অগ্রসর হইতে পারে না। সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণ (Eclipse) এই পথেই সংঘটিত হয় বলিয়া ইহাকে ইংরেজীতে "Ecleptic" কহে।

বৃত্তোপরি রেখাও বৃত্তাকার ধারণ করে।

---

* ইংরেজীতে পয়ার ছন্দে—এই রাশিগুলি এইরূপ আছে,—

P. T. O.

'The Ram, the Bull, the Heavenly turnes.
And next the crab, the Lion shines.
The Virgin and the Scales,
The Scorpion, Archer, and He-goat.
The man bears the watering pot.
And Fish with Glittering toils."
(Lockeyer's Astronomy.)

* এই চিহ্নগুলির ঠিক অনুরূপ 'টাইপ্' ছাপাখানায় না থাকাতে, এগুলির যথাসম্ভব সাদৃশ্য অনুসারে ইংরাজী "বড় হাতের অক্ষর" টাইপ্ দেওয়া হইল। আর দ্বাদশ রাশির আকৃতির 'ব্লক্' প্রস্তুত না থাকায়, তাহাও দিতে পারা গেল না। (পৃষ্ঠায়)

তজ্জন্য "অয়নান্ত," "নিরক্ষ," "অক্ষ" রেখাদি "বৃত্ত" কথিত হইয়া থাকে। বৃত্ত মাত্রেই ৩৬০ অংশে বিভক্ত; অয়নান্ত বৃত্তে তদনুরূপ ৩৬০ অংশ থাকিলেও, দ্বাদশটী চিহ্ন কর্ত্তৃক উহা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিভাগ বা চিহ্ন গুলিকে রাশি কহে। সুতরাং এক একটী রাশি ৩০ অংশ। এই রাশিগুলিও নক্ষত্রপুঞ্জ। হিন্দু-জ্যোতিষ শাস্ত্র অশ্বিনী, ভরণী ইত্যাদি যে ২৭টী নক্ষত্রের সহিত মানবজীবনের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার সওয়া দুইটীতে এক একটী রাশি এবং তাহাতে ৩০ অংশ পূর্ণ হইয়াছে।

১। মেষ রাশি—অশ্বিনী ১৩ ১/৩ অংশ
ভরণী ১৩ ১/৩ „
কৃত্তিকা ১৩ ১/৩ „
——৩০ অংশ।

২। বৃষ—কৃত্তিকা ১০
রোহিণী ১৩ ১/৩
মৃগশিরা ৬ ২/৩
——৩০ অংশ

৩। মিথুন—মৃগশিরা ৬ ২/৩
আর্দ্রা ১৩ ১/৩
পুনর্ব্বসু ১০
——৩০ অংশ

৪। কর্কট—পুনর্ব্বসু ৩ ১/৩
পুষ্যা ১৩ ১/৩
অশ্লেষা ১৩ ১/৩
——৩০ অংশ

৫। সিংহ—মঘা ১৩ ১/৩
পূঃ ফাল্গুনী ১৩ ১/৩
উঃ ঐ ৩ ১/৩
——৩০ অংশ

৬। কন্যা—উঃ ফাল্গুনী ১০
হস্তা ১৩ ১/৩
চিত্রা ৬ ২/৩
——৩০ অংশ

৭। তুলা—চিত্রা ৬ ২/৩
স্বাতী ১৩ ১/৩
বিশাখা ১০
——৩০ অংশ

৮। বৃশ্চিক—বিশাখা ৩ ১/৩
অনুরাধা ১৩ ১/৩
জ্যেষ্ঠা ১৩ ১/৩
——৩০ অংশ

৯। ধনু—মূলা ১৩ ১/৩
পূর্ব্বাষাঢ়া ১৩ ১/৩
উত্তরাষাঢ়া ৩ ১/৩

১০। মকর—উত্তরাষাঢ়া ১০
শ্রবণা ১৩ ১/৩
ধনিষ্ঠা ৬ ২/৩
——৩০ অংশ

১১। কুম্ভ—ধনিষ্ঠা ৬ $\frac{২}{৩}$

শতভিষা ১৩ $\frac{১}{৩}$

পূঃ ভাদ্রপদ ১০

———৩০ অংশ

১২। মীন—পূঃ ভাদ্রপদ ৩ $\frac{১}{৩}$

উঃ ঐ ১৩ $\frac{১}{৩}$

রেবতী ১৩ $\frac{১}{৩}$

অংশ

মোট- —৩৬০

হিন্দু-জ্যোতিষ শাস্ত্র এই রাশিগণের মানব-দেহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। যথা ;—

১।	মেষ	মস্তকে।
২।	বৃষ	মুখে।
৩।	মিথুন	কণ্ঠে।
৪।	কর্কট	হৃদয়ে।
৫।	সিংহ	পাকস্থলীতে।
৬।	কন্যা	নিতম্বে।
৭।	তুলা	বস্তিদেশে।
৮।	বৃশ্চিক	পায়ুদেশে।
৯।	ধনু	উরুতে।
১০।	মকর	জানুতে।
১১।	কুম্ভ	জঙ্ঘায়।
১২।	মীন	পাদদেশে।

গ্রহাদির সহিত পৃথিব্যাদি তত্ত্বের যেরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, রাশিগণেরও সহিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে সেইরূপ আকাশ ব্যতীত অপর চারিটী তত্ত্বের সম্বন্ধ উল্লেখিত হইয়াছে।*

* "মেষশ্চ সিংহ ধনুষৌ বিজ্ঞেয়া বহ্নিরাশয়ঃ।
বৃষ কন্যাথ মকর স্তথৈতে ভূমি রাশয়ঃ॥
মিথুনশ্চ তুলা কুম্ভোরাশয় পবনাত্মকা।
কর্ক-বৃশ্চিক, মীনাশ্চ বিজ্ঞেয়া জলরাশয়ঃ॥"
(অথ হায়নরত্ন, ৩ পৃষ্ঠা)

পৃথিবীতত্ত্ব	জলতত্ত্ব।
১। বৃষ।	১। কর্কট।
২। কন্যা।	২। বৃশ্চিক।
৩। মকর।	৩। মীন।
অগ্নিতত্ত্ব।	**বায়ুতত্ত্ব।**
১। মেষ।	১। মিথুন।
২। সিংহ।	২। তুলা।
৩। ধনু।	৩। কুম্ভ।

যোগশাস্ত্রে তত্ত্বাদির যেরূপ বর্ণ উল্লেখিত হইয়াছে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে রাশিগণেরও তদনুরূপ বিভিন্ন বর্ণ নিরূপিত হইয়াছে। 'স্বরোদয়' মতে পৃথ্বীতত্ত্বের পীতবর্ণ, জলতত্ত্বের শ্বেতবর্ণ, অগ্নির অরুণ বা লোহিত বর্ণ, বায়ুর শ্যামবর্ণ এবং আকাশের নানারূপ বিচিত্র বর্ণ।

জ্যোতিষশাস্ত্রমতে মেষের অরুণ বর্ণ, বৃষের শুক্ল, মিথুনের হরিদ্বর্ণ, কর্কটের শ্বেত-রক্ত-মিশ্রিত বর্ণ, সিংহের পাণ্ডুবর্ণ, কন্যার বিচিত্র বর্ণ, তুলার কৃষ্ণবর্ণ, বৃশ্চিকের পিঙ্গল বর্ণ, ধনুর অগ্নি-বর্ণ, মকরের ধবল বর্ণ, কুম্ভের কপিল বর্ণ এবং মীনের কৃষ্ণবর্ণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে।

অভিধর্ম্ম বা বৌদ্ধ দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সংস্কার স্কন্ধ।

যাহারা অভিসংস্করণ লক্ষণক, তাহারা সমস্ত একত্র সংস্কার স্কন্ধ। 'এথ সংস্করণং নাম রাসিকরণলকৃখণম্' (বি॥ ১৪)

অর্থাৎ অভিসংস্করণ অর্থে রাশিকরণ। সংজ্ঞা, বেদনা ও বিজ্ঞান, এই স্কন্ধত্রয়ের বিস্তার বা বর্দ্ধনের দিকে সংস্কারের গতি। মিলিন্দে অভিসংস্করণের এই দৃষ্টান্ত আছে—"যেমন কোন পুরুষ সর্পি, নবনীত, তৈল, মধু ও ফাণিত একত্র অভিসংস্কৃত করিয়া আপনি পান করে ও পরকে পান করাইয়া সুখী হয় ও করে।" এখানে অভিসংস্করণের অর্থ প্রস্তুত করা অথবা সংগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা। বুদ্ধ ঘোষ ও মিলিন্দ মিলাইয়া লক্ষণ করিলে সংস্কার এইরূপ হয়, যথা—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা স্বতবেদনাদি স্কন্ধত্রয়াত্মক ভাব সকলের সঞ্চয়ই সংস্কার। তাহার সমূহ সংস্কার স্কন্ধ।*

সঞ্চিতভাব এবং সঞ্চয়ের হেতু, উভয়ই বোধ হয় সংস্কার।

সংস্কার কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত ভেদে ত্রিবিধ ও সর্ব্বসমেত পঞ্চাশ সংখ্যক। তন্মধ্যে পঞ্চ সংস্কার সর্ব্বসাধারণ। ছয় প্রকীর্ণক বা কুশলাকুশলে যথাযোগ্য ভাবে মিলিত থাকে। পঁচিশ কুশল এবং চৌদ্দ অকুশল। মোট পঞ্চাশ সংখ্যক হইল।

সংস্কার সকলের প্রত্যেকটী ব্যাখ্যাত হইতেছে।—

(১) স্পর্শ (ফস্সো)। ফুসনা, সম্ফুসনা, সম্ফুসিতত্ব, এই শব্দত্রয়ের দ্বারা—অভিধর্ম্মে স্পর্শের লক্ষণ করা হইয়াছে। স্পর্শ মানস ও ঐন্দ্রিয়িক, উভয়বিধই হয়। তন্মধ্যে চক্ষুরাদিতে সঙ্ঘট্টন হয়, মনে সেরূপ হয় না। কিন্তু সংস্কারের পদস্থান বা আশ্রয় বেদনাদি স্কন্ধত্রয় বলিয়া স্পর্শসংস্কার বস্তুতঃ মানস বা অরূপ ধর্ম্ম। অতএব চক্ষুরাদি প্রণালীর দ্বারা বাহ্য বস্তুর ও মানসবিষয়ের (ধর্ম্মের) সংস্পর্শন ভাব স্পর্শ। যদিও বাহ্য ভাবের সহিত মিলন হইয়া স্পর্শ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ স্পর্শ মনোগত। যেমন তপ্তাঙ্গার লাক্ষা দ্রাবণের হেতু হইলেও লাক্ষাগত তাপই তাহার দ্রাবাবস্থার মুখ্য কারণ, সেইরূপ। ইহাতে এইরূপ বোধ হয় কি, যে মানসিক, বিশেষ ভাব আরম্মনকে গ্রহণ করিলে বেদনাদি উৎপন্ন হয়, তাহাই স্পর্শ। সাংখ্যের গ্রহণভাব বা receptivity এই স্পর্শের তুল্য।

(২) চেতনা। চেতনা অর্থে চিন্তা। বুদ্ধ ঘোষ এতৎসম্বন্ধে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যেমন সূত্রধরের জ্যেষ্ঠ শিষ্য নিজের কার্য্য করে ও পরের কার্য্যও দেখে। যেমন কৃষক ৫৫ জন কৃষাণ খাটায়, সেইরূপ ইহা চিত্তের স্পর্শাদি (পূর্ব্বোক্ত) ৫৫ অঙ্গকে চালিত করে। মিলিন্দে পূর্ব্বোক্ত ঘৃত নবনীতাদির অভিসংস্করণের ন্যায় চেতনার কার্য্য উক্ত হইয়াছে। তাহাতে আছে—

* সাংখ্যমতে চিত্তের ধারণাশক্তিদ্বারা সমস্ত অনুভূতভাবে বিবৃত থাকাই সংস্কার। তাহাই কর্ম্মসংস্কার। তাহার ব্যক্তভাব কর্ম্মফল। সংস্কার চিত্তের অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম। বৌদ্ধের সংস্কার ফলতঃ তাহা হইলেও ভিন্ন সূচিত। কারণ বৌদ্ধের লীনাবস্থা নাই। পরিদৃষ্ট কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই তাহাদের বিচার। বৌদ্ধের যাহা নিরুদ্ধ (লীন) হয়, তাহা উদিত হয় না। নিরুদ্ধ ভাব ও উদিত ভাবের সম্বন্ধ নাই। কর্ম্ম কিরূপে থাকে, কিরূপে ফলীভূত হয়, সে সব বিষয় বৌদ্ধেরা বুঝান না। কেবল মাত্র যোগভাষ্যেই তাহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিবৃত আছে।

"কুশলং কর্ম্ম চেতনায় চেতয়িত্বা" অর্থাৎ কুশল কর্ম্ম চেতনার দ্বারা চেতিত করিয়া—ইত্যাদি। ইহা হইতে জানা যায় যে, চিত্তের সমস্ত ভাব লইয়া তাহাদের সামঞ্জস্য পূর্ব্বক যে চিন্তন, তাহাই চেতনা।

(৩) একাগ্রতা—নানা আলম্বন ছাড়িয়া এক আলম্বন ধরা একাগ্রতা।+

(৪) জীবিতেন্দ্রিয়—রূপস্কন্ধের জীবিতেন্দ্রিয়ের ন্যায়। তাহা রূপের জীবন, আর ইহা অরূপাবস্থার জীবন, এই প্রভেদ।

(৫) মনসিকার—মনে করা অর্থাৎ পূর্ব্ব মন হইতে বিসদৃশ মন করা বা আনা। মনসিকার ত্রিবিধ, আরম্মণ, প্রতিপাদক, বীথি—(চক্ষুরাদি দ্বার ও চক্ষুরাদি বিজ্ঞানের সম্বন্ধীয় শ্রেণী) প্রতিপাদক ও জবন প্রতিপাদক।

এই পঞ্চ সংস্কার সর্ব্বচিত্ত (৮৯ বিজ্ঞান) সাধারণ।

(৬।৭) বিতর্ক ও বিচার—বিতর্কন বা চিত্তের অভিনিবোপন (অভিমুখে স্থাপন) বিতর্ক আর বিচরণ বা আরম্মণে অনুমজ্জন বিচার। এ বিষয়ে অনেক উপমা দিয়া বুদ্ধঘোষ বুঝাইয়াছেন। যেমন বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইলে, মধ্যে এক কণ্টক রোপিত করিতে হয়, সেইরূপ বিতর্ক আর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণকারী কণ্টক অনুমজ্জনকারী বিচার। যেমন গন্ধাকৃষ্ট ভ্রমর পদ্মে পতিত হয়, সেইরূপ বিতর্ক; আর পদ্মের উপরে ঘুরিয়া বেড়ান বিচার। আকাশে উৎপতিত কাম পক্ষীর পক্ষসঞ্চালন বিতর্ক; আকাশে উড্ডীন পক্ষীর পক্ষের অনতিপরিস্পন্দনের ন্যায় বিচার। অন্যত্র (তৃক্ নিপাত অটঠ কথায়) উভয় পক্ষের দ্বারা বাতগ্রহ পূর্ব্বক মহাশকুনের স্থির পক্ষের দ্বারা গমন বিতর্ক, আর বাতগ্রহণার্থ পক্ষের পরিস্পন্দন বিচার। এক হস্তে মলিন কাংস্যপাত্রধরা বিতর্ক, অন্য হস্তে তাহা পরিমার্জ্জন করা বিচার। ইত্যাদি অনেক উপমার উল্লেখ আছে, কিন্তু বিষয়টী তাহাতে অধিক পরিষ্কার হয় নাই। বিতর্ক ঘণ্টাঘাতের মত, আর বিচার সূক্ষ্ম সংঘট্টনের মত। বিতর্ক আর মনের পর্য্যাহনন-(চারিদিকে ঘাত) কারী আর বিচার অনুপবন্ধনকারী। বিভাবিনিকার আর এক দৃষ্টান্ত দেন। যেমন কোন গ্রামবাসী কোন রাজবল্লভ মিত্রের দ্বারা রাজগেহে অনুপ্রবেশ করে, সেইরূপ বিতর্কের দ্বারা আরম্মণ-আরোহণ হয়। আর একেবারে পরিচয় বিনা রাজগৃহে প্রবেশ অবিতর্ক আরম্মণপ্রাপ্তি। এই সব হইতে ইহা স্থির হয় যে, বৌদ্ধমতে মোটামুটি ভাবে আরম্মণ ধরা বিতর্ক, আর ধরিয়া তদ্বিষয়ক (সূক্ষ্ম) চিন্তা বিচার।*

+ ইহাকে স্মৃতিও বলা হয়। কুশলচিত্তের একাগ্রতা সমাধি।

* ভগবান্ পতঞ্জলি সমাধাঙ্গ বিতর্ক ও বিচারের অতি সুন্দর ও স্পষ্ট লক্ষণ দিয়াছেন। শব্দ, অর্থ, জ্ঞান ও বিকল্পের দ্বারা সংকীর্ণ চিন্তা বিতর্ক, আর শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ—স্মৃতি শুদ্ধ হইলে, কেবল বিষয় নির্ভাসক চিন্তা অবিতর্ক। বিতর্ক স্থূল বিষয়ক; সেইরূপ যাহা সূক্ষ্মবিষয়ক, তাহাই বিচার। স্থূলতঃ বিতর্ক সশব্দা স্থূল বিষয়িণী চিন্তা। অবিতর্ক নিঃশব্দ চিন্তা। যেমন 'নীল' এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক যে সেই শব্দের সহিত অভিন্ন নীলরূপে চিত্ত সমাধান

(৮) অধিমোক্ষ—দৃঢ় প্রসত্তি বা প্রযত্নের সন্ধানের নাম অধিমোক্ষ।

(৯) বীর্য্য—উৎসাহ ভাব।

(১০) প্রীতি—চিত্ত ও কায়ের তর্পণ ভাব। তৃষ্ণার্ত্তের জললাভের মত কল্পনা আরম্মণ পাইলে প্রীতি হয়।

(১১) ছন্দ—বিষয়ার্থিকতা। কর্ত্তুকাম্যতা; যেন মনের হস্ত প্রসারণের ন্যায়।

এই ছয় সংস্কার অন্যসমান, অর্থাৎ ৮৯ চিত্তের মধ্যে যোগযোগী কতকগুলির সহিত সম্প্রযুক্ত হয়।

(১২) মোহ—চিত্তের অজ্ঞান বা অন্ধকার ভাব। ইহা আরম্মণকে আচ্ছাদিত করে।

(১৩) অহ্রীকতা—লজ্জাভয়শূন্যতা।

(১৪) অনোত্তপ্প—নিন্দাভয়শূন্যতা।

(১৫) উদ্ধচ্চ (ঔদ্ধত্য)—বিক্ষেপ ভাব।

(১৬) কৌকৃত্য (কুকুচ্চ)—কুকর্ম্মের অনুতাপ।

(১৭) লোভ—তৈলাঞ্জন রাগের ন্যায় অপরিত্যাগ ভাব।

(১৮) দৃষ্টি—মিথ্যাজ্ঞান। সাধারণতঃ ব্রহ্মজাল সূত্রোক্ত ৬২ কুমতকে মিথ্যাদৃষ্টি বলা যায়, কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধের ভিতরও অনেক মিথ্যাদৃষ্টি আছে।

(১৯) মান—গর্ব। উন্মাদের মত কেতুকাম্যতা বা সকলের মধ্যে কেতুস্বরূপ হইবার ইচ্ছা।

(২০) দ্বেষ—চাণ্ডিক্য; ইহা সর্পের বিষ ঢালার মত বা নিজের আশ্রয়দাহনকারী দাবাগ্নির মত।

(২১) ঈর্ষা—পরসম্পত্তিতে অনভিরতি বা অপ্রীতি।

(২২) মাৎসর্য্য—লব্ধ বা লভ্য আত্মসম্পত্তির নিন্দা। পরসম্পত্তির সহিত নিজ সম্পত্তির সমানতা বিষয়ে অক্ষমা।

(২৩।২৪) থিন, মিদ্ধঃ—খিন বা স্ত্যান—অনুৎসাহ অর্থাৎ বীর্য্যের অভাব। মিদ্ধ আলস্য বা অকর্ম্মণ্যতা—আলস্য শরীরজড়তা, বৌদ্ধের মিদ্ধ কায়ের (বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার স্কন্ধের) অকর্ম্মণ্যতা।

(২৫) বিচিকিৎসা—সংশয়। অনিশ্চয় হেতু চিত্ত কম্পন।

দ্বাদশ হইতে পঞ্চবিংশ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ সংস্কার অকুশল। অতঃপর কুশল।

(২৬) শ্রদ্ধা—শ্রদ্দধানতা।

(২৭) স্মৃতি—একধারা স্মরণ সংস্কার স্থৈর্য্য। স্তম্ভের মত আরম্মণে দৃঢ়রূপে চিত্ত রাখা।

(২৮) হ্রী—লজ্জা-ভয়ে কায়-দুশ্চরিতাদি হইতে বিরতি।

(২৯) ওত্তপ্প (অবতপ্প)—পরনিন্দাদি ভয়ে দুশ্চরিত-নিবৃত্তি।

সবিতর্ক সমাধি। আর নীল নাম বিস্মৃত হইয়া কেবল নীলরূপাবগাহিধ্যান নির্বিতর্ক। নীলরূপে সমাধানানন্তর শব্দময় বিচারের দ্বারা রূপ-তন্মাত্রে উপনীত হওয়া সবিচার। আর রূপ-তন্মাত্রের নিঃশব্দ ধ্যান নির্ব্বিচার। শেষটি সালম্বন চিত্তস্থৈর্য্যের চরম উৎকর্ষ। বৌদ্ধদের 'দৃষ্টান্তসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই তাহারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বোধ হয়। বস্তুতঃ এইরূপ লক্ষণই সাধনে কার্য্যকারী; নচেৎ "তাকো সন্তাকো একচিত্ততং" ইত্যাদি লক্ষণ বিশেষ psychological grasp সূচিত করে না।

(৩০) অলোভ।

(৩১) অদ্বেষ—মৈত্রী।

(৩২) তত্র মধ্যস্থতা—চিত্ত চেতসিক কোন ধর্ম্মে ন্যূনাধিকতা ভাব গ্রহণ না করা। সারথি যেমন সমপ্রবর্ত্তিত অশ্বগণকে অধ্যুপেক্ষণ করে, চিত্ত চেতসিকে সেইরূপ অধ্যুপেক্ষণ। ইহাই উপেক্ষা।

(৩৩।৩৪) কায় ও চিত্তের প্রশ্রদ্ধি—কায় ও চিত্তের অকম্প (সাত্ত্বিক) ভাব। কায় অর্থে জ্ঞানেন্দ্রিয়।

(৩৫।৩৬) কায় ও চিত্তের লঘুতা—কায় ও চিত্তের অগুরু বা অস্তব্ধ ভাব।

(৩৭।৩৮) কায় ও চিত্তের মৃদুতা—মৃদুতা অরোধকতা। যেমন মোলায়েম চামড়া।

(৩৯।৪০) কায় ও চিত্তের কর্ম্মণ্যতা—মিদ্ধ ও থিনের বিরোধী ভাব। প্রসাদনীয় বস্তুতে প্রসাদ ভাব—হিত ক্রিয়াতে বিনিয়োগ-সামর্থ্য।

(৪১।৪২) কায় ও চিত্তের প্রাগুণ্য (প্রাগুঞ্ঞতা)—কায় ও চিত্তের অগ্লান (আরোগ্য) ভাব। সুস্থতা।

(৪৩।৪৪) কায় ও চিত্তের ঋজুকতা—আর্জ্জব। অর্থাৎ কায়ের অজিহ্মতা, অবক্রতা, অকুটিলতা এবং চিত্তের সরলতা।

ষড়্‌বিংশ হইতে চতুশ্চত্বারিংশ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কারকে শোভন সাধারণ বলে।

(৪৫) কায়-দুশ্চরিত-বিরতি বা সম্যক্‌ কর্ম্মান্ত—পাপক্রিয়া হইতে চিত্তের বিমুখ ভাব। ইহা ত্রিবিধ—প্রাণাতিপাত-বিরতি (অহিংসা); অদত্তদ্রব্যগ্রহণবিরতি (অস্তেয়) এবং কামে মিথ্যাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতার বিরতি।

(৪৬) বাগ্‌দুশ্চরিতবিরতি বা সম্যগ্‌বাক্‌—মিথ্যা, পিশুন ও পরুষ বাক্য এবং সম্প্রলাপ (সম্ফপ্পলাপ) (বাচালতা) ত্যাগ।

(৪৭) মিথ্যাজীববিরতি—সমস্ত পাপকর্ম্ম হইতে বিরতি।

এই তিনের নাম বিরতিত্রয়।

(৪৮) করুণা—দুঃখের প্রতি দয়া ভাবনা।

(৪) মুদিতা—পরসম্পত্তির অনুমোদন বা তাহাতে প্রমুদিত ভাব।

ইহাদের নাম অপ্রমাণ্য (অপ্পমঞ্ঞা)।

(৫০) প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—প্রজ্ঞা সমাধিজাত উৎকৃষ্ট জ্ঞান; তাহার ইন্দ্রিয় (সঞ্চিত শক্তি) প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

এই পঞ্চবিংশতি (২৬—৫০) সংস্কারের নাম কুশল সংস্কার। ১৪টী অকুশল; ২৫টী কুশল। স্পর্শাদি সর্ব্বসাধারণ সংস্কারের মধ্যে যাহারা অব্যাকৃত চিত্তের সহিত সম্প্রযুক্ত, তাহারাই অব্যাকৃত সংস্কার। স্পর্শাদির অন্তর্গত থাকাতে অব্যাকৃত পৃথক্‌ সংস্কার গণিত হয় নাই।

এই ৫০ সংস্কার যথাযোগ্য ভাবে ৮৯ বিজ্ঞানের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়। আর সেই বিজ্ঞান বা চিত্তসন্তান জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর আবর্ত্তন ক্রমে চলিত থাকে। যথা—

পটি সন্ধি ভবঙ্গ বীথিয়ো চুতি চেচ তথা ভারতরে।
পুন সন্ধি ভবঙ্গ মিচ্চয়ং পরিবত্ততি চিত্তসন্ততি॥

অর্থাৎ প্রতিসন্ধি (জন্ম), ভবঙ্গ (আয়ুষ্কাল), ও চ্যুতি (মৃত্যু) পুনঃ প্রতিসন্ধি পুনঃ ভবঙ্গ ইত্যাদিরূপ চিত্তসন্ততি পরিবর্ত্তন করে।

নির্ব্বাণ।

রাগ বা তৃষ্ণা হইতে নিষ্ক্রান্তি বা রাগাগ্নির নির্ব্বাণের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ এক-ধর্ম্ম। উহা অভাব মাত্র নহে। "পচ্চক্খানুমান সিদ্ধত্তা সব্বদস্সনেন চ অভাব মত্তং নির্ব্বাণ মিতি বিপ্পটী পন্নানং বাদং নিসেধতি" (বিভা। ৬)। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-সিদ্ধতা দেখিয়া, কেবল অভাব মাত্র নির্ব্বাণ, এরূপ অযুক্তবাদ নিষেধ করিতেছেন, ইত্যাদিতে নির্ব্বাণ যে অভাব মাত্র নহে, তাহা প্রতিপন্ন হয়। অভিধর্ম্মে নির্ব্বাণকে অসঙ্খত বা অসংস্কৃত ধাতু বলা হইয়াছে। অসংস্কৃত ধাতুর অনেক লক্ষণ আছে। নিম্নে প্রধান কতকগুলি উক্ত হইতেছে।—উহা অব্যাকৃত, কিন্তু বিপাক নহে। সংক্লিষ্ট—সংক্লেসিক নহে। অবিতর্ক, অবিচার। আচয়গামী বা অপচয়গামী নহে। অপ্রমাণ (অপ্রমেয়)। পণীত (পূর্ণ মধুর)। অনিয়ত। অপ্রতিঘ (ইন্দ্রিয়াভিঘাতক নহে)। অনিদর্শন (চক্ষুরাদির অগোচর)। হেতু নহে। হেতু বিপ্রযুক্ত ও অহেতুক (হেতু সকল যাহার সহভাগী নহে)। অরূপী লোকোত্তর। আসব সংযোজনাদি বিপ্রযুক্ত। অনারম্মণ (আলম্বনশূন্য)। চিত্ত নহে। অচৈতসিক। চিত্ত বিপ্রযুক্ত। চিত্ত সমুত্থান ও চিত্ত সংভূ নহে। উপাদান অনুপাদান (উপাদান ধর্ম্মশূন্য)। ইত্যাদি।

নির্ব্বাণের জন্য চারি আর্য্য সত্যের জ্ঞান আবশ্যক। তাহা যথা—দুঃখ জ্ঞান, দুঃখ সমুদয় জ্ঞান, দুঃখনিরোধ জ্ঞান, দুঃখনিরোধ-গামিনী প্রতিপদের (মার্গের) জ্ঞান। "অরিয়া ইমানি পটি বিজ্ঝন্তি" অর্থাৎ বুদ্ধাদি আর্য্যেরা ইহা মূলতঃ জানেন বলিয়া ইহাদের নাম আর্য্যসত্য।

দুঃখের যেরূপ জ্ঞান হইলে, দুঃখকে অনবশেষ প্রহান করিবার প্রযত্ন হয়, তাহাই দুঃখজ্ঞান। নচেৎ শুদ্ধ কথায় জানিয়া দুঃখকর বিষয়ের অনুধাবন করিলে, তাহাকে "দুক্খঞানং" বলা যায় না। বৌদ্ধপণ্ডিতগণ নিম্নোক্তপ্রকারে দুঃখ নির্দ্দেশ করেন। জাতি (জন্ম), জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন (বিলাপ), দুঃখ (কায়িক পীড়া), দৌর্ম্মনস্য (মানস দুঃখ)। উপায়াস (অত্যন্ত দুঃখজনিত দ্বেষ) * অপ্রিয়-সম্প্রযোগ, প্রিয়-বিপ্রযোগ, 'ইচ্ছিতা লাভ'। ইহার মধ্যে জাতিই সর্ব্ব-দুঃখের প্রসূতি "জাতিপ সূতিকং দুক্খং"।

দুঃখের যাহা উৎপত্তির কারণ, তাহার যথার্থ জ্ঞান—যে জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ সমূলে উচ্ছিন্ন হয়, তাহাই দুঃখ সমুদয়রূপ আর্য্যসত্য।

তৃষ্ণা ‡ দুঃখের উৎপত্তি-কারণ। "যাদ্দং

* বুদ্ধ ঘোষ বলেন—শোক ভাজনের মধ্যে পাক হওয়ার ন্যায়, পরিদেব তাহা হইতে উঠিয়া পড়ার মত, আর উপায়াস ভাজনের মধ্যে পরিক্ষয় পর্য্যন্ত পাক হওয়া। জাতি আদি দুঃখ, জরা মধ্যে দুঃখ, মরণ পর্য্যবসানে দুঃখ। দুঃখের নির্ব্বাচন যথা—দু.= কুৎসিত ; খং=তুচ্ছ। অর্থাৎ অনেক উপদ্রবাদির অধিষ্টান ও বালজনের পরিকল্পিত।

‡ তন্হা দুতিয়ো পুরিসো দীঘমদ্ধানং সংসারং। ইত্থভাবঞ্ঞথাভাবং সংসারং নাতিবর্ত্ততি॥

(সুত্ত নিপাত। ৭৪০ শ্লোক)

মনুষ্য তৃষ্ণারূপ দ্বিতীয়া (ভার্য্যা) সহ দীর্ঘ সংসার-পথে গমন পূর্ব্বক ইত্থভাবা-ন্যথা ভাব রূপ সংসারকে অতিক্রম করিতে পারে না।

তাহা পোনব্ভাবিকা নন্দীরাগ সহগতা তত্র তত্রাভিনন্দিনী" পৌনর্ভবিকা নন্দীরাগ (কোন্ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ রাগ সুখ উদিত হইতে থাকা) সহগম সেই সেই বিষয়ে অভিনন্দিনী তৃষ্ণাই দুঃখ সমুদয় নির্দ্দেশ। তৃষ্ণা ত্রিবিধ, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভব-তৃষ্ণা। বিষয়ভেদে তৃষ্ণা ছয়প্রকার—রূপ-তৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্প্রষ্টব্য-তৃষ্ণা ও ধর্ম্ম (মানস বিষয়) তৃষ্ণা। এই ছয় তৃষ্ণার বিষয়ে কামাস্বাদবশে যখন তৃষ্ণার প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে কামতৃষ্ণা বলে।

যখন সেই ছয় বিষয়কে শাশ্বত মনে করিয়া তৃষ্ণার প্রবৃত্তি হয়, তাহা ভবতৃষ্ণা (যেমন পাঞ্চভৌতিক, ইন্দ্রিয়-সুখনিদান, নিত্য, স্বর্গলোকে বিশ্বাসীদের তৃষ্ণা)।

আর যখন সেই ছয় তৃষ্ণা বিষয়েতে উচ্ছেদ-দৃষ্টি (তাহারা সম্যক্ বিনষ্ট হইবে, এইরূপ বিশ্বাস) সহগত হইয়া তৃষ্ণার প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে বিভবতৃষ্ণা বলে। বিধ্বংসাবস্থা প্রাপ্তির তৃষ্ণা।

অভিধর্ম্মে তৃষ্ণা বা লোভের অনেক পর্য্যায় আছে। তাহা মোক্ষমার্গগামী সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের লোকেরই দ্রষ্টব্য বলিয়া এ স্থলে উদ্ধৃত হইল লোভ—রাগ, সারাগ-অনুনয়, অনুরোধ, নন্দী (আমোদ পাওয়া), নন্দীরাগ, চিত্তের সারাগ, ইচ্ছা, মূর্চ্ছা (ইষ্টবিষয়ে চিত্তমোহ) অধ্যাশন (গ্রাস), গেধ (গৃধ্নুতা) পালিগেধ (সর্ব্বগ্রাস), সঙ্গ, পঙ্ক (অবসাদ কর), এজা (আকর্ষণ), মায়া, জনিকা (দুঃখজননী), সঞ্জননী, সিব্বনী (সেলাই বা বন্ধনকারিণী) জালিনী (জালাবদ্ধকারিণী), সরিৎ (আশনদী), বিষাত্মিকা, সূত্র, বিসতা (বিষয়ে বিসর্পিণী) আয়ূহনী (বিষয়ার্থ কষ্টশ্রমকারিকা), দ্বিতীয়া (ভার্য্যার মত সহচারিণী), প্রণিধি (আকাঙ্ক্ষা), ভবনেত্রী (জন্ম-মরণকারিণী), বন, বনথ (কূপবন), সংস্তব (ঘনিষ্ঠতা), স্নেহ, অপেক্ষা (স্নেহজনিত অপেক্ষা), প্রতিবন্ধু (সদাসন্নিহিত জ্ঞাতি-কুটুম্ব), আশা, আসিংসনা (আর্থিকতা), আসিংসনত্ব (প্রমত্তভাবে চাওয়া), রূপাশা, শব্দাশা, গন্ধাশা, রসাশা, স্প্রষ্টব্যাশা, লাভাশা, ধনাশা, পুত্রাশা, জীবিতাশা, জল্পা (লাভ হইলে বকিতে থাকা), লোলুপা, পুচ্ছঞ্জিকতা (কুকুরের পুচ্ছনাড়ার মত ভাব); সাধু-কাম্যতা (স্বার্থের জন্য প্রিয় হইবার ইচ্ছা), প্রার্থনা, স্পৃহনা, দুঃখমূল, দুঃখনিদান ইত্যাদি।

(ধর্ম্মসঙ্গনি)

তৃষ্ণার অনবশেষ নিরোধ অথবা অশেষ বিরাগ বা প্রতিনিঃসর্গই (ত্যাগ) দুঃখের নিরোধ বা নির্ব্বাণ। ইহা শান্তিলক্ষণ। অচ্যুতি ইহার রস বা প্রবাহ। অনিমিত্ত ইহার প্রত্যুপস্থান বা অভিমুখভাব।†

---

† বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা সমস্ত পদার্থকে লক্ষণ, রস (কৃত্যসম্পত্তি) প্রত্যুপস্থান (উপস্থানকার এবং ফল) ও পদস্থান দিয়া বুঝান। তদ্ব্যতীত বিভাগ, নির্ব্বাচন, অর্থ, অর্থোদ্ধার (বহুবিধ অর্থের মধ্যে যথার্থ নিষ্কাশন), অন্যূনাধিকতা, ক্রম, অন্তর্গত পদার্থের ভেদ, উপমাশূন্যতায় সকলের এক বিশিষ্ট ইত্যাদি প্রকারেও অনেক পদার্থ বুঝান। এইরূপে বুঝার নাম বিনিশ্চয়।

বুদ্ধঘোষ বলেন (বি। ১৬) যে, তথাগতদের উক্তি সিংহের মত; তাঁহারা দুঃখ-নিরোধের যে উপদেশ করেন, তাহাতে

নির্ব্বাণ অসংস্কৃত ধাতুর লক্ষণে সবিশেষ লক্ষিত হইয়াছে। ইহাকে "অচ্যুত ধ্রুব পদ" বলা হয়। ধর্ম্মপদে উহাকে "পরম সুখ" বলা হইয়াছে। ধ্রুব পদকে নির্ব্বাণের পদস্থান বলা যাইতে পারে। সম্যক্ দৃষ্টি আদি আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখোপশমগামিনী প্রতিপদ্। তন্মধ্যে চারি আর্য্য সত্যের সম্যক্ জ্ঞানই সম্যক্ দৃষ্টি।

সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্নের নির্ব্বাণ বিষয়ে চিত্তের অভিনিরোপণ (সংকল্প পূর্ব্বক সম্যক্ স্থাপন) সম্যক্ সংকল্প।

পূর্ব্বোক্ত বাগ্ দুশ্চরিত-বিরতি সম্যক্ বাক্। কায়দুশ্চরিত-বিরতি সম্যক্ কর্ম্মান্ত (কর্ম্ম)। মিথ্যাজীব-বিরতি বা নির্ব্বাণ সাধনের অনুকূল ভাবে জীবন যাপন করা সম্যগাজীব। † সম্যগ্বাগাদিসম্পন্নের যে কৌসীদ্য সমুচ্ছেদের জন্য বীর্য্য, তাহাই সম্যক্ ব্যায়াম। অভিধর্ম্মে ইহার এইরূপ লক্ষণ (প্রজ্ঞপ্তি বা পঞ্ঞত্তি) আছে। চৈতসিক বীর্য্যারম্ভ, নিষ্ক্রম, পরাক্রম, উদ্যম, ব্যায়াম, উৎসাহ, উস্সোল্হ (দৃঢ়োৎসাহ) নাম (স্থামন্); ধৃতি (সহিষ্ণুতা), অশিথিল পরাক্রমতা, অনিক্ষিপ্ত ছন্দতা (অভগ্নসংকল্প অনিক্ষিপ্ত ধুরতা (ভার সহিষ্ণুতা), ধুর সম্প্রগ্রাহ, বীর্য্য, বীর্য্যেন্দ্রিয়, বীর্য্য-বল।

বীর্য্যবান স্মৃতি সাধনের যোগ্য। অভিধর্ম্মের স্মৃতির এইরূপ লক্ষণ আছে। স্মৃতি—অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি (মনে আনা) স্মৃতিস্মরণতা (স্মৃতির স্মরণ), ধারণতা, অপিলাপনতা বা অপ্লবনতা (মনের ভেসে না বেড়ান—অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকা), অসম্মোষণতা (ভুলিয়া না যাওয়া) স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতি-বল।

দুঃখের হেতু পর্য্যন্ত প্রতিপাদন করেন, কেবল ফল মাত্রকে করেন না। আর অন্য তীর্থিকেরা কুক্কুরোক্তির মত উপদেশ করেন। তাহারা দুঃখনিরোধ ও তাহার উপদেশ করিতে যাইয়া কেবল দুঃখরূপ ফলের কথাই বলেন, দুঃখ হেতুর কথা বলেন না।

কিন্তু দুঃখের এই হেতুনির্দ্দেশ ও সমূলনাশ শুদ্ধ বৌদ্ধদের এক চেটীয়া নহে। সাংখ্যেও আছে, দুঃখের আদি হেতু অবিদ্যা, তাহার নাশে দুঃখের সমূলে নাশ হয়। বুদ্ধ ঘোষ সাংখ্যের বিষয় কিছু জানিতেন। অন্যত্র প্রকৃতি-পুরুষ বাদের উল্লেখ তাহার প্রমাণ। অতএব সম্প্রদায়াভিমানের ইহা এক নিদর্শন। অনেক বৌদ্ধও মনে করেন, আর কুত্রাপি আর্য্যসত্য ও নির্ব্বাণমার্গ নাই।

প্রতীত্য সমুৎপাদ অনুসারে তৃষ্ণার কারণ বেদনা, বেদনার কারণ স্পর্শ, স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন, তাহার কারণ নামরূপ, তাহার কারণ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার, সংস্কারের কারণ অবিদ্যা।

† শ্রদ্ধা, শীল, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও ধর্ম্ম বিনিশ্চয়রূপ যে উপায় ধর্ম্মপদে বর্ণিত আছে এবং যাহা যোগ মতের অনুরূপ, তাহাও এই মার্গের অন্তর্ভুক্ত। শ্রদ্ধার সহভাবী সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প। সম্যক্ বাক, কর্ম্মান্ত ও আজীব শীলের সহিত তুল্য। বৌদ্ধদের যে শীলস্কন্ধ আছে, তাহা বিস্তৃত বলিয়া উদ্ধৃত হইল না। বস্তুতঃ অহিংসা, সত্য, অচ্ছেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ করিলে এবং নির্ব্বাণবিরোধী কর্ম্ম ও বাক্য ত্যাগ করিলে, সমস্ত শীলই আচরিত হয়। বুদ্ধদেব 'শীলপরিপুরিয়া' সম্পন্ন ছিলেন, অর্থাৎ পরিপূর্ণ শীলের কোন অঙ্গেরই তাঁহাতে অভাব ছিল না।

স্মৃতিসাধন সমাধির মুখ্য উপায় বলিয়া সূত্রপিটকে ইহার সম্যক্ উপদেশ আছে। মহাস্মৃতি-প্রস্থান সূত্র ও স্মৃতিপ্রস্থান সূত্র দ্রষ্টব্য। উহা সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে।—

বোধি পক্ষীয় স্মৃতিপ্রস্থান চতুর্ব্বিধ—কায়ানুপশ্যনা, বেদনানুপশ্যনা, চিত্তানুপশ্যনা ও ধর্ম্মানুপশ্যনা।

অশুভ, দুঃখ অনিত্যবাদ ভাবনাপূর্ব্বক কায়াদিতে অনুপ্রবিভাবে সর্ব্বদা স্মরণ রাখাই স্মৃতিপ্রস্থান।

শরীর চাতুর্ভৌতিক, অশুচি, কেশ-অস্থি আদির সম্ভার, ইত্যাদি প্রকারে স্মরণ-প্রবাহ কায়ানুপশ্যনা স্মৃতি।†

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য।

† অশুভ ভাবনার দ্বারা কায়স্মৃতির আনুকূল্য (সপ্তায়) হয়। বিনীলক (নীলবর্ণ-শব), উদ্ধুমাতক (ফোলা শব), বিপূর্ব্বক (গলিতশব), বিচ্ছিদ্রক (মধ্যে দ্বিধা-জীর্ণ), বিখাদিতক) বক্‌খায়িতক শৃগালাদি ভক্ষিত), বিক্ষিপ্তক (টুকরা ২), হতবিক্ষিপ্ত (ছিঁড়িয়া ইতস্ততঃ ক্ষিপ্ত), লোহিতক (রক্তাক্ত), পুলবক (ক্রিমিযুক্ত), অস্থিক (অস্থিপঞ্জর), এই দশবিধ শবকে দেখিয়া তাহা ধ্যান পূর্ব্বক চিত্তে তদ্বিষয়ক ঘৃণা উত্তোলন করিতে হয় ও পরে নিজ শরীরেও সেই ভাব আনিতে হয়। সেই ভাব স্মৃতির অন্যতম বিষয়। ইহার নাম অশুভ ভাবনা। এইরূপ শবধ্যান হইতে বোধ হয় পরে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের দ্বারা শবসাধনা প্রথা প্রচলিত হয়।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি ?

এই বিশ্ব যে নিয়ম দ্বারা পরিচালিত, ইহার সমস্ত ব্যাপারে যে একটা সুশৃঙ্খলা বর্ত্তমান, একথা এ পর্য্যন্ত কেহ, এমন কি নাস্তিকেরাও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। নাস্তিকেরা বলেন যে, ঐ নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়ম, উহার মূলে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলিয়া কেহ নাই। অজ্ঞাতবাদীরা বলেন যে, প্রকৃতির নিয়ন্তা আছেন, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ মানব-বুদ্ধির অগম্য।

জ্ঞানের উৎকর্ষ অপকর্ষের সহিত জগতের সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কার্য্য হইতে কারণ-অনুমান যুক্তিসঙ্গত। এই বিশ্বের ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা কতকগুলি সত্যে উপনীত হই—যে সত্যগুলি দেশকাল দ্বারা বাধিত নহে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যাহাকে আমরা জড় বলি এবং যাহাকে আমরা শক্তি বলি, ইহারা কেহই ধ্বংসশীল নহে। ইহাদের রূপান্তর ভিন্ন আমরা কখনও ইহাদের ধ্বংস দেখি না। যাহা আছে, তাহার কোন দিন ধ্বংস নাই, এবং যাহা নাই, তাহা কখনও নাই। যাহা অস্ত নাই, তাহার আবির্ভাব আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি না, এবং যাহা অস্ত আছে, তাহার তিরোভাবও কখন দেখি না। "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ, নাভাবঃ বিদ্যতে সতঃ" গীতোক্ত এই সত্যটি বিজ্ঞানানুমোদিত। সুতরাং জড় এবং শক্তি, দুইই অনাদি এবং অনন্ত। তাহারা কখনও

সৃষ্ট হয় নাই, কখনও তাহাদের ধ্বংস নাই। আছে কেবল রূপান্তর মাত্র। জড় এবং শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। এই যে অট্টালিকার মধ্যে তুমি উপবিষ্ট আছ, তুমি মনে করিতেছ, সে তুমি উহার স্রষ্টা। কিন্তু উহার কোন্ দ্রব্যটি তুমি সৃষ্টি করিয়াছ? উহার কোনও উপকরণটি তুমি সৃষ্টি কর নাই, কেবল রূপান্তর মাত্র করিয়াছ। অগ্নি সংযোগে মৃত্তিকা দগ্ধ করিয়া ইষ্টক প্রস্তুত করিয়াছ, বৃক্ষাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া—দ্বার-বাতায়নাদি প্রস্তুত করিয়াছ। ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমার শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তা ঐ সমুদায় উপকরণে যুক্ত হইয়াছে। এই অট্টালিকার সমুদায় উপকরণই বর্ত্তমান ছিল, এবং কখনও ইহার কোন অংশেরই ধ্বংস হইবে না। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলেও, উহার কণামাত্রেরও অভাব হইবে না, হইবে কেবল উহা রূপান্তরিত মাত্র।

এই বিশ্বের অস্তিত্ব চিরকাল একই ভাবে আছে। আমরা যাহাকে অভাব বা ধ্বংস বলি, সে কেবল রূপান্তর মাত্র। ইহার একটি পরমাণুও সৃষ্ট হয় নাই, বা একটি পরমাণুও ধ্বংস হইবে না। অসৎ হইতে ভাবের অস্তিত্ব নাই, সতের কখনও অভাব নাই। এই বিশ্ব আছে, ইহা সৎ, ইহার ধ্বংস কখনও নাই। বিশ্বের সর্ব্বত্র আমরা একটি অনন্ত অবিরাম গতির বিদ্যমানতা দেখি; কুত্রাপি গতির অভাব দেখি না। অবিরাম গতির সহিত আমরা—অনন্ত রূপান্তরই দেখি। একটি বীজ পূর্ব্বাবস্থার রূপান্তর মাত্র; উহার জন্ম, উহার ধ্বংসও রূপান্তর মাত্র। রূপান্তর মৃত্যু নহে। জন্ম আমাদের জীবনের আরম্ভ নহে, কিম্বা মৃত্যু উহার অবসান নহে। বিশ্ব অনাদি, অনন্ত; উহার সৃষ্টিও নাই, লয়ও নাই। রবি সমুদ্রাদি হইতে রস গ্রহণ করিতেছেন; উহা বাষ্পে, বাষ্প মেঘে, মেঘ জলে, জল সমুদ্রাদিতে রূপান্তরিত হইতেছে। কেবল রূপান্তরের লীলা! কে কাহাকে সৃষ্টি করে, কে কাহাকে ধ্বংস করে? এই বিশ্বের বালুকণাও যদি আদ্যন্তবিহীন হয়, তবে কি কেবল মানবাত্মাই অমৃতত্ব হইতে বঞ্চিত? কখনও হইতে পারে না। যে নিয়ম দ্বারা তাবৎ বিশ্ব পরিচালিত, মানবাত্মা তাহার বহির্ভূত হইতে পারে না।

মনে কর—মানবাত্মার আদি আছে। মনে কর, একটি শিশুর জন্ম হইল, না একটি নূতন মানবাত্মা সৃষ্ট হইল। আমরা দেখি যে, প্রত্যেক মানবাত্মাই এক একটি বিশেষ ভাবাপন্ন। আমরা শৈশবাবস্থাতেই শিশুদিগের মধ্যে বল, সাহস, জ্ঞান, সৌন্দর্য্য, পরোপকার বৃত্তি প্রভৃতির অঙ্কুর দেখিতে পাই। এই সমুদায় আত্মা যদি সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে, তাহারা ঈশ্বরের অনুগৃহীত। কিন্তু ঈশ্বর ইহাদিগের প্রতি কেন অনুগ্রহ করিবেন, তাহার কি কোন কারণ আছে? অকারণ তাঁহার অনুগ্রহ কেন হইবে? অপর দিকে দেখিতে পাই, কতকগুলি আত্মা মূর্খতা, নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, কদাকার, ইত্যাদি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহারা যদি সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহারা কি ঈশ্বরের নিগৃহীত?

অকারণ ইহাদের প্রতি নিগ্রহের কারণ কি? ঈশ্বর মানবাত্মার স্রষ্টা হইলে, তিনি পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হন। যদি ঈশ্বর মানবাত্মার স্রষ্টা হন, তাহা হইলে মানবের দায়িত্ব কোথায়? পাপকারীরা বলিতে পারে, আমাদের অপরাধ কি? ভগবান্ আমাদিগকে যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহাই হইয়াছি। ঈশ্বর মানবাত্মার স্রষ্টা হইলে, তিনি মিথ্যাবাদী, পরদারাভিমর্ষণকারী, চোর, দস্যু প্রভৃতিদের স্রষ্টা, সুতরাং মূলতঃ তাহাদের কুকার্য্যে প্রয়োগকর্ত্তা বা নিয়ন্তা হইয়া পড়েন। মানবাত্মা স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের ফল যদি ভোগ না করে, কেবল ঈশ্বরেচ্ছায় যদি পাপকারী বা পুণ্যকারী হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে যথেচ্ছাচারী বলিতে হয়।

বহুবিধ জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকেও অনুগ্রহ করিতেছেন, কাহাকেও নিগ্রহ করিতেছেন, কাহাকে বিজয়ী করিতেছেন, কাহাকেও পরাজিত করিতেছেন, ইত্যাদি ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। 'আদম' কি অপরাধ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য নাকি প্রত্যেক মানবাত্মা দায়ী, এবং তজ্জন্য যিশুখৃষ্ট আত্মবলিদান দিলেন এবং তাঁহাকে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মোক্ষ হইবে। এইরূপ সমুদায় শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিলে, ঈশ্বর একের অপরাধে অপরকে দায়ী করেন, এবং একের পুণ্যে অপরের পাপ মাপ করেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভ বিশ্বাস করিলে, ঈশ্বর সৃষ্টির অগ্রে কি করিতেছিলেন? কেহ বলেন যে, ঈশ্বর কেবল মঙ্গলময়, আর অমঙ্গলের বিধাতা সয়তান। সয়তান এবং ঈশ্বরে আবহমান কাল বিবাদ চলিয়া আসিতেছে তাহা হইলে বস্তুতঃ দুইটি ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ায়। তাহা হইলে, ভাল-মন্দের জন্য কোন মানবাত্মারই দায়িত্ব থাকে না। যাহা ভাল, তাহা ঈশ্বরের; যাহা মন্দ, তাহা সয়তানের। প্রত্যেক মানবাত্মাকে মঙ্গলের ঈশ্বর ও অমঙ্গলের ঈশ্বরের দ্বারা গঠিত, স্বীকার করিতে হয়।

ফলকথা এই, বিশ্বের প্রশাসনে এক অসীমাত্মা ভূমার হস্ত ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" মানবাত্মা তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় এবং সনাতন নিয়মানুসারে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে।

"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি—সাধুকারী সাধুর্ভবতি—পাপকারী পাপো ভবতি—পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।"

(বৃহদারণ্যক শ্রুতি।—৪।৪ ৫)

প্রত্যেক মানবাত্মাই প্রত্যেক পরমাণুর ন্যায় নিত্য, উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। প্রত্যেক মানবাত্মাই স্বীয় স্বীয় চরিত্রের নিয়ন্তা। তুমি রোগী, অপরাধ তোমার। সুস্থ থাকিবার যে নিয়ম, তাহা তুমি পালন কর নাই, তজ্জন্য তুমি দায়ী। তুমি মূর্খ, তুমি জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা কর নাই, তাই তুমি মূর্খ। তুমি পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কার্য্য করিয়াছ, তাহার ফল-সমষ্টিতে কতকগুলি গুণবিশিষ্ট হইয়া নব জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং ইহজন্মে প্রত্যহ তোমার পূর্ব্ব কার্য্যানুসারে ফল পাইয়া থাক, এবং দেহাবসানেও পাইবে। আত্মহত্যা করিলেই যে মর্শে করিলে

তোমার নিস্তার আছে, তাহা নহে। মৃত্যু তোমার মৃত্যু সংঘটন করিতে পারে না। তুমি অনাদি ও অনন্ত।

মানবজীবন একটি সমর-ক্ষেত্র; তাই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সমরক্ষেত্রেই—মানব-জীবনের জন্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সমরক্ষেত্রে—সাধু এবং নির্ভীকের জয়,এবং অসাধু ও ভীতের পরাজয়। তুমি নীচমনা হও, মনে জানিও, তুমি নিজেই—তোমার জন্য এই নীচাবাস প্রস্তত করিয়াছ; তুমি যদি উচ্চমনা হও, মনে করিও, তুমি নিজেই তোমার জন্য এই মহদাবাস প্রস্তত করিয়াছ।

জগতে অমঙ্গল কেন? জগতে অমঙ্গল না থাকিলে, মঙ্গল কোথা থাকিত? ব্যাধি না থাকিলে, স্বাস্থ্যের উপলব্ধি কোথায়? অজ্ঞান না থাকিলে, জ্ঞান কোথায়? যে সাহস, বল, বীর্য্য, পরোপকার, স্বার্থত্যাগ জগতে সময়ে প্রশংসিত হইয়া থাকে, উহাদের দ্বন্দ্ব না থাকিলে, উহাদের অস্তিত্ব কোথায় থাকিত? দুঃখ না থাকিলে, দয়ার স্থান কোথায়? অত্যাচার না থাকিলে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়ের দণ্ডায়মান হইবার সুযোগ কোথায়? দরিদ্রতা না থাকিলে, ধনোপার্জ্জনের প্রবৃত্তি কোথায়? আবার দেখ, অন্ধকারের নিজের অস্তিত্ব নাই, উহা আলোকের অভাব মাত্র। অভাব কিছু সৎ নহে। আলোক না থাকিলে অন্ধকার, কিন্তু অন্ধকার না থাকিলে, কাহারও আলোকের জন্য প্রবৃত্তি হইত না। আলোক হইল, অন্ধকার আর নাই। অতএব আলোকের প্রতি প্রবৃত্তি চাই; কেননা, আলোকের অভাবে অন্ধকার আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে। পুণ্যের প্রতি প্রবৃত্তি চাই, কেননা পুণ্যের অভাবে পাপ আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে। অন্ধকার বলিয়া স্বতন্ত্র একটা জিনিষ নাই; আমরা প্রদীপ জ্বালিয়া আলোক আনার ন্যায় অন্ধকার আনিতে পারি না। আলোক না থাকিলেই অন্ধকার হইল। মানবাত্মাকে গতির দিকে আকৃষ্ট রাখিতেই—অগতি। ভাবের দিকে আকৃষ্ট রাখিতেই—অভাব।

দরিদ্রতা বলিয়া কোন ভাব-পদার্থ নাই, উহা ঐশ্বর্য্যের অভাব। ঐ অভাব না থাকিলে, ঐশ্বর্য্যের উপলব্ধি হইত না।

আমরা কি পরের দোষে কষ্ট পাই না? তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি প্রবঞ্চনা করিয়া আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিলে; শিশু অগ্নিতে হাত দিল, হাত পুড়িয়া গেল। অমৃত জ্ঞানে যাহা খাইলাম, তাহা বিষ হইয়া আমাকে জর্জ্জরিত করিল। কুষ্ঠরোগীর সেবায় আমি কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইলাম। এ কি বিধান? আগুনে পুড়িবেই পুড়িবে। ঈশ্বর অগ্নির দাহিকা শক্তি ধ্বংস করিয়া কার্য্য-কারণের বিচ্ছেদ ঘটাইলে, জগতে জ্ঞান, সতর্কতাদির দিকে কাহার লক্ষ্য হইত? অজ্ঞ শিশু আগুনে পড়িলে পোড়ে না, জানিলে, কয়জন মাতা শিশুর অগ্নি-সংস্পর্শ সম্বন্ধে সতর্ক হইতেন? কিন্তু একজন শিশুর অনিষ্ট হইতেই সমস্ত পল্লী সাবধান হইয়া গেল। নিয়ম যাহা, তাহা চিরকালই থাকিবে, তাহার বিপর্য্যয় হইতে পারে না। তোমার আমার কর্ত্তব্য, সেই নিয়মগুলি অবগত হওয়া এবং

তদনুসারে কার্য্য করা। কুষ্ঠরোগীর সেবায় যে সাধুর কুষ্ঠ রোগ হইল, তাহার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু ঐ সাধু স্বয়ং তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখিত নহেন। তিনি জানেন যে, তাঁহার শরীর কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত, কিন্তু তাঁহার হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল। আর যদি তিনি তাহাতে দুঃখিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, কতকগুলি রোগ-বীজ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, এবং তদনুসারে তাঁহার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তাঁহার রোগ তাঁহার অজ্ঞান বা অসাবধানতার ফল মাত্র। অজ্ঞানের ফল কেহ ভোগ করিবে না, বিধাতার এই নিয়ম হইলে, জ্ঞানার্জ্জনের প্রবৃত্তি কোথায় থাকিত? সুতরাং যাহাকে আমরা অমঙ্গল বলি, সে এক হিসাবে আমাদের মঙ্গলের জন্য। মঙ্গলের মঙ্গলত্ব ও বৃদ্ধি হেতুই অমঙ্গল। বিপদ মঙ্গল-জনক, কেন না, উহাতে আমাদের সাহসের বৃদ্ধি হয়; সতর্কতার শিক্ষা হয়। দরিদ্রতা মঙ্গলজনক, কেন না উহা আমাদিগের আলস্য পরিত্যাগ করায়। অমঙ্গল আমাদের ঔষধ। ঔষধ খেতে হয়ত নিতান্ত কটু-তিক্ত এবং দুর্গন্ধময়, কিন্তু উহাতে স্বাস্থ্য আনয়ন করে। অমঙ্গলও তদ্রূপ আমাদিগকে মঙ্গল আনয়ন করিয়া দেয়। বিশ্বের সনাতন নিয়মানুসারে যে কার্য্যের ফল যাহা, তাহা হইবেই। অজ্ঞানের ফল ভোগ করিয়া আমরা জ্ঞান অর্জ্জন করি। আগুনে পুড়িয়াই আমরা আগুন হইতে অব্যাহতি পাই।

এই বিশ্বে খামখেয়ালি ভাবে কিছুই রহে না। অমুক ভাগ্যবান, অমুক হতভাগ্য, আমরা এইরূপ অনেক কথা শুনি। কিন্তু মানবের ভাগ্য মানবের আয়ত্তাধীন। প্রত্যেকেই কার্য্যানুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে, এবং কাহারও কোনও অবস্থায় হতাশ বা বিষণ্ণ হইবার ন্যায্য কারণ নাই। অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য কর্ম্মফল-ভোগে দুঃখিত হওয়াই বরং দুঃখের বিষয়।

প্রত্যেক মানবই অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত জীবনে অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। তিনি কখনও ধনী, কখনও দরিদ্র, কখনও রাজা, কখনও প্রজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। কখনও জলমগ্ন, কখনও অগ্নি দগ্ধ, কখনও ব্যাধি গ্রস্ত, কখনও কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন। তিনি শৈশবে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে এবং বার্দ্ধক্যে মরিয়াছেন; হিংসা-বিশ্বাসঘাতকাদি দ্বারাও তিনি লাঞ্ছিত হইয়াছেন; বজ্রপাত, জলপ্লাবন, ভূমিকম্পের হস্ত হইতেও ত্রাণ পান নাই। তিনি কোনও জীবনে অসভ্য সমাজে, কোন জীবনে সুসভ্য সমাজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শীতপ্রধান বা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ প্রভৃতি অনেক দেশই তিনি দেখিয়াছেন। অরণ্য এবং জনাকীর্ণ নগর, উভয়ই তাঁহার আবাসস্থান হইয়াছে। তিনি ক্রীতদাস এবং দাসাধিপতি, দুইই হইয়াছেন। তিনি গৃহীও বটে, সন্ন্যাসীও বটে। পাপী-পুণ্যবান্, সুখী-দুঃখী, জেতা-জিত, হত-হন্তা, জ্ঞানী-অজ্ঞানী ইত্যাদি সকলই হইয়াছেন। জন্মজন্মান্তরে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান অধিকার করিয়াছেন।

যাহাকে আমরা দুঃখ বলি, তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই। উহা অনন্ত

জীবনের সহস্র সহস্র অবস্থার মধ্যে অবস্থান্তর মাত্র। দুঃখ অনেক সময় সুখ হইতে কি ভাল নয়? পরোপকারে যে দুঃখ হয়, সে কি পরোপকারলব্ধ সুখ হইতে ভাল নয়? দুঃখে মানুষ বলীয়ান্ হয়, তাহার হৃদয় প্রশস্ত হয়, কিন্তু সুখে মানুষকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, হৃদয় সঙ্কুচিত করে। দুঃখে মানুষকে শ্রমশীল করে, কর্ম্মঠ করে, পরের দুঃখ মোচনের প্রবৃত্তি জন্মায়; সুখ মানুষকে অলস এবং স্বার্থপর করে। রাজার ঘরের ছেলে হওয়ার চেয়ে, দরিদ্রের শিশু সহস্র গুণে কি ভাগ্যবান্ নহে?

এই বিশ্বের এই নিয়ম যে, তোমাকে সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন, আপদ বিপদের মধ্য দিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এমন কোন্ বীর আছে যে, তিনি রণক্ষেত্রে বিপদের কামনা না করেন? বিপদ না থাকিলে, বীরত্বের পরিচয়ের সম্ভাবনা কোথায়? মানবজীবনও তদ্রূপ। দুঃখ-ক্লেশ, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, শীত গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আধি ব্যাধি, রোগ-শোক, মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদি দ্বারা তিনি পরীক্ষিত হইয়া—অগ্নি-দগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ হইয়া থাকেন। মানুষ, মানুষ হইতে গেলে, সহস্র সহস্র বিপদ অতিক্রম করিতে হয়। আজ যে তোমার প্রভু তোমাকে বিনা অপরাধে-বেত্রাঘাত করিয়াছে, উহার কারণ কি তাহা জান? উহার কারণ যে, তুমি কখনও কাহারও প্রতি এইরূপ নৃশংস ব্যবহার করিবে না। ইহা তোমার শিক্ষারই জন্য।

মানবজীবনের দুঃখ দূরীভূত করিবার দুইটি উপায় দৃষ্ট হয়। উহার একটি উপায় হচ্ছে দুঃখকে অনঙ্গীকার করা, আর একটি হচ্ছে দুঃখকে জয় করা। ইহা বুঝিতে গেলে, আমাদের সর্ব্বপ্রথমে ইহা বুঝা চাই যে, মানুষও যেরূপ আত্মস্বত্ববিহীন, বিশ্বের তাবৎ পদার্থও ঐরূপ। পশু পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, প্রত্যেক সজীব পদার্থের আত্মা আছে। একটি কীটের আত্মা আমার আত্মা হইতে যৎটুকু নিম্ন, আমার আত্মাও মহাপুরুষদিগের আত্মা হইতে তত নিম্ন। যত নিম্ন দিকে চাই, ততই আমরা দেখিতে পাই দুঃখ কম। একটি পশুর ভালমন্দ বিচার নাই; শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাজ্যশাসন, মান, অপমান ইত্যাদি লইয়া তাহাদের কোন আন্দোলন নাই। তাহার পাপ পুণ্যের কোন জ্ঞান নাই, ভবিষ্যতের জন্য তাহার কোন চিন্তা নাই। আহার-বিহার এই দুইটি জিনিস লইয়া তাহাদের সমস্ত জীবন। পশ্বাদির নিম্নের জীবনে দুঃখ আরও কম। বৃক্ষলতাদির জীবন অনন্ত শান্তিময় বলা যাইতে পারে। তাহাদের কিছু করিতে হয় না, কোন ভাবনাও নাই, বৃক্ষাদির ন্যায় তুমিও বাহ্য শান্তি লাভ করিতে পার, বাহ্য দুঃখ অনঙ্গীকার করিতে পার, কিন্তু তাহা হইলে তোমার নিম্নে যাইতে হইবে। এতদূর নিম্নে যাইতে অনেক জীবন লাগে, কিন্তু যাওয়া যায়। আমরা প্রত্যহ মনুষ্য-দেহে পশ্বাদির আত্মা প্রত্যক্ষ করি। জন্ম-জন্মান্তরে ঐরূপ ভাবে অবরোহণ করিতে করিতে আমাদের আত্মা পশ্বাদির দেহ অবলম্বন করে। নিম্নগামী আত্মার পুনর্ব্বার উর্দ্ধগামী হইবার অনেক সুযোগ প্রাপ্ত

হয়, প্রত্যেক পদস্খলনে সে বুঝিতে পারে যে, নিম্নে যাইতেছে। সে বুঝিতে পারে যে, তাহার ধর্ম্মের দিকে প্রবৃত্তি কম হইয়া অধর্ম্মের দিকে প্রবৃত্তি অধিক হইতেছে। ইহা বুঝিয়াও যদি সে নিম্ন দিকেই ধাবমান হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর কে উদ্ধার করে? তুমি সুখ চাও, ঐ যে হৃষ্ট পুষ্ট ষণ্ডটি দেখিতেছ, ও দেখ দেখি কেমন সুখী! ঐ যে সুন্দরী ললনার ক্রোড়ে সারমেয় দেখিতেছ, দেখ দেখি ও কেমন সুখী! ঐরূপ দেহ অবলম্বন করিয়া কি তুমি সুখী হইতে চাও? তুমি যদি কেবল ঐরূপ সুখই চাও, তাহা হইলে তোমার পশু-জীবন কামনা করিয়া পশুচিত কার্য্য করিতে হয়। খল সর্পের ন্যায় ক্রূর হইলে, তুমি সর্পজীবন লাভ করিতে পার। একেবারে নিষ্ক্রিয় হইতে ইচ্ছা করিলে, ফল-ফুল-সুশোভিত তরু-লতায় রূপান্তরিত হইতে পার। সুতরাং দুঃখ অঙ্গীকার ইচ্ছা না থাকিলে, তোমার নিম্ন দিকে যাইতে হইবে। যে যত বড়, তাহার তত অধিক দুঃখ। মানবাত্মা সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহার দুঃখও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বড় হইতে হইলে, দুঃখকে জয় করিতে হইবে। তুমি যদি মৃত্যুকে ভয় না কর, তাহা হইলে তুমি উহাকে জয় করিয়াছ। মৃত্যু কি? মৃত্যু পরিবর্ত্তন ব্যতীত কিছুই নহে, এবং ঐ পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। ভয় করিলেও উহার হস্ত হইতে ত্রাণ নাই, এই জ্ঞান জন্মিলেই আর মৃত্যুর ভয় থাকে না। মৃত্যুতে অমঙ্গল কোথায়? মৃত্যুর ভয়ই মৃত্যুতে এক মাত্র অমঙ্গল। আমরা প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল হই, কিন্তু আমরা যদি জানি যে, মৃত্যু মৃত্যু নহে, তাহা হইলে আর আমরা দুঃখে অভিভূত হইনা। যাহাতে দুঃখ না আসে, তাহা করা যাইতে পারে; আসিলে, উহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে। যে স্থলে প্রতিবিধান করা না যায়, সে স্থলে উহা অনিবার্য্য, এই জ্ঞানে বীরের ন্যায় উহা সহ্য করা যাইতে পারে, এবং ইহাও নিশ্চয় যে, উহার অবসানও অনিবার্য্য। মানবজীবনের বীরত্বে অধিকারী হইবার জন্য সেকন্দর সাহ বা নেপোলিয়ান্ হইবার প্রয়োজন নাই; প্রত্যেক মানবই তাহার কুটীরে বসিয়া বীরত্বের অধিকারী হইতে পারে।

মানুষ যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। যে যেরূপ হইতে চায়, সে সেইরূপ হইতে পারে। "যাদৃশী কামনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" তুমি একেবারে জড়ের ন্যায় শান্তি চাও, উহা পাইতে পার; কিন্তু তোমার নিম্নের দিকে যাইতে হইবে। আবার তুমি ঊর্দ্ধগামী হইতে চাহিলে, নিশ্চয়ই উঠিতে পারিবে। নিম্ন দিকে যেরূপ সীমা নাই, অর্থাৎ যেরূপ অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিম্ন দিকে যাইতে পার, তদ্রূপ ঊর্দ্ধ-দিকেরও সীমা নাই; অনন্তকাল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে পার। নিম্ন দিকে যাওয়া সহজ, হাত-পা ছাড়িয়াদিলেই নিম্নে যাওয়া যায়। ঊর্দ্ধদিকে যাওয়া সহজ নহে। "দুর্গম-পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" যে সমুদায় তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, ঐ পথ বড়ই দুর্গম। "পথ দুর্গম

বটে, কিন্তু যত উঠ, ততই আনন্দ। "কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে"? অতএব "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" অসীম বিশ্বের মাঝে—মনে হয়, মানব একটি ক্ষুদ্র জীব; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মানবের শক্তি অসীম। তুমি যতই দরিদ্র হওনা কেন, ইচ্ছা করিলে তুমি পূর্ণ মনুষ্যত্ব অধিকার করিতে পার। এমন কোন ঐশ্বর্য্য নাই, যাহা তোমার আয়ত্তাধীন হইতে পারে না। এই বিশ্ব তোমার জন্য, তুমি ইহার স্বত্বাধিকারী, ইহাই তোমার সিংহাসন; তুমি ইহার রাজা। এই বিশ্বে এমন কোন্ রহস্য আছে, যাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য? এমন কোন্ বাধা আছে, যাহা মানব পরাজয় করিতে অক্ষম? হে মানব! তুমি এই বিশ্বে অজেয়।

ঐ যে বড় বড় নদী, সরোবর, সমুদ্র, পর্ব্বত, প্রান্তর, বন দেখিতেছ, উহাদের কি কোন শক্তি আছে? উহারা মানবের পদতলে লুণ্ঠিত রহিয়াছে। মানব উহাদের জেতা। মানব বুদ্ধি-বলে, আকাশের তারার—কেবল গণনা নয়, তাহাদের আকার-প্রকার গতি আদি পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারে। ঐ যে অনাবৃত কৃষক-বালক রাস্তায় ধূলায় খেলা করিয়াছে, ও জড় হিমালয় অপেক্ষাও বড়।

আপনাকে নগণ্য জ্ঞান করিয়া, মানবের ম্রিয়মাণ হইবার যুক্তি কোথায়? কাশী বা রোম, বেবিলন্ বা কার্থেজ্ ত সেদিনকার, মানবের শক্তি-সম্ভূত; কিন্তু মানবত অনন্তকালের। বেদ বল, বাইবেল বল, কোরাণ বল, তাহারা ত মানবের শক্তিরই পরিচয় দেয়। মানবাত্মার উন্নতি-অবনতি মানবাত্মারই কর্ত্তৃত্বাধীন। তাঁহার ভাগ্য তাঁহার নিজেরই হস্তে। তিনি নিজেই তাঁহার প্রভু। তিনি স্বরাট্। উন্নতমনার রাজ্য দিগন্ত-বিস্তৃত। যত দূর চিন্তা ও প্রেম পৌঁছিতে পারে, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য। নীচমনার রাজ্য অতি ক্ষুদ্র, সার্দ্ধ তিন হস্ত দেহের বাহিরে আর তাঁহার কোন রাজত্ব নাই। কিন্তু ইচ্ছা করিলে, তিনি তাঁহার অধিকার বিস্তৃত করিতে পারেন। যদি তিনি রাজ্যচ্যুত হয়েন, সে তাঁহারই দোষে। জগতে আত্মা ভিন্ন আত্মার শত্রু নাই। "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"। তুমি একে ওকে শত্রু মনে কর কেন? তুমি নিজেই তোমার শত্রু। তোমার আর কোনও শত্রু নাই। চোর তোমার দ্রব্য চুরি করিল, তুমি মনে করিলে, তুমি হারিলে, চোর জিতিল; বস্তুতঃ তাহা নহে। চোর তদ্দ্বারা তাহার নিজের যাহা চুরি করিল, তাহা টাকায় পাওয়া যায় না। অর্থ আজ আছে, কাল নাই; কিন্তু চোরের আত্মার যে সদ্গুণ অপহৃত হইল, তাহা প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। প্রভুর নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতে তোমার শরীর জর্জ্জরিত, কিন্তু তোমার শরীরের বেদনা ক্ষণস্থায়ী; প্রভুর যে আত্মা ক্ষত বিক্ষত হইল, উহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে অনেক দিন লাগিবে। তোমার একমাত্র শত্রু অজ্ঞান—অবিদ্যা। জ্ঞানই তোমার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই। যে জ্ঞানে মৃত্যুর মৃত্যুত্ব থাকে না, ভয়ের ভয়ত্ব থাকে না, সেই জ্ঞান তোমার অধিকার করা চাই। যদি মনে কর যে, খৃষ্ট, বুদ্ধ

প্রকৃতি তোমাকে ত্রাণ দিবেন, সে তোমার ভ্রম। তুমি নিজেই তোমার ত্রাণকর্ত্তা; আর কেহ তোমাকে ত্রাণ দিতে পারে না। "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" ইহা নিশ্চয় জানিও যে, তোমার রাজ্য তোমার অভ্যন্তরে, তোমার বাহিরে নহে। অভ্যন্তরের রাজ্য রক্ষার জন্য গোরা পল্টন্ চাই না; শত্রুতা—বিশ্বাসঘাতকতার কোন ভয় নাই। তোমার চিরকাল যুদ্ধ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তোমার শত্রু সব ভিতরে; বাহিরে তোমার কোন শত্রু নাই। তুমিই তোমার স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। তুমিই স্বর্গ সৃষ্টিকর, তুমিই নরক সৃষ্টিকর। স্বর্গ-নরক কবি-কল্পনা নয়, উহারা তোমার ভিতরে, উহারা তোমার সৃষ্ট। তুমি ইচ্ছা করিলে, চিরকাল সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ রাখিতে পার! আবার ইচ্ছা করিলে, প্রাত্যহিক নরকভোগও সম্ভাবিত। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখ যে তোমার ভিতর নরক কতটুকু স্থান বা স্বর্গ কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্বর্গের সীমা বৃদ্ধি কর; নরক ক্রমে ছোট হইয়া যাইবে। তোমার পাপের ফলই তোমার নরক, তোমার পুণ্যের ফলই তোমার স্বর্গ। নাস্তিক বলে, পিতা-মাতার শরীর লইয়া সন্তানের জন্ম; তাঁহাদের প্রকৃতিই তাহার প্রকৃতি; কিন্তু যাহাকে আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া বলি, উহাই যদি আত্মার প্রথম জন্ম হইত, তবে সে কথা খাটিত। তোমার পাপ-পুণ্যের জন্য তোমার পিতা-মাতা দায়ী হইলেন, তাঁহাদের পিতা-মাতা সুতরাং তাঁহাদের পাপ-পুণ্যের জন্য দায়ী। এইরূপে কোন আত্মারই নিজের দায়িত্ব থাকিল না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মা অজ এবং প্রত্যেক আত্মা যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, আত্মা অন্য সমগুণাক্রান্ত আত্মা দ্বারা আকৃষ্ট হয়। যে চোর, আজীবন চৌর্য্যে যাহার আসক্তি, দেহাবসান হইলে, তাহার আত্মার চৌর্য্যাসক্তি হেতু ঐ চোর-সামীপ্যেচ্ছাই বলবতী হওয়ায়, আত্মা চোর-গৃহেই জন্ম গ্রহণ করিবে। কিন্তু তৎপরে প্রতিপদে তাহার চৌর্য্য পরিত্যাগের উপায় উপস্থিত হয়; অথচ তাহা সত্বেও যদি সে চৌর্য্য ব্যাপারে নিরত থাকে, তাহা হইলে সে নিম্ন দিকেই যাইবে এবং ক্রমে হয়ত দস্যুগৃহে জন্ম গ্রহণ করিবে। সাধুর ঘরে সাধারণতঃ সাধুই জন্ম গ্রহণ করে, অসাধুর ঘরেই অসাধু। কিন্তু অসাধুও ইহজীবনে পুনর্ব্বার সাধুত্ব লাভ করিতে পারে; একটি সাধুও কর্ম্ম-দোষে অসাধু হইতে পারে।

এই আত্মা শরীরাতিরিক্ত পদার্থ। শরীর ইহার বাসস্থান মাত্র। আত্মা তাহার নিজ গুণোপযোগী শরীর গ্রহণ করে। কিন্তু এ বিষয়টা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা এই বিশ্বে সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তন দেখি। কিন্তু সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনই একটি অনন্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত। এখন দিন আছে, একটু পরেই রাত্রি হইল; এখন জাগ্রত আছি, একটু পরেই নিদ্রিত হইব; এখন শীত, কিছু দিন পরেই গ্রীষ্ম আসিবে। এখন বেঁচে আছি, দুই দিন পরেই মরিব।

আর, দেখ, শ্রমের পরেই বিশ্রাম; দুঃখের পরই সুখ; যুদ্ধের পরই শান্তি। আবার দেখ, ঐ যে শুয়ো পোকা বা গুটি পোকা মাটিতে বেড়াইতেছে, উহাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক্, উহা দেখিলেই তোমার মনে হয়ত একটা ঘৃণার ভাব আসে; কিন্তু ঐ পোকা কোন বৃক্ষ আশ্রয় করিল, উহার শরীরের পরিত্যক্ত নির্য্যাস দ্বারা নিজেকে রুদ্ধ করিল, কিছু দিন পরে একটি সুন্দর প্রজাপতি হইয়া বাহির হইল! তখন তুমি হয়ত উহাকে ধরিবার জন্য লালায়িত! শিশুরা প্রজাপতির সৌন্দর্য্য দেখিয়াই উহাকে ধরিতে ধাবিত হয়। প্রজাপতি পূর্ব্বজন্মে গুটিপোকা ছিল, গুটি পোকাই পরজন্মে প্রজাপতি হইল। যে কখনও গুটি পোকা দেখে নাই, যে তাহাকে ক্রমশঃ স্বশরীরের নির্য্যাস দ্বারা গুটি প্রস্তুত করিতে দেখে নাই, এবং তৎপরে ঐ গুটি হইতে প্রজাপতি হইয়া বাহির হইতেও দেখে নাই, তাহাকে প্রজাপতি এবং গুটিপোকা যে এক, তাহা বিশ্বাস করান কঠিন। কিন্তু এই ব্যাপারটি দেখিতে দেখিতে অনেকে এই রূপান্তরের বিষয় অবগত আছেন। প্রজাপতির ভিতরেও যে আত্মা, ঐ পোকার ভিতরেও সেই আত্মা। একই আত্মার দুইরূপ দেহ অবলম্বন করা— প্রত্যক্ষ করা গেল।

শরীর আত্মার আশ্রয়স্থান; কিন্তু শরীরের মধ্য দিয়াই আত্মার গুণ ফুটিয়া বাহির হয়। তোমার শরীরটি বেশ, তুমি দেখিতে বেশ সুন্দর; কিন্তু তুমি যদি 'বদমাএস্' হও, তোমার ঐ সুন্দর চেহারার মধ্যদিয়াও তোমার 'বদমায়েসি' ফুটিয়া বাহির হইবে। তুমি কদাকার, কিন্তু তুমি যদি পুণ্যবান হও; তোমার আত্মার জ্যোতিঃ তোমার কদাকার দেহকেও জ্যোতিষ্মান্ করিবে। আমরা সুন্দর দেহের মধ্যে এই সংসারে মিথ্যা কপটতা প্রভৃতি লুক্কায়িত রাখিয়া—অজ্ঞ লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাই। কিন্তু মৃত্যু অন্তে— আমাদের দেহাবসানের পরে, আমাদের আত্মা ঢাকার কোন আবরণ থাকে না। আবরণটা পড়িয়া গেলে, তখন প্রত্যেক আত্মাই তাঁহার স্বীয় স্বীয় রূপে দৃষ্ট হন। শরীররূপ আবরণ চলিয়া গেলে, দেখা যায় যে, কোন মানবাত্মা হয়ত ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়াছে! এই আত্মা পূর্ব্বজন্মে ব্যাঘ্রের ন্যায়ই কার্য্য করিতে করিতে সে ব্যাঘ্রাত্মা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু মানবদেহে থাকার জন্যই সে মনুষ্য-সমাজে বাস করিতে পারিত। মানবদেহাবসান হইলে, সে দেখিল যে, সে ব্যাঘ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঘ্রাত্মা মানুষের ঘরে জন্ম লইয়া কি সুখ পাবে? সে তাহার সমজাতীয় আত্মার সান্নিধ্য চায় এবং সুতরাং ব্যাঘ্রী প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই তাহাকে সুন্দরবনে ব্যাঘ্র পিতা-মাতার জন্ম গ্রহণ করিতে হইল। কেহ যেন মনে না করেন যে, এ কেবল কল্পনা। প্রত্যেকেই যেন নিজে নিজে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখেন—তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের আত্মা হয় উর্দ্ধগামী—না হয় নিম্নগামী হইতেছে। এখনই যদি তোমার শরীর রূপ আবরণ ফেলিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তোমার ভিতরের জিনিষ সব বাহির হইয়া পড়িবে। শরীরটাকে আত্মার

মুখস্ বলা যাইতে পারে। মুখস্ পরিয়া সাহেব বিবিরা নাচে, সে সময় কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে না ; মুখস খুলে ফেলিলে বড়ই লজ্জা হয়। 'অমুক ব্যক্তি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাহার কাছে এই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছি!' আমরা এখন সব মুখোস পরে আছি, কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছিনা। কোন কোন সময়ে হয়ত মুখসের ভিতর দিয়া মানুষটাকে 'চেন চেন' করিতেছি, কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। মুখোস পরে অনেক কুৎসিত বিবি সুন্দরী সেজেছেন। অনেক যথার্থ সুন্দরী হয়ত কদাকার মুখোস পরে কুৎসিত দেখাইতেছেন ; আমরাও তদ্রূপ—দেহরূপ মুখস বা খোলস্ দ্বারা আমাদের স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিয়াছি। যতক্ষণ মুখোস থাকে, ততক্ষণ প্রতারণা করা যায়, মুখোস পড়ে গেলে, স্বরূপ বাহির হইয়া পড়ে ; তখন আর কেহ কাহাকেও প্রতারণা করিতে পারে না।

মৃত্যুই আত্মার মুখোস খসাইয়া দেয়। যেই মুখোস পড়ে গেল, তখনই কে ভাল, কে মন্দ, ধরা পড়ে গেল। এখানে হয়ত যাহার বিকলাঙ্গ দেখিয়া তাহা হইতে দূরে যাইতেছি, সেখানে তাহার বিকলাঙ্গ-মুখোস পড়িয়া গিয়াছে, দেখি যে—উহার স্থলে লাবণ্যময়—জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি! এখানে হয়ত যাহাকে অসাধু বলিয়া চিরকাল নিন্দা করিয়া আসিয়াছি, হয়ত দেখিব—তিনিই যথার্থ সাধু। আবার হয়ত যে ভণ্ডকে সাধু বলিয়া সম্মান করিয়া আসিয়াছি, নানাবিধ পাপে তাহার আত্মা কলঙ্কিত ; ঢাকিবার যো নাই ; খোলস্ পড়িয়া গিয়াছে! এখানে যে অপরাধী বলিয়া হয়ত কারাগারে গেল, সেখানে গিয়া দেখিব সে নির্দ্দোষী—এবং যথার্থ দোষী তাহার নিজ অপরাধের কলঙ্ক দ্বারা ঘোষণা করিতেছে, 'উনি নির্দ্দোষী, আমিই দোষী।' এখানে আমরা মনের পাপ ঢেকে রাখি। মনে মনে কত স্ত্রীর সতীত্ব হরণ করি, কত লোকের ধন অপহরণ করি, কত লোক হত্যা করি, এসব কেহ জানিতে পারে না ; কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যের ন্যায় আমাদের প্রত্যেক চিন্তার দ্বারাও আত্মা উন্নত বা অবনত হয়। কেহ যেন মনে না করেন যে, অন্তরে বা বাহিরে কোন প্রকার অন্যায় করিয়া কেহ সারিয়া যাইতে পারিবেন। দেহাবসানেই আমাদের যথাযথ পরীক্ষা হইয়া আবার তদনুযায়ী নূতন দেহ ধারণ করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

"কর্ম্মকার-বৈশ্যতত্ত্ব"।—বঙ্গীয় 'কর্ম্মকার' জাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক পুস্তক। "বঙ্গভূমি" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীহরষিত লাল রায়-প্রণীত। শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা। শ্রীমান হরষিত লাল আমাদের স্নেহাস্পদ যুবক, বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী সেবক ও সুলেখক। ইনি যেরূপ দক্ষতা সহকারে শাস্ত্র যুক্তি-সমাযুক্ত বিংশতি প্রকার প্রমাণ প্রয়োগে বঙ্গীয় কর্ম্মকার

জাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। গ্রন্থকারের বিচার, গবেষণা ও লিপিপ্রাঞ্জলতার বিশিষ্ট পরিচয় এই পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিবিধ যন্ত্রশিল্পকার—মুদ্রাযন্ত্রকার কর্ম্মকার জাতি যে সমাজের অত্যাবশ্যকীয় ও আদরণীয় অঙ্গ, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই জাতির জাতীয় উন্নতি সাধনে উত্তম সাহিত্যিক সহায় স্বরূপ এই পুস্তক খানিকে এই জন্যই আমরা আদৃত দেখিতে ইচ্ছা করি।

বল্লালচরিতম্।—বঙ্গ "বল্লালী আমলের" বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি শ্রীযুক্ত গোপাল ভট্ট বিরচিত সংস্কৃত ছন্দানুগত শ্লোকবদ্ধ পদ্যগ্রন্থ। প্রাচীন সকল গ্রন্থই প্রায় মুখস্থ রাখার সুবিধার জন পদ্যগ্রথিত করা হইত। এখনকার মত তখন ছাপাখানার ছড়াছড়ি ও পুস্তক প্রকাশের বাড়াবাড়ি ছিল না। একখানি গ্রন্থ অতিকষ্টে সুলেখক দ্বারা প্রতিলিপীকৃত (নকল) করাইয়া তবে সঞ্চয় করা হইত। কোন গ্রন্থের কোন একটা কথা আলোচনার আবশ্যকতা হইলেই অমনি সহজে তাহা পাওয়া যাইত না; কারণ মূল গ্রন্থ বড় বিরল ও দুর্লভ ছিল। এই জন্যই তখন মুখস্থ করিয়া রাখার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। কাজেই গ্রন্থকারগণও স্ব স্ব গ্রন্থাদি স্বভাবতঃ পদ্যে গাঁথিয়াই প্রকাশ করিতেন। ভারতীয় কঠোর গণিত-জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রও পদ্যশ্লোকাবলীতে গাঁথা। "বল্লালচরিত" গ্রন্থে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, এই প্রধান জাতিত্রয় এবং অন্যান্য ভ্রষ্টবৈশ্য, শূদ্র ও সঙ্করবর্ণ সমুদয়ের উৎপত্তি, বৃত্তি ও কুলনির্ণয় এবং বংশের বিভাগ ও বিভূতি প্রভৃতির বিবরণ ইহাতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে; এই জন্য ইহাও মুখস্থ রাখার বিশেষ প্রয়োজন। তৎকালীন্ কুলাচার্য্যগণ মুখে মুখেই সকল কুলতত্ত্ব বিবরণ করিতেন; কেননা প্রাচীন ও তাৎকালিক কুলগ্রন্থ নিচয় সমস্তই সহজে মুখস্থ রাখার উপায় স্বরূপ পদ্যরচিত শ্লোকাবলীতে গ্রথিত ছিল।

শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট বিরচিত এই "বল্লালচরিত" গ্রন্থ কিন্তু বাস্তবিক বল্লালের কার্য্য ও জীবন-বিবরণী বিশেষ কিছু নাই। উহা কেবল "বল্লালী আমলের" বঙ্গীয় জাতি-কুল-সমূহের বিস্তৃত বিবরণে পূর্ণ; কিন্তু এই পুস্তকের "পরিশিষ্ট" রূপে শ্রীযুক্ত কবি আনন্দভট্ট রাজা বল্লাল সেনের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। বল্লালের সমসাময়িক গোপাল ভট্ট রাজভয়ে বল্লাল রাজার সমস্ত গর্হিত গুহ্যকার্য্যগুলির বিবরণ করিতে পারিয়াছিলেন না বলিয়া, বিশেষ কিছু ইচ্ছা করিয়াই লেখেন নাই; কিন্তু তাঁহার মূল উদ্দেশ্য তাৎকালিক জাতি-বিবরণ প্রকাশ, তাহা তিনি প্রয়োজনানুরূপ প্রাঞ্জল ও বিশদভাবেই রচনা করিয়াছেন। তাহার অনেক পরে বল্লালী ভয় বিরহিত আনন্দ ভট্ট বল্লাল-জীবনী লিখিয়া, মূল "বল্লালচরিত" গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে মূল গ্রন্থের এক প্রধান অভাব-পূরক হওয়াতে উহা বহুকাল হইতেই মূলগ্রন্থীভূত হইয়া চলিয়া আসিতেছে।

গ্রন্থখানি বাস্তবিক অতি প্রয়োজনীয়, অথচ অতি দুর্লভ ছিল। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশি-ভূষণ ভট্টাচার্য্য ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। প্রথিতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবি-রত্ন মহাশয় উহা সংশোধন পূর্ব্বক প্রকাশিত করিয়াছেন। অনুবাদকের ভূমিকায় এই পুস্তক প্রকাশের বিস্তৃত বিবরণ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমেই দেশের দীপ্তনামা পণ্ডিত মণ্ডলীর অত্র পুস্তক সম্বন্ধীয় অভিমতাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহারা সকলেই প্রায় একবাক্যে "বল্লাল-চরিতের" উপযোগিতা, আবশ্যকতা ও উপাদেয়তা স্বীকার করিয়াছেন এবং অনু-বাদক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ করিয়াছেন।

আজ কাল আমরা "প্র ড্ষ্টানের" চৌদ্দ পুরুষের খবর রাখি, 'আমেজান' নদীর সর্ব্বাধিক গভীরতা কত ফুট, তাহা জানি; আফ্রিকার 'হলুলু' জাতির আদি বংশোৎ-পত্তি-বিবরণ বলিতে পারি; অথচ নিজের জাতি-বংশের কিছুই জানিনা—কিছু খোঁজ রাখি না! ঠাকুর দাদার বাপের নামটাও হয়ত বলিতে পারি না, এমনি কপাল পুড়িয়াছে! এরূপ অবস্থায় এই "বল্লাল-চরিত" আমাদের বঙ্গীয় হিন্দুর জাতি-কুল-নির্ণয় ও আদি মূল বংশ-পরিচয় পরিজ্ঞানে—জাতীয় উন্নতি বিধানে বিশেষ উপকারে আসিবে। পূর্ব্বো-ত্তর ভেদে খণ্ডদ্বয়ে বিভক্ত এই গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য-বিবরণ, অপ-রার্দ্ধে বঙ্গীয় অপরাপর জাতি বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গের সুবর্ণবণিক ও যোগী ('যুগী') জাতির প্রকৃত মূল বংশ-বিভক্তি, সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও বল্লাল রাজের কোপ-বলাৎকৃত পাতিত্য-বিধান-বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফলে বাঙ্গালী জাতির আদি জাতিতত্ব বিষয়ে অবশ্য জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় ইহাতে বিস্তর আছে। এমন একখানি জাতীয় পরমোপকারী প্রয়োজনীয় পুস্তকের সমাজে সমাদর ও বহুল প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয়। শিক্ষিত স্বদেশ-সেবক ও স্বজাতি-হিতৈষী বাঙ্গালী মাত্রেরই এই পুস্তক ১।১ খানি সংগ্রহ করা এবং (এমন কি) পারিয়া উঠিলে—কণ্ঠস্থ করাও উচিত বোধ করি। অন্ততঃ একবার পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। বৈখানির দামও বেশি নহে, ॥০ মাত্র। কলিকাতার গুরুদাস বাবুর মেডিক্যাল্ লাইব্রারি প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।

"সেবিকা"—ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় এবং বিবিধ সাময়িক সংবাদ-সংবাহিনী মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ তত্বনিধি-সম্পাদিত। ডায়মণ্ড হারবার হইতে "হীরক" যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। আকৃতি-আয়তন বৃহৎ, কিন্তু পত্র-সংখ্যা চারিটি মাত্র। তবে "ডিমাই" আকারের প্রায় দ্বিগুণ বটে। বার্ষিক মায় ডাকমাশুল ১৲ টাকা মাত্র মূল্যে ইহার অধিক পত্র-সংখ্যা দিলেও খরচে পোষায় না। তবে স্বত্বাধিকারীর নিজের মুদ্রাযন্ত্র হইলে একরূপ চলিতে পারে। এই "সেবিকা"

পত্রিকাখানি প্রধানতঃ বঙ্গীয় 'মাহিষ্য' সমাজের মুখপত্র স্বরূপ। উক্ত সমাজস্থ শিক্ষিত ধনাঢ্যগণ নিয়মিত সাহায্যাদি করিলে, পত্রিকাখানি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা। পত্রিকা চলিতেছেও আজ নয় বৎসর হইতে। তবে "হিন্দুপত্রিকায়" সমালোচনার্থ ইহা আমরা সংপ্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এমন সুলভ মূল্যে এরূপ একখানি সুন্দর পত্রিকা পাওয়া বঙ্গ-সাহিত্যসেবীর অবাঞ্ছনীয় নহে। পত্রিকাখানিতে প্রধানতঃ মাহিষ্য-প্রসঙ্গ থাকিলেও, অপর বিবিধ হিতকর ও শিক্ষণীয় বিষয়ও থাকে। ভারত-গৌরব বেদান্তশাস্ত্রের মর্ম্ম-পদ্যানুবাদ "জ্ঞানধর্ম্ম গীতা" নামে যে একটি সন্দর্ভ ইহাতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে, উহা অতি উপাদেয়। রচনাটি বেশ সরল, মধুর, প্রাঞ্জল 'পয়ার' ছন্দে গ্রথিত। আবার এরূপ গুরু গম্ভীর গহন বিষয় যেরূপ কৌতুকের আভাসোজ্জ্বল ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহাও ইহার প্রশংসনীয় বিশেষত্ব। ইহার কৃষি-শিল্পাদি বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও বেশ উপকারী ও শিক্ষাপ্রদ। ইহাতে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথাও দেখিলাম। এই নিত্য-রোগাচ্ছন্ন বঙ্গদেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদিতে চিকিৎসাসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা ও পরীক্ষিত মুষ্টিযোগাদি যত প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। 'সেবিকা'তে সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও থাকে। মোটামুটি অনেকগুলি ভাল ভাল বিষয় ইহাতে প্রকাশিত হয়; তবে কিনা, পত্রিকার পত্র সংখ্যার অল্পতায় বিষয়গুলি প্রায় "হোমিওপ্যাথিক্ ডোজে" সারিতে হয়। বিষয়ের সংখ্যাধিক্য অপেক্ষা বিষয়ের বিশদীকরণ অধিকতর বাঞ্ছনীয়। অনেকগুলি প্রসঙ্গ কেবল ছিটাইয়া দেওয়া অপেক্ষা অল্প প্রসঙ্গও মোটামুটি মিটাইয়া লেখা ভাল। এই জন্য আশা করি, বিস্তৃত মাহিষ্যসমাজের সম্পন্ন সাহিত্যানুরাগিগণের সাহায্যে "সেবিকা" আর একটু স্থূলকলেবরা হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিলেই, পত্রিকার সংকল্পোক্তি-অনুসারী সকল প্রসঙ্গই অপেক্ষাকৃত বিশদরূপে আলোচিত হইতে পারিবে।

উপসংহারে আর একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। "সেবিকা"র কাল-মান জ্ঞাপক মাস-বৎসর ইংরাজী কেন? এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল প্রভাবের দিনে স্বদেশী ছাড়িয়া বিদেশী সন-তারিখ ব্যবহার (বিশেষতঃ 'স্বদেশী' সাহিত্য-ব্যাপারে) সঙ্গত কি? অধুনা 'স্বদেশী' ভাবের সম্প্রসারণ-আবশ্যকতায় যে কোন উপায়ে তৎসাহায্য-সম্ভাবনা উপেক্ষণীয় নহে। আজকাল বঙ্গের সাহিত্য-প্রসঙ্গে, 'স্বদেশী'-সেবক সাময়িক পত্রাদির অঙ্গে 'আগষ্ট' ও '১৯০৭' খৃষ্টাব্দ দেখিতেই যেন কেমন কুৎসিত দেখায়। আশাকরি, কাজের বিশেষ অসুবিধা না হইলে, ভবিষ্যতে এ খুঁত্ সংশোধিত হইবে।

['হিন্দু-পত্রিকা'-কার্য্যালয়ে আরও অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি সমালোচনার্থ আসিয়া মজুদ্ রহিয়াছে। আমরা পত্রিকার স্থানাবকাশ অনুসারে ক্রমশঃ তৎসমুদয়ের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব। প্রকাশকগণ আমাদের অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।]

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টীকৃত।)

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। | পৌষ। | ১৩১৪ সাল, ১৮২৯ শকাব্দা।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আত্মা দেহাবসানে কি ভাবে থাকে? এই প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে একটু চিন্তা কর। গাছে একটা আম দেখিতেছ, দেখছ কি? একটি বহিরাবরণ—ত্বক্ বা ছাল। সর্ব্বপ্রথমে ঐ ছালই আমের দেহ। উহা ক্রমে বড় হইল। উহার ভিতর শাঁস হইল, আঁঠি হইল, আম পাকিল। তুমি আম পেড়ে, ছাল ফেলে দিলে, শাঁসটুকু খেলে। আঁঠিটি মাটিতে পুতিলে। তার পর ঐ আঁঠি ভেদ করিয়া একটি অঙ্কুর বাহির হইল। এখন তুমি যে আমটি খেয়েছিলে, সে আমটি এই দুই পরিবর্ত্তনেও কি জীবিত আছে—না মরিয়া গেছে? আম খাইয়া ফেলিলেই আম মরিল না, ও উহার আঁঠিতে জীবিত রহিল। তার পর আম গাছ হইল। এ সময় আঁঠিটি পচিয়া গিয়াছে। যে আম খেলে, সে মলো না, সে ঐ বৃক্ষেই জীবিত আছে। একটা নারিকেলের ভিতরে আমরা প্রথমে খোসা, তারপর মালা, তারপর জল, তারপর নেওয়া, তারপর শক্ত নারিকেল, তারপর কোপল, ইত্যাদি বহু পরিবর্ত্তন দেখি; তারপর আবার তাহা হইতেই অঙ্কুরোদ্গম হইয়া নূতন নারিকেল গাছ হইয়া—বহিরোপকরণ লইয়া সে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়। আত্মা কি শরীর ছাড়া কখনও থাকে? আমের বা নারিকেলের আত্মা কি কখনও আম বা নারিকেলের দেহাংশ ছাড়া বর্ত্তমান রহিয়াছে? মানুষেরইবা তাহা কেন হইবে? মানুষের যে শরীর আমরা সাধারণতঃ দেখি, উহা স্থূলদেহ;

ঐ স্থূলদেহের ভিতর সূক্ষ্মদেহ আছে। আত্মার নূতন জন্ম ঐ সূক্ষ্মদেহ লইয়া। ঐ সূক্ষ্মদেহই নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নূতন স্থূলদেহ গঠন করে। যতক্ষণ স্থূলদেহের সহিত আত্মা সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ আত্মাকে শরীরের ভরণ-পোষণ করিতে হয়, এবং শরীরের উপাধি দ্বারা তাহার স্বাধীনতার সঙ্কোচ হয়। কিন্তু স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্মদেহযুক্ত আত্মার আর স্থূলদেহোচিত ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিতে হয় না। মুক্তাত্মারা—মৃত্যুর পর জীবনের অবস্থা কি, তাহা জানেন। তাঁহারা জানেন যে, আত্মা নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই নূতন দেহ ধারণ করে, এবং উহা নিমিষের মধ্যেই হইয়া থাকে। যাঁহাদের আত্মা উন্নত হইয়াছে, যাঁহারা বাসনা ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ইহসংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তবে যদি জগতের কোন মঙ্গল সাধন করিতে হয় তখন তাঁহারাও জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু যতক্ষণ বাসনার ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। আত্মজগতে যাঁহারা সুখ পান না, তাঁহাদের পুনর্ব্বার এই স্থানে ফিরিয়া আসিতে হয়। ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্থূল দেহ ধারণ করিতে হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আসা-যাওয়া করিতে করিতে আত্মার জ্ঞান পরিপক্ক হইলে, ইহসংসারে আর আসিতে হয় না।

একের সহিত এক যোগ দিলে দুই হয়, এটি চির সত্য। ভূতে সত্য, বর্ত্তমানে সত্য, ভবিষ্যতেও—অর্থাৎ সর্ব্বকালেই এটি সত্য। এখানে, ওখানে, সর্ব্বস্থানে—এটি সত্য। দেশ বা কালের দ্বারা এ সত্যের বাধা জন্মে না। এইক্ষণ দেখ যে, এই সত্যটি খণ্ডন করার অধিকার কাহারও আছে কি না। যাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলা যায়, তিনিও কি এই সত্যের বাধা জন্মাইতে পারেন বা জন্মাইয়া থাকেন? ঈশ্বর কি সত্যকে মিথ্যা করিতে পারেন বা করেন? যে শক্তির উপর এই বিশ্ব নিহিত, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর কি সেই শক্তি ধ্বংস করিতে পারেন বা করেন? পরে কি বলে, কোন্ শাস্ত্রে কি বলে, তাহা ভুলিয়া যাও, নিজের বিবেক পরিচালনা কর; তাহা হইলেই এই সকল প্রশ্নের উত্তর স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হইবে। তুমি আছ, এই বিশ্ব আছে, ইহার ধ্বংস করিবার শক্তি কার আছে? ধ্বংস নাই, আছে কেবল রূপান্তর।

আমরা যখন কোন ভাল কার্য্য করি বা মন্দ কার্য্য করি, তখন কি আমরা বলি যে, ঈশ্বর উহা করিয়াছেন? তুমি ঠিক দিতে ভুলিলে, ও ভুলটা কি ঈশ্বরের না তোমার? তুমি রাত্রিতে চুরী করিলে, ঐ কার্য্য ঈশ্বরের না তোমার? আবার তুমি পরের জন্য জীবন দিলে, ঐ কার্য্য ঈশ্বরের না তোমার? তুমি যদি শারীরিক মঙ্গল চাও, তাহা হইলে তোমার ব্যায়াম করিতে হয়, পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে হয়, আহার বিহার সংযত করিতে হয়। যদি জ্ঞানী হইতে চাও, জ্ঞান উপার্জ্জনের যে সমুদয় উপায় আছে, তাহা তোমায় অবলম্বন করিতে হয়। এই জীবনে যাহা তোমার প্রয়োজন—ধন, ধান্য, গো, অশ্ব, রথ, বসন, ভূষণ ইত্যাদি সকল প্রয়োজনের

অন্তই তোমার নিজের পুরুষকারের প্রয়োজন। ধান্য উৎপন্ন করিতে ধান্য বীজ বপন করিতে হইবে। উহা বপন না করিলে, তুমি পণ্ডিতই হও, বীরই হও, যোগীই হও আর ভক্তই হও, কিছুতেই ধান্য হইবেনা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে কার্য্য-কারণের নিত্য সম্বন্ধ। কার্য্য-কারণের এই সত্য সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেই তুমি তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে তবে কি ঈশ্বর একটি নিয়ম মাত্র? নিয়ম থাকিলেই নিয়ন্তা আসিয়া পড়ে; তাহা হইলে তিনি নিয়ন্তা। এই বিশ্ব তাঁহার শরীর, এই বিশ্ব জড় ও জড়শক্তি, এবং মানবাত্মা, পশ্বাত্মা প্রভৃতি সমুদায় আত্মাই তাঁহার শরীর স্বরূপ। তিনি সকলের মধ্যে থাকিয়া সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার নিয়মে বিশ্ব একটি সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। এই বিশ্বের বিরাট দেহ তাঁহার। তিনি "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" (ঋগ্বেদ) অর্থাৎ তিনি অনন্ত শির বা অবয়বযুক্ত, অনন্ত চক্ষু বা জ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত, অনন্ত পাদ বা কর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত বিরাট পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্তী হইয়াছেন।

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৩ ॥

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাঽপঃ শরীরং সোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪ ॥ যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমাগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৫ ॥ যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৬ ॥ যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭ ॥ যো দিবি তিষ্ঠন্দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৮ ॥ য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাঽদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৯ ॥ যো দিক্ষু তিষ্ঠন্দিগ্ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১০ ॥ যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১১ ॥ য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১২ ॥ যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৩ ॥ যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যধিদৈবত মথাধিভূতম্ ॥ ১৪ ॥ যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্ ॥ ১৫ ॥ যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ

প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৬ ॥ যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্ ন বেদ যস্য বাক্‌শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭ ॥ যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠঞ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮ ॥ যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠং শ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯ ॥ যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২০ ॥ যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্‌শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২১ ॥ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্তং ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম ॥ ২৩ ॥ ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৭ ॥

উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে অন্তর্যামীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—

যিনি পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্য্যামী ; অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তরে থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

(অন্তরঃ—অভ্যন্তরঃ, যময়তি—নিয়ময়তি, স্বব্যাপারে। তে—তব, সর্ব্বভূতানাং উপলক্ষণার্থম্।)

যিনি জলে বাস করিতেছেন, যিনি জলের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, জল যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, জল যাঁহার শরীর, যিনি জলের অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনি অমৃত ৪।

যিনি অগ্নিতে বাস করিতেছেন, যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অগ্নি যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অগ্নি যাঁহার শরীর, যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৫।

যিনি অন্তরীক্ষে বাস করিতেছেন, যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অন্তরীক্ষ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অন্তরীক্ষ যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরীক্ষকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৬।

যিনি বায়ুতে বাস করিতেছেন, যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, বায়ু যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, বায়ু যাঁহার শরীর, যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে থাকিয়া বায়ুকে নিয়মিত

করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৭।

যিনি স্বর্গেতে বাস করিতেছেন, যিনি স্বর্গের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, স্বর্গ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, স্বর্গ যাঁহার শরীর, যিনি স্বর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বর্গকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৮।

যিনি আদিত্যে বাস করিতেছেন যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, আদিত্য যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৯।

যিনি দিক্‌সমূহে বাস করিতেছেন, যিনি দিক্‌সমূহের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন দিক্‌সমূহ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, দিক্‌সমূহ যাঁহার শরীর, যিনি দিক্‌সমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া দিক্‌সমূহকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১০।

যিনি চন্দ্রে ও নক্ষত্রসমূহে বাস করিতেছেন, যিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ যাঁহার শরীর, যিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১১।

যিনি আকাশে বাস করিতেছেন, যিনি আকাশের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, আকাশ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, আকাশ যাঁহার শরীর, যিনি আকাশের অভ্যন্তরে থাকিয়া আকাশকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১২।

যিনি অন্ধকারে বাস করিতেছেন, যিনি অন্ধকারের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অন্ধকার যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অন্ধকার যাঁহার শরীর, যিনি অন্ধকারের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্ধকারকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১৩।

যিনি তেজে বাস করিতেছেন, যিনি তেজের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তেজ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, তেজ যাঁহার শরীর, যিনি তেজের অভ্যন্তরে থাকিয়া তেজকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১৪।

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের আধিদৈবিক সম্বন্ধ—অর্থাৎ দেবতাদিগের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ, তাহা বলা হইল; এইক্ষণ ব্রহ্ম হইতে তৃণপর্য্যন্ত ভূতসমূহের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ—অর্থাৎ ভৌতিক সম্বন্ধের কথা বলিব।

যিনি ভূতসমূহে বাস করিতেছেন, যিনি ভূতসমূহের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, ভূতসমূহ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, ভূতসমূহ যাঁহার শরীর, যিনি ভূতসমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভূতসমূহকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১৫।

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের আধিভৌতিকসম্বন্ধের কথা বলা হইল; এইক্ষণ তাঁহার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের কথা বলিব।

যিনি প্রাণে বা জীবাত্মায় বাস করিতেছেন, যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, প্রাণ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, প্রাণ যাঁহার শরীর, যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১৬।

যিনি বাক্যে বাস করিতেছেন, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, বাক্য যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, বাক্য যাঁহার শরীর, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ১৭।

যিনি চক্ষুতে বাস করিতেছেন, যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, চক্ষু যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, চক্ষু যাঁহার শরীর, যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষুকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত ১৮।

যিনি কর্ণেতে বাস করিতেছেন, যিনি কর্ণের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, কর্ণ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, কর্ণ যাঁহার শরীর, যিনি কর্ণের অভ্যন্তরে থাকিয়া কর্ণকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১৯।

যিনি মনেতে বাস করিতেছেন, যিনি মনের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, মন যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, মন যাঁহার শরীর, যিনি মনের অভ্যন্তরে থাকিয়া মনকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত ২০।

যিনি ত্বকে বাস করিতেছেন, যিনি ত্বকের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, ত্বক্ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে ত্বক যাঁহার শরীর, যিনি ত্বকের অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বক্‌কে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত ২১।

যিনি জ্ঞানে বাস করিতেছেন, যিনি জ্ঞানের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, জ্ঞান যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, জ্ঞান যাঁহার শরীর, যিনি জ্ঞানের অভ্যন্তরে থাকিয়া জ্ঞানকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ২২।

যিনি রেতে বাস করিতেছেন, যিনি রেতের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, রেত যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, রেত যাঁহার শরীর, যিনি রেতের অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত ২৩।

তিনি অন্যের দৃষ্টির অগ্রাহ্য হইয়া দর্শন করেন, শ্রুতির অগ্রাহ্য হইয়া শ্রবণ করেন মনের অগ্রাহ্য হইয়াও মনন করেন, জ্ঞানের অগ্রাহ্য হইয়াও জানেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বা জ্ঞাতা নাই। তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। তিনি ব্যতীত অন্য সকলই মরণশীল" যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর শুনিয়া উদ্দালক আরুণি অন্য প্রশ্ন করিলেন না।

আব্রহ্মস্তম্ব পর্যান্ত সকলই ব্রহ্মময়, সকল বস্তুই ব্রহ্ম দ্বারা নিয়মিত। জীবাত্মাও তাঁহার শরীর মাত্র, এবং তিনি তাহারও নিয়ন্তা। তিনি কেবল সাক্ষী, দ্রষ্টাস্বরূপ, তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে বিশ্ব পরি-

চালিত হইতেছে। তিনি আত্মারও আত্মা। তিনি পরমাত্মা।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া—
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তা
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। (শ্রুতিঃ)

জীবাত্মা পরমাত্মার কিরূপ সম্বন্ধ? না দুইটী পাখী যেমন একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহারা সখ্যভাবে সংযুক্ত হইয়া আছেন। জীবাত্মা স্বাদু ফল ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্ম-ফল ভোগ করেন, কিন্তু পরমাত্মা কেবল সাক্ষীস্বরূপে তাহা দেখেন।

তবে তিনি যে কেবল মানবদেহে জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত আছেন, তাহা নহে; তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এবং সর্ব্বপদার্থই তাঁহার বিরাট শরীর।

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ।
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ
অনাদিস্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা।"

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী। তুমিই বৃদ্ধরূপে দণ্ড ধারণ করিয়া ভ্রমণ কর। তুমি বিশ্বতোমুখ হইয়া সর্ব্বত্র রহিয়াছ।

তুমিই নীলবর্ণ ভ্রমর, তুমিই হরিৎ ও লোহিতবর্ণ পক্ষী, তুমিই তড়িদ্গর্ভ মেঘ, তুমিই ঋতু, তুমিই সমুদ্র, তুমি অনাদি, তুমিই বিভুরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ, যাহাতে বিশ্বভুবন রহিয়াছে।

অতএব ঈশ্বর কি? না তিনি বিভু—প্রভু। তাঁহার স্বরূপ কি? বিভুত্ব—প্রভুত্ব বা নিয়ন্তৃত্ব। এই বিশ্ব চিৎ ও অচিৎ; চৈতন্য এবং জড় ও জড়শক্তি তাঁহার বিরাট দেহ; উহা আছে। উহা তাঁহার বাহ্য বিকাশ। উহা রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না; অতএব তিনি সৎ বা সত্য। যে নিয়ম দ্বারা এই বিশ্ব পরিচালিত, উহা মঙ্গলময়, অতএব তিনি শিব। বিশ্ব সৌন্দর্য্যময়, অতএব বিশ্বেশ্বর সুন্দর। সুন্দর বলিলে আমরা কি বুঝি? যেখানে যে রূপ সমাবেশ সাজে, তাহা থাকিলেই আমরা সুন্দর বলি। সুসমাবেশের অভাবই কদর্য্যতা। প্রকৃতিতে কদর্য্য কিছু দৃষ্ট হয় না। ইহাতে 'খাপ্‌ছাড়া' কিছুই নাই। অতএব ঈশ্বর সত্য, শিব ও সুন্দর।

বিশ্ব তাঁহার নিয়ম দ্বারা নিয়মিত। তাঁহার নিয়মের পরিবর্ত্তন হইলে, তাঁহার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়। যদি এক আর একে দুই হয়, ইহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত, কিম্বা তিন কে তিন দিয়া গুণ করিয়া যে নয় হয় ইহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত, তাহাহইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকিতে পারিত না। এ কি বিশ্বাস করা যায় যে, ঈশ্বর সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ করিতে পারেন, কিম্বা ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল, মিথ্যাকে সত্য, অসরলতাকে সরলতা,

বিশ্বাসঘাতকতাকে বিশ্বস্ততা করিতে পারেন? এই ভারতবর্ষ নামে প্রকাণ্ড যে ভূখণ্ড রহিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। এই ভারতবর্ষ যে এক দিন ছিল, এ সত্য কি লুপ্ত করিতে পারেন? ভারতবর্ষের ভূত অস্তিত্বের লোপ সম্ভবপর হইলে, ভারতবর্ষ যে বর্ত্তমানে নাই, একথা কি সত্য হইবে? ঈশ্বর কি তাঁহার স্বীয় অস্তিত্ব লোপ করিতে পারেন? পরমাত্মা কি আত্মহত্যা করিতে পারেন? অথবা তিনি কি এই বিশ্বের অস্তিত্বের লোপ করিতে পারেন? এ সমুদায় বিষয় ধীর ভাবে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে, মনে জ্ঞানের উদয় হইবে। এ ব্যক্তির বা ও ব্যক্তির এ শাস্ত্রের বা ও শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া যুক্তিমার্গে এস। ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক মীমাংসায় যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা অনুচিত, এরূপ কোন উপদেশ বা অনুশাসন বাক্য যদি শুনিয়াথাক, তাহা ভুলিয়া যাও। সনাতন শাস্ত্র উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছেন, "যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" স্বীয় মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, এই সমুদায় জটিল বিষয় মীমাংসার চেষ্টা কর। যদি সম্পূর্ণ মীমাংসাও না করিয়া উঠিতে পার, তাহা হইলেও দেখিবে যে, তুমি মীমাংসার পথে উঠিয়াছ। যদি কুযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না কর কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি বা শাস্ত্রের উপর নির্ভর না কর; তাহা হইলে এ সত্য তোমার মনে অবশ্য স্বতঃ উদিত হইবে যে, তোমার কল্পনায় যত বড় শক্তি কল্পিত হউক না কেন, ভূতকালের কোন ব্যাপার কোনও শক্তি দ্বারা লুপ্ত হইতে পারে না। তোমার পিতা পিতামহাদি ছিলেন। এমন কোন্ শক্তি আছে, যাহা দ্বারা তাঁহারা যে ছিলেন, এই সত্যের লোপ হইতে পারে? যাহা তোমার জ্ঞানে সত্য বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা তুমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। হইতে পারে তোমার ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভ্রম বলিয়া তোমার স্থির ধারণা না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি উহা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃই বাধ্য। ভূত ব্যাপারগুলি যে ধ্বংস হইতে পারে না, এ সত্যটি স্বতঃই প্রতীয়মান, এবং ইহার ব্যত্যয় হইবারও যে কোনও সম্ভাবনা নাই, তাহাতেও সন্দেহ মাত্র নাই। সত্যের ভিত্তি সত্য। যাহা সত্য, তাহা ধ্বংসবিহীন। তোমার অস্তিত্ব একটি সত্য, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাহার ব্যত্যয় সংঘটন করিতে পারেন না। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর দণ্ডায়মান হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে যে, এক আর এক যে দুই হয়, ইহা চিরকালই সত্য। ভূতে সত্য, বর্ত্তমানে সত্য এবং ভবিষ্যতেও সত্য। বুঝিতে পারিবে যে, ঐ প্রকার গণিত শাস্ত্রের অন্যান্য সত্য, ন্যায়-অন্যায় বিষয়ক সত্য, বিশ্বের নিয়মাবলী ইত্যাদি বিষয়ক সত্য চিরকালই সত্য—ভূতে, বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে। যদি অতীতে তাহাদের পরিবর্ত্তন হইতে পারিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যদি অতীতে তাহাদের অস্তিত্বের ধ্বংস থাকিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও ধ্বংস হইতে পারে। ঈশ্বরের বিশ্বের বিধান সার্ব্বজনীন। ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া নহে। আগুনে পোড়ে, সকলেই আগুনে পোড়ে। পাপী-পুণ্যবান,

ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ—সকলেই পোড়ে। এই নিয়মগুলি অনাদি, অনন্ত। ঘড়ীতে চাবি দিলাম, আর ঘড়ী চলিল, এ তাহা নয়। বিশ্বের ঘড়ী চিরকালই চলিতেছে—কখনও বিরাম নাই, হইবেওনা। বিশ্ব নিয়মের অধীন—ভূতে, বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে। মানবের দৈনন্দিন কার্য্যে আমরা কি দেখি? তুমি ঠিক দিতে ভুল করিলে, এ ভুল কাহার? তোমার না ঈশ্বরের? অতিরিক্ত ভোজনে তোমার অজীর্ণ হইল, এই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল কাহার? অমুক টাকা পাইত, তাহাকে ফাঁকি দিলে, এ প্রতারণা কাহার? তোমার না ঈশ্বরের? এইরূপ সর্ব্ববিষয়েই দেখিবে যে, জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব নাই। তবে মূল নিয়ন্তৃত্ব অবশ্য আছে।

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"
(গীতা)

অর্থাৎ—

লোকের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম আর কর্ম্মফল—
ঈশ-সৃষ্ট নয়, হয় স্বভাবে কেবল।

ইহার মধ্যে কোন দৈব বা অমানুষিক কিছুই নাই, ইহা তুমি বেশ বুঝিতেছ; কিন্তু আর একটু বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ন্তৃত্ব। কার্য্য-কারণের নিত্য নিয়মাধীন এই বিশ্ব। কার্য্য-কারণের নিয়মাধীনই যদি জগৎ হয়, তাহা হইলে জগদীশ্বরের স্তব স্তুতির স্থান কোথায়? যতই স্তব-স্তুতি কর না কেন, ধান্যবীজ হইতে গোধূম উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানী-অজ্ঞানী ধনী দরিদ্রাদি সকলেরই ধান্য-বীজ হইতেই ধান্য উৎপাদন করিতে হইবে। কিন্তু ধান্যোৎপাদনের নিয়মে তাহার সত্তা রহিয়াছে। যেমন ধান্যোৎপাদনে, তেমন মনুষ্যোৎপাদনে। এক কথায়—বিশ্বস্থ তাবৎ উৎপাদনেই নিয়মাধীনতা রহিয়াছে; কেন না, যে উপায়ের দ্বারা যাহা উৎপাদন করিতে হইবে, তাহা না করিলে, হইবে না। এ ধর্ম্ম, ও ধর্ম্ম, এ বিশ্বাস, ও বিশ্বাস, এইরূপ পূজা বা ঐরূপ পূজাদির দ্বারা আত্মার মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে না। যে অনন্ত নিয়মে বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ নিয়মিত, মানবাত্মার মোক্ষও সেই নিয়ম দ্বারা নিয়মিত। যে কার্য্য দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদর্থে তাহাই করিতে হইবে। বিশ্বের মধ্যে একটি সার্ব্বজনীন প্রণালী দৃষ্ট হয়; উহাকে জনন-প্রণালী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উহার অর্থ এই যে, প্রত্যেক কারণ একটি বীজস্বরূপ এবং উহার কার্য্য-ফল ধ্রুব। মানবের প্রত্যেক কর্ম্মই একটি কারণ এবং উহার ফলও ধ্রুব। ভাল কার্য্যের ভাল, মন্দ কার্য্যের মন্দ ফল। পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতি উচ্চকণ্ঠে এই সনাতন সত্যই ঘোষণা করিয়াছেন। পরমাত্মা কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষপাতী নহেন। "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।"(গীতা) মন্দির, মস্‌জিদ্ বা গির্জ্জা, কিছুই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। ঝড়ে বা ভূকম্পে বা অগ্নিতে—মন্দির, মস্‌জিদ বা গির্জ্জা বলিয়া কিছুরই পক্ষপাতিত্ব হইবে না। অকাল-মৃত্যু সকল ধর্ম্মের লোকেরই হইয়া থাকে। রোগে পাপীও মরে, পুণ্যবানও মরে। ধনী-দরিদ্র বলিয়াও কোন বিচার নাই। শারীরিক ব্যাধি শারীরিক নিয়ম অপালনের জন্য,

মানসিক ব্যাধি মানসিক নিয়ম অপালনের ফল। ব্যক্তিবিশেষ, ধর্ম্মবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ, কিছুই নিয়মের বহির্ভূত নহে; সকলের পক্ষেই বিশ্বে এক মূল নিয়ম। আস্তিক-নাস্তিক, পাপী পুণ্যবান, ধনী-দরিদ্র; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্শী, ইহুদীর পক্ষে একই নিয়ম। যেমন কার্য্য, তেমনি ফল—"যেমন বুনিবে বীজ, ফলিবে তেমন।" ছাদ যদি খারাপ হয়, তাহা হইলে পুণ্যবান সেই ঘরে থাকিলেও জল পড়িবে; ছাদ যদি ভাল হয়, তাহা হইলে পাপী উহার নিম্নে আছে বলিয়া যে জল পড়িবে, তাহা নহে। পাপী ইষ্টকালয়ে বাস করিলে, উহা আগুনে পুড়িবে না; কিন্তু পর্ণকুটীরবাসী পুণ্যবানের আবাসও আগুনে পুড়িবে। পাপী কৃষক ধান বুনিলে এবং ধান্যোৎপাদনের জন্য যাহা করা উচিত, তাহা করিলে, ধান্য পাইবে; কিন্তু পুণ্যবান কৃষক অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে, কিম্বা ধান্যোৎপাদনের জন্য যাহা করা উচিত, তাহা না করিলে, কখনও ধান্যলাভের অধিকারী হইবে না।

তিনকে তিন দিয়া গুণ করিলে যেমন নয় হয়, আর কিছুই হইতে পারে না; কার্য্য-কারণের সম্বন্ধও ঐরূপ। ৩×১=৩, ৩×২=৬, ৩×৩=৯ ইত্যাদি নামতা স্বতঃ সত্য। জগতে সমস্ত সরল ও জটিল ব্যাপার ঐরূপ নিত্যনিয়মাধীনতায় সত্য। যেমন কারণ, তেমনি কার্য্য। কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ নিত্য; ইহা বিশ্বব্যাপী, সার্ব্বজনীন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গ্রহ, উপগ্রহ, বায়ু, জল, অগ্নি, আকাশ, স্থাবর, জঙ্গম—'আব্রহ্মস্তম্ব' পর্য্যন্ত অনিবার্য্য ভাবে অনন্ত কাল নৈসর্গিক নিয়মের অধীন। যে নিয়ম তোমার ভিতরে, সেই নিয়ম তোমার বাহিরে। তোমার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চিন্তা কারণস্বরূপ হইয়া তোমাকে ঊর্দ্ধ দিকে বা অধোদিকে লইয়া যায়। প্রত্যেক নিমিষে তোমার কার্য্যের বিচার হইতেছে। যদি তুমি মনে দ্বেষ, হিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা বা অন্য নীচ প্রবৃত্তির স্থান দিলে, অমনি হাতে হাতে তুমি তাহার ফল পাইলে। তোমার চরিত্র কলুষিত হইল, তোমার আত্মা নিম্নগামী হইলে। সাধুকার্য্য ও সাধুচিন্তার ফলও ঐরূপ হাতে হাতে নগদ বিদায়। রাত্রিতে যখন নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে তুমি আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাও, সেই সময়ে, তুমি দিবাভাগে যেরূপ ছিলে তাহা আর নাই। হয় পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল না হয় খারাপ হইয়াছ। বেশ চিন্তা করিয়া দেখিবে, তোমার আত্মা ভিন্ন তোমার আর কোন সার বস্তু নাই। ধন-ঐশ্বর্য্যাদি পড়িয়া থাকিবে, এই সোনার গৃহ পড়িয়া থাকিবে; এই গড়ের মাঠ, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা পড়িয়া থাকিবে। এই শরীর আগুনে পুড়িয়া যাইবে। থাকিবে কেবল আত্মা। অতএব ঐ আত্মার উন্নতি-অবনতিই তোমার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঐ শুন, পরমাত্মা যেন জীবাত্মাকে বলিতেছেন—

"জীব! আশ্বস্ত হও; তুমি অমৃতের পুত্র। অমৃতত্ব তোমার উৎপত্তি, অমৃতত্বই তোমার পরিণাম।"

ভক্ত বলিবেন যে, এ সমুদায় কথা মনে লাগে না। ভক্ত বলেন যে—"আমি চাই

এমন ঈশ্বর, যাঁহাকে সব সময় দেখিতে পারি, সেবা করিতে পারি, আপদে বিপদে যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি।" কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ যদি অপরিবর্ত্তনীয় হয়, তাহা হইলে ভক্তির স্থান কোথায়? আমরা বলি, উহার মধ্যেও ভক্তির স্থান আছে। (আগামী বারে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করা যাইবে।)

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার অনুশীলন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৩৬। ব্রহ্মেতে জীবাত্মার যে আত্মবুদ্ধি, তাহাই মোক্ষ। জীবাত্মা, অমৃতের পুত্র হইয়া, বিজাতীয় অভিনিবেশ বশতঃ চিরকাল অবিদ্যার কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া, অনাত্ম দেহাদিকে আত্মা ভাবিয়া, হর্ষ-শোকে বিভ্রান্ত ছিলেন। তাহাতে, যিনি আপনার প্রকৃত আত্মা, যিনি প্রেমাস্পদ পিতা, যিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অন্য সর্ব্ব হইতে প্রিয়, সেই অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মাকে ভুলিয়া গিয়া, আপনি সেই কারাগারে, পরের ন্যায়, অনাথের ন্যায়, কয়েদীর ন্যায়, ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন; এবং কত জন্ম-জন্মান্তরে আপনার মত কয়েদীদের সহ পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ-সহোদরা-স্ত্রী-পুত্রাদি সম্বন্ধ বার বার পাতাইয়া ছিলেন এবং তাহাদের বিচ্ছেদে বার বার কতই ক্রন্দন করিয়াছেন; সেই অমৃতের পুত্র, এক্ষণে সেই পরম প্রেমাস্পদ বাঞ্ছনীয় ধন জনক দর্শন, স্পষ্ট জানিতে পারিলেন যে, কেবল মায়াস্বপ্ন দ্বারা সেই মায়াময় অবিদ্যার কারাগারে বদ্ধ ছিলেন। সে নিদ্রা এক্ষণ ভঙ্গ হইল।

৩৭। সামান্য কয়েদখালাসীর যেমন আপনার মাতা, পিতা, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, গ্রাম প্রভৃতি একেবারে জাজ্বল্যমান মনে পড়ে, সেইরূপ সংসার-কারামুক্ত পুরুষের আত্মাতেই, পুরাতন সম্পদ্‌বৎ পরম পিতা পরমাত্মার সহিত, পরমপ্রিয় আত্মধাম জাগরিত হয় এবং তখন তিনি সেই স্বধামে অনন্ত আনন্দময় অভয়প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সামান্য কয়েদী কয়েদখালাসের পর আপনার বাটীতে গেলেও তাহার কলঙ্ক থাকে; কিন্তু সংসার-কারামুক্ত পুরুষের তাদৃশ কোন কলঙ্ক থাকে না; কেননা, তাহা মহাস্বপ্নরূপিণী মায়ার খেলা মাত্র। আত্মজাগরণে তৎসমস্ত মিথ্যারূপে প্রতীয়মান হয় এবং তাঁহার নাম রূপ গুণ ও মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই তিরোহিত হয়। তাহাতে তাঁহার নির্ম্মল স্ফটিকবৎ আত্মস্বরূপে অবিদ্যার কলঙ্ক তিষ্ঠিতে পারে না।

৩৮। যাঁহারা এই বর্ত্তমান কালে বিজাতীয় বুদ্ধিপ্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া, ভারতীয় শাস্ত্রবিধি ও শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য জ্ঞান হতশ্রদ্ধার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই মনে করেন, ঈশ্বর জীবাত্মাসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা জীবের পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম মানেন না; কর্ম্মের

স্বর্গাদির স্বীকার করেন না এবং মনোবুদ্ধি-বিরহিত কোনরূপ মোক্ষে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মনুষ্যের পরলোক মানেন, তাঁহারা সেই অবস্থাকে স্বর্গ বা দেবলোক আখ্যা দেন এবং তাদৃশ পরলোকস্থ পুরুষের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির সত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত আত্মতত্ত্ব মানেন না, বুঝিতেও পারেন না।

৩৯। এই প্রকারের ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিতে ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বের আদ্যোপান্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী; এবং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডবাসী অনন্তকোটি জীবের কোটি কোটি জন্ম ও অসংখ্য প্রকার স্বর্গাদি ভোগের ব্যবস্থা, এবং অবশেষে মহামোক্ষের বিধান—এই সমস্ত তত্ত্ব স্থান পায় না। সুতরাং তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মবিদ্যার আদর নাই। অনেকে উপনিষৎ ও বেদান্ত পড়েন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উক্তপ্রকার ভ্রষ্টবুদ্ধি বিধায়, তাঁহারা সর্ব্বসামঞ্জস্যরূপে ভারতীয় শাস্ত্রার্থ গ্রহণে অসমর্থ।

৪০। বিশেষতঃ শাস্ত্রের আর একটী কথার এবং আত্মজ্ঞানীগণের একটি ব্যবহারে তাঁহারা বিস্মিত হয়েন। তাহা এই যে, আত্মজ্ঞানী পুরুষ লোকসংগ্রহার্থে জনকাদি ঋষির ন্যায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন। কেননা, এই সকল ধর্ম্মই যেমন সমাজ-রক্ষার হেতু, সেইরূপ আর্ত্তে ব্রহ্মবিদ্যা এবং আত্মজ্ঞান লাভের সোপান। তদ্ভিন্ন স্বর্গাদি জন্মান্তর শুভগতির একমাত্র কারণ। অতএব আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ পুরুষ এ সমস্ত অনুষ্ঠানে অবহেলা করেন না। গৃহস্থাশ্রমে আত্মজ্ঞ পুরুষের এই একটী বিশেষ লক্ষণ।

৪১। ফলতঃ আত্মজ্ঞানে জাগ্রত পুরুষের নিকট আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সংসার মায়াকল্পিত, সুতরাং মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, অন্য সকলের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া অবিদ্যার অধ্যাস বশতঃ ইহা চিরকাল সত্য; কেননা ইহার হেতুভূত কামকর্ম্মবাসনাময়ী যে অবিদ্যা-প্রকৃতি, জীবের ভোগসমাপ্তি অথবা আত্মজ্ঞান ব্যতীত, তাহা শতকোটী কল্প-কালেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। অতএব এই সংসারের এবং ইহার সৃষ্টি, পালন ও সংহারের কর্ত্তা ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশাদি ঈশ্বরগণের প্রবাহরূপ স্থায়িত্ব পক্ষে সন্দেহ নাহি এবং জীবগণ, আপনাদের কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ততকাল অবশ্য ভোগ করিবেক। সে জন্য সর্ব্বশাস্ত্রই গৃহস্থাশ্রমবাসী মানবগণকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও যজ্ঞদেবার্চনাদি শুভ-কর্ম্মানুষ্ঠানে উপদেশ করেন, যাহাতে জন্মান্তর শুভগতি ও চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। ব্রহ্মবিদ্যার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, মিথ্যা ও মায়াময় বলিয়া উদ্ধতভাবে ঈশ্বর, জগৎ ও ধর্ম্মাধর্ম্মকে উড়াইয়া দিবে। যে সৌভাগ্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিবেন, তাঁহাকে অতি সাবধানতার সহিত আত্ম-শাসন অবলম্বন করিতে হইবে। তিনি মনে রাখিবেন যে, লোকের বুদ্ধিভেদ করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার কর্ত্তব্য যে, তিনি আপনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক লোকদিগকে তদনুষ্ঠান শিক্ষা দিবেন। কেবল যাঁহাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে

ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে এবং বিধিবিহিত আশ্রমধর্ম্মপালনে উৎসাহ ও উপদেশ দান করিবেন।

৪২। কেবল জ্ঞানাধিকারে ঈশ্বর জগৎ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম মায়াময়। সে জ্ঞান অল্প-লোকেরই ভাগ্যে উদিত হয়। উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শনের ব্রহ্ম-উপদেশ সেই অল্প লোকের নিমিত্ত। তদ্ভিন্ন ঐ সমস্ত শাস্ত্রে নিম্নাধিকারীদিগের জন্য সগুণ দেবার্চ্চনাদি তাবত্ ধর্ম্মের উপদেশ আছে। সাংখ্য-দর্শনেও আত্ম-উপদেশের অবান্তর ঐ সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদেশ দৃষ্ট হয়। সৃষ্টি ও কর্ম্মের অধিকারে, উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন, কর্ম্মমীমাংসাদর্শন, সাংখ্যদর্শন এবং ন্যায়-দর্শন—ইঁহারা সকলেই জগৎ-জীবের ও জগদীশ্বরের প্রবাহরূপ ধ্রুবনিত্যতা স্বীকার করেন। অতএব ঈশ্বরকে, জগৎকে ও ধর্ম্মাধর্ম্মকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার পূর্ব্বে, ব্রহ্মজ্ঞানার্থী পুরুষ ভাল করিয়া শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন।

৪৩। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ ব্যবহারে সম্পূর্ণ সরলচিত্ত হইবেন। মনুষ্য প্রায়ই ধার্ম্মিক, ভক্ত, যোগী ও জ্ঞানীগণের কোন না কোন প্রকার অলৌকিক ভাব-ভঙ্গি দেখিতে ভালবাসেন। কিন্তু যে পুরুষ আত্মজ্ঞ, তিনি অলৌকিক ভাব বা বেশাদির পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার কোন বিশেষ উপাধি, বেশ এবং চিহ্ন নাই। তিনি গৈরিক বসন, দীর্ঘকেশ, জটাভার, মুণ্ডিত মস্তক প্রভৃতি কোন ধর্ম্মধ্বজা ধারণ করেন না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বদা ধ্যান—সমাধিতে ও নিমগ্ন থাকেন না; মধ্যে মধ্যে দশাপ্রাপ্তও হন না এবং ভাবের কথাও কন না। তিনি সাধারণতঃ গৃহস্থাশ্রমবাসী অন্যান্য বর্ণাশ্রমাচারী, দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত, নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি-দিগের শ্রেণীর একজন ব্যক্তি মাত্র। তাঁহার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, ক্রিয়া-কর্ম্ম এবং জীবিকা-সংগ্রহ, সমস্তই সরল, লৌকিক ও শাস্ত্রীয় যুক্তিসঙ্গত (rational), লোকের অনুদ্বেগকর এবং বহ্বারম্ভবর্জ্জিত। যে কার্য্য করিলে, তাঁহার নিজের ও পরের চিত্তবিক্ষেপ হয় বা সমাজের শান্তিভঙ্গ হয়, এমত কার্য্য হইতে তিনি নিবৃত্ত থাকেন। গৃহাশ্রমে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আত্মজ্ঞ পুরুষের সাধারণতঃ এই লক্ষণ। গৃহধর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞানীর কথা স্বতন্ত্র।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

ধ্বনি-বিচার।

—•:•:•—

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী "ধ্বনি-বিচার" নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটীতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে বলিয়া আমরা উহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিন্দু-পত্রিকায় সন্নিবেশিত করিলাম।

বাক্যের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। কিন্তু ঐ সম্বন্ধ কিরূপে আসিল, তাঁহা সুধীগণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। ভাষার কতকগুলি শব্দ যে স্বাভাবিক ধ্বনির অনু-করণে উৎপন্ন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে তাঁবার

উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতটা ইংরাজীতে পণ্ডিতেরা "অনোম্যাটোপিক্ থিওরি" বলেন।

ধ্বনির অনুকরণে যে শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে, উহা বাঙ্গালা ভাষায় সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। 'কা কা' করে বলিয়া কাকের নাম কাক, 'কুহু কুহু' করে বলিয়া কোকিলের নাম কোকিল, 'কেঁউ কেঁউ' করে বলিয়া কুকুরের নাম কুকুর। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতমূলক কিনা, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে লেখক ধ্বনির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াছেন।

বাঁশীতে ফু দিলে, তাহা হইতে ধ্বনি বাহির হয় এবং তাহা শুনিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করি। এই আনন্দে মুগ্ধ হইয়া গোপীগণ কদমতলায় বংশীধারী হরির পানে ছুটিতেন। ধ্বনিতে যেমন আনন্দের সম্পর্ক আছে, উহার সাথে নিরানন্দের সম্পর্কও আছে। ধ্বনি যেমন আনন্দদায়ক, কখন কখন উহা তেমনি ক্লেশদায়ক। কোন্ ধ্বনি কিরূপে কি ভাব জাগায়, তাহা পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন না; তবে কোন্ ক্ষেত্রে ধ্বনি মধুর হইবে এবং কোন্ ক্ষেত্রে ধ্বনি কর্কশ হইবে, তাহার একটা ভেদ নির্ণয় করিতে পারেন।

বাঁশী বাজাইলে, বাঁশীর ভিতর আবদ্ধ বায়ুটা কাঁপিয়া উঠে এবং বাহিরের বায়ুরাশিতে তরঙ্গ (wave) সৃষ্টি করে। সেই কম্পমান বায়ুর ঢেউগুলি কর্ণের ভিতর বায়ুযন্ত্রে আঘাত করে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধ্বনির জ্ঞান হয়। তরঙ্গের সংখ্যা হ্রাস ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনির কোমলতা ও তীব্রতা নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সংখ্যার ঠিক হিসাবও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তানপুরার তারে ঘা দিলেও ঐরূপ তারটা সজোরে কাঁপে, চারিদিকের বায়ুরাশিতে তরঙ্গ ঢেউ জন্মায় এবং তরঙ্গ পড়িলে আমরা ধ্বনি শুনিতে পাই। সরু তারে সেকেণ্ডে যত ঢেউ জন্মায়, মোটা তারে তার চেয়ে বেশী নামে; কাজেই তার যত মোটা হয়, ধ্বনি ততই নীচে নামে বা কোমল হয়।

আবার ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিশিয়া স্বরমাধুর্য্যের উৎকর্ষ বাড়ায়। বাঁশীর ভিতর সমস্ত বাতাসটা স্বর-সংযোগে কাঁপিয়া উঠে; আবার ঐ বাতাস আপনাকে দুই-তিন চারি সমান স্তরে ভাগ করিয়া লইয়া, এক এক ভাগে আপন আপন ধ্বনি জন্মাইয়া কাঁপে; কোন ধ্বনিটা তীব্র, অন্যটা কোমল। কোমলে তীব্রে মিশ্রিত হইয়া ধ্বনির মাধুর্য্য বাড়াইয়া দেয়। বাঁশীর ভিতরে বাতাস বা তন্ত্রী-যন্ত্রের তার যেমন আপনাকে সমান সমান ভাগ করিয়া লইয়া, মধুর ধ্বনি উৎপাদন করে, টেবিলের উপর কাঠ ঠক্ করিয়া ঠোকর দিলে, কাঠখানা কাঁপিয়া উঠে এবং কাষ্ঠফলকটা আপনাকে নানা ভাগে ভাগ করিয়া লয়; কিন্তু উহার ভাগগুলি এলো মেলো হইয়া পড়ে এবং ঐ সকল ভাগ হইতে যে সকল ধ্বনি জন্মে, তাহারা এক যোগে একটা কর্কশ শব্দ উৎপাদন করে; এইরূপে আমরা কর্কশ ও মধুর ধ্বনির উৎপত্তি বুঝিতে পারি। এখন

কিরূপে আমাদের স্বাভাবিক বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বুঝিব।

আমাদের বাগ্‌যন্ত্রটা অনেকটা বাঁশীর মত। ফুস্‌ফুস্ হইতে প্রশ্বাসের বায়ু মুখকোটরে আসিবার সময় কণ্ঠনালীর পেশীনির্ম্মিত তারে আঘাত দিয়া, ঐ তারকে কাঁপাইয়া দেয় এবং তারের কম্পে মুখকোটরের বায়ুর মধ্যে ঢেউ জন্মায়। সেই ঢেউগুলি মুখকোটর হইতে বাহিরে আসিয়া কর্ণগত হইলে, বাহিরে আসিয়া ধ্বনি জন্মায়। বাহির হইবার সময় কোথাও কোন বাধা বা আটক না পাইয়া বাহির হইলে, উহা স্বর বর্ণের উৎপত্তি করে, আর কোনস্থানে বাধা পাইলে, ব্যঞ্জনবর্ণের উৎপত্তি করে। মুখব্যাদান করিয়া বা বিবৃত করিয়া আমরা স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ করি। আর ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিবার জন্য বহির্গমনের বায়ুকে বাগ্‌যন্ত্রের কোন এক স্থানে আটকাইয়া ফেলি। কণ্ঠতন্ত্রী কাঁপাইয়া, কণ্ঠনালী হইতে বাতাস বাহির হইতেছে, এমন সময় ক্ষণেকের মত জিহ্বার গোড়াটা উপরে তুলিয়া কণ্ঠের দ্বার বন্ধ করিলে, ধ্বনি বাহির হইল 'ক'—উহা ব্যঞ্জন বর্ণ। জিহ্বা মূলের স্পর্শকালে উহার উৎপত্তি, এইজন্য উহারা জিহ্বমূলীয় স্পর্শবর্ণ। অথবা জিহ্বার মধ্যভাগ তালুকে স্পর্শ করিয়া বাতাস আটকাইলাম, আর ধ্বনি হইল 'চ'। উহা তালব্য স্পর্শবর্ণ, অথবা জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টাইয়া উপরে তুলিয়া, তালুর পশ্চাতে যেখানটাকে মূর্দ্ধা বলে, সেই খানটা স্পর্শ করিলে ধ্বনি হইল 'ট'। আবার জিহ্বার উপরিভাগ উপর পাটীর দাঁতে ঠেকাইয়া বাতাসটা বন্ধ করিবা মাত্র ধ্বনি জন্মিল 'ত'—উহা দন্ত্যস্পর্শবর্ণ। আর দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করিয়া, তাহার মধ্য দিয়া জোরে বাতাস ছাড়িলে, জন্মিল 'প'—উহা ওষ্ঠ্য স্পর্শবর্ণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নরকণ্ঠ একটা বাঁশীর মত। বাঁশীর ভিতর হইতে বাতাস অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইলে যে বহুক্ষণ স্থায়ী ধ্বনি জন্মায়, সে স্বরের ধ্বনি। সেই বাতাসের পথ রোধ করিলে, ক্ষণস্থায়ী ব্যঞ্জনের উৎপত্তি হয়। ব্যঞ্জন-ধ্বনির একটা লক্ষণ হইল, উহা ক্ষণস্থায়ী। এত অল্প সময় ব্যাপিয়া উহার স্থিতি যে, পূর্ব্বে বা পরে স্বর ধ্বনি না থাকিলে, উহার উচ্চারণ চলে না। আমরা 'কা' কি 'কু' ইত্যাদি স্বরান্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে পারি; আবার অক্, ইক্, উক্ এইরূপে আদিতে স্বর বসাইয়া ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণ বুঝিতে পারি; কিন্তু স্বরবর্জ্জিত খাঁটি ব্যঞ্জনটুকু উচ্চারণ করিতে পারি না। বায়ু কণ্ঠনালী হইতে মুখকোটরে বাহির হইবার সময় যদি বাধা পড়ে, সেই বাধায় সমকালে বাহির হয় ব্যঞ্জন ধ্বনি; বাধাটা সরিয়া গেলে যাহা আসে, তাহা স্বর।

খাঁটি স্বরের উচ্চারণে মুখ একেবারে খোলা বা বিবৃত থাকে; তবে মুখ-কোটরটার আকৃতি অনুসারে ঐ স্বরের বিকার উপস্থিত হয়। 'আ' উচ্চারণ সময়ে আমরা একেবারে বদন ব্যাদান করিয়া থাকি; তখন জিবেটা মুখগহ্বরের নীচে নামিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। 'ঈ' উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরে উঠিয়া তালুর নিকটবর্ত্তী হয়—জিহ্বার অগ্রভাগ নীচের পাটীর

দাঁতের পশ্চাতে আসিয়া পড়ে। মুখের কোটর তখন অনেকটা ছোট হইয়া পড়ে। 'উ' উচ্চারণের সময় মুখ-কোটর আরও ছোট হয়; দুই ঠোঁট কাছাকাছি আসে এবং দুই ঠোঁটের মাঝে একটী বিবর উৎপন্ন হয়। ঐ বিবরের দ্বার দিয়া বায়ু বহির্গত হয়। মুখ-গহ্বরের আকার ও আয়োজন-ভেদ অনুসারে স্বরের এইরূপ ভেদ হইয়া থাকে।

কোন্ কোন্ ধ্বনি মিশিয়া কি কি স্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে, জারম্যান্ পণ্ডিত হেলম্ হোলৎজ্ প্রথমে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। 'অ', 'ই', 'উ' প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরের মধ্যে কোনটার ভিতর কি কি ধ্বনি আছে, তাহা তিনি বিশ্লেষণ দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বিশ্লেষণে যে যে ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, সেই সেই ধ্বনি মিশাইয়া 'অ' 'ই' 'উ' প্রভৃতি স্বর যন্ত্রযোগে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এ সকল পদার্থ-বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা। ব্যাকরণের এত সূক্ষ্মতত্ত্বের খোঁজ নেওয়া হয় না। এখানে মোটামুটি হিসাব চলে। এই মোটা হিসাবে দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত বর্ণমালায় তিনটী বিশুদ্ধ স্বর আছে 'অ' 'ই' 'উ', এই তিন স্বরের প্রত্যেক আবার মাত্রা ভেদে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, এই তিনটী করিয়া রূপ আছে, যথা—অ, আ, আ৩; ই ঈ ঈ৩; উ, ঊ, ঊ৩; এই নয় স্বরের প্রত্যেকের আবার দুইটী করিয়া ভেদ আছে। নাক দিয়া কতক হাওয়া বাহির করিয়া আমরা প্রত্যেক স্বর উচ্চারণ করিতে পারি;—যথা—অঁ (অং) অথবা কণ্ঠনালী হইতে জোরের সহিত হাওয়া বাহির করিতে পারি—যথা—অঃ। এই দুই ভেদে অনুস্বার ও বিসর্গ ব্যঞ্জন কি স্বর, ইহা লইয়া একটা তর্ক আছে। বাস্তবিক উহা স্বরও নহে, ব্যঞ্জনও নহে। উহা স্বরবর্ণের বিকৃতি বুঝাইবার চিহ্ন মাত্র। উল্লিখিত নয়টী স্বরের এই দ্বিবিধ বিকার হইতে পারে, যথা—অং, অঃ, আং, আঃ; এইরূপে সমুদয়ে ২৭টী স্বর উৎপন্ন হয়। এই ২৭টী স্বর-ধ্বনি তিনটী মূল ধ্বনিরই (অ, ই, উ,) রূপভেদ মাত্র।

অ, ই, উ' ইহাদের পরস্পর সন্ধিতে কয়েকটী সন্ধ্যক্ষরে উৎপন্ন হয়, যথা—

অ + ই = এ	অ + এ = ঐ
অ + উ = ও	অ + ও = ঔ

এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত বর্ণমালায় ঋ ৯ দুইটী বর্ণ স্থান পায়। উহারা স্বর মধ্যে গণিত হইলেও, খাঁটী স্বর নহে। ঋ উচ্চারণের সময় প্রায়ই জিহ্বাগ্র স্পর্শ করে, ৯ উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বাগ্র প্রায়ই উপর পাটীর দাঁত স্পর্শ করে। প্রায় করে, একটু ফাঁক থাকিয়া যায়; এইজন্য ইহাদিগকে ব্যঞ্জনের মধ্যে না ফেলিয়া, স্বরের মধ্যে ফেলা হইয়াছে।

'ক' 'চ' 'ট' 'ত' 'প' এই স্পর্শবর্ণ কয়েকটী মুখ-কোটরের ভিন্ন২ স্থানের স্পর্শের ফলে উচ্চারিত হয়, দেখা গিয়াছে। প্রত্যেকের আবার রূপভেদ আছে।

স্পর্শের সময় একটু জোর দিলে, হাওয়াটা একটু জোরে বাহির হয়, তখন 'ক' পরিণত হয় 'খ'য়ে; 'চ' পরিণত হয় 'ছ'য়ে, ইত্যাদি। 'ক' 'চ' 'ট' 'ত' 'প' এই পাঁচটী অল্পপ্রাণ; খ ছ ঠ থ ফ, এই কয়েকটী মহাপ্রাণ।

আবার হাওয়ার পরিমাণ বেশী হইলে, 'ক' 'চ' 'ট' 'ত' 'প' যথাক্রমে 'গ' 'জ' 'ড' 'দ' 'ব'য়ে পরিণত হয়। ধ্বনির এই গাম্ভীর্য্যের পারিভাষিক নাম ঘোষ। এইরূপ প্রাণের ও ঘোষের তারতম্যে 'ক' বর্গ 'ক' 'খ' ও 'গ' 'ঘ' এই চারি রূপ গ্রহণ করে, আর উচ্চারণ কালে নাক দিয়া কতক হাওয়া আসিলে, উহার আনুনাসিক রূপ হয় ঙ। কাজেই জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ ক-বর্গের অন্তর্গত পাঁচটী বর্ণ ক খ গ ঘ ঙ; ঐরূপ তালব্য চ বর্গের অন্তর্গত চ ছ জ ঝ ঞ ইত্যাদি বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণগুলি এইরূপ সাজান যাইতে পারে।

স্পর্শবর্ণ।

	ঘোষহীন		ঘোষবান		আনুনাসিক		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ		সন্ধ্যক্ষর	উষ্ম
জিহ্বামূলীয়	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	—	—
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	য	শ
মূর্দ্ধণ্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	র	ষ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন	ল	স
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম	ব	—

সংস্কৃত বর্ণমালার বর্ণ 'হ'কে কণ্ঠ্যবর্ণ বলা চলে। অ যেন মহাপ্রাণ হইয়া 'হ'য়ে পরিণত হয়।

'য়' 'র' 'ল' 'ব' এই চারিটি অন্তস্থ বর্ণকে সন্ধ্যক্ষর রূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

য়= ই + অ, র= ঋ + অ ; ল= ৯ + অ, ব= উ + অ

উহাদের উচ্চারণে সম্পূর্ণভাবে মুখ বিবৃত থাকে না, আবার হাওয়া একেবারে আটকান পড়ে না; কাজেই উহারা না স্বর—না ব্যঞ্জন।

'শ' 'ষ' 'স' তিনটি বর্ণ আছে। জিহ্বা ঘেঁষিয়া বায়ু বাহির হইবার সময় বায়ুর ঘর্ষণে এই এই ধ্বনি জন্মে। ইহাদের নাম উষ্মবর্ণ—এবং যথাক্রমে এই তিনটীর উচ্চারণ তালু হইতে মূর্দ্ধা এবং দাঁতের গোড় হইতে বাহির হয়, এই জন্য ইহাদের পরস্পরের বিভিন্নতা।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে মনুষ্যের ভাষার অনেকাংশ নির্ম্মিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা নির্ম্মাণকার্য্যে এই অনুকরণ কতদূর চলিয়াছে, তাহাই বিচার্য্য। কতিপয় ধ্বনির একযোগে এক একটি শব্দ গঠিত হয়; এক শব্দের উপর এক বা একাধিক অর্থের আরোপ করা হয়; সেই শব্দের সেই অর্থ কোথা হইতে আসিল? গঠনে যে যে ধ্বনি উপাদান রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই ধ্বনির সহিত সেই সেই অর্থের কোনরূপ সম্পর্ক আছে কি না, তাহা দেখান আবশ্যক। তাহা হইলেই বুঝিতে

পারা যাইবে, কেন ঐ শব্দ ঐ রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় আলোচিত হইবে।

প্রথমে 'আ' 'ই' 'উ' এই স্বরত্রয়ের ভেদ কোথায়, তাহা দেখা যাউক। 'আ' উচ্চারণে আমরা বদন ব্যাদান করি; মুখ-কোটরের পরিসর ও আয়তন যথাশক্তি বাড়াইয়া লই 'ই' উচ্চারণে মুখ কোটরের আয়তন ছোট হইয়া পড়ে; 'উ' উচ্চারণে আরও ছোট হয়। 'আ' 'ই' 'উ' এই তিন স্বরের মধ্যে আ বড় বুঝায়; ই তার চেয়ে ছোট; উ আরও ছোট বুঝায়।

বাঙ্গালায় 'টা' 'টি' টু' এই তিনটী প্রত্যয় আছে। যথা একটা, একটি, একটু। 'একটা' বলিলে যত বড় বুঝায়, 'একটি' বলিলে তার চেয়ে ছোট বুঝায় এবং 'একটু' বলিলে আরও ছোট বুঝায়।

চকচকে জিনিষ বলিলে উজ্জ্বল জিনিষ বুঝায়, চিকচিকে জিনিষের ঔজ্জ্বল্য তার চেয়ে কম। চুকচুকে জিনিষের ঔজ্জ্বল্য বোধহয় তার চেয়ে আরও কম।

চন্‌চনে রৌদ্রের চেয়ে চিন্‌চিনে রৌদ্রের দীপ্তি কম। 'পটপটে' জিনিষ হাল্‌কা ও ভঙ্গপ্রবণ; 'পিটপিটে' জিনিষ আরও হাল্‌কা এবং 'পুটপুটে' জিনিষ এত ভঙ্গুর যে হাতে নাড়াচাড়া করা কঠিন।

এই কয়েকটী দৃষ্টান্তেই 'আ' 'ই' 'উ' এই তিন স্বর একই ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হইয়া কিরূপে ভিন্নভাব জ্ঞাপন করে, তাহা দেখান হইল। প্রবন্ধকার ব্যঞ্জনবর্ণ লইয়াও ঐরূপ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি অনুসারে অনেক গুলি শব্দের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহা দ্বারা মনে হয়, ভাষা ধ্বনির উপর সংস্থাপিত। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যাহাতে আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করে। কিন্তু ভাষার অন্তর্গত যাবতীয় শব্দেরই এইরূপে উৎপত্তি বুঝা যায় না। ইহাই প্রবন্ধকারের মন্তব্য।

আমরা উক্ত প্রবন্ধটীর সারমর্ম্ম এখানে দিলাম। প্রবন্ধকারের বুদ্ধিমত্তার আমরা প্রশংসা করি। তিনি দিন দিন এইরূপ স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত প্রবন্ধ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন করুন, এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

অভিধর্ম্ম বা বৌদ্ধদর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

সুখদুঃখাদি বেদনা কেবল যথাযথ দেখিয়া যাওয়া বা সদা স্মরণারূঢ় রাখা বেদানুপশ্যনাস্মৃতি।

চিত্তেরও সেইরূপ সরাগ, সদ্বেষাদি ভাব স্মরণারূঢ় রাখা চিত্তানুপশ্যনা স্মৃতি। ধর্ম্ম বা সংজ্ঞা ও সংস্কার ধর্ম্মকে সেইরূপ দেখা ধর্ম্মানুপশ্যনা স্মৃতি প্রস্থান। ইহারাই সম্যক্ স্মৃতি। তদ্ব্যতীত উহার সহায় দশ অনুস্মৃতি আছে। "অনু অনু শরণং অনুসত্তি" অর্থাৎ অনুক্রমে স্মরণ অনুস্মৃতি। তাহারা যথা—বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি (শ্রদ্ধাদি সমন্বয়াগত দেবতাদের গুণ আমাতে আসুক, এই ভাবে দেবচিন্তা), উপশমানুস্মৃতি (সর্ব্বদুঃখের উপশম স্মরণ),

মরণানুস্মৃতি, কায়গতস্মৃতি ও আনাপানস্মৃতি (শ্বাস-প্রশ্বাসের স্মরণ) এই দশ।

লোকোত্তর সমাধিই সম্যক্ সমাধি। কুশল চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। তাহার লক্ষণ অবিক্ষেপ; বিক্ষেপ বিধ্বংসন রস। অবিকম্পন প্রত্যুপস্থান এবং সুখ পদস্থান।

মূল অভিধর্মে সমাধির এত লক্ষণ আছে—স্থিতি, সংস্থিতি (সম্পিণ্ডিত ভাব), অবস্থিতি (অবগাহন ভাব), অবিসাহার (অবিসার ভাব বা অনৌদ্ধত্য), অবিক্ষেপ অবিসাহার মানসতা (মানসকার্য্যে একরূপ প্রবাহ), সমথ (শান্তি), সমাধীন্দ্রিয়, সমাধি-বল।

সমাধি অনেক প্রকারে বিভক্ত হয়, যথা—উপচার সমাধি, অপ্পনা সমাধি, লোকীয় সমাধি, লোকোত্তর সমাধি ইত্যাদি। উপচার (অর্থাৎ অপ্পনার সমীপচারী) অপক্ক সমাধি যেন শিশুর চলনের মত। আর অপ্পনা পরিপক্ক সমাধি যেন বলবান্ পুরুষের চলনের মত। লোকীয় সমাধি কামাবচরাদি ত্রিভূমিক লোকোত্তর সমাধি লোকোত্তর ভূমিক। সমাধি সাধনের জন্য "কর্ম্মস্থান গ্রহণ" করিতে হয়।

সমথ বা শান্তিসাধক কর্ম্মস্থান ৪০ সংখ্যক আছে। তন্মধ্যে যাহার যে গুলি প্রকৃতির অনুকূল, তাহা গ্রাহ্য। পূর্ব্বোক্ত দশ অশুভ ভাবনা, দশ অনুস্মৃতি, মৈত্র্যাদি চারি ব্রহ্মবিহার, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা (অন্নের অর্জ্জনাদি দোষ ভাবনা), ব্যবস্থান (পৃথিব্যাদির ধাতুর শরীরে কেশাদিরূপে যে ভাব আছে, তাহার ভাবনা), দশ কসিন ও আকাশানন্ত্যায়তনাদি চারি আরূপ্য-আলম্বন—এই সকলের নাম কর্ম্মস্থান।

বিতর্কাদি পঞ্চ সমাধাঙ্গ লোকীয় বা লোকোত্তর উভয় সমাধিতে সাধারণ। কসিন্ বা ধ্যাননির্ব্বর্ত্তক উপায় দশ প্রকার—(মতান্তরে অষ্ট প্রকার) পৃথিবী, আপো, তেজো, বায়ো, নীল, পীত, লোহিত, অবদাত (শ্বেত) আকাশ ও আলোক, এই দশ কসিন।

পৃথিবী কসিন এইরূপে সাধ্য—প্রথমে সর্ব্বপ্রকার বাহ্য চিন্তা ও শরীরধারণের অতিরিক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরুপদ্রব স্থানে অরুণবর্ণ গঙ্গামৃত্তিকার মত মৃত্তিকার এক তাল (বাসিনমণ্ডল) চক্ষুর সম্মোচ্চদেশে স্থাপিত করিয়া, তাহাকে নিকট হইতে স্থির চক্ষে দেখিতে থাকিবে। পরে চক্ষু বুজিলেও উহা (বাসিন মণ্ডল) যখন মনে মনে দৃষ্ট হইতে থাকিবে, তখন তাহাকে উগ্গহ নিমিত্ত বলা যায়। "পৃথিবী, পৃথিবী, পৃথিবী" এইরূপ নাম সহকারে ঐরূপ ধ্যান করিতে হয়। পরে উগ্গহ নিমিত্ত যখন কসিন-দোষশূন্য হয়, তখন তাহাকে প্রতিভাগ নিমিত্ত বলা যায়। এইরূপে প্রাপিত নিমিত্ত (তন্ময়তা) গ্রহণ করিয়া সবিতর্কাদি পঞ্চবিধ ধ্যান উৎপন্ন হয়।

কোন কুণ্ডিকা অনাবিল জলে পূর্ণ করিয়া আপো-কসিন ভাবনা করিতে হয়। দীপশিখা, দাবাগ্নি বা কোন অগ্নিতে তেজো-কসিন হয়। কোন পর্দায় অর্দ্ধ হস্তাধিক পরিমিত চক্রাকার ছিদ্র করিয়া, তন্মধ্য দিয়া তৎপ্রমাণ অগ্নি-রূপ দর্শন পূর্ব্বক তেজোকসিন্ ভাবনা করিতে হয়।

বায়ু শরীরে লাগিলে, তাহার অনুভব পূর্ব্বক অথবা ইক্ষু আদির ক্ষেত্র বায়ুর দ্বারা

স্পন্দিত দেখিয়া বায়ুর ধারণা পূর্ব্বক বায়ু-নিমিত্ত গ্রহণ করিতে হয়। কোন নীল পুষ্পের পত্রের দ্বারা এক করণ্ড পূর্ণ করিয়া নীল কসিন ভাব্য। পীত, লোহিত, অবদাত কসিনও ঐরূপ।

ভিত্তি-ছিদ্রাদি-আগত আলোকে আলোক-কসিন ভাব্য।

সেইরূপ বাতায়নাদিগত পরিচ্ছিন্ন আকাশে (ফাঁক স্থানে) আকাশ-কসিন্ ভাব্য। সুভাবিত হইলে, কসিনের প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। তদ্দ্বারা ঊর্দ্ধ, অধঃ, তীর্য্যক্, অদ্বয় (সর্ব্বদিগ্ব্যাপী) ও অপমাণ ভাবে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। *

কসিন-ফল রূপাবচরের অন্তর্গত। কসিন-ধ্যান হইতে কতকগুলি সিদ্ধি লাভ হয় এবং এতাবন্মাত্রধ্যায়ীরা রূপলোকে গমন করেন। যোগদর্শনোক্ত ভূতজয়জনিত সিদ্ধির সহিত কাসনজনিত সিদ্ধির প্রায় ঐক্য আছে। বিশুদ্ধমার্গের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কসিনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। উহাই বর্ত্তমানে কসিনধ্যায়ীদের একমাত্র অবলম্ব্য শাস্ত্র।

এস্থলে পঞ্চ প্রকার ধ্যানের বিবরণ যথাযথ অনূদিত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

বস্তুতঃ উহারা চিত্তৈশ্বর্য্যের এক এক প্রকার অবস্থা। যোগ ভেদে যথাযোগ্য ভাবে উহারা লোকীয় বা লোকোত্তর হয়।

তন্মধ্যে প্রথম ধ্যান যথা—কাম ও অকুশল কর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ (আভ্যন্তরিক বিবিক্ততাজনিত) প্রীতিসুখযুক্ত প্রথম ধ্যানে উপসম্পন্ন হইয়া বিহার † করেন।

দ্বিতীয় ধ্যান যথা—বিতর্ক ও বিচারের উপশম হইতে আধ্যাত্ম সম্প্রসাদন চিত্তের একাদি ভাব (একাগ্রতা), অবিতর্ক প্রীতি-সুখ (রূপ দ্বিতীয় ধ্যানে উপসম্পন্ন হইয়া বিহার করেন।

তৃতীয় ধ্যান যথা—প্রীতির (মানসসুখ) বিরাগ হইলে উপেক্ষক হইয়া বিহার করেন। (তখন) স্মৃত (স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞ (মানসিক ঘটনার বোধযুক্ত) হইয়া "কায়ে" সুখের প্রতিসংবেদন করেন। এ বিষয়ে আর্য্যেরা বলেন "উপেক্ষক স্মৃতিমান্ সুখবিহারী" ইতি এইরূপে তৃতীয় ধ্যানে উপসম্পন্ন হইয়া বিহার করেন।

চতুর্থ ধ্যান যথা—সুখ ও দুঃখের প্রহান হইলে, পূর্ব্বেকার সৌমনস্য ও দৌর্ম্মনস্য অস্তগত হইলে অ-দুঃখ, অ-সুখ, উপেক্ষা ও (অথবা উপেক্ষাজনিত) স্মৃতির পরিশুদ্ধিযুক্ত চতুর্থ ধ্যানে উপসম্পন্ন হইয়া বিহার করেন।

ইহার নাম ধ্যানে চতুষ্ক নয়। পঞ্চক-

---

* ভগবান্ পতঞ্জলিও বলেন—"পরমাণু পরম মহত্ত্বান্তোহস্য বশীকারঃ" বস্তুতঃ কসিন সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত ভূতের স্থূলরূপ ও স্বরূপ ধ্যান। ভূততত্ত্ব ধ্যানে সাংখ্যমতে শব্দাদি পঞ্চ গুণ আলম্বন করিতে হয়, কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন, গন্ধ, রস ও স্পষ্টব্য বিষয়রূপ লোকে নাই। নাই ইহা সত্য নহে, তবে মনুষ্যে উহারা রূপ অপেক্ষা সঙ্কুচিত বলিয়া তত গ্রাহ্য নহে।

† বিভঙ্গে 'বিহরতি' শব্দের এইরূপ অর্থ আছে, যথা—বিহরতীতি ইরিয়তি, পবত্ততি, পালেতি, যপতি, যাপেতি, চরতি, বিহরতি তেন বুচ্চতি বিহরতীতি।

সয়ে একবার বিতর্ক, পরে বিচার বিপ্রযুক্ত করিয়া দ্বিতীয় ধ্যানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

যোগদর্শনের সমাপত্তির (বৌদ্ধেরাও ইহাকে সমাপত্তি বলেন) সহিত ইহারা প্রায় তুল্য। ভিন্ন ভাষায় কথিত হওয়াতে এবং এই ধ্যান-লক্ষণ বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রাচীনতম অংশ বলিয়া, ইহা যোগীদের সম্যক্ দ্রষ্টব্য।

অতঃপর চারি আরূপ্যধ্যান কথিত হইতেছে চতুর্থ ধ্যান সহকারে আকাশ-কসিন ভাবনাপূর্ব্বক তাহা প্রসৃত করতঃ সেই আকাশানন্ত্যায়তন সংজ্ঞা যে ধ্যানে সংগত থাকে, তাহাকে আকাশানন্ত্যায়তন ধ্যান বলে। তাহাতে সর্ব্বশঃ রূপসংজ্ঞার সমতিক্রম হয়, প্রতিঘ সংজ্ঞার শব্দাদি জ্ঞানের অস্তগমন হয়, নানাত্ব সংজ্ঞার অমনসিকার হয়।

ইহা চতুর্থ ধ্যানের বিষয় বলিয়া অভিধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু প্রথমে "অনন্ত আকাশ" এই শব্দ পূর্ব্ব মানসিক বিচারের দ্বারা অনন্তভাব আনয়নের বিধি উক্ত (বুদ্ধঘোষ কর্ত্তৃক) থাকাতে, ইহা সবিচারাদিও প্রথমে হইবে। ইহা দ্বারা রূপের নির্ব্বেদ বিরাগ ও নিরোধ হয়।

যোগশাস্ত্রে ইহা তন্মাত্রতত্ত্ব। তাহাতেও বিষয়ের নানাত্ব ও শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াবস্থা নাশ হয় এবং উহা বিচারানুগত (সবিচার, নির্ব্বিচার) সমাপত্তির বিষয়।

বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন ধ্যানে আকাশানন্ত্যায়তন ছাড়িয়া তাহার বিজ্ঞান মাত্র লক্ষ্য করিতে হয়। আকাশানন্ত্যায়তন স্পৃষ্ট বিজ্ঞানের মনসিকার পূর্ব্বক ইহা সাধ্য। বিজ্ঞান আকারে অনন্ত নহে, কিন্তু মনসিকার বশে (মনসি-কাতব্ব বসেন) অনন্ত।

ঐ সর্ব্বগত বিজ্ঞান (মহদ্ বিষয়ক) "নাস্তি ২" * বা "শূন্য ২" এইরূপ আবর্জ্জন, মনসিকার ও প্রত্যবেক্ষণের দ্বারা যে বিজ্ঞানরহিত ভাব হয়, তাহাই আকিঞ্চন্যায়তন আরূপ্যের চরমধ্যান নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন। আকিঞ্চন্যায়তন অতিক্রম পূর্ব্বক সূক্ষ্মতম সংজ্ঞাবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যানই নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন।

তখন পটু সংজ্ঞাকৃত্য থাকেন না বলিয়া তাহা নৈবসংজ্ঞা এবং সূক্ষ্ম সংজ্ঞা থাকে বলিয়া তাহা 'ন অসংজ্ঞা'।

এই শেষ তিনটি সাংখ্যের অন্তঃকরণ তত্ত্বধ্যান—শেষটি বুদ্ধিতত্ত্ব, কারণ বুদ্ধি সংস্কার বা অনাত্মবোধের চরম সীমা। প্রাগুক্ত সমস্তই লৌকিক সমাধি; অতঃপর লোকোত্তর সমাধি কথিত হইতেছে। ইহাদের নাম চারি আর্য্যমার্গ। তন্মধ্যে 'স্রোত-আপত্তি' নামক প্রথম মার্গের বিবরণ এইরূপ—লোকোত্তর প্রথম ভূমির ধ্যান নির্য্যানিক বা সংসারবন্ধন ছেদ করিয়া গমনশীল, অপচয়গামীর বা জন্মক্ষয়কারীর তাহাতে অজ্ঞাতম্ জ্ঞাস্যামীতি-ইন্দ্রিয় হয়। (ইহার দ্বারা অদৃষ্ট, অজ্ঞাত, অপ্রাপ্ত, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ভাবের সাক্ষাৎকার হয়।)

---

* বিজ্ঞানরুদ্ধ হইলে, আকিঞ্চন্য ও নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞ ধ্যান হয়, কিন্তু ইহাকেও বিজ্ঞান স্কন্ধের সামিল ধরা হইয়াছে; অতএব এক তত্ত্ব বিজ্ঞান আনুমানিক বা representative বলিতে হইবে।

তখন কায়দুশ্চরিত, বাগ্দুশ্চরিত ও মিথ্যা-জীবের সমুদ্ঘাত হয়, অর্থাৎ উহাদের উৎপত্তির পথ সম্যক্ বন্ধ হয়। আর তাহাতে ধর্ম্মবিচয় নামক সম্বোধ্যঙ্গ প্রজ্ঞা হয়। এই কয়টী পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত সমাধি হইতে লোকোত্তর প্রথম মার্গের শেষ। বলা বাহুল্য, ইহাও সবিতর্কাদি চারি বা পঞ্চ ধ্যানের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

লোকোত্তর সকৃদাগামী নামক দ্বিতীয় মার্গের ধ্যানও নির্ব্বাণিক অপচয়গামী। ইহাতে কামরাগ ও ব্যাপাদ তনুতার প্রাপ্ত হয়। তাহাতে 'আজ্ঞা' ইন্দ্রিয় (অঞ্ঞিন্দ্রিয়) হয়। আজ্ঞা, জ্ঞাত, দৃষ্ট, প্রাপ্ত, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত সমস্তের সাক্ষাৎকারবতী, চরম প্রজ্ঞা *।

অনাগামী নামক তৃতীয় ভূমির ধ্যান নির্ব্বাণিক অপচয়গামী। তাহাতে কামরাগ এবং ব্যাপাদের অনবশেষ প্রহাণ হয়। ইহাতেও আজ্ঞা-ইন্দ্রিয় থাকে।

অর্হৎ নামক লোকোত্তর চরম ভূমিতে রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য (উদ্ধচ্চ), ও অবিদ্যার অনবশেষ প্রহাণ হয়। ইহাতে অঞ্ঞাতাবীন্দ্রিয় † হয়।

ইহাই নির্ব্বাণ। সংস্কারাদিশূন্য হেতু ইহা শূন্য ও রাগাদিনিমিত্তশূন্য হেতু ইহা অপ্রণিহিত (চরম গতি) এবং অনিমিত্ত বা দোষ শূন্য।

প্রাগুক্ত বিষয় সমস্ত পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, মোক্ষমার্গ বৌদ্ধদের সম্পূর্ণ আছে। তাহাতে অবশ্য ঋষিদের উদ্দিষ্ট মোক্ষপদে গমন হয়। কিন্তু মার্গ ও গতি এক হইলেও, সেই মার্গতত্ত্ব বুঝাইবার প্রণালী ভিন্ন। সাংখ্য ও বৌদ্ধের সে বিষয়ে কি ভেদ, তাহা আলোচনা করা যাউক। সাংখ্য সংকার্য্যবাদী বৌদ্ধ প্রতীত্য সমুৎপাদবাদী। ১০ ঘন ইঞ্চ পরিমিত মৃত্তিকা পিণ্ড পরিণত হইলেও ১০ ঘন ইঞ্চ থাকে, আবার পিণ্ড ঘট হইলেও এই পরিমাণ থাকে। পিণ্ড সম্যোগ্য ভাবে প্রসারিত হইয়া ঘট হয়। স্থূলতার হ্রাস এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থতার বৃদ্ধি সেই প্রসার। কতক-গুলি নিয়মের দ্বারা সেই পিণ্ডস্থ প্রসার ঘটরূপে বিকাশিত হয়। ইহার মধ্যে মৃৎ উপাদান বা সমবায়ীকারণ এবং অন্য নিমিত্ত কারণ। এইরূপে বলা যায়, মৃত্তিকা ঘট-রূপে পরিণত হইল বা ঘটের উপাদান

* প্রজ্ঞার লক্ষণ অভিধর্ম্মে এইরূপ আছে—প্রজ্ঞা প্রজাননা বিচয় (গবেষণা) প্রবি-চয়, ধর্ম্মবিচয় (ধর্ম্ম গবেষণা), সল্লক্ষণা, উপলক্ষণা, প্রত্যুপলক্ষণা (ভেদ করিয়া জানা) পাণ্ডিত্য, কৌশল্য, নৈপুণ্য, বেভব্যা (সমালোচনা) চিন্তা, উপপরীক্ষা (বিশ্লেষণ) ভূরিমেধা, মেধা, পরিণায়িকা (নায়ক-জ্ঞান), বিপশ্যনা, সম্প্রজ্ঞান, (প্রজ্ঞা) প্রতোদ, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞা-প্রদ্যোত, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, (তত্ত্বপরীত) ধর্ম্মবিচয় সম্যক্ দৃষ্টি।

পরবর্ত্তী পণ্ডিতের দ্বারা প্রজ্ঞা অনেক প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই বাগাড়ম্বর।

† অঞ্ঞাতঞ্ঞস্সামীতিন্দ্রিয় হইতে প্রথম মার্গের জ্ঞান হয়। আজ্ঞার দ্বারা প্রথম মার্গের ফল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মার্গ ও তৎফল এবং চতুর্থ মার্গ, এই ছয় বিষয়ের জ্ঞান হয়। অঞ্ঞাতাবীন্দ্রিয় (আজ্ঞাবিন্দ্রিয়) হইতে অর্হত্ত্বের ফল বা নির্ব্বাণের জ্ঞান হয়।

মৃত্তিকা। এইরূপে নিমিত্ত ও উপাদানে সমস্ত জগৎ বিশ্লেষ করিয়া সাংখ্যেরা প্রকৃতি রূপ চরম উপাদানে এবং পুরুষ রূপ চরম হেতুভূত (নিমিত্তে) উপস্থিত হন। এই সৎকার্য্যবাদে কার্য্য হইতে কারণে বা কারণ হইতে কার্য্যে অন্বিত এক যুক্তি অনুস্যূত থাকে। ইহাই সৎকার্য্যবাদের মূল তত্ত্ব। বস্তুতঃ কার্য্য কারণেই থাকে; কেবল কতকগুলি নিমিত্তের দ্বারা তাহার অভিব্যক্তি হয়।

বৌদ্ধমতে সমস্তই হেতু ও প্রত্যয় বা কেবল প্রত্যয়—অর্থাৎ উপকারক কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। হেতুও এক প্রকার প্রত্যয় বলিয়া গণিত হয়। অহেতুক অপ্রত্যয় কোন পদার্থ হয় না। কেবল অসংস্কৃত ধাতুই অহেতুক অপ্রত্যয়। তাঁহাদের কিন্তু (অন্ততঃ বিজ্ঞানের) উপাদান কারণ নাই।* তাঁহারা উপাদান নিমিত্ত সকলকেই "ধর্ম্ম" রূপ এক জাতিতে নিক্ষেপ করিয়া বিচার করেন। অর্থাৎ মৃৎ যেমন রূপাদি ধর্ম্মসমষ্টি, ঘটও সেইরূপ; মৃৎ নামক ধর্ম্ম সকল রূপ হেতু হইতে এবং অন্য হেতু ও প্রত্যয় হইতে ঘট (মৃদ্ধর্ম্ম সকলের সদৃশ ও বিসদৃশ) নামক ধর্ম্মসমষ্টি উৎপন্ন হয়।

ইহা বাস্তবিক সাংখ্যের বিরুদ্ধ নহে, কিন্তু অবিরুদ্ধ অন্য প্রকার দর্শন মাত্র।

সাংখ্য বিশ্লেষ পূর্ব্বক বিশেষের মধ্যে সাধারণ উপাদান আবিষ্কার করেন, ক্রমশঃ সাধারণতম অব্যক্ত নামক উপাদানে উপনীত হন। আর বৌদ্ধ সর্ব্বশেষে সমস্ত পদার্থের মূলে শূন্য পদার্থে উপনীত হন। কিন্তু বৌদ্ধেরা শূন্যকে অভাব মাত্র বলেন না। "শূন্য রূপেণ কৌশিক তিষ্ঠতি" "রূপী রূপাণি পশ্যতি শূন্য" "আকিঞ্চন্য ধ্যান" ইত্যাদি অবস্থানযোগ্য ও ভাবনাযোগ্য শূন্য কখনও অভাব মাত্র নহে।

এইরূপ শূন্য অব্যক্তের সহিত প্রায় তুল্য। বৌদ্ধেরা প্রতীয়মান অবিশিষ্ট পদার্থের মূল শূন্য বলেন। সাংখ্য অবিশিষ্টকে বিশ্লেষ করিয়া, পরে মূলে অব্যক্তকে স্থাপিত করেন।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন মৌলিক পদার্থকে কারণ মধ্যে গণনা করেন না। তাঁহাদের পঞ্চস্কন্ধের কোনও সামান্য উপাদান নাই। তাঁহাদের আকিঞ্চন্য বোধ এবং নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায় সূক্ষ্ম স্বীকৃত থাকিলেও, তাঁহারা সংজ্ঞাস্কন্ধ বা বিজ্ঞানস্কন্ধের কিরূপে অন্তর্গত, তাহা স্পষ্ট নহে। পরন্তু অনন্ত বিজ্ঞানের নিরোধ করিয়া সেই অবস্থায় যাইতে হয়, এরূপ উপদেশ আছে।

সাংখ্য বুদ্ধি, অহংকার ও মনঃ নামক সূক্ষ্ম বোধ, ক্রিয়া ও ধারণা শক্তিকে প্রতীয়মান বিজ্ঞানের বা চিত্তের সামান্য উপাদান স্থির করেন।

তবে পূর্ব্বকর্ম্মের ধর্ম্ম বা অতীত ধর্ম্ম

---

* মতান্তরে প্রত্যয় বা প্রত্যয়োপনিবন্ধ কতকটা উপাদান কারণের সমার্থক। "অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ পৃথব্যপ্তেজোবায়্বাকাশ বিজ্ঞান ধাতূনাং সমবায়াদ্ভবতি কায়ঃ। তত্র কায়স্য পৃথিবী ধাতু কাঠিন্যাভিনির্ব্বর্ত্তয়তি" ইত্যাদিতে পৃথিবী আদি ধাতু (যদিও ধাতু অসংস্কৃত) স্বরূপ প্রত্যয়োপনিবন্ধ উপাদান কারণের প্রায় তুল্য।

এবং প্রত্যুৎপন্ন ধর্ম্মের হেতুতা সম্বন্ধ ব্যতীত অন্যান্য সম্বন্ধ আছে কিনা, তদ্বিষয়ে সাংখ্য ও বৌদ্ধের মতভেদ হইতে পারে। ইহাই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের মূল। বৌদ্ধ অতীত ও বর্ত্তমান ধর্ম্মের হেতুতা ও হেতুজন্যতা ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সাংখ্যেরা তৎপ্রতিকূলে যে যুক্তি দেন, বৌদ্ধেরা তাহার এ পর্য্যন্তও সদুত্তর দিতে পারেন নাই।

বৌদ্ধ দর্শনের প্রণালী সংক্ষেপতঃ এইরূপ:—রূপ নামক কতকগুলি বাহ্য ও আধ্যাত্ম ধর্ম্ম আছে, আর সংজ্ঞা-বেদনাদি কতকগুলি অরূপ ধর্ম্ম আছে। রূপের মধ্যে প্রসাদ রূপ (জ্ঞানেন্দ্রিয়) রূপ ও অরূপের ঘটন স্থান। তদ্দ্বারা রূপ ধর্ম্ম-সংজ্ঞিত, বেদিত, সংস্কৃত ও বিজ্ঞাত হয় এবং অরূপ ধর্ম্ম রূপাহার ও আত্মঅরূপের পুনরাহারে (স্পর্শাহার, মনঃসঞ্চেতনাহার ও বিজ্ঞানাহার) জীবিত থাকে। অরূপ ধর্ম্মের এই জীবনের ফল প্রধানতঃ দুঃখ এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহ, এই তিন হেতু আহারের প্রবর্ত্তক।

অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহের দ্বারা সেই দুষ্ট আহারের নিবৃত্তি হইলে, সেই দুঃখময় অরূপধর্ম্মের জীবনের শান্তি হয়। তাহাই পরম সুখ বা নির্ব্বাণ। তখন যাহা থাকে, তাহার নাম অসংস্কৃতধাতু। পঞ্চস্কন্ধকেই আমরা "আত্মা" নামে ব্যবহার করি; কিন্তু তখন পঞ্চস্কন্ধ নিরুদ্ধ হয় বলিয়া সেই অবস্থা অনাত্মা।

বৌদ্ধদর্শনে "নির্ব্বাণ সুখের ভোক্তা কে?" এ প্রশ্নের সদুত্তর নাই। আর অসংস্কৃত ধাতুর সহিত সত্ত্ব বা জীবের সম্বন্ধ কি, তাহারও সদুত্তর নাই। পঞ্চস্কন্ধই কি নিজের নিরোধের চেষ্টা করে? "আমি" নির্ব্বাণ-সুখের জন্য বরাবর চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নির্ব্বাণের সঙ্গে "আমি"র সমস্তই ধ্বংস হইল; কেবল অসম্বন্ধ অসংস্কৃত ধাতু রহিল!! আর যদি বল, 'সউপাধিশেষ' নির্ব্বাণে নির্ব্বাণের (মনোবিজ্ঞান ধাতুজ) বিজ্ঞানই পরম সুখ; তাহা হইলে, নির্ব্বাণসুখ আজীবন মাত্র স্থায়ী হয়।

এই সব বিষয়ের সদুত্তর প্রচলিত বৌদ্ধ ব্যাখ্যান-প্রণালী হইতে হয় না। বুদ্ধের পর ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচলিত বৌদ্ধদর্শন রচিত হয়; সুতরাং ইহাতে মূলের বিশুদ্ধতা সম্যক্ রক্ষা পাইয়াছে কি না, তাহাতে সংশয় আছে

যাহা হউক, বৌদ্ধ ও আর্য্যগণ ভিন্ন ২ পথ দিয়া যখন নির্ব্বাণরূপ একই শিখরে উপনীত হন, তখন তাঁহাদের ভিন্নতা থাকিলেও বিরুদ্ধতা নাই। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে Hume এর প্রণালী কতকটা বৌদ্ধের মত। Hume বলেন "We have therefore no idea of substance distinct from that of collection of particular qualities * * *. The idea of substance as well as that of mode, is nothing but a collection of simple ideas, that are united by the imagination and have a particular name, assigned them, by which we are able to recall to ourselves or others, that collection. The difference betwixt these ideas consists in this, that the particular qualities

which form a *substance* are commonly referred to an *unknown something* in which they are supposed to inhere or at least supposed to be closely and inseparately connected by the relations of contiguity and causation.

(—Works I. P. 32.)

কথাগুলি প্রায় সত্য, কিন্তু সাংখ্যের মূল substance বা প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত নহে। শক্তি পদার্থ যেরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, উহাও সেইরূপ জ্ঞাত। অনুমান প্রমাণের দ্বারা শক্তির সত্তা নিশ্চয় হয়, কিন্তু ক্রিয়ার মত মনে উহার ধারণা বা image হয় না। বৌদ্ধদেরও চরমে অসংস্কৃত ধাতুরূপ nonmenon স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাঁহারা নিয়ে কেবল phenomena লইয়া বিচার করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

অভিধর্ম্মপাঠীদের কতকগুলি বর্গ বা গুচ্ছক স্মরণ না রাখিলে বিশেষ অর্থের অবগতি হয় না। সে কারণ এ স্থলে কতকগুলি বর্গ উক্ত হইতেছে।

৪ আসব—আসব অর্থে আশ্রব বা বিষয়প্রবৃত্তি। বুদ্ধঘোষ উহাকে আসব বা মত্ত অর্থেই ব্যাখ্যা করেন। তাহারা যথা—কামাসব, ভবাসব, * দৃষ্টাসব (কুমত) অবিদ্যাসব।

* কাম ও ভব সর্ব্বত্রই কামলোকে ও ভবে (জন্মে বা সংসারে বর্ত্তমান থাকায়) তৃষ্ণা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৪ ওঘ—ওঘ বা বন্যা—যাহা দুঃখময় সংসারে ভাসাইয়া লইয়া যায়। উপরোক্ত চারিটীই ওঘ।

৪ যোগ—উপরোক্ত কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যাই যোগ বা বন্ধন।

৪—অভিজ্ঝা (লোভ)—কায়গ্রন্থি, ব্যাপাদকায় গ্রন্থি, শীলব্রত-পরামর্শ কায়গ্রন্থি ও ইদংসত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি। তৃতীয়টী সামান্য পুণ্য কর্ম্মেই জীবন যাপন করা।

৪ উপাদান—কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত, আত্মবাদ। উপাদান অর্থে গ্রহণ, যেমন সর্পের ভেক-গ্রহণ।

৬ নীবরণ—নীবরণ নির্ব্বাণের বাধা। কামচ্ছন্দ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা ও অবিদ্যা।

৭ অনুশয়—কামরাগ, ভবরাগ, প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও অবিদ্যা। ১০ সংযোজন—৭ অনুশয় ও শীলব্রত, ঈর্ষা এবং মাৎসর্য্য।

১০ ক্লেশ—লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্ত্যান (থিনং), ঔদ্ধত্য (উদ্ধচ্চং), অহ্রীকতা ও অনৌত্তপ্য (অনোত্তপং)।

উপরোক্ত সমস্তই পাপ।

৭ ধ্যানাঙ্গ—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, একাগ্রতা, সৌমনস্য, দৌর্ম্মনস্য ও উপেক্ষা।

১২ মার্গাঙ্গ—অষ্ট আর্য্যমার্গ এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা ব্যায়াম ও মিথ্যা সমাধি।

৯ বল—শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, হ্রী, উত্তপ্য, অহ্রীকতা ও অনৌত্তপ্য।

৪ অধিপতি—ছন্দ, চিত্ত, বীর্য্য ও মীমাংসা। অধীন প্রবৃত্তি সকলের পতীভূত ধর্ম্মই অধিপতি। ছন্দ বা ইচ্ছা থাকিলে সবই সিদ্ধ হয়; অতএব পূর্ব্ব সংস্কারবশে প্রবল ছন্দ, যাহার অধীন অন্য কতকগুলি ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়, তাহাই ছন্দাধিপতি। চিত্তাদি অধিপতিও সেইরূপ। মীমাংসা অর্থে যুক্তিপূর্ব্বক গবেষণা বা বিচার।

৪ আহার—কবলিঙ্কার (অন্ন) স্পর্শ, মনঃসঞ্চেতনাহার (অকুশল ও কুশল জন্ম গ্রহণ) এবং বিজ্ঞানাহার (সেই জন্ম বা প্রতিসন্ধির বিজ্ঞান যে সহজাত নাম রূপকে আহরণ করে, তাহা)।

ইহারা মিশ্রবর্গের অন্তর্গত।

৪ স্মৃতিপ্রস্থান—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

৪ সম্যক্ প্রধান—প্রধান অর্থে বীর্য্য—উৎপন্ন পাপধর্ম্মের প্রহানের জন্য বীর্য্য, অনুৎপন্ন পাপধর্ম্মের অনুৎপাদনের জন্য বীর্য্য, অনুৎপন্ন কুশলধর্ম্মের উৎপাদনের জন্য এবং উৎপন্নের ভূয়ি ভাবের জন্য বীর্য্য।

ইহারাই সম্যক্ ব্যায়াম।

৭ বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি (সম্যক্) ধর্ম্মবিচয় (আর্য্যসত্য প্রজ্ঞা), বীর্য্য (সম্যক্ ব্যায়াম), প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা।

এই সমস্ত বোধিপক্ষীয়ের অন্তর্গত।

৫ স্কন্ধ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।

৫ উপাদানস্কন্ধ—রূপাদিরা উপাদান স্কন্ধই দুঃখ।

১২ আয়তন—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মনঃ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম্ম। [illegible]

১৮ ধাতু—চক্ষুধাতু [illegible] মনোধাতু ধর্ম্মধাতু ৬ এবং চক্ষুরাদি ছয়ের বিজ্ঞান। ধাতু শব্দের কি অর্থে ব্যবহার হয়, তাহা অস্পষ্ট। চক্ষু ও চক্ষুধাতুর কি ভেদ, তাহা বৌদ্ধেরা বলিতে পারেন না। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে চক্ষুই চক্ষুধাতু। "যাহারা আপনার স্বভাব ধারণ করে, তাহারাই ধাতু; অথবা ভারীরা যেরূপ ভার বহন করে, সেইরূপ সত্ত্বেরা দুঃখরূপে যাহাদের বিধারণ করে তাহারা ধাতু।" ধাতুর এইরূপ অস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ধাতুর মধ্যে নির্ব্বাণ ধর্ম্ম-ধাতুর অন্তর্গত (কারণ নির্ব্বাণ এক ধর্ম্ম)। বুদ্ধঘোষের উক্তি হইতে বোধ হয় চক্ষু-রাদিরা মূলতঃ নিঃসত্ত্ব ও নির্জীব, এই তত্ত্ব ধাতু শব্দ সূচিত করে। কিন্তু তিনি আবার বলেন, যেমন স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতু বা যেমন অস্থিমজ্জাদি শরীর-ধাতু, চক্ষুরাদি ধাতুও সেইরূপ।

সম্বর্ত্ত ও বিবর্ত্ত—সম্বর্ত্ত ও বিবর্ত্ত সাংখ্যের প্রতিসর্গ ও সর্গের তুল্যার্থক। দীর্ঘ নিকায়ের অগ্গঞ্ঞ সুত্তে এবং বিশুদ্ধিমার্গের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ইহার যে বিবরণ আছে, তাহার সার সঙ্ক-লিত হইতেছে। 'পরিহায়মান' কল্পের নাম সম্বর্ত্ত ও বর্দ্ধমান কল্পের নাম বিবর্ত্ত। সম্বর্ত্ত বা লয় তিন প্রকারে হয়, যথা—আপসম্বর্ত্ত, তেজঃসম্বর্ত্ত, ও বায়ুসম্বর্ত্ত।

যখন তেজের দ্বারা কল্পের সম্বর্ত্ত হয়, তখন আভাস্বর দেবতাদের নিম্ন সমস্ত লয় হয়, আর আপ সম্বর্ত্তে [illegible]

দেবদের ও বায়ুসম্বর্ত্তে শিহায়স্কৃৎ দেবদের নিম্ন পর্য্যন্ত সমস্ত নাশ হয়।*

তেজঃ সম্বর্ত্তের প্রথমে কল্পান্তকালীন মহামেঘ উৎপন্ন হইয়া শত সহস্র চক্রবাল পর্য্যন্ত বর্ষাবর্ষণ করে। পরে পর্জ্জন্য প্রচ্ছিন্ন বর্ষাধারা বন্ধ হইয়া যায়। তাহার দীর্ঘকাল পরে সমস্ত জীব মৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে যায়।+ ধ্যান ব্যতীত ব্রহ্মলোকে যাওয়া যায় না, তজ্জন্য বুদ্ধঘোষ বলেন—সেই সময়ে কামাবচর দেবেরা নগ্নশির, বিকীর্ণকেশ, রুদন্মুখ হইয়া ও হস্তের দ্বারা অশ্রু মুছিতে মুছিতে অতি বিরূপ বেশে মনুষ্য পথে বিচরণ পূর্ব্বক দুর্ভিক্ষ্যাদ-পীড়িত মনুষ্যদের বলেন, "হে মনুষ্যগণ, এই লোক বিলীন হইবে, তোমরা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা কর; পিতা, মাতা ও কুলজ্যেষ্ঠদের পূজা কর" ইত্যাদি। তাহাতে প্রায় মনুষ্য ধ্যানপরায়ণ হইয়া দেবলোকে যায়; তথায় দিব্যসুধা ভোজন করিয়া, বায়ু কসিনের পরিকর্ম্ম পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করে। অবশিষ্টেরা অপরাপরীয় বেদনীয় + কর্ম্মের দ্বারা দেবলোকে ও পরে উক্তরূপে ব্রহ্মলোকে যায়। পরে বহু কাল

---

* ইহা বুঝিতে হইলে বৌদ্ধদের জীবযোনির বিবরণ জানা আবশ্যক। বৌদ্ধ মতে সত্ত্বদের চারি উৎপাদভূমি আছে। ভূমি অর্থে 'যেরূপে হয়' অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধের বিশেষ বিশেষ বাচক। অপায় ভূমি, কামসুগতি ভূমি রূপাবচর ভূমি ও অরূপাবচর ভূমি, এই চারি ভূমিতে সমস্ত লোকের সত্ত্বগণ বর্ত্তমান আছে।

(১) অপায় ভূমি—নিরয় (অবীচি আদি), তির্য্যক্ যোনি, পেত্তিবিষয় (পার্থিব প্রেত বা earth-bound spirits) ও অসুরকায়, এই চতুর্ব্বিধ।

(২) কামসুগতি ভূমি—মনুষ্য, চাতুর্ম্মহারাজিক, ত্রয়স্ত্রিংশদেব (ইন্দ্রাদি), যামা, তুষিত, নির্ম্মাণ রতি ও পরিনির্ম্মাণ বশবর্ত্তী, এই সপ্ত প্রকার।

(৩) রূপাবচর ভূমি—ব্রহ্মপরিষদ, ব্রহ্মপুরোহিত, মহাব্রহ্মা (এই তিন প্রথম ধ্যানভূমি)। পরিত্তাভ, অপ্রমাণাভ, আভাস্বর (এই তিন দ্বিতীয় ধ্যানভূমি)। পরিত্তশুভ, অপ্রমাণশুভ, শুভকৃৎস্ন (এই তিন তৃতীয় ধ্যানভূমি)। বিহায়স্কৃৎ, অসংজ্ঞসত্ত্ব ও শুদ্ধাবাস (চতুর্থ ধ্যানভূমি)। শুদ্ধাবাস সত্ত্বেরা আবার পঞ্চবিধ, [illegible] [illegible] সবিতর্কাদি [illegible] ধ্যানের (রূপবিরাগ) দ্বারা রূপাবচর ভূমি লাভ হয়।

(৪) অরূপাবচর ভূমি—আকাশানন্ত্যায়তন ভূমি, বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন ভূমি, আকিঞ্চন্যায়তন ভূমি ও নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ভূমি—এই চতুর্ব্বিধ।

ইহার মধ্যে পঞ্চ শুদ্ধাবাস ভূমিকে কখনও সাধারণ মানব, স্রোতআপন্ন ও সকৃদাগামীরা লাভ করে না। আর্য্যেরা অপায় ভূমি ও অসংজ্ঞ সত্ত্ব ভূমি লাভ করে না। শেষ ভূমি সকলকে আর্য্য ও অনার্য্য সকলেই লাভ করিতে পারে।

\+ "অপরে অপরে দিট্‌ঠধম্মাতো অঞ্ঞস্মিং যথ কথচি বেদিতব্বং কম্মং অপরাপরিয় বেদনীয় (বিভা)।" অর্থাৎ যে কর্ম্ম দৃষ্ট জন্ম ব্যতীত অন্য যে কোন জন্মে সফলীভূত হয়, তাহাই অপরাপরবেদনীয়। বিপাকের কাল বশে বৌদ্ধেরা কর্ম্মকে চারি প্রকারে বিভাগ করেন, যথা—দৃষ্টধর্ম্ম বেদনীয়, উপপদ্য বেদনীয়, অপরাপরীয় বেদনীয় এবং অহোসি কর্ম্ম।

গত হইলে, দ্বিতীয় সূর্য্য প্রকাশিত হয়। তদ্ধেতু তখন রাত্রি-দিনের ভেদ আর থাকে না। এইরূপে ক্রমশঃ সপ্ত সূর্য্য প্রকাশ পায়। সেই কালের মধ্যে সিংহপাতন—হংসপাতনাদি মহাহ্রদ ও নদী-সমুদ্রাদি সব শুষ্ক হইয়া যায়। সকল (শত সহস্র কোটি) চক্রবাল একজ্বালা হইয়া সেই অগ্নিজ্বালা সুমেরুর উপরে উঠিয়া চাতুর্মহারাজিক দেবদের গ্রহণ করে। পরে সুমেরুস্থিত কনকবিমান, রত্নবিমান ও মণিবিমান আচ্ছাদিত করিয়া সেই অগ্নিজ্বালা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবদের গ্রহণ পূর্ব্বক আভাস্বর লোক পর্য্যন্ত যায়। যতকাল সংস্কার থাকিবে, ততকাল সেই অগ্নি জ্বলিয়া, ঘৃত বা তৈলের অগ্নির মত সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া নির্ব্বাপিত হয়। তখন নীচের ও উপরের আকাশ এক হইয়া যায় ও মহান্ধকার হয়। ইহাই সম্বর্ত্ত।

তাহার দীর্ঘ কাল পরে পুনশ্চ মহামেঘ উত্থিত হইয়া অত্যন্ত বর্ষণ পূর্ব্বক শত সহস্র কোটি চক্রবালের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত জলে পূরিয়া, অন্তর্হিত হয়। বায়ু সমুত্থিত হইয়া, সেই জলকে সর্ব্বদিকে ঘন ও গোলাকার করে (যেন পদ্মিনী-পত্রস্থ জলের মত)। বিবর দানের দ্বারাতেই (মধ্যে মধ্যে ফাঁক্ করিয়া) সেই মহোদক ঘন হয়। বায়ুর দ্বারা সম্পিণ্ডীয়মান ও পরিক্ষীয়মাণ সেই উদক অবতরণ করিলে, ব্রহ্মলোকের নীচের চারি দেবলোক প্রকাশ পায়। পূর্ব্ব পৃথিবীর স্থান পর্য্যন্ত জল অবতরণ করিলে, বলবান্ বায়ু সকল উৎপন্ন হইয়া রুদ্ধ হয় ও জল নিরুচ্ছ্বাস হয়। সেই মধুরোদক পরিক্ষীণ হইলে, উপরে রস-পৃথিবীকে সরের মত উত্থাপিত করে। তখন ব্রহ্মলোকের প্রথমোৎপন্ন আভাস্বর দেবেরা আয়ুক্ষয়ে বা পুণ্যক্ষয়ে, সেই লোক হইতে চ্যুত হইয়া, ইহলোকে স্বয়ম্প্রভ অন্তরীক্ষচর হইয়া উৎপন্ন হয়। তাহারা সেই রস-পৃথিবী আস্বাদ করতঃ তৃষ্ণাভিভূত হইয়া স্বয়ংপ্রভত্ব হারায়। তখন অন্ধকারে তাহারা ভীত হয় ও পরে তাহাদের ভয় নাশ করিয়া সূর্য্য প্রকাশিত হয়। ভয় নাশ করিয়া তাহাদের 'শূরভাব' (শূরতা) উৎপাদন করাতেই 'সূরিয়' নাম হইয়াছে। সেইরূপ রাত্রির অন্ধকার নিবারণের 'ছন্দ' হইবার পর চন্দ্র উৎপন্ন হওয়াতে চন্দ্র নাম হইয়াছে। চন্দ্র-সূর্য্যের পর সুমেরু, হিমবান্ ও চক্রবাল পর্ব্বত প্রকাশিত হইয়াছিল। যেমন ভাত পাক করিতে গেলে তাহা ফুটিয়া কোন স্থানে স্তূপ স্তূপ হয়, কোন স্থানেবা নিম্ন নিম্ন হয়, সেইরূপ নিম্ন স্থানে সমুদ্র ও স্তূপ সকল পর্ব্বত হয়।

অনন্তর সেই রস-পৃথিবী ভোজন করিতে করিতে সত্ত্বদের কেহ কেহ সুবর্ণযুক্ত ও কেহ কেহ দুর্ব্বর্ণ হইয়া যায়। তখন সুবর্ণেরা দুর্ব্বর্ণদের অবজ্ঞা করে ও তাহাদের সেই অবজ্ঞা-রূপ দুষ্কর্ম্মের জন্ম রসপৃথিবী অন্তর্হিত হয়। পরে ভূমি-পর্পটী উৎপন্ন হয়। পরে পূর্ব্ব কারণে তাহাও অন্তর্হিত হয়। পরে 'পদালতা' (মিষ্টলতা) উৎপন্ন হয় ও তাহাও যায়।

পরে 'অকৃষ্টপাক' শালি উৎপন্ন হয়। তাহা কণতুষাদিশূন্য ও শুদ্ধ। ইহার পর সত্ত্বেরা ভোজন আরম্ভ করে। তাহারা

তাহলে সেই শালি দিয়া পাষাণ পৃষ্ঠে স্থাপন করিলে, স্বয়ং অগ্নিশিখা উৎপন্ন হইয়া তাহা পাক করে। তাহা পুষ্পসদৃশ ওদন হয় এবং তাহাতে সূপ-ব্যঞ্জনাদির প্রয়োজন হয় না। সেই স্থূল আহার হইতে সত্ত্বদের মূত্র-পুরীষ উৎপন্ন হয় এবং তাহার নিষ্ক্রমণ-পথও হয়। নিষ্ক্রমণপথ স্ত্রী ও পুরুষের স্বীয় স্বীয় ভাবেই উৎপন্ন হয়। তখন পুরুষেরা স্ত্রীদের ও স্ত্রীরা পুরুষদের সর্ব্বদা ভাবনা (অতিবেলং উপনিজ্ঝায়তি) করাতে কাম-পরিদাহ ও তৎপরে মৈথুন-ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সেই অসদ্ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ করাতে বিজ্ঞদের দ্বারা ভৎর্সিত হইতে থাকিলে, তাহারা সেই অসদ্ধর্ম্ম লুকাইবার জন্য আগার নির্ম্মাণ করে। পরে তাহারা ধান্য সঞ্চয় করে ও ক্রমে তুষ ও কণ তণ্ডুলের সহিত দৃষ্ট হয়। পরে কেহ কেহ অন্যের অদত্ত গ্রহণ করিতে লাগিল। অদত্তা-দায়ীদিগকে ২। ৩ বার বারণ করিয়াও না শুনাতে, পরে পাণিলেড্ডু (কিল ঘুসি) প্রহারপূর্ব্বক দণ্ড দিতে লাগিল।

এইরূপে চৌর্য্য-মিথ্যা আদি প্রাদুর্ভূত হওয়াতে, সেই সত্ত্বেরা স্থির করিল যে, আমরা একজনকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানিব, যিনি দোষীদের অর্থদণ্ড বা ভৎর্সনা বা নির্ব্বাসিত করিবেন। আর আমরা তাঁহাকে শালির ভাগ দিব।

পরে আভিরূপতর, দর্শনীয়তর, বলী, বুদ্ধিসম্পন্ন, নিগ্রহ-প্রগ্রহ করিতে সক্ষম, কোন এক বোধীসত্ত্ব জন্ম গ্রহণ করেন। সত্ত্বেরা তাদৃশ পুরুষের নিকট যাইয়া, তাঁহাকেই প্রধানরূপে মান্য স্থির করে।

তিনিই ক্ষেত্রের অধিপতি বলিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের দ্বারা পরকে রঞ্জন করাতে 'রাজা' নামে অভিহিত হন। এইরূপ বোধীসত্ত্বকে আদি করিয়া, ক্ষত্রিয়মণ্ডল ও ক্রমে ব্রাহ্ম-ণাদি বর্ণ উৎপন্ন হয়।

ইহাই বৌদ্ধদের এক সম্বর্ত্ত—বিবর্ত্ত। ইহাতে অগ্নির দ্বারা ধ্বংস হয় বলিয়া ইহাকে তেজঃসম্বর্ত্ত বলে। আপো সম্বর্ত্তও ঐরূপ; তবে তাহাতে দ্বিতীয় সূর্য্য উদয়ের পরিবর্ত্তে ক্ষারোদকবর্ষী মহামেঘ উত্থিত হইয়া শত সহস্র কোটী চক্রবাল পরিপুরিত করিয়া বর্ষণ করে। ক্ষারোদক বৃষ্ট হওয়ায় সমস্ত বিনষ্ট হয়। সেই উদক্ বায়ুর দ্বারা বিধৃত হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে তিন ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিলয় করিয়া উদক শুভকৃষ্ণ দেব-লোকের নিম্নে অবস্থান করে। পরে পূর্ব্বের মত সমস্ত সংস্কারের সহিত উদকও অন্ত-র্হিত হয়।

বায়ু সম্বর্ত্তে প্রবল বায়ু উত্থিত হয়। তাহাতে প্রথমে সূক্ষ্ম রজঃ, পরে সূক্ষ্ম বালুকা, পরে শর্কর-পাষাণাদি বায়ুর দ্বারা আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। পরে মহা পৃথিবীর নীচে বাত উত্থিত হইয়া, পৃথিবীকে পরিবর্ত্তিত ও উর্দ্ধমূল করায়, শত শত যোজন পরিমাণ পৃথিব্যংশ সমস্ত বাতবেগে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া—চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বিনষ্ট হয়। পৃথিবী হইতে বিহায়-স্ফল দেবলোক পর্য্যন্ত বায়ুর দ্বারা ঐরূপে গৃহীত হইয়া, পরে সর্ব্ব সংস্কার সহ বায়ু অন্তর্হিত হয়। কি কারণে এই লোক-বিনাশ হয়, তদুত্তরে বৌদ্ধ শাস্ত্রে এইরূপ আছে—"অকুশল মূলই বিনাশের কারণ।

অধর্ম্মের রাগের প্রাবল্যে অগ্নির দ্বারা ও দ্বেষের প্রাবল্যে উদকের দ্বারা নাশ হয়। কাহারও মতে দ্বেষে অগ্নির দ্বারা ও রাগে উদকের দ্বারা নাশ হয়। একবার অগ্নিদ্বারা নাশ হইলে অনন্তর সাতবার অগ্নির দ্বারা নাশ হইতে থাকে। উদক ও বায়ু সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।" জীবদের অকুশল কর্ম্ম হইতে কিরূপে ও কেন মহাভূত ধ্বংস হইবে, তাহা বৌদ্ধেরা বুঝান নাই। সাংখ্য-মতে জগৎ ব্রহ্মার অভিমানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সুপ্তি বা চিত্ত-লয়ে জগৎ লয় পায় ও জাগরণে জগৎ ব্যক্ত হয়, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত ব্যাখ্যা।

শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য।

তত্ত্ব-চিন্তা।

(জীবভাগ।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৭১। যখন "কর্ম্ম" হইতে সংস্কার, তখন কর্ম্ম কি, তাহা জানা আবশ্যক। সনরূপে দেহীর বিষয়ে বিহারই কর্ম্ম। মানসিক কর্ম্ম সূক্ষ্ম, দৈহিক কর্ম্ম স্থূল। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ভূতজাত বা স্থূল ভৌতিক বলিয়া স্থূল; এই সমুদয়ে অঙ্গের যে বিহার, উহা দৈহিক বিহার। সুখ-দুঃখ ভাবনা আদিতে যে বিহার, উহা মানস বিহার। বুদ্ধিমান্ পাঠক এক্ষণে অবশ্য সংস্কার বুঝিলেন। [illegible]

শব্দ স্পর্শাদি স্থূল ভৌতিক, সুখ-দুঃখাদি সূক্ষ্ম ভৌতিক। অতএব জীবের কর্ম্মসূত্র ভূত হইতে আরব্ধ। ভূত সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশের পূর্ব্বে যাহাতে থাকে (ইহাকেই "প্রকৃতি" নাম) তাহা কি থাকে, তাহা বলা যায় না; অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম মিশিয়া যাহা হইয়া থাকে। উহাও প্রকৃতির অধিকারে; ইহাতেই অনন্তের লীলা।

৭২। সাধারণ হিন্দুদিগের ধারণা— মনুষ্য, দেবতা, ঈশ্বর ও পরমেশ্বর পর পর শ্রেষ্ঠতাযুক্ত। অর্থাৎ মনুষ্য হইতে দেবতা শ্রেষ্ঠ, দেবতা হইতে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর হইতে পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। এই ধারণায় পরমেশ্বর এক, ঈশ্বর একাধিক বা বহু, দেবতার সংখ্যা ঈশ্বর-সংখ্যার অধিক, এবং তদতোধিক মনুষ্য-সংখ্যা। এই ধারণা বা কল্পনা মন্দ নহে। কারণ ইহাতে অপকার নাই, বরং উত্তরোত্তর উপকার আছে। মানুষ দেবতা হইতে চাহিলে—উন্নতির দিকে যাইতে চাহিল, তাহাতে ক্ষতি নাই, উপকার আছে।

এই কল্পনাটী ভক্তিমার্গের উপযুক্ত। কেন? জ্ঞানমার্গী মনুষ্য, দেবতা, ঈশ্বর, পরমেশ্বরে বিভিন্নতা আরোপ করেন না। জ্ঞানমার্গী জানেন, এক অদ্বৈত তত্ত্ব, পরমেশ্বর, ঈশ্বর, দেবতা বা জীব; কেবল অবস্থান্তরে নামান্তরপ্রাপ্ত। ভক্তিমার্গী শুধু অবস্থান্তর স্বীকার করেন না, [illegible] [illegible] অর্থাৎ [illegible] তাহার পর কে ঈশ্বর হইবে, [illegible]

পরমেশ্বর হইবে, ইহা কল্পনা করেন না।

মনুষ্য ও দেবতার কি বিভিন্নতা, বিচার করিয়া দেখা উচিত।

(১) মনুষ্য স্থূল দেহধারী; ক্ষিতি, অপ্, তেজ আদি পঞ্চভৌতিক দেহধারী। চক্ষুর দৃশ্য, স্পর্শ স্পৃশ্য। দেবতারা দেহধারী হইয়াও ত্রিভৌতিক—অর্থাৎ তাঁহাদের দেহ ক্ষিতি ও অপ্ নাই, শুধু তেজ, মরুৎ ও আকাশে নির্ম্মিত; সুতরাং অদৃশ্য, অস্পৃশ্য।

(২) দেবতারা আমাদের মত স্থূল দেহধারী নহেন বলিয়া, আমাদের দৈহিক বিকার (ক্ষিতি ও অপ জনিত বিকার) প্রাপ্ত হন না। উক্ত দুই ভূতজাত বা উহাদিগের সম্বন্ধীয় কোন যন্ত্রণা প্রাপ্ত হন না। তাঁহাদের বিকার অপর ত্রিভৌতিক সূক্ষ্ম শরীরে বহন করিতে হয়।

(৩) স্থূল দেহধারী নহেন বলিয়া দেবতারা গর্ভযন্ত্রণা ও জন্মমৃত্যু যন্ত্রণা প্রাপ্ত হন না। আবার আমাদের দেহপাতে যেরূপ মৃত্যুযন্ত্রণা হয়, তাঁহারা তাহা প্রাপ্ত হন না। মনুষ্য অস্তিত্বের আদিতে জন্ম, অন্তে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। স্বর্গবাসী হইলে বা দেবতা হইলে, তথায় তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; স্বর্গত্যাগেও তথায় মৃত হইতে হয় না। মনুষ্য স্বর্গবাসের উপযুক্ত দেহত্ব লাভ করিয়া স্বর্গে অবস্থিতি করেন; ভোগাবসান হইলে, আবার ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন। উপযুক্ত দেবতা মুক্তিপ্রার্থী হইয়া যখন মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতে চাহেন, তখন স্বর্গবাসের উপযোগী তৈজস দেহ মর্ত্ত্যের ন্যায় ত্যাগ করিতে হয় না; সুতরাং তাঁহার মৃত্যু অসম্ভব। সেই সূক্ষ্মশরীরী দেবতা মোক্ষসাধনার্থে স্থূল দেহ ধারণ হেতুই জন্মগ্রহণ করেন।

৪। মনুষ্য ভূবাসী, ভৌম শরীরে স্বর্গে যাইতে পারে না। দিব্যদেহী দেবতারা স্বর্গবাসী।

সাধারণতঃ স্বর্গ ঊর্দ্ধদিকে নির্দ্দেশ করা হয়। ঊর্দ্ধে বস্তুতঃ শূন্য বা আকাশ আছে; দেবতারা আকাশবাসী হইয়া ঊর্দ্ধে আছেন, এ বিচার ঠিক নহে। আকাশ-বাসীই যে ঊর্দ্ধে বিরাজমান, ইহা না হইতে পারে; কেন না আমাদের চতুর্দ্দিকেই আকাশ।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, মৃত্যুর পর পরিত্যক্তদেহ মনুষ্য আকাশবাসী হয়েন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, মৃত্যুর পর মনুষ্য আকাশ প্রাপ্ত হন না, পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়েন। এই পিতৃলোক হইতে পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন।

দেবতারা আকাশবাসী স্বীকার করি, কিন্তু তাঁহাদের কর্ত্তৃক ঋষিদিগের সম্মাননা শুনা যায়। এমন কি, অনেক দেবতা কোন কোন ঋষিকে ভয় করিয়া চলিয়াছেন! ইহাতে ঋষিদিগের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ হইতেছে। অথচ ঋষিরা স্থূল দেহধারী। যখন স্থূল দেহধারী ভূবাসী হইয়াও তাঁহারা আকাশবাসী দেবতাদের আরাধ্য, তখন যদি আকাশ-বাসই শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে [illegible] আকাশবাসী, [illegible] দেবতারা যে আকাশে বাস করেন, [illegible] আকাশ নহে; নর আকাশবাস আর স্বর্গবাস এক নহে।

৭৩। প্রকৃত আকাশবাসী হওয়া কঠিন। স্বর্গবাসী হওয়া উহা অপেক্ষা সহজ। প্রকৃত যোগী সময় সময় আকাশবাসী হয়েন, তখন তাঁহার পক্ষে স্বর্গবাস অকিঞ্চিৎকর। কি প্রকারে আকাশবাসী হওয়া যায়, উহা সাধকের সদ্‌গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।

মনুষ্য স্বর্গে যাইতে পারে না, এই যে ধারণা, উহা অপ্রকৃত। মনুষ্য ত্রিলোক-(ভু, ভুব ও স্বর্গ) বিহারী। দেহ-বোধ সত্বে মনুষ্য ভূবাসী, দেহবোধ-নিঃসত্বে (চিন্তায়) ভুবলোকবাসী, এবং আত্মচিন্তায় স্থূলবোধ-বিচ্যুত হইয়া, আনন্দলাভার্থে স্বর্গবাসী হয়েন। বিষয়ীর ভূ হইতে ভুবলোক পর্য্যন্ত গমনাগমন হয়, অবিষয়ীরা স্বর্গ পর্য্যন্ত গমনাগমন করেন। স্বর্গের পর অপর চারিটী লোক আছে,—মহ, জন, তপ ও সত্য। স্বর্গ হইতে স্বর্গীয় দেবতারা ঐ চারি লোকের জন্ম তপস্যা করেন। ভূতে অবস্থিতি করিয়াও সিদ্ধ ঋষিরা ঐ চারি লোকে বিচরণ করিতে পারেন। দেহ-বোধ সত্বে যেমন বিষয়ীর স্বর্গসুখ লাভ অসম্ভব, স্বর্গবাসী হইয়াছেন বলিয়াই দেবতার মুক্তিলাভও সেইরূপ অসম্ভব। দেবতা মুক্ত হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া, মুমুক্ষায় পাঞ্চভৌতিক পাশ ছেদন করেন। ত্রিভৌতিক পাশ ছেদনে পূর্ণতা লাভ ঘটে না। দেব-তপস্বী ভূতের উত্তমাংশ লইয়া উত্তম কুলে জন্ম লয়েন। পরে তপস্যা দ্বারা মুক্ত হয়েন। যে দেবতা তপস্বী নহেন, স্বর্গ সুখভোগান্তে তাঁহাকে প্রবৃত্তিঅনুযায়ী কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; অনুষ্ঠান দ্বারা আবার স্বর্গবাসীও হইতে পারেন।

৭৪। যে সপ্ত লোকের উল্লেখ হইল, উহাদের মধ্যে ভূ ব্যতীত অপর কোনটীই কর্ম্মস্থান নহে। সাধারণতঃ উহাদিগকে স্থান, ধাম বা লোক না বলিয়া বুঝান যায় না। প্রকৃত কথা, উহারা অহংয়ের এক একটী অবস্থায়তন। জীব হইতে আত্মস্বরূপ লাভ পর্য্যন্ত ঐ ঐ অবস্থায় অহং অবস্থিতি করেন।

নিত্যযুক্ত সিদ্ধপুরুষেরা বলিতে পারেন, কোন্ মনুষ্য হইতে কোন্ দেবতা কোন্ বিষয়ে বা কি ভোগ হেতু শ্রেষ্ঠ; আবার কোন্ মনুষ্য কি প্রকারে স্বর্গবাসী না হইয়াও সপ্তলোক বিচরণ করিতে পারেন।

৭৫। মুক্তিপ্রার্থী সাধক তপস্যা-বলে যে যে লোক প্রাপ্ত হয়েন, সেই সেই লোকের অধীশ্বর তাঁহার সহায়তা করেন। এমন কি, তাঁহাকে অন্য কাজ কিছুই করিতে হয় না, তৎলোক-অধীশ্বরই তাঁহার সকল কাজ করিয়া দেন। তপস্যা-বলে স্বর্গলোকের উপযুক্ত হইলে, স্বর্গের অধীশ্বর এবং মহ, জন, তপ লোকের উপযুক্ত হইলে, মহ, জন, তপ লোকের অধীশ্বর সেই সাধকের সাধনে সহায় হন। ভক্তের হইয়া রণক্ষেত্রে ভগবান যেরূপ উপস্থিত হয়েন, সেইরূপ ভক্তের প্রতি কার্য্যেই ভগবান আপনি কর্ম্মী হইয়া কর্ম্ম করিয়া দেন। এমন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাহিকে অক্ষম ব্যক্তি কর্তৃক মহা অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। দ্রৌপদী কর্তৃক সশিষ্য দুর্ব্বাসার আতিথ্যকার্য্য সম্পন্ন হওয়া উহার একটী বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত।

শ্রীশ্যামাচরণ বসু।

শ্রীহরিঃ

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। মাঘ। ১৩১৪ সাল, ১৮২৯ শকাব্দা।

শেষের সে দিন।

—•:•:••

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর!
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র, কিবা জায়া,
তার মুখ দেখে তত হইবে কাতর।
গৃহে 'হায়! হায়!' শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিক্ষীণ, নাড়ীহীন, হিম কলেবর।"

[৺ রামমোহন রায়।]

দিন যায়, রয়না; কিন্তু শেষের সে দিনের কথা প্রায় কোন দিনেই মনে হয় না! যাহাও কিঞ্চিৎ কচিৎ হয়, তাহাও হওয়ার মত নয়। সে দিনের কথা লাগার মত মনে লাগিলে, আর কি কিছু ভাল লাগে? অবিদ্যার কি অদ্ভুত কুহক-কুয়াসা! মায়ার—কি মোহিনী শক্তি! সংসার-মোহের কি সম্মোহন আবরণ! বিষয়-বিষ-নেশার কি মারাত্মক মাদকতা! অথবা এক কথায় ভগবানের কি ভুবনভুলানী ভব-ক্রীড়ার ভাব-কৌশল! যা সব চাইতে সুনিশ্চিত সর্ব্বনাশ, অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গল, অপ্রতি-বিধেয় আপৎ, আমরা তাহাতেই একেবারে নিশ্চিন্ত,—নিশ্চেষ্ট—নিদ্রিতবৎ! সংসারে একটু সামান্য অশুভ অশান্তি, অনিষ্ট বা অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিলে, আমরা তাহার পরিহারার্থ কত সাবধান হই, প্রতি-কারার্থ কত ব্যস্ত হই; অথচ সর্ব্ব অশুভের সমষ্টি স্বরূপ—সর্ব্বান্তকরূপ মরণকে আমরা মনের কোণেও স্মরণ করি না! কোন কল্পিত কষ্ট বা অনুমিত অসুখের চিন্তায় এবং সন্দিগ্ধ মন্দের আশঙ্কায় আমরা কাতর হই; দূরবর্ত্তী বিপদও আমাদিগকে ব্যস্ত ও ব্যাকুল করে; কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট ও সতত সম্ভাব্য মরণকে আমরা দিনান্তেও মনঃ প্রান্তে স্মরণ করি না। আমরা সর্ব্বভিতে—সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা মৃত্যুর ভীষণ খেলা—তাকের

করাল লীলা—কৃতান্তের সর্ব্বাত্মক দন্তমালা দেখিতেছি, তবু তদ্বিষয়ে কেমন নির্ভর—নিশ্চিন্ত! "কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্!" সাধে কি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের "কিমাশ্চর্য্যম্" প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥"

অর্থাৎ—

দিনে দিনে জীবগণে
যেতেছে যম-ভবনে ;
অবশিষ্ট রহে যারা,
অমরত্ব চাহে তারা!
এ হতে আশ্চর্য্য আর
কি আছে (ভব-মাঝার)?

"মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ"—নিশ্চয়—নিঃসন্দেহ মরিতেই হইবে। 'মরিতে হইবে' এই ছয়-অক্ষরী ছোট কথাটির মত ধ্রুব নিশ্চিত খাঁটি সত্যকথা আর দ্বিতীয় নাই। বরং, 'ঈশ্বর আছেন' এ বাক্যেও কাহারো ২ সন্দেহ, কিন্তু 'মৃত্যু আছে' এ কথাটা নিত্য—নির্দ্দিষ্ট—নিঃসন্দেহ! সেই মরণহরণ জগৎ-কারণ হরি অপেক্ষাও যেন মরণেরই জাজ্জ্বল্যমানতা অধিক! এ হেন মরণকে ভুলিয়া থাকা,—সংসারে সর্ব্ব কাজের মাঝে মরণকে মনে না রাখা বাস্তবিকই বিস্ময়কর! জগতের আশ্চর্য্যতম বিষয় বলিয়া ইহার অভিনন্দন ধর্ম্মনন্দনের পক্ষে সুযোগ্য ও সুসার্থকই হইয়াছিল।

মরণ মনে না হওয়াই ভগবন্মায়ার একটি নিঃসংশয় নিদর্শন। যখন তখন মরণ-স্মরণ হলে কি আর রক্ষা ছিল? তাহলে আর এত হাসি-খেলা, ভোগ-বিলাস, আরাম-বিরাম, আমোদ-প্রমোদ, নৃত্য-গীত কি ভব-রঙ্গভূমে চলিতে পারিত? মাথার উপরে ক্ষীণসূত্রে দোদুল্যমান্ খরধার খড়্গ লইয়া কে লাফালাফি করিতে পারে? ইহসর্ব্বস্বসংচ্ছেদক মরণ-মহাখড়্গ আমাদের মাথার উপর সদা-সম্ভাবনার শীর্ণসূত্রে, অসম্ভাবিতার ভার ও অসহ্যতার ধার সংযোগে—ভীষণবেগে দুলিতেছে! তাহারই তলে "'আত্মারাম সরকারের' ভেল্কী বাজীর পুতুলরূপে কখনও আমাদের লাফালাফির ধুম,—কখনওবা নির্ভাবনায় ঘুম! সূতা কখন ছেঁড়ে,—খাঁড়া কখন পড়ে—তার ঠিক নাই; আমাদের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই!— ভবের খেলায় তালভঙ্গ নাই! মায়ার এমনই কুহক! মোহ এমনই মাদক!

মনে হয়, আমরা যেন ঠিক কসাইখানার ছাগল-ভেড়া। দিব্য লেজ নেড়ে ঘাস-পাতা খাচ্চি, ও'দকে যে ছোরায় ধার দেওয়া হচ্ছে, তা টের পাচ্ছিনা! যখন টুঁটিতে পোঁস্ পড়িবে, তখনই হোঁস্ হইবে! তখন কেবল 'হা হতোঽস্মি' বাণী, করুণ কাতরাণি, আর দারুণ যাতনায় ছটফটানি মাত্র সার হইবে। তখন অশ্রুধারেও উদ্ধার নাই, হাহাকারেও প্রতীকার নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-পত্রিকায় একটি গান প্রকাশিত হইয়াছিল,—

"আর খাবনা পাতা নেজুড় নেড়ে।
আমার ছোরার কথা মনে পড়ে॥
এ সংসারখান কসাইর দোকান,
কাল-কসাই ঐ আস্‌ছে তেড়ে।
হাতে হাস্‌ছে ছোরা, আস্‌ছে তেড়ে॥

বি-এ, এম্-এ, জজ্—সেজেষ্টার
নির্ভাবনায় সেঙ্কুড় নাড়ে।—
(যেন)
খোঁ দাই জানার, কসাইখানার
ছাগল-ভেড়াটি সকল ভেড়ে॥

'নিত্য-নতুন' ঘাস্ পাতা-খড়
খাচ্চি আর ঘুমাচ্চি পড়ে'।—
(কচ্ছি)
শিং-ল্যাজের বাহারে বিকার,
'জবাই'র চিন্তা সবাই ছেড়ে॥

ছোরা-মারা জান্‌লে যারা,
ভাগ্‌লে তারা দড়া ছিঁড়ে ;—
(আমি)
রোখা ভেড়া, পাকা দড়া,—
টান্‌লে আরো এঁটে পড়ে॥

(এই)
নিরুপায় 'শরতের' উপায়
মরতে রয় ও পায় পড়ে।—
(তবে)
কসাইর বাপের সাধ্য কি আর—
গোঁসাই যদি দেয়গো ছেড়ে॥
(তবে)
কসাইর বাঁধন খসাই হেলায়,
গোঁসাই যদি দেয়গো ছেড়ে॥"

বাস্তবিক যিনি যতই বিদ্যাবান, বুদ্ধিমান, যশ-সৌরভে—পদ-গৌরবে গরীয়ান্, রূপে গুণে, কুলে-শীলে, ধনে মানে মহীয়ান্ হউন না কেন, মানুষ হইয়া, অধিকার পাইয়াও, এই সর্ব্বনেশে শমন-সঙ্কটের কোন প্রতীকার না করিতে পারিলে, অর্থাৎ শেষের সে দিনের সেই দারুণ দুর্দ্দিন সুদিনে পরিণত না করিতে পারিলে, সব বৃথা—সব বিড়ম্বনা। কসাই-খানার ছাগল-ভেড়ার মত মরা, মুক্তিসাধনাধিকারী মানবজন্মধারীর পক্ষে বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ অন্নময় কোষ,—ভাত-ব্যঞ্জনের পরিণামপিণ্ড এই মিছে মায়ার ভাণ্ড দেহকে অবশ্য চিরদিন বজায় রাখা যাইবে না। যোগবলে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ হইতে পারে, কিন্তু চিরজীবীত্ব অসম্ভব।

"অশ্বত্থামাবলির্ব্যাস হনুমন্তো বিভীষণঃ।
মার্কণ্ডেয়ো নারদশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ॥"

অর্থাৎ—

অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ,
মার্কণ্ডেয়, নারদ, এ চিরজীবী সাতজন॥

শাস্ত্রমতে এই চিরজীবীত্ব চারি যুগাবচ্ছিন্ন মাত্র। অমৃতপানে স্বর্গীয় দেবগণ অমর; 'অমর'ই তাঁদের নামান্তর, কিন্তু সে অমরত্ব প্রলয়ান্ত পর্য্যন্ত। মহাপ্রলয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও মরণ শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে। 'শেষের সে দিন' একদিন সকলেরই আসিবে। সৃষ্ট মাত্রই বিনষ্ট হইবে। স্থূল সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও যে সেই মূল সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মের সৃষ্ট। যাহা মায়িক, তাহা কায়িক, তাহাই ধ্বংসশীল। "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।" স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে সামান্য সৃষ্ট তৃণ পর্য্যন্ত এই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মের মায়া দ্বারা কল্পিত; সুতরাং ইহা মায়িক বলিয়াই কায়িক এবং কায়িক বলিয়াই ধ্বংসশীল। যাহা জন্মে, তাহাই

মরে। আবার যাহা মরে, তাহাই জন্মে। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" (গীতা)। এইরূপে এই জগৎ অনিত্য হইয়াও প্রবাহরূপে নিত্য। স্বরূপতঃ নিত্য কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্ম। তিনি মায়াধীশ; জগৎ মায়াধীন। এই অনিত্য ভৌতিক বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহাতে, তিনিই একমাত্র নিত্যতত্ত্ব শাশ্বতস্বরূপ পরব্রহ্ম। "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ব্রহ্ম।" যাঁহা হতে এই ভূতসমূহ জাত, জাত ভূতগণ যাঁহাতে জীবিতরূপে স্থিত, এবং যাঁহাতে কালে প্রবিষ্ট হইয়া বিনষ্টপ্রায় প্রতীত, তিনিই ব্রহ্ম।

আমরা যেখানে জন্মিয়াছি, সেখানে অবশ্যই মরিব। সিন্ধু-জলে বিম্ব-বিন্দুবৎ যাঁহা হতে আমরা উদ্ভূত হইয়াছি, তাঁহাতেই বিলীন হইব। সিদ্ধভক্ত রামপ্রসাদের একটি গান আছে,—

"বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেউ বলে ভূত-প্রেত হবি,
কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি,
কেউ বলে সাযুজ্য মেলে॥

* * *

(রাম) প্রসাদ বলে—যা ছিলি ভাই!
তাই হবিরে নিদান কালে;
(যেমন) জলের বিম্ব জলে উদয়,
লয় হয় সে মিশায়ে জলে॥"

মৃত্যুর পর পাপীরা প্রেতযোনি পাইয়া প্রেতলোকে—অর্থাৎ যমলোকে নরক-যাতনা পাইবে, আর পুণ্যাত্মারা স্বর্গলোকে দেবযোনি পাইয়া স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিবেন। রামপ্রসাদ বলেন যে, সে মৃত্যুই নয়; প্রকৃত মৃত্যু হইলে, অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের বিলয় হইলে একেবারে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইয়া, পরমাত্ম-সমুদ্র-সম্ভূত জীবাত্মা-বিম্ব পরমাত্মাতেই মিলিত—অর্থাৎ 'সোঽহং' সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। অতএব সাধারণ মৃত্যু মৃত্যুই নয়। যদি সাধারণমৃত্যুতেই মুক্তি হইত, তবে মহাপাপ ও মহানরকের কারণ আত্মহত্যাই অতি সহজ মোক্ষসাধন হইত। তাহা হইলে সমস্ত সাধন-ভজন, যোগ, তপস্যা, উপাসনার ফল দুহাত দড়ীতে বা দুগণ্ডা পয়সার আফিংয়ের বড়ীতেই সিদ্ধ হইত! অতএব পূর্ব্বোদ্ধৃত গানটিতে রামপ্রসাদের উক্ত যে মৃত্যু, তাহা ফলিতার্থে অমৃতত্ব বা মুক্তিতত্ত্ব মাত্র।

জগতে প্রকৃত মৃত্যু কিছুই নাই। পরিবর্ত্তন ভিন্ন বিলোপ বা অত্যন্তাভাবরূপ প্রকৃত মৃত্যু অবৈজ্ঞানিক ও অসিদ্ধ। সে পরিবর্ত্তনও জড়স্বরূপের মাত্র। আত্মস্বরূপের পরিবর্ত্তনও নাই, জন্ম-মৃত্যুও নাই। উহা চিরস্থির—অবিকারী, অব্যয়; নিত্য, সত্য, সনাতন। জীবাত্মার নামরূপাত্মক উপাধির পরিবর্ত্তনই জীবের ঐহিক মৃত্যু পদে আখ্যাত। গীতা বলেন, উহা আত্মার পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন—অর্থাৎ 'কাপড়-ছাড়া' মাত্র।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

অর্থাৎ—

যথা জীর্ণবস্ত্র-ভার   করি নর পরিহার,
পরে নব বসন অপর।
দেহী তথা জীর্ণকায়   পরিত্যাগ করি পায়
পুনঃ অন্য নব কলেবর॥

অনিত্যতা এই পোষাকেই মাত্র, পোষাকধারীর কিছুই নয়। আপদ বিপদ বিঘ্ন বিকার সমস্ত পরিচ্ছদের উপরেই পড়ে, পরিধারী আত্মা নিত্য—নিরাপদ্—নিরাময়—নির্লিপ্ত। আত্মা অস্ত্রে ছেঁড়েনা, আগুনে পোড়েনা, জলে রসে না, বাতাসে শোষে না। গীতায় স্বয়ং ভগবানই গাইয়াছেন,—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥"

অর্থাৎ—

অস্ত্র না ছিঁড়িতে পারে, অনল পোড়াতে নারে,
জল এঁরে পচাতে অক্ষম;
বায়ু নয় শোষিতে সক্ষম।
অচ্ছেদ্য অদাহ্য ইনি অক্লেদ্য অশোষ্য হন।
নিত্য সর্ব্বগত স্থাণু অচল ও সনাতন॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত ইনি—অবিকারী উক্ত হন।
এঁকে হেন জেনে তাই শোক তব অকারণ॥

ফলে মরণের ভয় বা তজ্জনিত সর্ব্বনাশের শোক কেবল মূঢ়তার ফল মাত্র। বাস্তবিক গীতোক্ত সেই 'বসন-বদল'কেই মরণ ভাবিয়া ডরে মরা তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে প্রহসন মাত্র। খেলনা কেড়ে নিলে খোকা কাঁদে; তদ্রূপ জীবের তবের খেলার খেলনা এই শরীরটি সরাইয়া নিতে দিতেও পরমার্থজ্ঞান-শিশুগণ (আমরা) নিতান্ত নারাজ। এ বিষয়ে আমরা শিশুরও অধম। নূতন কাপড় পরিয়া শিশু উল্লাসে নাচিতেছে; কেহ কেড়ে নিতে গেলে সে সম্ভবতঃ কাঁদিবে; কিন্তু আমাদের এ 'বাসাংসি জীর্ণানি'—প্রপঞ্চ মায়া-সূত্রে রচিত পুরাতন কায়া-কাপড়খানি বদলাইয়া নূতন পরাইবার আয়োজনেও আমরা নিশ্চয় কাঁদিব। এ হাসি-কান্নাময় সংসারখেলা সাঙ্গ হইয়া আসিলে, মায়া মূঢ়রাই কায়া-বিয়োগ-ভয়ে কাঁদে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত মোহমুক্ত সাধু-ভক্তগণ বরং অভয়-ভাবনানন্দে হাসেন! অনেক সময় শেষের সে দিনের প্রসাদ-বিষাদ ভাব-ভেদে সাধু-অসাধু কতকটা চেনা যায়। সাধু শিরোমণি তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"তুলসি! যব্ জগমে আয়ো,
জগ হসে, তোম্ রোয়্।
আয়সা কর্‌ণি কর্ চলো কি
তোম্ হসে, জগ রোয়॥"

অর্থাৎ—

তুলসি! যবে এলে ভবে,
হাস্‌লে তুমি, কাঁদ্‌লে লোক।
যাবার বেলা এম্‌নি যাবে,
হাস্‌বে তুমি, কাঁদ্‌বে লোক॥

ফলে "শেষের সে দিন" সুদীন মায়াধীনগণের পক্ষেই ঘোর দুর্দ্দিন; কিন্তু দীননাথের প্রেমাধীন সাধুভক্তের কাছে সে দিন বরং আরো বিশেষ শুভদিন! বিরহিণী পতিব্রতার পতি-সকাশে যাওয়ার দিন যেরূপ সুদিন বা শুভদিন, জগৎপতির

আকর্ষণে—ভক্তের ঐহিক জগতের দৈহিক-বাধা বিনাশের দিন—সেই শেষের সে দিন ততোধিক সুদিন বা শুভদিন। কিন্তু সংসারে সাধারণতঃ আমাদের স্থায় বদ্ধ জীবের পক্ষে সে দিন কি সর্ব্বনেশে দিন! সর্ব্বের নাশ, অর্থাৎ কিছুই না রবে সে দিন, এক দিন সে দিন হবে।

"এক দিন হায়! এমন হবে,
এ মুখে আর বল্‌বে না।
এ হাতে আর ধরবেনা,
এ চরণে আর চল্‌বেনা॥
নাম ধরে ডাক্‌বে সবে,
শ্রবণে তা শুন্‌বে না।
(তখন)
পুত্রে-মিত্রে—জগৎ-চিত্রে—
নেত্রে নিরখিবে না।"
খোকার বুলি, খুকীর হাসি,
প্রাণপ্রেয়সীর প্রেমের ফাঁসি,
সকল ফেলে যাবে চলে,
সঙ্গে কিছু লবেনা॥
(তখন)
বিলাস-বিহার, আহার-বাহার—
মজার আর মজিবেনা।
(ও সেই)
কাংলা-রুয়ের মুড়োর মুয়ে
মুড়ো দৈ আর দিবেনা॥
(আহা!)
মুদে যখন দুটো নয়ন,
উঠে নেত্রে কর্‌বে শয়ন,
(তখন)
বাঁশের বালিস লবে বুকে,
প্রাণের বালিস পাবে না॥
(সে দিন)
সুন্দরী স্ত্রী তেয়াগিয়ে,
'সুন্দরীর খেটে' নিয়ে,
কাষ্ঠ অঙ্গ আলিঙ্গিয়ে,
কষ্ট কিছুই হবে না॥

এইরূপ শমন-বিবেক-সংগীত ক্ষণিক বৈরাগ্যের আবেশে গাইতেও বেশ, শুনিতেও বেশ, ইহার কাব্য-রস-তত্ত্বের বা সাহিত্য-সত্ত্বের আস্বাদনও বেশ; কিন্তু এ সব গৌণ-ফল; মুখ্যফল যে ঐহিকতায় অনাসক্তি ও ভগবদ্ভক্তি, সাহিত্যিক মরণ-স্মরণ শিক্ষায় তাহার স্থায়িত্ব রক্ষা হয় না। যাহা হয়, তাহার বিকাশ বাহ্যিক ও চপলা চমকবৎ ক্ষণিক! এই মায়িক বিশ্বে মায়া-মোহের কুহক-রহস্যে ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। মোট কথা, এ মর্ত্ত্যে মরণ-বিস্মরণেই বিস্ময়ের চরম; তাই ইহাই যুধিষ্ঠিরের "কিমাশ্চর্য্য-মতঃপরম্।"

মরণ-স্মরণ আমাদের অতি উৎকৃষ্ট মানস-গুরু। গুরুর উপদেশ, ধর্ম্মসংস্কারকের বক্তৃতা, শাস্ত্র-গ্রন্থপাঠ, সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি আর কিছুতেই বিষয়ে বিরক্তি, ধর্ম্মে আসক্তি, সত্ত্বগুণের উদ্দীপন ও ভগবানের দিকে প্রাণের আকর্ষণ সেরূপ হইতে পারে না, একান্ত মনে মরণ-স্মরণে যেরূপ হইতে পারে। এই সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপ একটি গল্প মনে পড়িল।—

এক হিন্দু-রাজা অতিশয় বিষয়াসক্ত, ভোগ-বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু 'হিন্দু' বলিয়া, তাঁহার স্বভাবতঃ গুরুভক্তি ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস ছিল, এবং উহাই তাঁহাকে কালে অতি-বিষয়াসক্তি প্রভৃতি

দোষ হইতে মুক্তি দিয়া, বৈরাগ্যবান ও সাধন-শক্তিমান করিয়াছিল। রাজার গুরুদেব বিষয়বিরাগী যোগীপুরুষ ছিলেন। রাজা মনের সাধে ইন্দ্রিয়সেবা-সম্ভোগ-সমর্থ হইবার জন্ম যোগীবরের নিকট কোন মন্ত্রৌষধি প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় শক্তিবর্দ্ধনার্থ প্রার্থী হইলেন। তাহাতে যোগীবর কোন একটি বৃক্ষের শিকড় বহু ক্ষুদ্র ২ খণ্ডে কাটিয়া, তাহার এক ২ খণ্ড প্রত্যহ রাজাকে সেবন করিতে দিলেন। যোগী নিজে ঐ শিকড় প্রতিদিন বহু পরিমাণ সেবন করিতেন; অন্নাদি প্রায় খাইতেন না এবং অহোরাত্রের অধিকাংশ সময়েই ভগবদুপাসনানিষ্ঠ ও ধ্যান-সমাধির ভাবাবিষ্ট থাকিতেন। কখন কখন ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি বিষয়ক ভক্তি-সংগীত গাহিতেন, আর আনন্দে দুই নয়ন বাহিয়া প্রেমাশ্রু লহরী গোমুখী-মুখ-গলিতা পতিতপাবনী গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইত! এ হেন ভক্তি ও বিষয়-বিরক্তি রূপ আধ্যাত্মশক্তিমান সাধু গুরু লাভেও রাজার বিষয়াসক্তি প্রবলা ছিল, ইহাই আপাত-আশ্চর্য্য! ফলে কিন্তু গুরু-কৃপায় সে প্রবলতা নির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্বে দীপশিখার প্রবলতার ন্যায়ই হইয়াছিল।

যাহা হউক, রাজা সেই গুরুদত্ত শিকড় সেবনে বিপুল বাজীকরণ-শক্তি লাভ করিয়া অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবায় মত্ত হইলেন। ছয় মাসে সে শিকড় নিঃশেষিত হইল। আবার ঐ শিকড় পাইবার আশায় ঐ ইন্দ্রিয়-বিলাস-বিমুগ্ধ রাজা আবার স্বীয় গুরুদেব যোগী-বরের আশ্রমে উপনীত হইলেন। যোগীবর তখন সেই শিকড়ই চিবাইতে ছিলেন। রাজা তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন,—"গুরুদেব! আমি যে শিকড়ের বিন্দুমাত্র সেবা করিয়া, তাহার তেজে আহার-বিহারাদি ইন্দ্রিয়সেবায় অহোরাত্র আসক্ত ও সুশক্ত থাকি, আপনি সেই শিকড় প্রত্যহ বহু-পরিমাণে ব্যবহার করিয়াও এরূপ অন্নত্যাগী, বিলাস বিরাগী, স্ত্রী-সংস্পর্শশূন্য—নির্বিঘ্ন, এবং নিয়ত ভগবৎসাধন-সম্পন্ন থাকেন, ইহা অতীব বিস্ময়ের বিষয়।" রাজার এই বাক্যে যোগীবর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"বৎস! এই আর ৬ মাস কাল পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ মাত্রায় ব্যবহারের উপযোগী সেই শিকড় দিতেছি, ব্যবহারার্থে লইয়া যাও। এই ৬ মাস পরে এতদর্থে আবার যখন আমার নিকট আসিবে, তখনই তোমার এই বিস্ময়োৎপাদক সমস্যার সমাধান প্রাপ্ত হইবে। আজ কিছু বলিব না; বলিলেও বুঝিবে না।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "দেব! এই ঔষধে শক্তিবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু আয়ু-বৃদ্ধিও কি হয়?" গুরুদেব বলিলেন—"নিশ্চয়; তোমার ইন্দ্রিয়-সেবার আধিক্যে আয়ুক্ষয় হইয়া আসিয়াছিল; এই মহৌষধ সেবন না করিলে, তুমি অদ্যাপি জীবিত থাকিতে কি না, সন্দেহ। যাহা হউক, এই ঔষধ-বলে তুমি আর ছয় মাস নিশ্চয় বাঁচিবে; কিন্তু অদ্য হইতে ষষ্ঠ চন্দ্রে তোমার আয়ুঃশেষ-সম্ভাবনা জানিবে; অতএব এই ছয় মাস আহার-বিহার, বিলাস-বাহার, যত পার, ভোগসুখ লাভ করিয়া লও। আজ আর অন্য কথায় কাজ নাই। গৃহে গিয়া আমার আদেশ পালন কর। ছয় মাসের শেষাংশে, অর্থাৎ তোমার জীবনের সম্ভাবিত

শেষাংশে আবার আসিবে।" রাজা এই কথা শুনিয়া, গুরুদেবকে প্রণামপূর্ব্বক অগত্যা বিষণ্ণমুখে ও অবসন্নবুকে শিকড় সহ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন; শিকড়ও গুরুর আদেশানুযায়ী দ্বিগুণ মাত্রায় সেবা করিতে লাগিলেন বটে। কিন্তু ভোগবিলাসে তাঁহার আর প্রবৃত্তি রহিল না। ভোগসুখ আর ভাল লাগিল না। আমোদ-প্রমোদে অরুচি হইল, বিষয়-বিলাস বিষবৎ জ্ঞান হইল। সংসারের সম্মোহন ইন্দ্রজাল অপসারিত হইল; উহার বৈরাগ্য-বিশীর্ণ বিরস কর্কশ মূর্ত্তি দেখা দিল। তখন অশন-বসন-বাসনাদির আসক্তি বিরক্তিতে পরিণত হইল। এ ভোগায়তন ভৌতিক শরীরকে যোগবিবেক-নেত্রে কেবল মাংস রক্ত মল-মূত্রের অমেধ্য ক্ষেত্র মাত্র জ্ঞান হইতে লাগিল। তখন—

"সমাশ্লিষ্যত্যুচ্চৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া,
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব।
অমেধ্যে ক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো,
মহামোহান্ধানাং কিমিহ রমণীয়ং ন ভবতি॥"

ইত্যাদি "শান্তিশতকের" শ্লোকসমূহের তীব্র তাৎপর্য্যগ্রহ যেন মূর্ত্তিমান বৈরাগ্য-বিগ্রহরূপে হৃদয়ে উদয় হইল।

তখন ধর্ম্মের কথা মনে আসিল। ভগবানের দিকে দৃষ্টি পড়িল। গুরুবাক্য-বিশ্বাসে অকস্মাৎ আসন্ন মরণের স্মরণ আসিয়া রাজার সংসার-লিপ্সা হরণ করিল। সেই রাজপদ-মদ-গর্ব্বিত রাজা আপনাকে বিশ্বরাজার এক অতি নিঃস্ব প্রজার ন্যায় অকিঞ্চন, অভিমানহীন ও দীনাতিদীন ভাবিতে লাগিলেন।

গুরুর আজ্ঞায় রাজা সেই গুরুদত্ত মহা-গুণশালী মহৌষধ প্রত্যহ দ্বিগুণ মাত্রায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ইন্দ্রিয়-চাপল্য অতি বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাক্, অণুমাত্র রহিল না! ঐহিক ভোগের দৈহিক উত্তেজনা অন্তর্হিত হইয়া, আধ্যাত্মিক যোগের পারমার্থিক প্রেরণা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। 'শেষের সে দিন' অনুদিন অনুস্মরণে অল্পদিনেই রাজার এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইল!

যাহা হউক, গুরুক্ত সেই "ষষ্ঠ চন্দ্র" সমাগত হইবার—অর্থাৎ ৬ মাস কাল পুরিবার কিছু পূর্ব্বেই গুরু-আজ্ঞা-পালন-পূত, বিবেক-বৈরাগ্যযুত, বাহিরে রাজ্য-পালনরূপ মহা বিষয়কর্ম্মকারী—অন্তরে নির্লিপ্ত নিরীহ 'জনক'-জীবনধারী সেই "মানস-গুরু মরণ স্মরণ"কারী রাজা মন্ত্রগুরু যোগীবরের আশ্রমে পুনরাগত হইলেন।

রাজার অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক মূর্ত্তি ও ভাব-ভক্তি দেখিয়া যোগীবর স্মিত-সৌম্য মুখে কহিলেন—"এস বৎস! কেমন আছ?" রাজা (প্রণিপাতপূর্ব্বক) কহিলেন—"ভবৎ-প্রসাদে—কৃপাশীর্ব্বাদে কৃতার্থ আছি। আমার এ অনিত্য জীবনের অবসান-দিন ত আগতপ্রায়; তাই একবার অন্তকালে অন্তিমের সম্পদ্ ঐ অভয়-পদ দর্শন-স্পর্শনের আশায় এ সেবকাধম আসিয়াছে।

যোগী। বৎস! ভয় নাই। মদ্দত্ত মহৌষধে পুনরায় তোমার আয়ু আর ১ বর্ষ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

রাজা। গুরুদেব! আপনার ঔষধের ঐহিক গুণ পূর্ব্ববার বেশ বুঝিয়াছিলাম। আয়ুর্বৃদ্ধি

হইতে পারে; কিন্তু ভোগশক্তি ও ভোগাসক্তিবৃদ্ধি পায় নাই। এবার বরং আপনার ব্যবস্থিত 'মরণ স্মরণ' মহৌষধই মহাবৈরাগ্যরূপ মহৎপরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে; তবে আর ভগবৎপ্রসাদে আয়ুক্ষয়েই বা ভয় কি? "ভবিতব্যং ভবত্যেব।" ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।

যোগী। বৎস! ঠিক বলিয়াছ। "বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।" বৈরাগ্যই একমাত্র অভয়ের কারণ। এ হেন দেবদুর্লভ অধ্যাত্মসম্পদ্ বৈরাগ্য 'মরণ-স্মরণ' দ্বারা যত সহজে লাভ হয়, কোন যোগ-তপস্যায় তত হয় না। নিরন্তর মরণ-স্মরণ ফলে তোমার অন্তর বৈরাগ্য-বিধৌত—বিষয়-বাসনা-বিরহিত হইয়াছে; তাই এমন অসাধারণ তেজ-বীর্য্য ও ভোগ-শক্তিসম্বর্দ্ধক মহৌষধ দ্বিগুণ মাত্রায় সেবনেও তোমার কিছুমাত্র ইন্দ্রিয়-চাপল্য ঘটে নাই! অধিকন্তু তাহার শক্তিতে তোমার ফলিতার্থে আয়ুর্বৃদ্ধি হইলেও তুমি উক্ত বৈরাগ্য-ফলে—অধ্যাত্ম-বীরত্ব বলে অম্লান-হৃদয়ে মরণার্থ প্রস্তুত হইয়াছ। এখন বৎস! তোমার পূর্ব্বদিনের সমস্যার সমাধান বুঝিয়াছ কি?

রাজা।—প্রভো! আপনার প্রসাদে প্রায় বুঝিয়াছি।

যোগী। আজ পূর্ণভাবেই বোঝ। তুমি ভাবিয়াছ, তোমার ৬ মাস পরে মৃত্যু হইবে, তাই তুমি সেই মরণ স্মরণ-জাত বৈরাগ্য-বারিতে হৃদয়ের সমস্ত বিষয়বাসনা বিধৌত করিয়াছ; আর আমি প্রতিমুহূর্ত্তেই সেই মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিতেছি। প্রতিক্ষণেই তাহার আলিঙ্গনের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং ঐ অতুল তেজস্কর ভেষজ মুহুর্ম্মুহুঃ সেবনেও আমার সংযম সংক্ষুব্ধ বা বৈরাগ্য ব্যাহত হয় নাই। বরং গুরুকৃপায় ঐ মহৌষধের সাত্ত্বিকী শক্তিতে আমার আয়ুঃসত্তা ও সাধনশক্তি-সত্তা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়াছে। ভগবৎকৃপায় তোমারও এক্ষণে সেই অবস্থা। তবে তুমি গৃহী ও মহাবিষয়ী রাজা, আর আমি এই পর্ণকুটীরবাসী, কন্দমূলফলাশী, কৌপীনধারী বনচারী মাত্র।

রাজা। তবে প্রভো! আমার কি উপায় হইবে? আপনি বলিলেন,—আমার আয়ু আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে; তবে আমি ঐ রাজ্যপালন রূপ—বিষম বিষয়ার্ণবের তুমুল তুফানে থাকিয়া কিরূপে আত্মরক্ষা করিব?

যোগীবর একতুম্বরে একটি শ্লোক বলিলেন—

"পুষ্পাস্ত্রপুঞ্জ বিষয়ানুপসেবমানো
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপাদারবিন্দং।
সঙ্গীতবাদ্যকরতালবশংগতাপি
মৌলীস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥"

অর্থাৎ—

পুষ্পাস্ত্রপুঞ্জরূপেও বিষয়-সেবনে,
হরিপাদপদ্ম নাহি পরিহরে ধীর।
যাহি গান-বাদ্য-তান-বাধ্যতা-বন্ধনে
শির-কুম্ভ-সুরক্ষণ যথা নর্ত্তকীর॥

এই ভাবে সংসারে থাকিতে হইবে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—"পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" অর্থাৎ অনাসক্ত পদ্মপত্রবৎ বাহ্যতঃ বিষয়ে লিপ্ত হইয়াও অন্তরে অলিপ্ত রহিবে। অর্জ্জুনকে দিনের সে দিন মরণ-ফলের জ্ঞান তজ্জনিত বৈরাগ্য-বলে তুমি নিজ জীবনে।

নিষ্কামতায় রাজর্ষি জনকের আদর্শ লাভ করিয়াছ। এখন গৃহে যাও, জনকবৎ গৃহে থাকিয়াও গুরুদত্ত মন্ত্রসাধন ও মরণ-স্মরণজাত বৈরাগ্য-প্রভাবে বিষয়-বিমুক্তি ও ভগবদ্ভক্তি লাভে ধন্য হও।"

রাজা গুরুপ্রণামপূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল গুরুকৃপাবলে—বিষয়-বৈরাগ্য-বলে ভক্তি-সাধনে—ভগবদারাধনে প্রেমানন্দ-মনে অতি-বাহিত করিলেন এবং 'শেষের সে দিন' স্মরণ-ফলে স্বীয় শেষের সে দিনে দীননাথের চরণতলে শরণলাভের পূর্ণ পরমার্থ-প্রভাবে যথার্থ কৃতার্থ হইলেন।

এই উপাখ্যানে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, মরণ-স্মরণে জীবনের অনিত্যতা বোধ হয় এবং আয়ু-সীমাবচ্ছিন্ন এই ভব-ভোগের সমস্ত ভোগ্য বিষয়ই অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া, ইহার প্রতি আসক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও বৈরাগ্যবিলীন হইয়া যায়; কিন্তু আসঙ্গলিপ্সা মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সুতরাং সে লিপ্সার পূরণার্থ অনিত্য পদার্থের পরিবর্ত্তে নিত্যধন ভগবচ্চরণ লাভের বাসনা ও তদর্থে সাধনা চলিতে থাকে এবং গুরু-কৃপাগুণে তাহা লাভ হয়।

সুচিকিৎসক 'জোলাপ' দিয়া পেটের কুপিত মল নিঃসারিত করিয়া, পরে ঔষধ সেবন করাইলে, তাহা যেরূপ শরীর মধ্যে সহজেই শীঘ্র ক্রিয়াশীল হইয়া, রোগীর স্বাস্থ্য-বিধান করে, এই ভবরোগে রোগী আমরাও যদি তদ্রূপ মরণ-স্মরণ-জনিত বৈরাগ্য-সারক সেবনপূর্ব্বক জন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত বিষয়-বাসনারূপ কুপিত মলরাশি নিঃসারিত করিয়া, আশয়শুদ্ধি-সম্পাদনে সমর্থ হই, তখন অধ্যাত্মবৈদ্য শ্রীগুরুদেব-দত্ত ইষ্টমন্ত্র-মহৌষধির সত্ফল লাভে অবিলম্বে আরোগ্য ও পরমশ-প্রেমান্ন-পথ্য ভোগের যোগ্য হইব, সন্দেহ নাই। আমরা যত কিছু পাপ, অপরাধ বা অযথা কার্য্য করি, মরণ স্মরণ না থাকাই তাহার প্রধান কারণ। জীবনের অনিত্যতা যে জাজ্বল্যমান দেখে, প্রতিক্ষণ বৈরাগ্যের প্রহরতায় আজীবন অপাপ-জীবন তাহারই থাকে। কেননা, অনিত্য জীবনের অনিত্য বিষয়ভোগের অকিঞ্চিৎকরত্ব জ্ঞানে পাপের আপাতলোভনীয়ত্বের অভাবে স্বভাবতঃ তাহারই মনে জাগে।

উপসংহারে নিবেদন, সাংসারিক দুর্ঘটনা-বিশেষে আকস্মিক চিত্তাক্ষেপবশে যে সাময়িক বিষয়-বৈরাগ্য জন্মে, তাহাকে শাস্ত্রে "মর্কটবৈরাগ্য" বলা হইয়াছে; উহা স্থায়ী ও সাধন-সাফল্যদায়ী নহে। আবার শব-দর্শনে বা শববাহকের রোমহর্ষণী হরিধ্বনি শ্রবণে যে উদাসভীতিভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, শাস্ত্রোক্ত সেই "শ্মশান-বৈরাগ্য" ও ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকারী। কিন্তু দিনান্তে একবারও একান্ত-মনে স্বীয় শেষের সে দিনের অবশ্যম্ভাবিতা স্মরণ করিলে যে বৈরাগ্যের শুভ সঞ্চার হইতে থাকে, তাহা পাকা গাঁথনির ন্যায় সুদৃঢ়রূপে স্তরে ২ সংগঠিত হইয়া, বিষয়-জঞ্জাল বিরহিত বিশ্ব-বিস্তৃত আত্মমন্দির নির্ম্মাণ করে এবং বিশ্বময়ের প্রেমঘন জাগ্রত বিগ্রহ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া, পূজককে প্রেমানন্দ-প্রসাদ প্রদানে পরম পরিতৃপ্ত ও চরম চরিতার্থ করে। অতএব ভগবচ্চরণে

প্রার্থনা, আমরা যেন শেষের সে দিনের কথা 'শেষের সে দিন' পর্য্যন্ত কোন দিনই না ভুলি।

যেন—
শেষের সে দিন,
স্মরি প্রতিদিন।
মরণ-হরণ হরি,
এ ধারণা ধরি,
মরণ স্মরণ করি,
বলি 'হরি হরি'!

শ্রীশঃ—

জীবন-সংগ্রামের নবীন অস্ত্র।

সংগ্রাম সংসারের নিয়ম। কি জীবজগৎ কি জড়জগৎ সর্ব্বত্রই সর্ব্বক্ষণ সংগ্রাম বিদ্যমান। কালপ্রবাহ জীবনের বক্ষের উপর দিয়া খরবেগে সতত প্রবাহিত; অসমর্থ ভাসিয়া যায়, কোন্ অপরিজ্ঞাত প্রদেশে বাহিত হইয়া, স্বীয় অধিকার হারাইয়া ফেলে, আর সবল শক্ত দৃঢ়হস্তে সহস্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়া স্বাধিকার রক্ষা করে।

সূক্ষ্মচক্ষে দর্শন করিলে, সংসার নন্দনকানন বোধ হইবে না; কলকোকিলকূজিত নবপল্লব-মুকুলমণ্ডিত কুসুমস্তবক-সজ্জিত 'কুঞ্জ'ও মনে হইবে না। বস্তুতঃ ভয়াবহ রণক্ষেত্র রূপে প্রতীয়মান হইবে। শান্তি, প্রীতি এখানকার অতিথি—তাড়না, বেদনা, যাতনা, রোদন, পলায়ন ও মরণ এখানকার অধিবাসী। প্রতিদ্বন্দ্বিতার উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য, তীব্র-আক্রমণ, দুষ্কর আত্মরক্ষা, সবলের জয়, দুর্ব্বলের পরাজয় ক্ষয়—এখানকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ভারতীয় সমাজে এই জীবন-যুদ্ধ ভীষণ হইতে ভীষণতর ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রকৃতির অকৃপায় ভারতীয়গণ আক্রমণের ভার পান নাই। আত্মরক্ষার দুঃসাধ্য অগ্নি-পরীক্ষার অধিকার পাইয়াছেন। সমাজের উচ্চস্তরের কথাই প্রধানতঃ এ প্রবন্ধে আলোচ্য।

প্রথমতঃ দ্বিজাতির পুরাকালীন জীবনযুদ্ধের অস্ত্রগুলির বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ বিষয়ে বৈদিকযুগের অন্তিমভাগে (জীবিকা সম্বন্ধে) দৃষ্ট হয়,

"দ্রব্যমর্জ্জয়ন্ ব্রাহ্মণঃ যাজয়েদধ্যাপয়েৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা।"

অর্থোপার্জ্জনের জন্য ব্রাহ্মণ যাজন, (পৌরোহিত্য) অধ্যাপন, ও সৎপ্রতিগ্রহ করিবেন।

সংহিতাযুগেও এই সিদ্ধান্ত সম্মানিত হইত, প্রমাণ—

"ষণ্ণাস্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ।"

যজন, অধ্যয়ন, দান এবং যাজন, অধ্যাপন, প্রতিগ্রহ এই ষট্ কর্ম্ম ব্রাহ্মণের

কর্ত্তব্য, ইহার মধ্যে শেষোক্ত তিনটী জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়। এ নিয়ম সাধারণ।

সংহিতাযুগে জীবিকার্জ্জনের উপায়ভেদে ব্রাহ্মণগণ বহুশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়,

কুশূলধান্যকো বা স্যাৎ কুম্ভীধান্যক এব বা।
ত্র্যৈহিহিকো বাপি ভবেৎ অশ্বস্তনিক এব বা।
চতুর্ণামপি চৈতেষাং দ্বিজানাং গৃহমেধিনাং।
জ্যায়ান্ পরঃ পরোজ্ঞেয়ো ধর্ম্মতো লোকজিত্তমঃ।
ষট্‌কর্ম্মৈকো ভবত্যেষাং ত্রিভিরন্যঃ প্রবর্ত্ততে।
দ্বাভ্যামেকঃ চতুর্থস্তু ব্রহ্মসত্রেণ জীবতি।”

কুশূলধান্যক, কুম্ভীধান্যক, ত্র্যৈহিক অথবা অশ্বস্তনিক হইয়া জীবন যাপন করিবে। এই চতুর্ব্বিধ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষা পরোক্ত অধিক শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে কেহ ষট্‌কর্ম্ম অবলম্বন করিবে, কেহ কর্ম্মত্রয় গ্রহণ করিবে, কেহ দুইটী কর্ম্ম, কেহ বা ব্রহ্মসত্র দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।*

গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহুপরিবার-ব্যক্তি 'ঋত' অর্থাৎ শিল এবং উঞ্ছ (১) অযাচিত, যাচিত, কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদ (২) ঐ ষট্‌প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পপরিজন গৃহস্থ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ আশ্রয় করিতেন। অন্য গৃহস্থ প্রতিগ্রহকে নীচবৃত্তি মনে করিয়া, যাজন ও অধ্যাপন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। যাজনে দোষদর্শী ব্যক্তি কেবল মাত্র অধ্যাপন অবলম্বন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন।

এই শ্লোকে প্রদর্শিত চতুর্ব্বিধ গৃহস্থের বর্ণনা হইতে সমাজের বিভিন্ন প্রকার চারি

---

* মেধাতিথি বলেন, 'কুশূলধান্যক' অর্থাৎ যাহার বর্ষত্রয়ের সংস্থা (ধান্য ও বস্ত্রাদি) আছে, "কুম্ভীধান্যক' অর্থ ৬ মাসের উপযুক্ত ধান্য যাহার আছে। গোবিন্দরাজ বলেন, "কুশূলধান্যকের ১২ দিন চলিবার উপযুক্ত ধান্য আছে, "কুম্ভীধান্যকের' ৬ দিনের মত ধান্য সঞ্চিত আছে। কুল্লুকভট্ট বলেন 'কুশূল ধান্যকের' গৃহে ৩ বর্ষের ধান্য সঞ্চিত আছে। কুশূল অর্থ ইষ্টকাদিরচিত ধান্যাগার। আর 'কুম্ভীধান্যক' ষান্মাসা-হোপযোগী ধান্যের অধীশ্বর। কেহ বলেন কুশূল অর্থ মরাই,—দেশভেদে "আউড়ী" নামে অভিহিত। ইহারাই বড় দৃঢ় এবং বাহিরে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হইলে 'গোলা' নাম ধরে, তাহাই কুল্লুকের ধান্যাগার। কুম্ভী অর্থ 'জালা' বা 'কোলা' কিম্বা 'মাট্' ইত্যাদি প্রাদেশিক নামে পরিচিত বৃহৎ মৃৎপাত্র। কুশূল অর্থ 'গোলা' আর কুম্ভী অর্থ উষ্ট্রী বা আউড়ী। ইহা আমরা বলি।

(১) ক্ষেত্রপতিত বল্লরীগ্রহণ অর্থাৎ 'ধান্' কুড়াইয়া লওয়া শিল, এবং ক্ষেত্রে-পতিত পরিত্যক্ত ধান্যকণা সংগ্রহ উঞ্ছ। এতদুভয়ের নাম 'ঋত'।

(২) কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদ স্বয়ং করিবে না, অপরের দ্বারা করাইবে। গৌতমের ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে, "কৃষি-বাণিজ্যকুসীদঞ্চ স্বয়ং কৃতানীতি।"

অবস্থা বুঝিবার সুবিধা হয়। সমাজে সময়-বিশেষে কার্য্য-বিশেষ প্রশংসিত বা নিন্দিত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ জলন্ত সত্য। কৃষি ও বাণিজ্যাদির প্রতি অনাদরপ্রদর্শন সেই দিনই সম্ভব, যে দিন গ্রীক্ পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস্ ভারতে বিদ্যা ও ধর্ম্মব্যবসায়ীর আদর সমস্তাৎ ব্যাপ্ত দেখিয়াছিলেন। বৈদিকযুগের নবোদ্গমে কৃষিবাণিজ্য রাজ-পূজা পাইত, এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন দেখি না। জ্ঞানচর্চ্চার যুগে জ্ঞানীর উচ্চস্থানে যাঁহারা আরূঢ়, তাঁহাদের কৃষি স্বয়ং করিতে সঙ্কোচ বোধকরা স্বাভাবিক, সুতরাং "স্বয়ংকৃত" কৃষিবাণিজ্য তখন সমাজে স্থান পাইয়াছিল। এই সময় শারীর শক্তির প্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক কেবল মানসিক শক্তির অনুশীলন রূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণ-সমাজ দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ করেন। কার্য্যবিশেষের প্রতি ঘৃণা ও কায়িক পরিশ্রমে পরাঙ্মুখতাই মূল্যহীন মানের দাবী উপস্থিত করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছিল।

যখন কৃষি-বাণিজ্য-সেবার সহিত পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধ-রক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চাকারিগণের অপ্রীতিকর হইয়াছিল, তখন যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহই জীবিকার্জ্জনের উৎকৃষ্ট উপায় রূপে অবধারিত হইল।

প্রতিগ্রহের সম্মান—যোগ্যতার অন্তর্মূর্তি। শক্তিমানের চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিবার জন্য দেশ যেদিন প্রাণে প্রাণে প্রস্তুত ছিল, সেদিন প্রতিগ্রহের নামান্তর ছিল "পূজা-প্রাপ্তি" বা সৎকার-লাভ। মহাপ্রতিভা, অসীম সামর্থ্য ও উচ্চজ্ঞানের অভাবে "প্রতিগ্রহ" ভিক্ষা বা প্রার্থনার নীচমূর্ত্তি ব্যতীত অপর কিছুই হয় না। যখন প্রতিগ্রাহীর ধনলাভ "কাঙ্গালী বিদায়ের" দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন আভিজাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ-তনয়ের হৃদয়তন্ত্রীতে যে ঘৃণাব্যঞ্জক ঝঙ্কার উঠিয়াছিল, তাহারই পরিচয় শাস্ত্রে পরিস্ফুট। সে পরিচয় মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের দশমাধ্যায়ে। (৩) উহাতে প্রতিগ্রহকে নীচকর্ম্ম বলা হইয়াছে। সমাজের শ্রেষ্ঠ দুইটী যজন ও অধ্যাপন, (পৌরোহিত্য ও অধ্যাপকতা বা গুরুতা) লইয়া যোগ্য ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকিলেন; প্রতিগ্রহ উচ্চজীবিকার শ্রেণী হইতে নির্ব্বাসিত হইল।

সমাজের অপর স্তরে এই সময় আর এক ধ্বনি উঠিল। সুযোগ্য ব্যক্তি প্রতিগ্রহে ঘৃণা বোধ করিলেন। অপেক্ষাকৃত অযোগ্য— জ্ঞানার্চ্চায় অসমর্থ অভিজাতবংশীয় সন্তান ঘোষণা করিলেন—

'প্রতিগ্রহাৎ শুধ্যতি জপ্যহোমৈঃ
যাজ্যন্তু পাপং ন পুনন্তি বেদাঃ,"

প্রতিগ্রহ-জনিত দোষ জপ-হোমাদি-দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু যাজন-কর্ম্মে যে দোষ উৎপন্ন হয়, তাহা দূর করা বেদেরও অসাধ্য। এই প্রচারের পরিণামে 'প্রতিগ্রহ' উচ্চ জীবিকাজ্ঞানে পূজিত হইল না, (কারণ উৎকর্ষ-নিশ্চয় শিক্ষিত সমাজেরই করতলগত) পক্ষান্তরে, সুযোগ্য ব্যক্তিগণ যাজনের

---

(৩) প্রতিগ্রহাৎ যাজনাদ্বা তথৈবাধ্যাপনাদপি।
প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্য গর্হিতঃ।

প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। পৌরাণিক যুগে মহর্ষি বশিষ্ঠের মুখে পুরাণকার বলাইয়াছেন,

"পৌরোহিত্যমহং জানে গর্হিতং দূষ্যজীবিতং।
অকার্ষং গর্হিতমপি তবাচার্য্যত্ব-সিদ্ধয়ে।"

অর্থাৎ হে রাম! আমি জানি পৌরোহিত্য গর্হিত কর্ম্ম, ঘৃণ্য জীবিকা, তথাপি উপনয়ন সময়ে তোমার আচার্য্যত্ব লাভ করিবার প্রত্যাশায়ই ঐ নিন্দনীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সময়ে পৌরোহিত্য-ঘটিত কলহ-ঘটন, ও সেই বিভ্রাটের ফলে সমাজবিপ্লব—এমন কি রাষ্ট্রবিপ্লব পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পুরাণপাঠকের অবিদিত নহে। পৌরোহিত্য নির্ব্বাসিত হয় নাই, কিন্তু উচ্চসম্মান হারাইয়া যথা কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

শেষ আশ্রয়—ব্রাহ্মণ-শক্তির নির্দ্দোষ অবলম্বন ব্রহ্মসত্র বা অধ্যাপন। এই পদার্থ দুই বিভিন্ন আকারে আমাদের দেশে আপন কঙ্কাল লইয়া দণ্ডায়মান। এক আকার অধ্যাপকমণ্ডলী, অপর মূর্ত্তি গুরুসম্প্রদায়। অধ্যাপকবর্গের অধিকার-স্থান সমাজ-সাধারণ, গুরুকুলের অধিকার-ক্ষেত্র সমাজের অংশবিশেষ শিষ্যসন্ততি মাত্র।

এই দুই মূর্ত্তিতে মৃতপ্রায় ব্রহ্মসত্র প্রায় চতুর্দ্দশশতবর্ষাধিক পূর্ব্বের ব্রাহ্মণজীবিকার জীর্ণ নিদর্শন জগতে প্রচার করিতেছে।

ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি শস্ত্র-ধারণ, বৈশ্যবৃত্তি বাণিজ্য-কৃষি-পশুপালনাদি।

এ যাবৎ আমরা অনাপৎকালের উপার্জ্জন বিষয়ে আলোচনা করিলাম, অধুনা আপৎকালীন জীবিকার কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। শাস্ত্র, আর্ত্ত বা বিপন্নের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। বস্তুতঃ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা না হইলে, সে ব্যবস্থা যত সুন্দর বা পবিত্র হউক্ না কেন, সমাজ তাহাকে নিষ্ঠুর বিধান মনে করিতে বাধ্য হয়। যখন আপন্ন ব্রাহ্মণ স্বব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জনে অসমর্থ হইবেন, তখন তিনি ক্ষত্রিয়বৃত্তি—অর্থাৎ যোদ্ধৃকর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। (১) প্রদেশ-বিশেষের নিরক্ষর ব্রাহ্মণ-সন্তান জমিদারের "পাইক্" "পেয়াদা"রূপে নিরীহ প্রজার মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া আপদ্ধর্ম্মের নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। এখন উহা সামান্য ভৃত্যভাবমাত্র হইলেও, আরম্ভ-সময়ে উহা সৈনিকশক্তির অংশ-বিশেষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, এরূপ নির্দ্দেশ অসত্য নহে।

ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের দ্বারা জীবন রক্ষা ক্লেশকর হইলে, ব্রাহ্মণের আশ্রয় বৈশ্যবৃত্তি—অর্থাৎ কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য প্রভৃতি। (২) অবস্থার আপীড়নে ব্রাহ্মণসন্তান কৃষকের সকল কার্য্যই ক্রমে ২ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু "স্বহস্তে হলচালনা" এখনও অপকর্ম্ম

---

(১) মনু:—অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা। জীবেৎ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মেণ সহ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ।

(২) উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ ভবেৎ। কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্ বৈশ্যস্য জীবিকাঃ।

মনে করিতেছে। গোরক্ষণ যে ভাবে দেশে দিশুবান, তাহাতে উহার নাম 'গোহত্যা' রাখিলেই সত্যের আদর করা হয়। বাণিজ্য একেবারে "চর্ম্মপাদুকাবিক্রয়" পর্য্যন্তে অবতরণ করিয়াছে। গোরক্ষার এক মূর্ত্তি গোশকটজীবন। একজন বন্ধুর মুখে এক দিন শুনিয়াছিলাম, পশ্চিমের কোনও প্রসিদ্ধ সহরে একজন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে এক ব্যক্তি একখানা-পত্রের শিরোনামা পাঠ করিতে বলায়, বিপ্রপুত্র ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, "লালা" নহি"। শেষে জানা গেল, ঐ ব্রাহ্মণ-তনয় গোশকট-পরিচালনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার বিবেচনায়, পত্র পাঠ করা 'লালা' সম্প্রদায়ের এক চেটিয়া, ব্রাহ্মণের উহা অগৌরবকর। এ দৃশ্য যেমন শোকোদ্দীপক, তেমনি হাস্যজনক।

শূদ্রবৃত্তি ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। (১) শূদ্রবৃত্তি সেবাকর্ম্ম; প্রকৃত কথা বলিতেগেলে—উহা "খানসামাগিরি"র নামান্তর। শাস্ত্রের আদেশ, ব্রাহ্মণ শূদ্রবৃত্তি এবং শূদ্র ব্রাহ্মণবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবে না। বঙ্গদেশে ইহার এখনও বিশেষ ব্যতিক্রম হয় নাই। বলা বাহুল্য, 'শূদ্র' বলিতে 'অনার্য্য জাতি' বুঝিয়া থাকি। ভারতের কোনও ২ প্রদেশে ব্রাহ্মণ প্রকৃত শূদ্রবৃত্তি আশ্রয় করিয়াছে। লাহোরের একটি বিবরণ জনৈক বন্ধুর মুখে শুনিয়া বুঝিয়াছি, ইহা প্রকৃতির প্রতিশোধ, নূতন নহে। বিবরণ এই—জনৈক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ব্যক্তি উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া লাহোরে গিয়াছিলেন; তাঁহার ব্রাহ্মণ পাচক সন্ধ্যার পর প্রভুর চরণ-মর্দ্দনে (গোড়্ মলিতে) প্রবৃত্ত হইবে, চিরন্তন সংস্কার বশে তিনি নিষেধ করিলেন। প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিল, "ইহাকে আমরা 'দোষকর' মনে করি না।" ঋষির শাসন—বুভুক্ষার শোষণ অপেক্ষা প্রবল নহে। এ সংবাদে আনন্দিত হইতে পারি না। উদারতায়—মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মণ সংসারের সেবক হইতে পারেন, কিন্তু এ তাহা নহে; ধনাহঙ্কারে আত্ম সম্ভ্রম জ্ঞানের এরূপ মলীমস-মূর্ত্তি-গ্রহণ বা শোচনীয় পরিণতি লাভ কাহারও প্রীতিকর হইতে পারে না। আত্মম্ভরিতা জাতীয় উন্নতির অন্তরায়, কিন্তু আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান আত্মোন্নতির সর্ব্বপ্রধান উপকরণ, ইহা কাহারও বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

আপৎকালে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রবৃত্তি এবং বৈশ্য শূদ্রবৃত্তিও গ্রহণ করিতে পারেন।

এই পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় জীবিকার আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিলাম, আপৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণে দোষী হন না। বর্ত্তমান সমাজে বৃত্তিবিপ্লব রাজত্ব করিতেছে। অম্বষ্ঠগণ শাস্ত্রীয়বৃত্তি ছাড়িয়া নানা কর্ম্ম করিতেছেন,—শাস্ত্র বলেন, "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।" যাঁহারা 'মসীজীবী ক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের কেহ ২ অধ্যাপকতাও করিতেছেন। অপরবর্ণ বিপদেও ব্রাহ্মণবৃত্তি গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ শাস্ত্রের মত,—কিন্তু 'যাজন'কর্ম্ম ব্যতীত অন্য সকল ব্রাহ্মণজীবিকাই অপর

(১) মনুঃ—"ন কথঞ্চন কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ কর্ম্মবার্ত্তিকং।"

জাতির বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণও সর্ব্বজাতির বৃত্তি গ্রহণ করিতেছেন। অনাপদ্ধর্ম্মে এখন অপধর্ম্ম পাইতে প্রবৃত্ত, আপদ্ধর্ম্ম অনাপদে প্রবৃত্ত। সমাজের যে অত্যন্ত আপৎকাল উপস্থিত, ইহা বলা বাহুল্য। অপকৃষ্টের—শূদ্রকর্ম্মের সেবা দ্বারাও গ্রাসাচ্ছাদনের স্বচ্ছলতা ঘটিতেছে না।

দারিদ্র্য, রোগ, শোক ও অকালমৃত্যুর সংক্রামণে সমাজের বক্ষঃস্থল অবিরত সংক্ষোভণে বিক্ষিপ্ত করিতেছে; যেখানে তাহারাই চিরদিনের জন্য আনন্দধ্বনির দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়াছে, সে সমাজের যে আপৎকাল, ইহা জড়বুদ্ধিরও অগোচর নয়। অতএব এরূপ আপদ্ধর্ম্মের প্রচার বাঞ্ছনীয়।

আপদ্ধর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে, এ দুইটী শাস্ত্রপ্রসঙ্গে স্মৃতি-বিপ্লবের পরিচায়ক। মনু বলিতেছেন—

"বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং
বিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতিঃ ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবন-
হেতবঃ।"

অর্থাৎ বিপৎকালে বিদ্যা, শিল্প, ভৃতি (বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন—'চাকরী'), সেবা (১) (শূদ্রকর্ম্ম), গোরক্ষণ, ব্যবসায় (বাণিজ্য) কৃষি (স্বয়ংকৃত) সন্তোষ, ভিক্ষাচর্য্যা, কুসীদ (সুদ লইয়া—টাকা ধার দেওয়া), এই দশবিধ জীবিকার্জ্জনের উপায়।

'বিদ্যা' অর্থে ব্যাখ্যাতৃগণ তর্কবিদ্যা, বিষবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বুঝিয়াছেন—ইহা সকল বর্ণের বিপৎকালের জীবিকা।

'বৈদ্যতর্কবিষাপনয়নাদিবিদ্যা
সর্ব্বেষামাপদি জীবনার্থং ন
দুষ্যতি, ('মন্বর্থমুক্তাবলী।')

সুতরাং উত্তরবঙ্গে ও কলিকাতায় ব্রাহ্মণ-কবিরাজগণ অপকর্ম্ম করিতেছেন না।

"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ভেষজং ন
কার্য্যং।"

এই নিষেধোক্তি (বেদবাণী) তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে; কারণ, উহা স্ববৃত্তি-দ্বারা জীবিকার্জ্জন সম্ভব হইলেই অপরবৃত্তি-গ্রহণ নিষেধ করিতেছে।

এই সমস্ত জীবনোপায়ের মধ্যে যাহার যাহা নিষিদ্ধ, তিনি বিপদে তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। মন্বর্থমুক্তাবলীর যুক্তিপূর্ণ উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি "আপৎপ্রকরণাৎ, জীবন হেতব ইতি,

(১) 'সেবা' অর্থে কুলুকভট্ট বলেন—"পরাজ্ঞাসম্পাদনং"। পরের আদেশ পালনেই জীবিকার্জ্জন করা, তদ্দ্বারা অর্থ গ্রহণ করিলেই জীবিকা হয়। 'ভৃতি' অর্থে তিনি বুঝিয়াছেন, "বেতনভুক্তের বেতনগ্রহণং।" এতদুভয়ের পার্থক্য বুঝি না। বিনা বেতনে পরের আদেশ-পালনে যখন জীবনরক্ষার পথ পরিষ্কৃত হয় না, তখন বেতন লইয়া পরাজ্ঞাপালন করা, বেতন লইয়া পরের প্রেষ্য (আজ্ঞাপালক) হওয়া, এ দুইটীর ভেদ কোথায়? "শিল্প" বলিতে তিনি বুঝিয়াছেন: "শিল্পং লিখনাদিকরণং"। শিল্প অর্থে যদি "কেরাণীগিরি" হয়, তবে শিল্পের চিত্তাকর্ষক হয় নাই; "ভৃতি" অর্থ চাকরী, ইহাতে মতভেদ নাই।

নির্দ্দেশাৎ এবাং মধ্যে বয়া বৃত্ত্যা বক্তানাপদি জীব্যাং নিষিদ্ধং তয়া তত্তাত্যনুজ্ঞায়তে ইত্যাদি।”

ধৃতি অর্থাৎ সন্তোষে দুঃখের ভার লঘু হয়, কিন্তু উহা আপৎসময়ের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়রূপে গণ্য হইবার যোগ্য কি না, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। ধৃতি অর্থে ধৃতিমত্তা। ধৃতি—ধারণা অর্থাৎ অতীত ব্যাপারের স্মারকলিপীরক্ষা (পুরাতন হিসাব রক্ষা।) এরূপ কেহ বলেন, কথাটা নিতান্ত মন্দ বোধ হয় না।

‘বিদ্যা’ শব্দে আমরা অধ্যাপনা বুঝি। ব্রহ্মসত্রে (অনাপদ্বৃত্তিতে) বেতনব্যবস্থা নাই। অধ্যাপকমণ্ডলী ও গুরুকুল, সমাজের দ্বারা সেবিত—পালিত হন, কিন্তু তাঁহাদের অর্থাগম—বেতন বা ভৃতিশব্দবাচ্য নহে। কালনিয়মে নিয়ত-সংখ্যক মুদ্রা গ্রহণ করিয়া কার্য্য সম্পাদন করাই ভৃতিজীবন। অনাপৎকালে অধ্যাপনে বেতন গ্রহণ নিষিদ্ধ, কিন্তু আপদে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যাপনা করা শাস্ত্রোক্ত ভৃতকাধ্যাপকতা।

স্বচ্ছন্দতার ভৃতকাধ্যাপকতা নিন্দনীয়, উহাতে প্রায়শ্চিত্তভাগিতাই শাস্ত্রের অভিমত। বেতনগ্রাহী অধ্যাপক ঘৃণিত, পক্ষান্তরে সমাজের সর্ব্ববিধ সহানুভূতি-রহিত। মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ে ১৫৬ শ্লোকে দৃষ্ট হয়,—ভৃতকাধ্যাপককে দৈব-কার্য্যে এবং পিতৃকার্য্যে নিমন্ত্রণ করাও দোষাবহ। এই নিন্দিত ভৃতকাধ্যাপকতা বিপৎকালে কর্ত্তব্য বলাই সঙ্গত।

যাজ্ঞবল্ক্য ‘শকট’ ‘গিরি’ এবং ‘অনূপ’ (জীবিকোপায়ের মধ্যে) এই তিনটী অতিরিক্ত লিখিয়াছেন। শকটচালনা এবং পর্ব্বতের কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি বিক্রয় জীবিকার্জ্জনের উপায় বটে। ‘অনূপ’ অর্থাৎ (জলপ্রায়ং) নিম্ন-ভূমি,—সেখানে বৃক্ষ ওষধি উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্বিক্রয় জীবিকানির্ব্বাহের অন্যতম উপকরণ।

বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ নীল, লাক্ষা, লবণ, লৌহ, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, গুড়, মদ্য, মাংস, পশু, মনুষ্য ও কৃতান্ন (রাঁধা ভাত) প্রভৃতি বিক্রয় করিবে না।

মনু মহারাজের এ নিষেধ আর কেহ মানে না, কৃতান্নবিক্রয় বন্ধ হইলে নানা নামের নানা ভাবের “হোটেল্” গুলি বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে দেশের লোকের অশেষ আপত্তি। যখন “আব্‌গারী” বন্দোবস্ত হয়, তখন সময় সময় কুলীন ব্রাহ্মণেরা ডা’কুই অগ্রগণ্য হয়, দেখিয়াছি।

এই বৃত্তিবিপ্লব ভারতে সুবর্ণযুগ আনয়ন করিবে আশা করি। বিপ্লব হইতে শৃঙ্খলা আসে।

সমাজের কাছে এইসব শাস্ত্রের আর সম্মান নাই। ব্যবসায় কাহারও নিজস্ব নহে। সকলেই সকল ব্যবসায়ের অধিকারী। যখন আপদ্ধর্ম্মেরও নীচে যাওয়া হইতেছে, তখন সুবিধানুসারে ভদ্রভাবে ব্যবসায় গ্রহণ করা সকলেরই ইচ্ছা।

শ্রম স্বীকার করিতে এ দেশের ভদ্রলোকেরা পরাঙ্মুখ। মানের পরিমাণ এখনও নিতান্ত অল্প নয়; কাজেই ‘চাকরী’কে সভ্যতার চরম আদর্শ মনে করিয়া, অজাত-শ্মশ্রু বালক হইতে পক্বকেশ প্রৌঢ় পর্য্যন্ত তাহারই সেবায় ষোড়শোপচার সংগ্রহ

করিয়া "সার" হইতেছি। সম্প্রতি ভগবৎ-কৃপায় আমরা ঐ অধঃপতনের পথে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। অদৃষ্টের কশাঘাতে ফিরিতে বাধ্য হইতেছি। চাকরী যে আপৎকালে অকর্ত্তব্য নয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য সমাগত হওয়ায়, আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছি ও আত্মশক্তির অনুশীলনে অসামর্থ্য অনুভব করিতেছি।

শিল্প-বাণিজ্য-চন্দ্রমা বৈদেশিক অভিজাত-রাহুর করালকবলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। 'কৃষি' অনাদৃত—অবজ্ঞাত—উপেক্ষিত হইয়া সমাজের নিম্নস্তরে মুখ লুকাইয়া আছে। নিপুণদৃষ্টিতে দেখা যায়, সমাজের দুই স্তরে জীবনসংগ্রামের দুই অস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। উচ্চস্তরে লেখনী, নিম্নস্তরে হল বা লাঙ্গল। নিম্নস্তর সবেগে লেখনীর চঞ্চল অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। লেখনী-দেবী কিঞ্চিৎ চিত্তচাপল্য অনুভব করিতেছেন মাত্র, এখনও নিম্নস্তরে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হন নাই।

নিম্নস্তরে যে ক্ষত্রশক্তি (*) অবজ্ঞাত ভাবে বিরাজিত, তাহা হইতে ধ্বনি উঠিয়াছে,—"হে অগ্রগণ! তোমরা আমাদিগকে বহুকুলের ব্রাত্যরূপে বৃথা ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছ, অথচ তোমরাই আমাদিগকে 'চাষা' বলিয়া ঘৃণা কর, আমাদের জল গ্রহণ করিতেও তোমরা কুণ্ঠিত। আমাদের সামাজিক অধিকার দেও; নতুবা তোমাদের ভূমি আর কর্ষণ করিব না। তোমরা যেমন বিদেশীদ্রব্য বর্জ্জন করিয়াছ, আমরা সেইরূপ তোমাদের সম্বন্ধ বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইব।"

জানি না, আজ মনু যাজ্ঞবল্ক্য থাকিলে কি উত্তর দিতেন! আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ ধারণা হয়, দুর্ব্বল ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি, কাহাকেও কোনও অধিকার প্রদান করিতে পারে নাই। সবল হস্তে দানের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। অশক্তের অপরকে অধিকার প্রদানের নামান্তর বা রূপান্তর বোধ হয় "স্বাধিকারে বঞ্চিত হওয়া"। ভারতীয় সমাজে সঙ্কটসমস্যার সময় সমাগত, এ সময়ে প্রত্যেক মনীষী ব্যক্তি আত্মহিত-চিন্তায় অগ্রসর হউন্।

জীবনযুদ্ধের পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে লেখনী আর সমাজের অন্নসমস্যার সুমীমাংসায় সক্ষম নহে; সুতরাং আমরা বলদেবের প্রিয়াস্ত্র "হলদেবে"র সেবা করিতে বলি। পুরাতত্ত্বে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের হলচালনা "পুরাতন" হইলেও, বর্ত্তমান সমাজের নয়নে "নূতন"। তাহাই বলি, হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের ভ্রাতৃগণ! জীবনসংগ্রামের নবীন অস্ত্র গ্রহণ করুন। আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ বৈদিক যুগের প্রারম্ভে আপনাদিগকে 'আর্য্য' বা 'কর্ষক' নামে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; পরন্তু গৌরব মনে করিতেন। তাঁহারা জগতের এক অসীমশক্তিশালী সম্প্রদায় ছিলেন। আপনারা সর্ব্বসংহারক "মান" কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইয়া দিয়া, "প্রাণ" রক্ষা করুন। বিশাল সংসারে যাহাদের বিত্তবিত্তপ্রমাণ ভূমিও নিজের নাই, তাহাদের আবার মান? শৃগালীও আপন গহ্বরে স্বাধীনতার স্বর্গসুখ সম্ভোগ করে; আর আপনাদের সেরূপ আশা করিবার শক্তিও সামর্থ্য—স্বত্ব

* লেখকের মতে—বৈশ্যবৃত্তিসম্পন্ন বর্ব্বর শূদ্র-শক্তিকেই আর দেশবাসী "ক্ষত্রশক্তি" বলে অভিহিত করিতেছেন।

"স্নানে"র অভিনয়ে মান জ্ঞান হয়! হল-চালনায় আপনাদের শাস্ত্রসম্মত অধিকার আছে।

মহর্ষি মনু অনাপৎকালে অস্বয়ংকৃত কৃষি ও বিপদে পরোক্ষভাবে স্বয়ংকৃত কৃষি অর্থাৎ বৈশ্যধর্ম্ম অনুমোদন করিয়াছেন। পরাশর বলিয়াছেন, ষট্‌কর্ম্মনিরত বিপ্র কৃষি কর্ম্ম (অনাপৎ সময়ে) করাইবেন। তাৎপর্য্য বুঝা যায়, আপৎকালে স্বয়ং কৃষি করিতে পারেন। ধর্ম্ম শাস্ত্র-প্রণেতা বৃহস্পতি গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

"কৃষিবাণিজ্যকুসীদং প্রকুর্ব্বীতা-স্বয়ং কৃতং।
আপদি স্বয়মপ্যেতৎ কুর্ব্বন্ যুজ্যেত নৈনসা।"

কৃষি বাণিজ্য ও কুসীদ স্বয়ং করিবে না, অপরের দ্বারা করাইবে। কিন্তু আপৎকালে স্বয়ং কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদের অনুষ্ঠানে পাপস্পর্শশঙ্কা নাই। ইহার মধ্যে কুসীদ অপেক্ষাকৃত ঘৃণ্য। কূর্ম্মপুরাণে দুন্দুভিনাদে প্রচারিত হইয়াছে।

"কৃষিং স্বয়ং প্রকুর্ব্বীত বাণিজ্যং বা সমাশ্রয়েৎ।
কষ্টাং পাপীয়সীং বৃত্তিং কুসীদং তাং পরিত্যজেৎ।"

স্বয়ং কৃষি বা বাণিজ্য করিবে, কিন্তু পাপবৃত্তি কুসীদ পরিত্যাগ করিবে। বস্তুতই কুসীদ, চরিত্রের মহত্ব নষ্ট করে। উহা ধন-বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় হইলেও উদারতার শত্রু।

বৈশ্যাচারের বিজয়যুগে কৃষিবাণিজ্যই জয়যুক্ত হইবে। বাণিজ্য বর্ত্তমান-প্রতিযোগিতার সমরক্ষেত্রে সহজে জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য লাভ করিতে পারিবে কি না—বলা যায় না, তজ্জন্য স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা চলিতেছে। এখন কৃষিই শ্রেষ্ঠসাধন। হে ভ্রাতৃগণ! শরীরের স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতার ভাবস্ফূর্ত্তি যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে শ্যামল শস্যলতিকার চরণচুম্বি শীতল-সমীর সেবন করিয়া অনাবৃত আনন্দের অধীশ্বর হও। জাতীয়তার নব প্রভাতে জীবনসংগ্রামের নবীন অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, পদভরে ভুবন কাঁপাইয়া অগ্রসর হও, ভগবানের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ অলক্ষ্যে তোমাদের মস্তকে বর্ষিত হইবে। ওঁ শান্তি!

জাতীয় বিদ্যালয়
যশোহর।

বররত্নমালা।

অথ মুমুক্ষূণামুপাদেয়েষু পদার্থেষু কতমা বরিষ্ঠা রত্নভূতা ইতি। উচ্যতে॥ (১)

আগমেষু শ্রুতিঃ। শ্রুতিষু—"যচ্ছেদ্‌বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনীতি" সাধন পক্ষে। (২) আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ,

---

বঙ্গানুবাদ।

মুমুক্ষুগণের উপাদেয় পদার্থের মধ্যে কোন্‌গুলি বরিষ্ঠ রত্নস্বরূপ, তাহা বলা হইতেছে। (১)

আগম সকলের মধ্যে শ্রুতি শ্রেষ্ঠ।

সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব-গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ ইতি সাধন বুদ্ধি পক্ষে। তত্ত্বপক্ষেতু— (৩)

সাধনবিষয়ক শ্রুতির মধ্যে এই শ্রুতি শ্রেষ্ঠ—প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্‌কে (অর্থাৎ বাগ্-অন্বিত সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়কে) মনে উপ-সংহৃত করিবেন, মনকে * জ্ঞানরূপ আত্মাতে অর্থাৎ "আমি জানিতেছি" এই স্মৃতি-প্রবাহে উপসংহৃত করিবেন। সেই জ্ঞানকে মহান্ আত্মায় বা অস্মিতা মাত্রে উপসংহৃত করিবেন এবং অস্মিতাকে শান্ত, আত্মায়—অর্থাৎ উপাধি শান্ত বা বিলীন হইলে যে স্বরূপ-আত্মা থাকেন, তদভিমুখে উপসংহৃত করিবেন। (২)

* সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে মন স্বয়ং উপ-সংহৃত হইয়া জ্ঞান আত্মায় যায়। মহা-ভারত বলেন "তদৈবোপহৃ সঙ্কল্পাৎ মনো হ্যাত্মনি ধারয়েৎ"। এ বিষয়ে যোগতারা-বলীতে শঙ্করাচার্য্য অতি সুন্দর কথা বলিয়া-ছেন, তাহা যথা "প্রসহ্য সঙ্কল্প পরম্পরাণাং সংছেদনে সন্তত সাবধানঃ। পশ্যন্নুদাসীন দৃশা প্রপঞ্চং সঙ্কল্পমুন্মূলয় সাবধানঃ"। অর্থাৎ সাবধান বা সদা স্মৃতিমান্ হইয়া শৌর্য্যসহকারে প্রপঞ্চে বিরাগ পূর্ব্বক সঙ্কল্পকে উন্মূলন কর।

সাধনের বৃদ্ধি কিসে? এই শ্রুতি শ্রেষ্ঠ—আহারশুদ্ধি * অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রবলভাবে বিষয় গ্রহণ ত্যাগ করিলে সত্ত্ব-শুদ্ধি বা চিত্তপ্রসাদ হয়; সত্ত্বশুদ্ধি হইতে ধ্রুবাস্মৃতি বা সমাধি হয়। স্মৃতি লাভ হইলে, সমস্ত অবিদ্যাগ্রন্থি হইতে বিমুক্তি হয়। (৩)

* বৌদ্ধ যোগিগণ ইহাকে আহারে

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতো পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতি-
রিতি॥" (৪)

সিদ্ধেষু আদিবিদ্বান্ পরমর্ষিঃ কপিলঃ।
দর্শনেষু সাংখ্যম্। সাংখ্যগ্রন্থেষু যোগ-
দর্শনম্।

মহাযুক্তাষ সাংখ্যেষু শাক্যমুনিঃ।

প্রতিকূল—সংজ্ঞা বলেন। তন্মতে আহার চতুর্ব্বিধ। কবলিঙ্কার বা অন্ন, স্পর্শ বা ঐন্দ্রিয়িক বিষয়, মনঃসঞ্চেতনা বা জন্ম এবং বিজ্ঞান। কবলিঙ্কার আহারকে পুত্রের মাংস ভক্ষণবৎ বোধ করিবে; স্পর্শকে চর্ম্মহীন গাত্র পৃষ্ঠ বেদনাবৎ দেখিবে, মনঃসঞ্চেতনাকে অগ্নিময় স্থান বা তুষানলের মত দেখিবে, এবং বিজ্ঞানকে বিদ্ধশেল সমান দেখিবে। এইরূপ দেখার নাম আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা। এইরূপ দেখিতে শিক্ষা করিলে যে সাধকগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

তত্ত্ববিষয়ক শ্রুতি মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ—

অর্থ বা বিষয় সকল ইন্দ্রিয় হইতে পর (কারণ বিষয় ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বারা গ্রহণ হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহার বিষয়ত্ব মনেই প্রকাশিত হয়)। অর্থ হইতে মন পর। মন (চিন্তার কারণ) হইতে বুদ্ধি বা অহ-ঙ্কার পর। বুদ্ধি (অভিমান রূপা) হইতে মহান্ আত্মা পর। মহান্ আত্মা বা মহত্তত্ত্ব (সমাধি প্রাপ্ত "অস্মীতি" বোধ) হইতে অব্যক্ত পর (কারণ মহত্তত্ত্ব লীন হইয়া অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত বা প্রকৃতি (স্বরূপতঃ সমস্ত অনাত্ম পদার্থের লীনভাব) হইতে পুরুষ পর। পুরুষ হইতে কিছু পর নাই, তাহা চরমা গতি॥ (৫)

স্বগতদোষাবীক্ষণায় বৌদ্ধনীতিশাস্ত্রম্। বৌদ্ধশাস্ত্রেষু ধর্ম্মপদম্। বীজেষু ওঙ্কারঃ সোহহমিতি চ। মন্ত্রেষু "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যাদি"। ধর্ম্মগাথাসু "শয্যাসনস্থোহথ পথি ব্রজন্ বা স্বয়ঃপরিক্ষীণবিতর্ক জালঃ। স সারবীজক্ষয়মীক্ষমানঃ স্যান্নিত্যতৃপ্তোহমৃতভোগভাগীতি" (৫)

সিদ্ধের মধ্যে আদি বিদ্বান্ পরমর্ষি কপিল * শ্রেষ্ঠঃ। দর্শনের মধ্যে সাংখ্য শ্রেষ্ঠঃ। সাংখ্যগ্রন্থের মধ্যে যোগদর্শন। মহানুভাব সাংখ্যের মধ্যে শাক্যমুনি *। আত্মগত দোষ দেখিবার জন্য বৌদ্ধনীতি শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে ধর্ম্মপদ শ্রেষ্ঠ। বীজের মধ্যে ওঙ্কার ও সোহহম্। মন্ত্রের মধ্যে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে"। অর্থাৎ সেই বিষ্ণু বা আকাশে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ব্যাপনশীলদেবের পরমপদ সদা জ্ঞানী বেদবিৎগণ হৃদয়ে স্মৃতিমান্ হইয়া অবলোকন করেন। "শয্যা বা আসনে স্থিত বা পথে চলিতে ২ আত্মস্থ, চিন্তাজাল যাঁহার ক্ষীণ, তাদৃশ সংসার-বীজের ক্ষয় দর্শন করিতে২, নিত্যতৃপ্ত, অমৃত ভোগভাগী হইবে"। যোগভাষ্যস্থ এই বৈরাগিকী গাথা মোক্ষধর্ম্মে বীর্য্যপ্রদায়িনী গাথার মধ্যে শ্রেষ্ঠ॥ (৫)

* প্রথমে এই পৃথিবীতে যাঁহা হইতে মোক্ষধর্ম্ম বা সাংখ্যযোগ প্রবর্ত্তিত হয়, তিনিই কপিল। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ সম্যক্ উপদেষ্টা ছিলনা। তিনি স্বীয় পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কার বলে ইহজীবনে যোগের দ্বারা পরম পদ সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ করেন। মতান্তরে সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ভ দেবই (বৈদিক যুগে ঋষিগণ জগতের অধীশ্বরকে বা সগুণব্রহ্মকে 'হিরণ্যগর্ভ' নামে জানিতেন) তাঁহাকে যোগধর্ম্মের

আধ্যাত্মিকাসু মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তীয়া যোগক্ষী চ। সাধনালম্বনেষু আত্মা প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ইতি শ্রুত্যুদ্দিষ্টঃ। মোক্ষোপায়েষু শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞাঃ। বাহ্যধ্যানেষু

আলোক দেন। শ্রুতি আছে "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি" ইত্যাদি। স্মৃতি বলেন "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ"। সম্ভবতঃ এই মতভেদ লইয়া ঋষিযুগের ভারতে সাংখ্য ও যোগ নামে দুই সম্প্রদায় হয়। কিন্তু উভয়ের আদিই কপিল। জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি উপনিষদের ঋষিগণ সকলেই কপিলের পরে এবং কপিল-প্রবর্ত্তিত সাংখ্যযোগের দ্বারা পারদর্শী ছিলেন, ইহা ভারত হইতে জানা যায়। ভারতে আছে "জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে। যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র॥"

(মোক্ষধর্ম্ম ৩১০ অধ্যায়) অর্থাৎ হে নরেন্দ্র, মহদ্ব্যক্তির মধ্যে, বেদ সকলে, সাংখ্যমতাবলম্বী ও যোগমতাবলম্বীগণের মধ্যে যে মহৎ জ্ঞান দেখা যায় এবং পুরাণেও যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যায়, তাহা সমস্তই সাংখ্য হইতে আসিয়াছে। অন্যত্র "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্।" "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।" ফলে মহর্ষি কপিল পৃথিবীতে মোক্ষধর্ম্মের আদিম উপদেষ্টা। তাঁহার বাক্য অবলম্বন করিয়া তদীয় শিষ্য প্রশিষ্যগণের দ্বারা সাংখ্য-যোগাদি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

* শাক্যমুনির গুরুদ্বয় (আড়ার কালাম ও রুদ্রক-রাম পুত্র) সাংখ্য ও যোগী ছিলেন। সাংখ্যীয় মোক্ষবাদী পদও শাক্যমুনি সম্যক্ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তিনি সাংখ্যযোগী, অভিধানে যদ্যপি নাই। কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ অভ্যাস করিয়া থাকাতে তিনি মহানুভাবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

মুক্ত পুরুষঃ। আধ্যাত্মিক ধ্যেয়েষু বোধঃ। মিশ্রধ্যানেষু আত্মস্থ মুক্তপুরুষ ধ্যানম্। স্থূল বন্ধনস্য প্রমাদস্য প্রহাণায় স্মৃতিঃ। সূক্ষ্মবন্ধন-রূপায়া অস্মিতায়া নিরোধোপায়েষু তপঃসু চ প্রাণায়ামঃ। (৬)

ঐকাগ্র্য সাধনেষু স্মৃতিঃ। স্মৃত্যা লক্ষণাসু দ্রষ্টাহং-স্মরামি স্মরিষ্যমহঞ্চ তিষ্ঠামীতি। ধার্য্যবিষয় স্মৃতিসাধনেষু শিথিলপ্রযত্ন শরীরস্য প্রাণক্রিয়া-বোধস্মৃতিঃ। কার্য্যবিষয় স্মৃতি সাধনেষু বাগ্‌রোধস্য বোধস্মৃতিঃ। জ্ঞেয় বিষয় স্মৃতিসাধনেষু নাদবোধস্মৃতিঃ হার্দ্দজ্যোতি র্বোধস্মৃতিশ্চ॥ (৭)

আখ্যায়িকার মধ্যে মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বীয় এবং বৌদ্ধ আখ্যায়িকা শ্রেষ্ঠ; কারণ উহাতে কেবল বিশুদ্ধ মোক্ষধর্ম্মনীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধনের আলম্বনের মধ্যে আত্মভাব শ্রেষ্ঠ। প্রণব ধনু, শর আত্মা, ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য ইত্যাদি, শ্রুতিতে এই আত্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। মোক্ষের উপায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা। বাহ্যধ্যেয় পদার্থের মধ্যে মুক্ত-পুরুষ। আধ্যাত্মিক ধ্যেয়ের মধ্যে বোধ। মিশ্র (বাহ্য ও আধ্যাত্মিক) ধ্যানের মধ্যে আত্মস্থ মুক্ত পুরুষের ধ্যান শ্রেষ্ঠ। বন্ধনের মধ্যে স্থূল যে প্রমাদ, তাহার নাশের জন্য স্মৃতি শ্রেষ্ঠ। সূক্ষ্মবন্ধন যে অস্মিতা, তাহার নিরোধের উপায়ের মধ্যে এবং তপস্যার মধ্যে প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ। (৬)

ঐকাগ্র্য সাধনের মধ্যে স্মৃতি সাধন শ্রেষ্ঠ। স্মৃতির লক্ষণার মধ্যে এই লক্ষণা শ্রেষ্ঠ—"আমি (স্মরণ ব্যাপারের) দ্রষ্টা" এই ভাবে স্মরণ করা এবং তাহা যে স্মরণ করিতেছি, তাহাও স্মরণ করিতে থাকিব ও থাকিতেছি, এতাদৃশ ভাবই-স্মৃতি। শিথিল-প্রযত্ন শরীরের যে প্রাণক্রিয়া, তাহার

আনুব্যবসায়িকস্মৃতি সাধনেষু অতীতানাগত চিন্তা নিরোধ জ্ঞান-স্মৃতিঃ। সাহি সকল কল্পন পূর্ব্বকৃত্যাদি স্মরণ নিরোধাত্মিকা। স্মৃতিসাধন স্থানেষু মূর্দ্ধজ্যোতিষি পশ্চাদ্‌ভাগে বং॥ (৮)

সুখেষু শান্তিসুখম্। বাহ্যসুখেষু সন্তোষজং যৎ। সুখসাধনেষু বৈরাগ্যম্। বৈরাগ্য-সাধনেষু নিরিচ্ছতাজনিতো যো ভাব-বিশেষঃ চিত্তেন্দ্রিয়স্য, তৎস্মৃতিপ্রবাহ ভাবনম্॥ (৯)

বোধের স্মৃতি—শরীরবিষয়ক স্মৃতির সাধনের মধ্যে প্রধান। জ্ঞেয় বিষয়ক স্মৃতি সাধনের মধ্যে অনাহত নাদের বোধস্মৃতি * এবং হৃদয়স্থ জ্যোতির বোধস্মৃতি প্রধান। (৭)

* ইহাকে নাদানুসন্ধান বলে। যোগতারাবলীতে আছে—লোকে যে সওয়া লক্ষ লয়ের উপায় আছে, তন্মধ্যে নাদানুসন্ধান শ্রেষ্ঠ।

অতীত ও অনাগত চিন্তার যে নিরোধ, তাহার যে বোধ, তদ্বিষয়ক স্মৃতি—আনুব্যবসায়িক স্মৃতি সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহা সকল ও পূর্ব্বকৃত্যাদি স্মরণের নিরোধস্বরূপ। শিরঃস্থ জ্যোতির পশ্চাৎপ্রদেশ স্মৃতিসাধনস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৮)

সুখের মধ্যে শান্তি সুখ শ্রেষ্ঠ। বাহ্যবিষয়ক সুখের মধ্যে সন্তোষজ সুখ। সুখের সাধনের মধ্যে বৈরাগ্য। নিরিচ্ছতা থাকিলে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের যে ভাববিশেষ অনুভূত হয়, স্মৃতির দ্বারা তাদৃশ ভাবপ্রবাহ উপস্থিত রাখা বৈরাগ্য সাধনের মধ্যে প্রধান। (৯)

বৈরাগ্য সহায়েষু সন্তোষো হেয়তত্ত্ব-জ্ঞানঞ্চ। সন্তোষসাধনেষু ইষ্টপ্রাপ্তৌ সন্তুষ্ট নিশ্চিন্তভাবস্য স্মৃত্যা ভাবনম্ ॥ (১০)

দমেষু বাগ্দমঃ। বাক্যেষু তত্ত্ববিষয়কং যৎ। কামদমনোপায়েষু ভোগোপরমঃসন্ কাম্যবিষয়াস্মরণম্। লোভদমনোপায়েষু তুষ্টঃসন্ অভাবসঙ্কোচঃ। শারীর ধৈর্য্যেষু চক্ষুঃধৈর্য্যম্ ॥ (১১)

ধারণয়া চিত্তবন্ধনায় আধ্যাত্মিক দেশঃ শ্বাস-প্রশ্বাসৌ চ। আধ্যাত্মিক দেশেষু আহৃদয়াৎ আব্রহ্মরন্ধ্রঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ বোধ-ব্যাপ্তো যঃ। শ্বাস-প্রশ্বাসয়োঃ যদ্দীর্ঘং সূক্ষ্মং প্রযত্নবিশেষপূর্ব্বকং রেচনং সহজতঃ পূরণঞ্চ। প্রাণায়াম প্রযত্নেষু সর্ব্বকরণানাং স্থির শুভ্র-স্বভাবস্য স্মারকাণি রেচনপূরণবিধারণানি ॥ (১২)

বৈরাগ্যের সহায়ের মধ্যে সন্তোষ এবং হেয়তত্ত্বের জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। ইষ্টপ্রাপ্তি হইলে যে তুষ্ট নিশ্চিন্তভাব অনুভূত হয়, তাহার স্মৃতি-প্রবাহ ভাবনা করা সন্তোষ-সাধনের মধ্যে প্রধান। (১০)

দমের মধ্যে বাগ্দম। বাক্যের মধ্যে তত্ত্ববিষয়ক বাক্য। ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়-ভোগে নিরস্ত রাখিয়া কাম্যবিষয়কে স্মরণ না করা কামদমনোপায়ের-মধ্যে শ্রেষ্ঠ। লোভদমনোপায়ের মধ্যে তুষ্ট হইয়া অভাব সঙ্কোচ করা। শারীর ধৈর্য্যের মধ্যে চক্ষুর ধৈর্য্য। (১১)

ধারণার দ্বারা চিত্তবন্ধন করিবার জন্য আধ্যাত্মিক দেশ এবং শ্বাস-প্রশ্বাস শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক দেশের মধ্যে হৃদয় হইতে

ধীপ্রসাদায় যুক্তজ্ঞানার্জ্জনম্। জ্ঞানেষু কার্য্যকরং যৎ। জ্ঞানার্জ্জনোপায়েষু শ্রদ্ধা-সহিতা জিজ্ঞাসা। জ্ঞানার্জ্জন প্রতিপক্ষ প্রহানায় মানস্তব্ধতাত্মম্ভরিতা ত্যাগঃ। জ্ঞানেষু যো যথার্থ লক্ষণ—সাধকঃ। লক্ষণাসু যা প্রস্ফুট ধারণায়া ভাবিনী। জ্ঞানপ্রয়োগেষু দ্রষ্টুরবিকারিত্ব-সাধনম্। বিচারেষু মহদাত্মাধিগম পূর্ব্বকঃ বিবেকখ্যাতি-পর্য্যবসিতঃ বিচারঃ ॥ (১৩)

ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় বোধ ব্যাপ্তদেশ শ্রেষ্ঠ। দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, প্রযত্নবিশেষ, রেচন এবং সহজতঃ পূরণ, ইহাই শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত করণের স্থির, শুভ্রবৎ, ভাব যাহা স্মরণ করাইয়া দেয় (অর্থাৎ স্মৃতি আনয়ন করে), তাদৃশ রেচন, পূরণ ও বিধারণ প্রাণায়াম-প্রযত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (১২)

ধীশক্তির প্রসন্নতার জন্য—যুক্তজ্ঞানার্জ্জন জ্ঞানের মধ্যে—কার্য্যকর জ্ঞান; জ্ঞানার্জ্জনের উপায়ের মধ্যে—শ্রদ্ধা সহিতা জিজ্ঞাসা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানার্জ্জনের প্রতিপক্ষ নাশের জন্য—অভিমান, স্তব্ধতা (নিজের গুরুত্ব বুদ্ধি হেতু অবিনেয়তা) ও আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ হয়। জ্ঞানের মধ্যে যাহা পদার্থের যথার্থ লক্ষণা সাধিত করে, তাহা শ্রেষ্ঠ। লক্ষণার মধ্যে—যাহা মনে প্রস্ফুট-ধারণা উৎপাদন করে। জ্ঞান প্রয়োগ বা বিচারের মধ্যে—যাহা দ্রষ্টার অবিকারিত্ব সিদ্ধ করে, তাহা। মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক যে বিচারের বিবেক খ্যাতিতে শেষ হয়, তাহা (সে বিচার সম্প্রজ্ঞাত) বিচারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ (১৩)

বাহ্যদুর্বোধ পদার্থবোধেষু দিক্ কালয়ো
র্মূলবোধঃ অনাদি সত্তাবোধশ্চ। বিকল্পেষু
সবিতর্কান্তো যঃ। কল্পনাসু ধ্যেয়কল্পনা।
ধ্যেয়কল্পনাসু সূক্ষ্মতর শুদ্ধতরাত্ম কল্পনা
শ্রেষ্ঠা। সঙ্কল্পেষু সংকল্পং মহানীত্যাত্মকো
মুক্ত্যৈ তত্ত্বাধিগমায় ধ্যানম্। সূক্ষ্মতর
তত্ত্বাধিগমহেতুষু সবিচারং ধ্যানম্। জ্ঞানদী-
প্তিকরেষু যোগজো স্বজ্ঞানদোষপ্রেক্ষণং
সর্বজ্ঞে পুরুষে নির্ভরশ্চ॥ (১৪)

স্থূলকায় তত্ত্ববোধেষু প্রথমশৈথিল্য সিদ্ধে
অকঠিনঃ প্রাণ-ক্রিয়া-পুঞ্জঃ কায়প্রদেশ
ইত্যধিগমঃ। সূক্ষ্মকায় তত্ত্ববোধেষু মহদাত্ম-
প্রাণাধিষ্ঠান ভূতোঽণু বা অনন্তো বা
ব্যোমাকাশঃ॥ (১৫)

সূক্ষ্মতমাসু স্থিতিষু নিরোধভূমিঃ। ঈশ্বর-
ধ্যানালম্বনেষু হার্দাকাশঃ। সত্যসাধনেষু
ঋজুচিত্তস্য স্বমভাষিত্বং। আর্জব সাধনেষু
নিরীহস্য অদুষ্ট চিন্তা॥ (১৬)

পদার্থরত্নানি গৃহাণ যোগিন্!
শাস্ত্র সুধাব্ধে হি সমুদ্ধৃতানি।
ত্রৈলোক্য-রাজ্যাচ্চ পরং পদং যৎ
প্রাপ্স্যসি ভূত্বা বররত্নমালী॥ (১৭)

ইতি সাংখ্যযোগী-শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য
প্রথিত পদার্থরত্নমালা সমাপ্তা।

শ্রীসাংখ্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী।
কাপিলাশ্রম।

সমাপ্ত।

দিক্ (অবকাশ; আকাশ নহে) ও কালের
মূল বুঝা এবং অনাদি সত্তা বুঝা বাহ্য দুর্বোধ
পদার্থ বুঝার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিকল্পের মধ্যে
সবিতর্ক সমাধি অন্তভূত বিকল্প শ্রেষ্ঠ।
কল্পনার মধ্যে ধ্যেয় কল্পনা। ধ্যেয় কল্পনার
মধ্যে আপনাকে সূক্ষ্মতর ও শুদ্ধতর কল্পনা
করা শ্রেষ্ঠ। সঙ্কল্পকে ত্যাগ করিলাম, এই
সঙ্কল্প—সঙ্কল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তত্ত্বাধিগমের
জন্য ধ্যান। উত্তরোত্তর সূক্ষ্মভাব সাক্ষাৎ-
কারের জন্য সবিচার ধ্যান। জ্ঞানের
দীপ্তিকর উপায়ের মধ্যে—যোগযুক্ত হইয়া
নিজের জ্ঞান-দোষ চিন্তন ও সর্বজ্ঞপুরুষে
নির্ভর করা শ্রেষ্ঠ কর্ম। (১৪)

প্রথম শৈথিল্যের দ্বারা শরীর সম্যক্ স্থির
সুখবৎ হইলে, কায়প্রদেশ অকঠিন, প্রাণ-
ক্রিয়াপুঞ্জ স্বরূপ এইরূপ সাক্ষাৎকার স্থূল-
শরীরতত্ত্ববোধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মহদাত্মার
যে প্রাণ—যাহা প্রাণের সূক্ষ্মতম অবস্থা—
তাহার অধিষ্ঠানভূত যে অণু বা অনন্ত
ব্যোমাকাশ, তাহাই সূক্ষ্মকায়তত্ত্ববোধের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেবল "অস্মি" মাত্র বলিয়া
সেই ব্যোমাকাশ অণু এবং তদ্দ্বারা সার্বজ্ঞ্য
হয় বলিয়া তাহা অনন্ত। (১৫)

সূক্ষ্মতম * স্থিতির মধ্যে নিরোধভূমি
(যোগদর্শনোক্ত) শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর ধ্যানের
যে যে আলম্বন আছে, তন্মধ্যে হার্দাকাশ
শ্রেষ্ঠ। সত্যসাধনের মধ্যে ঋজুচিত্ত হইয়া
স্বল্পভাষণ শ্রেষ্ঠ। আর্জবসাধনের জন্য
নিরীহ হইয়া অদুষ্ট চিন্তা করা শ্রেষ্ঠ॥ (১৬)

* প্রকৃতিলয়াদিও সূক্ষ্মতম স্থিতি আছে,
কিন্তু তন্মধ্যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই শ্রেষ্ঠ।

হে যোগিন্! শাস্ত্র-সুধাব্ধি হইতে
সমুদ্ধৃত এই পদার্থরত্ন সকল গ্রহণ কর।
বররত্নমালী হইয়া, ত্রৈলোক্য-রাজ্য অপে-
ক্ষাও যাহা পরমপদ, তাহা প্রাপ্ত হইবে। ১৭

সমাজ ও শাস্ত্র।

সাধারণতঃ সমাজই শাস্ত্রের অধিকার-ভূমি। শাস্ত্রের উদ্যত দণ্ড প্রায়শঃ সমাজের বক্ষেই আপন আসন স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হয়। শাস্ত্র যেমন সমাজশাসক, সমাজও তেমনি শাস্ত্রের উপর পাত্র, দেশ ও সময়া-নুরূপ আধিপত্য বিস্তার করে। কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করে না, প্রত্যুত পর-স্পরের অপেক্ষায় থাকে। সমাজের অসংযত বল্গা শাস্ত্রের কঠোর হস্তে ন্যস্ত হয়, আবার সময়ে শাস্ত্রের উচ্ছৃঙ্খল আধিপত্য, সমাজের সবল আকর্ষণে সংযত হয়; ফলে শাস্ত্র, সময়ের ও সমাজের আনুগত্যে ব্যাখ্যাত হয়।

প্রকৃতির শাসন জগতের সর্ব্বদেশেই সমাদৃত হয়, সুতরাং সময়ের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সর্ব্বদেশের শাস্ত্রই নবভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। এরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন ও নিদর্শন যথেষ্ট আছে। যখন সমাজে নব তথ্য আবিষ্কৃত হয়, নবভাবের অনুপ্রাণনা উপস্থিত হয়, তখন পুরাতন মতের নূতন ব্যাখ্যা না করিলে আর প্রাচীনের প্রসার প্রবল থাকে না; কাজেই বসন্তশেষে নব-পল্লব-পরিচ্ছদে সজ্জিত পুরাতন তরুই পথি-কের নয়নরঞ্জন করে। ধর্ম্মজগতে নূতন তথ্য প্রচারিত হইলেই পাশ্চাত্যগণ বাই-বেলের এক কোণে ঐ সত্যের অবস্থিতি প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাহাই বাইবেল্—"খোল্ ও নলিচা উভয়ের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সেই হুঁকাটী" হইয়া বিরাজ করিতেছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজে, (দাক্ষিণাত্যের সমাজে,) সমাজের পক্ষ-পাতে শাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রসেবকের নবব্যাখ্যা প্রচারের শুভ সময় সমাগত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দক্ষিণাপথের সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক আচার "মাতুলকন্যাপরিণয়ের" অনুকূলে সুপ্রথিতনামা দার্শনিক, ব্যবস্থাপক, ও রাজনৈতিক পুরুষ মহাত্মা মাধবাচার্য্যের অপূর্ব্ব শাস্ত্রব্যাখ্যা-কৌশলের আভাস প্রদান করিব।

দাক্ষিণাত্যের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মাতুল-দুহিতাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা শ্লাঘার বিষয় মনে করেন।* অপর দিকে আর্য্য-শাস্ত্র জলদগম্ভীর ঘোষে বলিতেছেন—"মাতুলস্য সুতামূঢ়া মাতৃগোত্রাং তথৈবচ। সমান প্রবরাঞ্চৈব ত্যক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।" অর্থাৎ মাতুলকন্যাকে ও সমানপ্রবরাকে বিবাহ করিয়া দ্বিজাতি পাপগ্রস্ত হইবেন, সেই পাপ অপনোদনের জন্য পত্নীপরিত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অন্যতম শাস্ত্র প্রণেতা বশিষ্ঠ বলিয়াছেন।—

"পরিণীয় সগোত্রান্তু সমানপ্রবরাস্তথা।
তস্যাং কৃত্বা সমুৎসর্গং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
মাতুলস্য সুতাঞ্চৈব মাতৃগোত্রাং তথৈবচ।"

---

* লেখকের নিকট একজন সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—"আমি মাতুলকন্যা বিবাহ করিয়াছি; এরূপ বিবাহ গৌরবকর মনে করি।"

অর্থাৎ সগোত্রা, সমানপ্রবরা, মাতুলসুতা ও মাতৃগোত্রাকে বিবাহ করিয়া সেই নারীতে রেতঃসেক করিলে, দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ করিতে বাধ্য হইবেন।

কুকার্য্যে তিরস্কার ও সৎকর্ম্মে পুরস্কার-প্রাপ্তি জগতের সনাতন নিয়ম। মাতুল-কন্যা-পরিণয়ন শাস্ত্র-দৃষ্টিতে কুকার্য্য, সুতরাং শাস্ত্রাজ্ঞ মহর্ষি তাহাতে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

মাধবাচার্য্য যখন 'ন্যায়মালাবিস্তর' গ্রন্থ রচনা করেন, তখনও তিনি দাক্ষিণাত্যের ঐ আচারকে 'অপ্রমাণ' বা অসঙ্গত বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু যখন সামাজিক শক্তির প্রবল আকর্ষণে শাস্ত্র স্বীয় অধিকার হারাইতে প্রস্তুত হইল, তখন সমাজরক্ষক নৃপতির বা সমাজপতির ইঙ্গিতে সময়জ্ঞ সুধীবর মাধবাচার্য্য শাস্ত্রের নবব্যাখ্যা প্রচার করিয়া, সমাজ ও শাস্ত্রের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন। পরাশরসংহিতার মাধবপ্রণীত ভাষ্যে (ঐ গ্রন্থ 'পরাশরমাধব' নামে পরিচিত, উহা ন্যায়মালা রচনার পরে ও 'কালমাধব' প্রণয়নের পূর্ব্বে লিখিত হয়।) মাতুল-দুহিতৃ-পরিণয় শাস্ত্র-সঙ্গত বলিয়া সর্ব্বপ্রথম ঘোষিত হয়।

মাধবাচার্য্য বলেন, যাহার মাতা ব্রাহ্ম বা দৈবাদি বিধানে বিবাহিতা, অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মাদি বিধানে বিবাহিতার পুত্র, তিনি ঐ মাতার ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন। আর যে ব্যক্তির জননীর পরিণয় কার্য্য আসুরাদি বিধানে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ যিনি আসুরাদি বিধানে বিবাহিতা রমণীর গর্ভজাত, তিনি মাতুলদুহিতা বিবাহ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন।

উক্ত মনীষীর উক্তিসমূহের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মাদি বিধানে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে, 'সপ্তপদীগমনের' পরই রমণী পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়া পতিগোত্র লাভ করেন। আসুরাদি বিধানে বিবাহে শাস্ত্রীয় দান-কার্য্য যথাবিধি নিষ্পন্ন না হওয়ায়, রমণী আমরণ—এমন কি, মরণের সম্বৎসর কাল পরেও (সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত) পিতৃগোত্র-ভাগিনী থাকেন। স্বামিগোত্রভাগিনী না হওয়ায়, অপিচ পিতৃকুলের গোত্র-সম্বন্ধ-চ্ছেদ না ঘটায়, আসুরাদি বিধানে বিবাহিতা নারী পিতৃকুলেরই "সগোত্রা" এবং "সপিণ্ডা" হয়েন। ব্রাহ্মাদি বিধানে পরিণীতা নারী স্বামিকুলে সগোত্রতা ও সপিণ্ডতা লাভ করেন, কিন্তু পিতৃকুলে "সপিণ্ডা" "সগোত্রা" থাকেন না। মাতার সপিণ্ড ও সগোত্র ভ্রাতার দুহিতাই সন্তানের অবিবাহ্যা। সেই বিবাহেই প্রায়শ্চিত্ত ভাগিতা আছে। যে মাতুল মাতার সগোত্র ও সপিণ্ড ভ্রাতা নহেন, তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করা ভাগিনেয়ের পক্ষে অপকর্ম্ম নহে, সুতরাং প্রত্যবায়ী হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

মাধবাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যার মূলসূত্র মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রেই পাইয়াছেন। মনুসংহিতা ১১ অধ্যায় ১৭২ ও ১৭৩ শ্লোক এস্থানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

"পৈতৃষ্বস্রেয়ীং ভগিনীং স্বস্রীয়াং মাতুরেব চ। মাতুশ্চ ভ্রাতুঃ আপ্তস্য গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ। এতাস্তিস্রস্তু ভার্য্যার্থে নোপযচ্ছেত্তু বুদ্ধিমান্। জ্ঞাতিত্বেনানুপেয়াস্তাঃ পতন্তি হ্যুপযন্নধঃ।" পৈতৃষ্বস্রেয়ী ভগিনী, মাতৃস্বসৃ-দুহিতা ও মাতার আপ্ত ভ্রাতার কন্যা, এই

রমণীত্রয়ের অন্যতমা নারীতে উপগত হইলে চান্দ্রায়ণ করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহাদিগকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবেন না। জ্ঞাতিত্বনিবন্ধন এই রমণীত্রয় অগম্যা; এই সকল রমণীতে উপগমন করিলে দ্বিজগণ পতনের পথে সবেগে অগ্রসর হইতে থাকেন।

এই শ্লোকদ্বয়ে কয়েকটী শব্দের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। পিতৃষস্‌-দুহিতার বিশেষণ "ভগিনী" শব্দ তাহাদের অন্যতম। পিতৃষ্বসা ব্রাহ্ম্যবিধানে পরিণীতা হইলে, তাঁহার সহিত পিতৃকুলের সগোত্রতা-নিবৃত্তি হয়, সুতরাং তাঁহার কন্যা মুখ্যার্থে "ভগিনী" নহেন, কিন্তু আসুরাদি বিধিতে বিবাহিতা সগোত্রা পিতৃষ্বসার কন্যা যথার্থ ভগিনী, তাহাকে বিবাহ করা বা তদুপগমন দোষার্হ। অপর একটী মাতার ভ্রাতার বিশেষণ "আপ্তস্য"। মাতার আপ্ত ভ্রাতা অর্থাৎ সগোত্র ও সপিণ্ড ভ্রাতার কন্যাকে বিবাহ করা অনুচিত। ইহাতে বোধ হয়, মাতার যে ভ্রাতা "আপ্ত" নহেন, অর্থাৎ অসগোত্র ও অসপিণ্ড, তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করা দোষাবহ নহে। "আপ্ত" শব্দ না থাকিলে, এরূপ ব্যাখ্যার আলম্বন দুর্ঘট ছিল। দ্বিতীয় শ্লোকে 'জ্ঞাতিত্বেন' পদ—ব্যাখ্যার অপর আশ্রয়। জ্ঞাতিত্বপ্রযুক্ত অগম্যতা বা অবিবাহ্যত্ব নির্দ্দেশ করায়, যেখানে (১) সগোত্রতা ও সপিণ্ডতার অপগম ঘটিয়াছে, সেখানে উপগম ও বিবাহ দোষজনক নহে, মনে করা যায়। গোত্রসম্বন্ধাদির কি বিনাশের পরও যদি জ্ঞাতিত্ব থাকে, তবে সে জ্ঞাতিত্ব হয় অমর, নচেৎ কথার কথা।

কেবল যে মানবধর্ম্মশাস্ত্রের করুণ কটাক্ষই একমাত্র সম্বল, তাহা নহে; আর্য্যসভ্যতার ও জ্ঞানের অনন্ত রত্নভাণ্ডার বেদশাস্ত্রেও মাতুল-কন্যা-পরিণয়ের স্নিগ্ধ নিদর্শন লোক-দৃষ্টিগোচর হইবে। এস্থলে একটী বৈদিক-মন্ত্র উদ্ধৃত ও আলোচিত হওয়া আবশ্যক মনে করি।

"আয়াহীন্দ্র! পথিভিরীলিতেভিঃ। যজ্ঞমিমং নো ভাগধেয়ং জুষস্ব। তৃপ্তাং জহুর্ম্মাতুলস্যেব যোষা, ভাগস্তে পৈতৃষ্বসেয়ী বপাম্॥"

ব্যাখ্যা। হে ইন্দ্র! ঈড়িতেভিঃ পথিভিঃ অস্মাকং ইমং যজ্ঞং প্রতি আয়াহি আগত্য ভাগধেয়ং জুষস্ব স্বীকুরু। ঋত্বিজঃ ত্বামুদ্দিশ্য তৃপ্তাং তৃপ্তিকরীং বপাং জহুঃ ত্যক্ত-বন্তঃ। যথা মাতুলস্য যোষা দুহিতা ভাগি-নেয়স্য ভাগঃ, যথা বা পৈতৃষ্বসেয়ী পিতৃষ্বস্-

(১) শরীরাবয়ব সম্বন্ধ ও শ্রাদ্ধীয় পিণ্ড-সম্বন্ধ লইয়া সপিণ্ডতা নির্দ্দেশ করা হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের অবয়ব-সম্বন্ধে সপিণ্ডতার মত প্রবল। সে সপিণ্ডতার জীবনে নিবৃত্তি হয় না, সুতরাং পিতৃষ্বসা সপিণ্ডা থাকেন। সগোত্রা না হইয়া সপিণ্ডা হইলে, তাদৃশ কন্যা বিবাহ করা দোষজনক নয়। বিবা-হিতা (ব্রাহ্ম্যাদি বিধানে) কন্যার পিতৃ-কুলে সাপিণ্ড্য থাকে না। পারিভাষিক ত্রিপুরুষ সাপিণ্ড্য আছে, স্বীকার করিলেও, সগোত্রতা না থাকায়, কন্যা বিবাহে বাধা হয় না, কারণ সপিণ্ডতা ও সগোত্রতা এক-সঙ্গেই বিবাহে বাধা দেয়, পৃথক্ নহে। ইহা সম্প্রদায়বিশেষের মত।

কন্যা পিতুঃ পৌত্রস্ত ভাগঃ, তথাবং তে বপাখ্যঃ ভাগঃ অস্তু।

বঙ্গানুবাদ।—হে ইন্দ্র! স্তুত প্রশস্ত মার্গসমূহ দ্বারা এই যজ্ঞে আগমন কর, আসিয়া তোমার যজ্ঞভাগ গ্রহণ কর। ঋত্বিক্‌গণ তোমার উদ্দেশে তৃপ্তিকরী বপা (প্রাণিদেহের অংশবিশেষ) উৎসর্গ করিয়াছেন। যেমন মাতুলকন্যা ভাগিনেয়ের ভাগ, অর্থাৎ গ্রহণযোগ্যা (তাৎপর্য্যতঃ পরিণয়নার্হা) কিম্বা যেরূপ পিতৃষ্বসৃদুহিতা গ্রাহ্যা (বিবাহ্য), সেইরূপ এই বপা তোমার ভাগ, অর্থাৎ গ্রহণের উপযুক্ত। প্রদর্শিত বেদমন্ত্র অর্থবাদ হইলেও অপ্রসিদ্ধ পদার্থের দ্বারা স্তুতি করা যায় না, সুতরাং এখানে বিধি কল্পনা করিতে হইবে।

অপর একটী বেদবাক্য উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য বিধায় উক্ত পরিত্যক্ত হইল না। মন্ত্র যথা,—"তস্মাৎ সমানাৎ পুরুষাৎ অত্তাচাদ্যশ্চ জায়েতে তৃতীয়ে সঙ্গচ্ছাবহৈ উত চতুর্থে সঙ্গচ্ছাবহৈ" ব্যাখ্যা।—সমানাৎ পুরুষাৎ অত্তা ভোক্তা আদ্যঃ ভোগ্যশ্চ জায়তে, তৌ পরস্পরং মন্ত্রয়তঃ তৃতীয়ে পুরুষে (কূটস্থাৎ) সঙ্গচ্ছাবহৈ বিবহাবহৈ উত চতুর্থে পুরুষে সঙ্গচ্ছাবহৈ বিবহাবহৈ।

বঙ্গানুবাদ।—ভোগ্য ও ভোক্তা দুইজনেই এক ব্যক্তি হইতে জন্ম গ্রহণ করে। সেই ভোগ্য ও ভোক্তা পরস্পর মন্ত্রণা করে,—মূল পুরুষ হইতে তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষে আমরা বিবাহিত হইব।

বিষয়টী বিশদরূপে বুঝিতে হইলে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। মনে করা যাউক, রাম একজন গৃহস্থ, তাহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। ঐ কন্যা ব্রাহ্ম-বিধানে বিবাহিতা হয়,—তাহার একটী পুত্র সন্তান জন্মে, রামের পুত্রের একটী কন্যা জন্মে। এই পুত্র ও কন্যার বিবাহ হইতে পারে। রাম কূটস্থ বা মূল পুরুষ, তাহার পুত্র-কন্যা দ্বিতীয় পুরুষ, তাহাদের কন্যা-পুত্র তৃতীয় পুরুষ। ইহাদের মধ্যে কন্যাটী ভোগ্যা, পুত্রটী ভোক্তা। এক রাম হইতেই তৃতীয় এই পুত্রকন্যাযুগল (স্বামী ও স্ত্রী) উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহারা রাম অপেক্ষা তৃতীয় পুরুষেই বিবাহিত হইয়াছে*।

এইরূপ ব্যাখ্যা জগতে দুর্লভ নহে। এরূপ ধর্ম ও সংসারের সমস্যানুরূপ সমন্বয়-বিধানের জন্য শাস্ত্রের কুক্ষিতে রক্ষিত আছে। "শাস্ত্র নূতন হয় না" বলিতেও অক্ষম নহি, কিন্তু "ব্যাখ্যা নূতন হয় না" বলিতে একেবারে অসমর্থ। মাধবাচার্য্য

* বৌধায়নমুনি স্বপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে দক্ষিণদেশের পঞ্চবিধ বিরুদ্ধ আচার ও উত্তরদেশের পঞ্চবিধ বিরুদ্ধ আচার—সেই সেই দেশেই সদাচার, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের আচার দাক্ষিণাত্যদেশীয় ব্যক্তি উত্তরদেশে অনুষ্ঠান করিলেও দোষজনক হইবে, ইহাও বলিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের আচারগুলির নামোল্লেখ করিতে গিয়া বৌধায়নমুনি মাতুলসুতা-বিবাহ, অনুপনীত ব্যক্তি ও ভার্য্যার সহিত একত্র ভোজন, পর্য্যুষিত ভোজন, মাতৃষ্বসৃ-দুহিতৃ পরিণয়ন ও পিতৃষ্বসৃকন্যা-পরিণয়ের কথা বলিয়াছেন। উত্তরদেশের উক্তরূপ আচারপঞ্চক—তাঁহার মতে ঊর্ণাবিক্রয়, মদ্যপান, আয়ুধীয়কত্ব, সমুদ্রযাত্রা, "উভয়তোদন্ত" প্রাণিগণের দ্বারা ব্যবহার নিষ্পাদন।

ঐ বিবাহকে সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত বলিতে যাইয়া, দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করিয়াছেন ;—"রাগ-প্রযুক্ত এরূপ আচার প্রচলিত হয় নাই, কারণ যাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অবগত আছেন এবং বিধি প্রতিপালন ও নিষেধ বিবর্জন কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, ও অনুষ্ঠানের সঙ্কীর্ণ সঙ্কুল সূক্ষ্মপথ হইতেও যাঁহাদের কদাপি পদস্খলন হয় নাই, তাঁহারাও এইরূপ আচারকে সসম্মানে পালন করিয়া থাকেন ; সুতরাং রাগিজনের মোহমূলক শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপব্যবহার বা যথেচ্ছাচার ইহার জন্মদাতা নহে। শিষ্টাচারও শাস্ত্রের সম্মতি জ্ঞাপন করে।

মাধবের এই উক্তির যুক্তিযুক্ততা বিষয়ে আমরা আলোচনা করিব না, কেবল পাঠকবর্গের অবগতির জন্য একটী পূর্ব্বকথিত কথার উল্লেখ করিব মাত্র। আমরা বলিয়াছি, "ন্যায়মালা-বিস্তর" গ্রন্থ রচনাকালে মাধব এই আচারকে অপ্রমাণ বলিতে কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করেন নাই। তখন রাগপ্রসূত শাস্ত্রবিরুদ্ধ অন্যান্য আচারের সহিত এই দাক্ষিণাত্যা-চারের বিন্দুমাত্র পার্থক্য তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টির গোচরে আসে নাই। আবশ্যকতা উপায় সৃষ্টি করে, ইহা জগতের সার্ব্বভৌম সত্য।

পরিশেষে আমরা ইহা বলিতে একান্তই বাধ্য যে—,মাধবাচার্য্য ওরূপ ব্যাখ্যা প্রচার করিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য, নচেৎ তাঁহার ব্যাখ্যার সমাদর বা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা কোথায় ? শাস্ত্রকে অপৌরুষেয় না বলিয়া যে জাতি তৃপ্তি লাভ করে নাই, তাহাদের নিকট ব্যাখ্যাকর্ত্তা, ওরূপ না লিখিলে অণুমাত্রও আশা করিতে পারেন না, ইহা চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় সত্য।

অপর পক্ষে, মাধবাচার্য্য ইঙ্গিতে সত্যের নগ্নমূর্ত্তির দিকে পাঠককে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াই বিপক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"মাতুলদুহিতৃ-বিবাহের ন্যায় পিতৃস্বসৃদুহিতৃবিবাহও ত শাস্ত্রসিদ্ধ, তবে শিষ্টেরা সে সম্বন্ধে উদাসীন কেন ?" উত্তরে মাধব গম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন, "শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও উহা লোকসিদ্ধ নহে।" যাহা সমাজের বিদ্বেষের বিষয়, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত হইলেও অকর্ত্তব্য। শাস্ত্রসিদ্ধ ও সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যবহারের নাম করিতে যাইয়া তিনি পুত্রগণের বিষম বিভাগ, সৌত্রামণীযাগে সুরাগ্রহ গ্রহণ, গোসবে গোবধাদি—বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মাধব কি স্পষ্টতঃই বলেন নাই যে—সমাজ যাহা চাহে না, তাহা শাস্ত্র দিলেও, সে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ ? ইহাতে কি সঙ্কেতে বলা হয় না যে, সমাজ যাহা চায়, তাহা শাস্ত্র না দিলে, সমাজ শাস্ত্র অতিক্রম করে ? আমরা মনে করি, যখন সমাজের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পূরণে শাস্ত্রের পুরাতন ব্যাখ্যা অসমর্থ হয়, তখনই নূতন ব্যাখ্যা প্রচারের প্রয়োজন হয়। আজ যদি মাধবাচার্য্য জীবিত থাকিতেন, বোধ হয়, তিনি পরাশরসংহিতা-ভাষ্যের ২।১ স্থানে পূর্ব্বসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া, নবসিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেন ; কারণ শাস্ত্র সময়ানুসারে সমাজের অনুগমন করিতে প্রস্তুত হয়। শম্।

শ্রীঃ—

যশোহর

জাতীয় বিদ্যালয়।

শ্মশান
বা
শান্তি-নিকেতন।

স্বর্ণ-পারা-সসাগরা ধরা-অধিপতি,
অত্যুচ্চ ধবল প্রাসাদে বসতি;
উজলি বিজলীরাগে রত্ন বিজড়িত—
দীপাবলী কিবা জ্বলি করে আলোকিত!
সঙ্গীতে বিশারদ গীত-আলাপনে,
লাস্যপরা বিদ্যাধরী নিরতা নর্ত্তনে;
যন্ত্রীদলে কুতূহলে মধুর বাজায়,
সারি সারি গন্ধবারি কিঙ্করী ছিটায়;
আনন্দে আন্দোলি পাখা করয়ে ব্যজন,
অজস্র সহস্র পুষ্প করে বরিষণ;
সামন্ত অমাত্য সহ অনিত্য আমোদে,
ভূপতি নরপতি তুষ্ট তোষামোদে;
এখানে যাহারে লোকে অবিবেকী জনে,
অদম্য বৈষম্য দেখা হেরিনু নয়নে;
কামনা-অনলে দগ্ধ মুগ্ধ অনুক্ষণ,
পারি কি বলিতে এরে শান্তিনিকেতন?

অনিত্য সংসারাসক্ত মধ্যবিত্ত জন,
প্রিয়তম পুত্র কন্যা স্নেহের ভাজন,
জনক-জননী পূজ্য স্বর্গধাম জিনি,
জীবনস্বরূপা ভার্য্যা গৃহলক্ষ্মী যিনি;
এ সকল সহ ভ্রাতা ভগিনী-সোদরে,
অপ্রচুর ধন লয়ে অতি সমাদরে—
কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে এক পাতিয়া সংসার,
ভাবিল ইহাই বুঝি সর্ব্বসুখসার।
ভাবিছে পরম সুখে কাটাইবে কাল,
অবোধ—জানেনা তার সম্মুখেতে কাল।
জানিল, পড়িয়া ক্রমে সংসার আবর্ত্তে,
"এ সংসার দুঃখময় সুখ-পরিবর্ত্তে।"
অভাগা, কালের চক্রে বিষম জঞ্জালে
ক্রমে যথা জলজীব জালজীবী-জালে।
অবিশ্রান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে প্রাণপণে,
দিবসের কর্ম্ম চিন্তা—নিশিতে স্বপনে,
রোগ, শোক, মনস্তাপ, কুচিন্তা, বিরক্তি-
করিলেক দূর তার সংসারানুরক্তি।
হেন যথা উপসর্গে করে জ্বালাতন,
পারি কি বলিতে তারে শান্তিনিকেতন?

পরিধান চীরবাস, বাস তরুতলে,
বহে যারা নেত্র-জলে, দহে ক্ষুধানলে;
ভিক্ষাজীবী ভিক্ষা আশে, আসে দ্বারে সব
ধীরে ধীরে যষ্টিকরে করে ভিক্ষারব;
রহিয়াছে ঝুলি, ঝুলি ভিক্ষার উপায়—
ভিখারীর বামদেশে, দেশে দেশে যায়;
পথিমাঝে জলাশয়ে জলাশয়ে যায়,
নগরে নগরে যায়, যায় ভিক্ষা পায়;
নাহি যার যথা এই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গতি,
তথা কি সম্ভবে কভু শান্তির বসতি?
সংসার অসার জানি সন্ন্যাসী সুজন,
অনিত্য পার্থিব সুখ দিয়া বিসর্জ্জন,
পরমেশ-জগদেক-শরণ-চরণে,
সমর্পিয়া মনঃপ্রাণ, পশেছে কাননে;
অবশ্য সংসারাসক্তি নাহি সন্ন্যাসীর,
অন্তরে কামনা কিন্তু আছয়ে মুক্তির।
থাকিলে কামনা, শান্তি কভুনা সম্ভবে,
হে শ্মশান! এ ভবে কি শান্তি নাই তবে?
কালচক্রে ঘুরি ঘুরি ক্লান্ত কলেবরে
বিসর্জ্জিয়া কামনায় অনন্তের তরে,
সংসারের-বন্ধন-পাশ করিয়া ছেদন,
তোমার শরণাগত হয় জীবগণ।

বিজন অরণ্যে, পথে, নগরে, প্রান্তরে,
ভ্রমিনু জননী-মাঝে প্রতি ঘরে ঘরে,
কোথাও না পাইলাম শান্তি-দরশন,
যদি পাই তব ঠাঁই,—তাই অন্বেষণ।
ভ্রমিয়া বুঝেছি খলু সংসারের ভাব,
অশান্তি-প্রভাব শুধু, শান্তির অভাব।
অভাব-সম্ভব-ভব-ভাবনানিচয়,
কামনায় শান্তি-লোপ ঘটায় নিশ্চয়।
জীবকুল সমাকুল বিপুল ধরাতে,
দেখি মাত্র অভাবের অভাব তোমাতে!
থাকে না অভাব তার, অন্তিম সময়,]
অভয় আশ্রয় তব যেজন লভয়;
অতএব, হে শ্মশান! সত্য সনাতন!
তুমিই অশান্তি-রাজ্যে শান্তি-নিকেতন।
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালের
সাক্ষী তুমি, পুণ্যভূমি এই জগতের।
অবিবেকী নীচাশয় মুগ্ধ জীবগণ—
তোমার বিকট-মূর্ত্তি করে দরশন।
দেখে তারা—ভয়ঙ্করা পিশাচীর পাল—
লোহিত-লোলুপা লোল রসনা বিশাল!
ভীমবেশ, রুক্ষকেশ, অট্ট অট্ট হাসি,
উলঙ্গিনী উন্মাদিনী অঙ্গে পাংশুরাশি,
ডাকিনী, যোগিনী, ভূত, প্রেত চারিভিতে,
বদন ব্যাদানে যেন ধরা গরাসিতে!
পরম হরষে পাশে পেয়ে শবদেহ,
অধীরে রুধির-মাংস গরাসিছে কেহ;
শিবাদল কোলাহল করিছে বিস্তর;
নাড়ী-ভুঁড়ি কাড়াকাড়ি করে পরস্পর।
অবিরল ক্লেদ-মল লাগিতেছে মুখে,
সুপথ্য ভাবি মত্ত ভোজনের সুখে!
কখনো জ্বলিছে অগ্নি—নিভিছে আবার,
ভীত চিত্ত চমকিত, ঘোর অন্ধকার!

কভু কোলাহলে কাক-শকুনি গৃধিনী,
শবদেহ ল'য়ে কেহ করে টানাটানি।
কোথাবা গলিত মুণ্ড, কর বা চরণ,
বিষম বীভৎস দৃশ্য—বিকট ভীষণ!
অসার সংসার-মোহে মুগ্ধ যার মন,
জীবনের নশ্বরত্ব নাজানে সে জন,
অবিবেকী সেই, যার অন্তরে বিকার,
নিন্দিত, ঘৃণিত তুমি নিকটে তাহার।
হে শ্মশান! ভব-জীবকুল-পরিণাম!
বিবেকীর কাছে তুমি শান্তি-সুখধাম!
প্রশান্ত মুরতি তব করি দরশন,
নির্ভয় হৃদয়ে লয় তোমার শরণ।
এ ভবমণ্ডলে মাত্র তুমি হে শ্মশান!
ইহ-পর-লোকদ্বয়ে যোগ-সন্ধিস্থান।
সংসার বৈরাগ্য-চিন্তা তব দরশনে
জনমে অজ্ঞান-অন্ধ-অবিবেকী মনে।

যথা মধু ঋতুরাজ চিরবিরাজিত,
সুখসেব্য শোভন সামগ্রী সমন্বিত;
নন্দনকাননানন্দ—ইন্দ্র-মনোহর,
মন্দার কুসুম সার-সুষমা সুন্দর,
সরলা, চপলা-ভাতি অনন্তযৌবনা
অপ্সরী, কিন্নরী, চারুনিতম্বা, সুস্তনা,
কল্পতরু, সর্ব্বকাম-ফল-সম্পাদন,
দেবেন্দ্র বাসব-বাঞ্ছা রত্নসিংহাসন,
অমাত্য অমরবৃন্দ; মন্ত্রী বৃহস্পতি,
পবিত্রসলিলা মন্দাকিনী স্রোতস্বতী;
অনিন্দ্য সুন্দর সুর-আনন্দাভিরাম—
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত বৈজয়ন্তধাম।—
বাসনা-বিজয়ী জানে অশান্তির মূল;
শ্মশান! নহে সেস্থান তব সমতুল।
বিশ্বপ্রেমে মত্ত নিত্য বিশেশ শঙ্কর,
কৈলাস ভবন উচ্চ হিমাদ্রি-শিখর,—

পরিহরি, লইলা আশ্রয় তব স্থানে,
সদাশিব সদা মগ্ন আত্মানন্দধ্যানে।
ত্রিভুবন মাঝে শান্তিনিকেতন তুমি,
ধর্ম্মক্ষেত্র সুপবিত্র চির পুণ্যভূমি,
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে
অভিহিত, হে শ্মশান! তুমি সর্ব্বধামে;
প্রভূত বিক্রমশালী অদ্বিতীয় ভূপ,
হীনবল দীনজন, সুরূপ, কুরূপ,
ধনী দুঃখী, স্ত্রী-পুরুষ, শিষ্ট-দুষ্টমতি,
হিন্দু-মুসলমান্-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-ইহুদী;
বিবিধ বিভিন্ন জাতি অভিন্ন সত্তায়,
সমভাবে তব পূত অঙ্কে স্থান পায়;
জগতে সবার প্রতি তব সমজ্ঞান,
গরল, অমৃত, ভস্ম, চন্দন সমান।
পক্ষপাতশূন্য তুমি—নিত্য নির্ব্বিকার,
কে আছে তোমার সম সদা শুদ্ধাধার?
সাক্ষাৎ বৈরাগ্য তুমি, সাম্য মূর্ত্তিমান!
অন্তিমের শান্তিস্থান তুমি হে শ্মশান!
তব ভ্রান্তি-শ্রান্তি-শান্তি তোমাতে শ্মশান!
প্রেমানন্দে বন্দি তোমা, সদানন্দধাম!

শ্রীদ্বিজবর বিশ্বাস।
(সাতক্ষীরা।)

দান-ধর্ম্ম।

—০:০:০—

"দানমেকং কলৌযুগে।" কলিযুগে দানই একমাত্র সর্ব্বপ্রধানপুণ্যকার্য্য। অন্যান্য কঠোর আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মক্রিয়া কলিতে দুঃসাধ্য, সুতরাং কথঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকারজাত দানধর্ম্মই কলিতে সুসাধ্য; অতএব শাস্ত্রানুশাসনে কলির মানব (বিশেষতঃ গৃহী) যথাশক্তি ও যথাসম্ভব দানধর্ম্মে বাধ্য। এই দানের মধ্যে আবার অন্নদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ কলিতে—"অন্নগতাঃ প্রাণাঃ"।—এই জন্যই শাস্ত্র বলেন—"কলৌ সর্ব্বেষু দানেষু অন্নদানং মহত্তমম্।" কলিকালে সর্ব্ববিধ দানের মধ্যে অন্নদানই শ্রেষ্ঠতম। এই জন্যই আমাদের দেশে মুষ্টিভিক্ষার অবাধ প্রচলন। মুষ্টিভিক্ষা দানে প্রায় কাহারই কিছুমাত্র অতুষ্টির সম্ভাবনা নাই; সুতরাং প্রার্থীর মনেও দাতার আপত্তির ভাবনা নাই। কিন্তু ইদানীং ইহার কিছু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাহার কারণও আছে। ইদানীং মুষ্টিভিক্ষাতেও দাতার অতুষ্টি-সম্ভাবনা এবং গ্রহীতার হৃদয়েও আপত্তির ভাবনা ঘটিতেছে। "একমুষ্টি" অবশ্য আপত্তিজনক না হইতে পারে, কিন্তু একের বহুত্বেই অনেকের সৃষ্টি। অনেক মুষ্টিতে পরিমাণে 'সের'—'মণ' সবই হইয়া পড়ে। অধুনা যে রকম ভিখারীর আমদানী, এবং দুর্ভিক্ষ—দুর্ম্মূল্যতার ফলে ঐ আমদানীর দিন দিন যেরূপ অভিবৃদ্ধি, তাহাতে "মুষ্টিভিক্ষা"র অবশ্যদেয়ত্ব রক্ষাকরা অনেকেরই সাধ্যায়ত্ত হইতেছে না। ইহার দোষ-গুণ কি? অসাধ্যতা স্থলে বাধ্যতা-পরিহার দোষ নহে; কিন্তু সেই অসাধ্যতা অবশ্য সঙ্গত ও স্বাভাবিক হওয়া চাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিঃ

(১৮৬৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টারীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৩১৪ সাল, ১৮২৯ শকাব্দা।

দান-ধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ইদানীং দশটি পোষ্যপোষক যে গৃহী অতি কষ্টে তাহার দৈনিক প্রায় পাঁচসের চাউলের খরচ চালাইতেছে, মুষ্টিভিক্ষায় দৈনিক ভিখারীর পাল বিদায় করিতে তাহার যদি সমষ্টিতে আরও দু একসের চাউলের খরচ বাড়িয়া যায়, তবে তাহার পক্ষে তাহা নির্ব্বাহ কাজেই দুর্ব্বহ হয়। এই দুর্ব্বহতাতেই পূর্ব্বোক্ত অসাধ্যতা সঙ্গত ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং মুষ্টিভিক্ষার দানধর্ম্ম কার্য্যটিরও সঙ্কোচ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই দান-সঙ্কোচ বা প্রার্থী-প্রত্যাখ্যান প্রত্যবায়জনক কিনা?

লোকগণনায় স্থির হইয়াছে, এ দেশে ১৮ লক্ষ ভিক্ষুক। এই ১৮ লক্ষের মধ্যে বড় ২।৩ লক্ষ অন্ধ-আতুর, কালা, কাণা, খোঁড়া, অঙ্গহীন, দুর্ব্বল, রোগী ও বৃদ্ধ প্রভৃতি বাস্তবিক স্বশ্রমে স্বপোষণে অসমর্থ, অর্থাৎ খেটে খেতে অপারক। ফলতঃ শাস্ত্রানুসারে এই ২।৩ লক্ষ ভিক্ষুকই দানের যোগ্যপাত্র। অবশিষ্ট ১৫ লক্ষ কর্ম্মালস ব্যবসায়ী ভিক্ষুক (professional begger) সমাজের গলগ্রহ মাত্র। বহুমুষ্টি-সমবায়ে খাদ্যশস্য-সমষ্টি-দানে এ কুপোষ্যগণকে পুষিতে সমাজ ধর্ম্মতঃ দায়ী নহে। এই অভূতদৃষ্ট অন্নকষ্টের দিনে অবশ্যপোষ্য-পোষণই সাধারণতঃ দুঃসাধ্য; সুতরাং এই কুপোষ্য-পোষণ যে অসাধ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই ১৫ লক্ষ লোক যদি শুধু ভিক্ষার্থ-পর্য্যটনের দৈনিক পরিশ্রমটুকু "খেটে খাওয়া"র স্বাবলম্বনসাধনে খাটাইত, তবু অন্ততঃ অতি ন্যূনকল্পেও গড়ে প্রত্যেকের মাসে ৩টি টাকা স্বাব্য শ্রমার্জ্জিত হইলেও, মাসে প্রায় অর্দ্ধকোটি

টাকা! সুতরাং বৎসরে প্রায় ছয়কোটি টাকা দেশের আয় হইত। বার্ষিক ছয়কোটি বড় কম কথা নয়। ইংরাজরাজের সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যের রাজস্ব-আয়ের প্রায় এক-পঞ্চবিংশ-অংশ-পরিমিত! বর্ষে বর্ষে কেবল আলস্য, ঔদাস্য, কর্ম্ম-বিমুখতা ও ধর্ম্ম-বিমূঢ়তার সেবায় দেশের এতগুলি অর্থের অপচয় হইতেছে, বলিতে হইবে। অধিকন্তু উহাদের পোষণার্থে দেশের ন্যায়-শ্রমার্জ্জিত অর্থ ততোধিক পরিমাণে অপব্যয়িত হইতেছে; কারণ ইদানীং মাসিক ৩৲ টাকায় একজনের শুধু পেটের ভাতও হওয়া কঠিন; আরও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় নানা খরচ আছে। অতএব আলস্য-দোষে অপচয় ও অলসের পোষণে অপব্যয়, এ ক্ষেত্রে এই উভয়তঃই দেশের যে প্রভূত ধনক্ষতি, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিশ্ব-বিলোড়ী 'স্বদেশী' আন্দোলনে—দেশের এই জীবন-সঙ্কট দিনে, এইরূপ জাড্য, কর্ম্ম-বৈমুখ্য ও দেশীয় বা জাতীয় বিপুল অর্থনাশরূপ অনর্থের প্রশ্রয় প্রদান কার্য্যটি সাত্ত্বিক পুণ্যের পরিবর্ত্তে তামসিক পাপ-মোহেই পরিণত হইতেছে। আলস্যের প্রশ্রয়-দান সর্ব্বঅনর্থের নিদান। সুতরাং তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ তামস দান প্রকৃত দানধর্ম্মই নহে।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র বলেন,—পরিশ্রমই ধন। ফলে পরিশ্রম ভিন্ন জগতে ধনোপার্জ্জন সাধারণ নিয়ম নহে। 'পড়ে' পাওয়া' টাকার তোড়া বা মোহরের ঘড়া অর্থশাস্ত্রোক্ত সাধারণ নিয়মার্জ্জিত ধন নহে; উহা বর্জ্জিত বিশেষত্ব—(exceptional case); অতএব পরিশ্রমার্জ্জনীয় অবশ্যকর্ত্তব্য ও অবশ্যসম্ভাব্য—দেশের এই বিপুল ধনাগমের প্রতিকূল ও ধননাশের অনুকূল কার্য্য করিতে আমাদের অধিকার কি? সুতরাং স্বাবলম্বধর্ম্মানুরুদ্ধ পবিত্র কর্ম্মযোগে বিমুখ ব্যবসায়ী ভিক্ষুককে দেশের বহু ধননাশক—মহানিষ্টসাধক জানিয়াও, বরং আরও ন্যায্য শ্রমার্জ্জিত ধন ব্যয় করিয়া তাহার জীবন ও তাহার কদাচরণকে পোষণ করা পাপ কি না, তাহা বোধহয় বিনা আয়াসেই বিচার্য্য। অতএব স্বাবলম্বনশক্তিমান পরাবলম্বনকারীদের পোষণে অস্মদ্দেশে যে তথাকথিত (so-called) দানধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা "ধর্ম্ম" শব্দের বাচ্যতা লাভের যোগ্য কিনা; অন্ধ-আতুর-অক্ষম প্রভৃতি সমাজের সঙ্গত ও স্বাভাবিক পরাবলম্বীদের সেবায় পবিত্র দানে সহজ স্বাবলম্বনসমর্থগণকে অংশী করা ন্যায়-ধর্ম্ম-সঙ্গত কিনা, ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। ফলে, যাহারা অবশ্য-পরপোষ্য—যথার্থ দীন, তাহাদের সেবাই সমাজের এক প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাই যুক্তি ও শাস্ত্রার্থ-সম্মত যথার্থ দানধর্ম্ম। শ্রমের অপব্যবহারকারী, প্রায়শঃ অনৈতিকাচারী, (সুবিধা পাইলে) নানা দুষ্ক্রিয়াকারী অশিক্ষিত, ইন্দ্রিয়াসক্ত, দেশীয় প্রভূত অর্থ অপব্যয়ের হেতুভূত—দেশের স্পষ্ট অনিষ্টকারী কুপোষ্যগণের পোষণে যথার্থ দান-ধর্ম্মের ব্যভিচাররূপ কদাচার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। মোট কথা, অক্ষমের ন্যায্য প্রাপ্যে সক্ষমকে অংশী করা, কুপাত্রে দেয় দ্রব্যের ভাগ অপাত্রে

অর্পণ করা প্রকৃত দানধর্ম্মের অপলাপ। উহা পুণ্য-পরিবর্ত্তে পাপ। অস্মদ্দেশে এই পাপ অধুনা বর্দ্ধিত বেগে বর্ত্তমান; সুতরাং ইহার অবিলম্ব-প্রতীকার প্রার্থনীয়।

এতদ্দেশে ক্রিয়াকর্ম্মে সাধারণতঃ যে 'কাঙ্গালীবিদায়' হইয়া থাকে, তাহাতে দেখা যায় যে, বড় জোর শতকরা ৫।৭ টি অন্ধ-আতুর প্রভৃতি উপার্জ্জনাক্ষম প্রকৃত কাঙ্গালী উপস্থিত; তদ্ব্যতীত প্রায় সবই "জোয়ানমর্দ্দ" মুচী-মেথর ও সক্ষম সখের কাঙ্গালী! কাঙ্গালীবিদায়ে যে সমস্ত ফকির-বৈষ্ণব দল উপস্থিত হয় তাহাদের অধিকাংশেরই আকৃতি, প্রকৃতি ও আচরণ দাতার স্বাভাবিক দয়াবৃত্তির উত্তেজক নহে। আমাদের রক্ষণশীল 'ভালমানুষ' সমাজের চিরাগত প্রথায় তাহারা বড় 'মজা' পাইয়া গিয়াছে। স্বচ্ছন্দে দশজনের চাউলে উদর ভরিয়া, সমাজের সহজলভ্য বহুধনহানি করিয়া, আপনাদের আলস্য-পূজা বজায় রাখিতেছে। একটি বাঙ্গলা প্রবাদ-পত্ত আছে—

"দশ দুয়ারে ঘুরি,
ঝুলি-করোয়া পুরি,
পয়সা-কড়ী, কল-পাকড়,
মাঝে সাঝে কাপড়-চোপড়;
ফাঁকের ঘরে পাই যখন,
"বড় বিদ্যা" চালাই তখন।
খাই আর জমাই, বেচেও করি টাকা।
"ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" যে বলে সে বোকা॥"

আমাদের দেশের পেসাদারী ভিখারীদের পক্ষে এ পদ্যটি অনেক স্থলে 'অক্ষরে অক্ষরে খাটে'। ঐরূপ পেশাদারী ভিখারী 'বাউল' আখ্যাধারীদের নিকট 'নমুনা' সম্বন্ধে একটা সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকও প্রচলিত আছে, যথা—

"রণ্ডা-যৌবন-ভজন-বীরঃ,
কীর্ত্তন-পতনে মন্নশরীরঃ।
ইন্ধনমালী বলয়িতবাহুঃ,
পরধন-হরণে সাক্ষাদ্রাহুঃ॥"

পবিত্র "বৈষ্ণবী" আখ্যার অতীব অপব্যবহারকারিণী রণ্ডা (রাঁড়) গণের যৌবন ভজনে বীর, সংকীর্ত্তনে পুনঃ পুনঃ কৃত্রিম "দশা-পড়া"র অভিনয়ে মল্লের ন্যায় সুদৃঢ়শরীর, কাঠের মালাধারী ও বাহুতে তাড়-বালা পরিধানকারী ব্যক্তি পরের ধন গ্রাস করিতে সাক্ষাৎ রাহুতুল্য।

পূর্ব্বোক্ত ভিখারীবৃন্দ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (positive and negetive) দুই প্রকারে দেশের ক্ষতি করে। এতগুলি লোককে বারমাস বসাইয়া খাওয়ান বিপুল ব্যয়সাধ্য। দেশকে এই ব্যর্থ নিষ্প্রয়োজন ব্যয় বহুকাল হইতে বহন করিতে হইতেছে। আবার ইহাদের অনুপার্জ্জনজনিত প্রভূত ধনাগম-হানি অধুনা দেশের এক দুর্নিবার্য্য দুর্দ্দৈব স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে ইহাদেরও স্বাবলম্বনশূন্যতাজনিত মনুষ্যত্বের হানি। মনুষ্যজন্মে মনুষ্যত্বের অভাবে সুখ কোথায়? সুতরাং ইহারা কেবল দেশে দুঃখের বোঝা বাড়াইতেছে। শাস্ত্র বলেন,—

"ঈর্ষী ঘৃণীত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগিনঃ॥"

"যাহারা পরের ঈর্ষাকারী, সর্ব্বদা 'ঘিণ্-ঘিণ্' স্বভাব; অসন্তোষপরবশ-চিত্ত, কোপন-স্বভাব ও সর্ব্বদা ভয়াতুর দুর্ব্বল এবং পর

লোক, আর যাহারা পরের ভাগ্যে খায়, অর্থাৎ স্বাবলম্বনহীন পরমুখাপেক্ষী দীন, তাহারা দুঃখভাগী। শাস্ত্র বলেন,—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।" একে ত গোটা জাতিটাই "সূচ সূতা-দিয়াশলাই কাটিট" পর্য্যন্তের জন্যও পরমুখাপেক্ষী, তাতে আবার স্বতঃ পরমুখাপেক্ষী জাতি-টার মধ্যে আবার আলস্য ও অকর্ম্মসেবী পূর্ণ পরভাগ্যজীবী এতগুলি লোকের ভার জাতীয় দুর্ব্বহ গলগ্রহ। ভিখারী জাতির আবার এতগুলি সখের ভিখারী পোষণ কি শোভাপায়? যে জাতির এখন স্বাবলম্বন ভিন্ন আর গতি নাই, উপায় নাই, উদ্ধার নাই, সে জাতির মধ্যে প্রকাশ্য প্রচলিত প্রথায় স্বাবলম্বনের এই ঘোর অবমাননা—পরমুখাপেক্ষিতার এই প্রকট প্রশ্রয়, এবং সাধ করিয়া দুঃখভাগিতার এই বিপুল-ভারবর্দ্ধন বাঞ্ছনীয় কিনা, চিন্তাশীল দেশ-হিতৈষিগণ তাহা ভাবিয়া দেখুন। কথাটা লইয়া আন্দোলন আলোচনা চলিতে থাকুক। যদি উচিত বোধ হয়, সভা-সমিতি করিয়া, লিখিয়া, বলিয়া, বুঝাইয়া, প্রয়োজনীয় শাস্ত্র-প্রমাণাদিও প্রদর্শন করিয়া, প্রচারকের প্রচার দ্বারা—ফলে সম্ভাবিত সর্ব্ববিধ উপায়াবলম্বনে ঐরূপ ভিক্ষা দেওয়া 'একদম্' বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক্। উক্ত বিরাট ভিখারী সমাজও বাধ্য হইয়া মনুষ্যত্বে সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক; স্বাবলম্ব-কর্ম্মযোগ সেবায় দেশের কাজে আসুক; দেশের সন্তানধর্ম্ম-লাভে ধন্য হওয়ার জন্য প্রস্তুত হউক্। দেশের দেশাচার নিরুদ্ধ এইরূপ একটা প্রবল সমষ্টি শ্রমশক্তি যথাসম্ভব "কাজে লাগা" (utilized) হওয়া যে অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ে অতীব আবশ্যক, আমাদের এ সিদ্ধান্তে যদি ভুল থাকে, তাহাও প্রদর্শিত,—আলোচিত ও বিচারিত হউক। ফলকথা, বর্ত্তমানে এটি একটি ভাবিবার বিষয়। শাস্ত্র যুক্তি-পরীক্ষার বিষয়; পরন্তু অণুমাত্রও উপেক্ষার বিষয় নহে।

বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশের অনেক স্থলেই এইরূপ পেশাদারী ভিক্ষা আইনের দ্বারা প্রতিষিদ্ধ। ওরূপ ভিখারীর রাজদ্বারে দণ্ডার্হ। সে সব দেশে অন্ততঃপক্ষে একটু নাচ গান, একটু হাসি-তামাসা কি একটু "হরবোলা"গিরি, ভাঁড়ামী বা একটু কোনরূপ ক্রীড়া-কৌতুকাদি দেখান প্রভৃতি কোন না কোন কিছু সময়-বাণিজ্যের 'মুনাফা' স্বরূপ না দিলে, এক পয়সাও পাওয়ার প্রত্যাশা বা দেওয়ার প্রথা নাই। সক্ষমের প্রতি প্রতিদানই যুক্তি ও নীতি-সঙ্গত, কিন্তু দান নহে। দান অক্ষমের জন্য—অসমর্থের যথার্থ অভাবের মোচনের জন্য। অন্ধ, আতুর, রোগী, বৃদ্ধ প্রভৃতি যথার্থ অসমর্থদের জন্য প্রতীচ্য প্রদেশে অনাথাশ্রম প্রভৃতিরও অভাব নাই। আবার সমর্থগণের খাটিবার জন্য কার্য্যও (work) সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত। অস্মদ্দেশে এ জন্য অবশ্য 'আইন' প্রার্থনীয় নহে। কেননা "more enactment—more slavary„ রাজার বিধি যত বাড়িবে, প্রজার দাসত্বশৃঙ্খলের পেঁচও তত বাড়িবে। দেশের লোক বুঝিয়া সুঝিয়া চলিতে পারিলে, রাজার বেশি আইন করিবারই বা আবশ্যকতা বোধ হইবে কেন? আমাদের দেশে অনাথাশ্রম থাকুক,

অন্নরক্ষিণী ব্যবস্থা হউক, স্থানীয় দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার স্থাপিত হউক, আর ইতরসাধারণ সমর্থ শ্রমজীবিগণের জন্য নানা ব্যবসায়াদির 'কারখানা' (workshop) প্রভৃতি বাড়ুক।

অপাত্রে অধিক দানাদি দূরে থাক্, পূর্ব্বোক্ত মুষ্টিভিক্ষাও সমষ্টিতে দেশের প্রভূত ধনহানির হেতুভূত। ধর্ম্মবুদ্ধি-মূঢ়তায়—আলস্য-প্রশ্রয়, অকর্ম্ম-অর্চ্চনা ও দেশের অকারণ দুঃখভার-বিবর্দ্ধন দেশ হইতে দূরীভূত হউক্।

অস্মদ্দেশে ঐরূপ পেসাদারী 'ফকির-বৈষ্ণব' ভিখারীর দল কেবল যে আলস্য-দোষে বা শ্রম-বৈমুখ্যবশে ঐরূপ ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহা নহে; তাহাদের অনেকের বিশ্বাস যে, ভিক্ষাই তাহাদের ধর্ম্মসঙ্গত উপজীবিকা; 'খেটে খাওয়া' তাহাদের ধর্ম্মতঃ নিষিদ্ধ। খেটে খাওয়ার কথা বলিলে, তাহারা অনেকে বিরক্ত হয়, কেহবা চটিয়া ওঠে! বলে "খেটে খাওয়া আমাদের অপমান; ওতে আমাদের জাতি যায়। আমাদের বাপ-দাদা কেউ খেটে খায় নাই। ভিক্ষা না করা আমাদের পক্ষে পাপ।" ইত্যাদি। দেখুন দেখি, রোগ কতদূর পাকিয়া গিয়াছে! আমাদের দেশের প্রবাদ—

"কাজে কুড়ে,
ভোজনে দেড়ে,
বচনে মারে পুড়ে পুড়ে!"

বস্তুতঃ ইহারাই এই প্রবাদের পরিষ্কার প্রমাণ-পাত্র। অথবা "ভাল কর্‌তে পারিনা, মন্দ কর্‌তে পারি, কি দিবি তা দে"—এই প্রবাদবাক্যেরও ইহারা বিশিষ্ট বিষয়ীভূত। ইহারা দেশের কোনই ভাল করেনা, বরং বিপুল ধনহানিকরণ ও দুঃখভার বর্দ্ধন রূপ বিশিষ্ট অনিষ্টই করে, অথচ ইহাদিগকে কি দিবে, তা দেও! ইহাদের পোষণ-তোষণের সম্পূর্ণ ভার নেও। নচেৎ নাকি তোমার মনুষ্যত্বের মূলধন ধর্ম্মেরই হানি! কি বিড়ম্বনা! কি প্রহসন-কল্পনা!

আমাদের কোন হরিভক্ত বন্ধু বলেন যে—"যে "জয় রাধাকৃষ্ণ" বাক্য শুনাইয়া ভিক্ষা চাহিবে, সে সাদরে ভিক্ষাদান-সৎকার লাভের যোগ্য। আহা! সামান্য মুষ্টিভিক্ষার বিনিময়ে সে যে আমাকে ভক্তিমুক্তি-সাধন অমূল্যধন দিল! আহা! এ যে আধা পয়সার বিনিময়ে 'রাধা-কৃষ্ণ' লাভ! কারণ নাম-নামী অভিন্ন-ভাব।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত র'ন আপনি শ্রীহরি॥"

ইত্যাদি। আমাদের হরিভক্ত বন্ধুটির ঐরূপ ভগবদ্ভক্তিভারগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের আমরা কোন প্রতিবাদ করিনা; কিন্তু হায়! সেই 'রাধা-কৃষ্ণ'ইবা কয়জন বলে? অনেকেই "চাট্টি ভিক্ষে পাইগো মা-জননি!"—"অতিথ বিদায় করগো"—"দয়া হউক্ বাবু!" ইত্যাদি বুলিই প্রায় বলে। গৃহস্থ-পক্ষের লোক দেখিলে, অনেকে কিছু বলেও না—খালি ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া দাঁড়ায়। যারা হরিনাম করে, হরিসংকীর্ত্তন করে বা আজকাল্‌কার "স্বদেশী" গান করে, সে সব ভিখারীকে দান, অবশ্য আপত্তি-জনক হইতে পারে না; কারণ উহা ঠিক 'দান'ই নহে—প্রতিদান মাত্র। কিন্তু নিরর্থক ঐরূপ দৈনিক বহু সমর্থ 'অতিথ বিদায়'

করিতে দেশ কতদূর সঙ্গতভাবে সমর্থ, সেই দান-ধর্ম্ম (?)-রহস্যই অধুনা অবশ্য আলোচ্য।

উপসংহারে, আমরা এ বিষয়ের শাস্ত্রীয়তা পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিয়া, বিদায় গ্রহণ করিব। সৎপাত্রে দানই শাস্ত্রের বিধান; অপাত্রে দান বরং পাপ ও পাতিত্যের নিদান। শাস্ত্র বলেন, অপাত্রে দানে দাতা-গ্রহীতা উভয়েই পতিত—সুতরাং প্রায়শ্চিত্তার্হ হন। ঋষিবাক্য রূপ শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি—পরমার্থ-পথপ্রদর্শক মহাজনগণের পদাবলীতেও প্রকাশিত। ভগবদ্দাস ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"দাতা রাজস, দানী লালস,
দোনো একহি ভাও।
দোনো মূঢ়া ডুব্ পড়া—
চড়্‌কে পাথর নাও॥"

যে স্থলে রাজসিক দানকারী দাতা এবং 'মৎলববাজ' বিষয়াসক্ত গ্রহীতা, সে স্থলে ঐ দুয়েরই সমান দশা; যেমন পাথরের নৌকায় চড়াইয়া পার করিতে গেলে, মাঝী ও চড়ন্দার উভয়েই ডোবে, তদ্রূপ তামস বা রাজস দানে দাতা-গ্রহীতা উভয়েই পতিত হয়। শাস্ত্রে দেশ-কাল-পাত্র-বিচারিত সাত্ত্বিক দানই অভিনন্দিত, রাজস-তামস দান নিন্দিত। সর্ব্বশাস্ত্রসার গীতায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥"
"যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥"
"অদেশ-কালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥"

দান ধর্ম্ম কর্ত্তব্য, এই মাত্র বুঝিয়া, যে ব্যক্তি দাতার কোন উপকারে আসিবে না, সে ব্যক্তি যদি দানের অপাত্র না হয়, আর দানের স্থান ও সময়টা যদি প্রতিকূল না হয়, তবে যে নিঃস্বার্থ বা নিষ্কাম দান, তাহাই সাত্ত্বিক দান, তাহাই যথার্থ দানধর্ম্ম। আর কোন উপকার পাওয়ার আশায় বা কোন 'কাজ হাসিল' করার মৎলবে—অথচ মনে কষ্ট বোধ করিয়া যে দান করা হয়, সে রাজস দান। আর দেশ-কাল-পাত্রের প্রতিকূলতায়, অর্থাৎ অনুপযুক্ত স্থানে, সময়ে ও অপাত্রে—অবহেলা ও অবজ্ঞার সহিত যে দান, তাহাকে তামস দান কহে। ফলে অপাত্রে সকাম রাজস-তামস দানে পুণ্য-পরিবর্ত্তে বরং পাপ-স্পর্শ; কেবল সুপাত্রে নিষ্কাম সাত্ত্বিক দানই দানধর্ম্মের আদর্শ। পুরাণ বলেন,—

"অশ্রদ্ধয়া হ্যপাত্রেভ্য হুতং দত্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে সর্ব্বং ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥"

অশ্রদ্ধায়—("গুরু-বেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা") অর্থাৎ অবিশ্বাসের সহিত যজ্ঞ-পূজাদি করিলে এবং অবহেলার সহিত অপাত্রে দান করিলে, সেই যজ্ঞাদি বা দানাদি সর্ব্বকার্য্যই অসৎ। তাহা ইহকাল, পরকাল, কোন কালেরই কোন কাজে আসে না, অর্থাৎ ফলদায়ক হয় না স্মৃতি বলেন,—

"ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে নরে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে * * দাতা পতত্তি
তৎক্ষণাৎ॥"

বিড়ালব্রতী ভণ্ডতপস্বী লোকের অভি-সন্ধি-সিদ্ধির অনুকূলে জলটুকুও দান করিতে

নাই। এমন কি, বকব্রতী খল-ব্রাহ্মণকেও তদ্বৎ প্রত্যাখ্যান করিবে। বাস্তবিক মহাশত্রুকেও তৃষ্ণার জলদান উদার আর্য্য-শাস্ত্রের বিধান; কিন্তু এ স্থলে "বার্য্যপি" শব্দের দ্বারা একটু 'অর্থবাদ' করিয়া বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আদান-প্রদানই জগতের ব্যাপার। অন্তর্বাহ্য-নির্ব্বিশেষে উভয় জগতেই নিরন্তর আদান-প্রদানের যোগ-বিয়োগ-প্রবাহ বহিতেছে। সাধারণতঃ মানুষ প্রায় সর্ব্বদাই কোন না কোন আদান-প্রদানের অভিনয়ে অভি-নিবিষ্ট থাকে। এই জন্য স্বতঃপতনশীল বা পদস্খলনশীল মানবের জন্য এহেন প্রয়ো-জনীয় বিষয়ে একটু বেশি 'কিনারী' (margin) রাখিয়া, নিষেধাত্মক বেড়া দেওয়া আবশ্যক; এবং এই জন্যই শাস্ত্রে অনেক স্থলে (স্বতঃসিদ্ধ সনাতন অখিল-ধর্ম্মমূল বেদেও) ঐরূপ অর্থবাদ-বাক্যের আবশ্যকতা হইয়াছে। ফলকথা, 'ভণ্ড-তপস্বী' খল জাতীয় মতলববাজ লোক-গুলিকে তাহাদের বিশেষণ-সত্বের আনু-কূল্যার্থ কদাচ কিছুমাত্র ('জলটুকুও') দান করিবে না। তদ্রূপ ব্যক্তি যদি সর্ব্ববর্ণগুরু ব্রাহ্মণ-বংশেও জন্মিয়া থাকে, তবু সেও দানের সম্পূর্ণ অপাত্র। ওরূপ অপাত্রে দানকারী দাতা তৎক্ষণাৎ পাতিত্যপ্রাপ্ত—অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তার্হ হন।

এখন মনে করুন, পূর্ব্বকথিত বাউল-বৈষ্ণব-ফকির-'সাধু'-'গুলখেকো'-বেশে, আবার প্রায় ব্যভিচারী, পরদারী, পরস্বহারী, হিংসাকারী, মিথ্যাচারী,—অথচ হয়ত ধর্ম্মধ্বজাধারী, নানা জাতীয় 'পেশাদারী' ভিখারীকে 'ভিখারী-বিদায়' মাত্র জ্ঞানে যে আমরা দান করি, তাহা শুধু 'মুষ্টিভিক্ষা' হিসাবে ধরিলেও, সমষ্টিতে যে বিপুল ধনের বিশিষ্ট অপব্যয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এইরূপ মহানিষ্টকর অপব্যয়ের কর্ত্তৃত্বাংশী-ভূত হওয়া কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। দেশের অনিষ্ট, জাতির অনিষ্ট, সমাজের অনিষ্ট—এবং তদ্ধেতু নিজের ব্যক্তিগত পাপ ও পাতিত্যরূপ পরম অনিষ্ট—কেবল ধর্ম্ম-বিমূঢ়তা, শাস্ত্রানভিজ্ঞতা ও উপেক্ষা-ঔদাস্যে যেন আমরা আর না ঘটাই। সামান্য দানেও যেন আমরা দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিতে না ভুলি। একবিন্দু গোমূত্র-মিশ্রণে যেমন প্রকাণ্ড এক জালা দুগ্ধ বিকৃত হয়, তদ্রূপ অপাত্রে সামান্য মুষ্টিমেয় দানেও দাতার সমগ্র পুণ্য-জীবন ক্ষুণ্ণ হয়। বিড়ালব্রতী—বকব্রতী প্রভৃতি অপাত্রে "ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেৎ" বাক্যে যেখানে জলটুকু দেওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, সেখানে অস্মদ্দেশে প্রায়শঃ ঐরূপ অপাত্র ব্যবসায়ী ভিখারী-গণকে অন্ন-বস্ত্র-অর্থ প্রভৃতি দানে ঐ সমস্ত অপাত্রবৃত্তির বিবর্দ্ধনের আনুকূল্য করা, অসমর্থ-সেবার্থ অর্থ সমর্থকে দেওয়া এবং তদ্দ্বারা দেশের প্রভূত ধনহানির অন্ততঃ আংশিক হেতুভূত হওয়াও কদাচ বুদ্ধিমান, ধর্ম্মার্থী ও দেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য নহে।

অপাত্রে দানে ও উক্ত অপাত্রগণের অনুপার্জ্জনে যে পরিমাণ ধনহানি ঘটে, সেই পরিমাণ ধনে দেশে অবশ্য-পরপোষ্য-প্রতিপালনার্থ কত অনাথাশ্রম, দাতব্য ঔষধালয়, বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয়, ধর্ম্মগোলা, ধর্ম্মশালা, জলাশয় ও প্রয়োজনীয় পথ-ঘাট

প্রভৃতি হইতে পারে; বস্ত্র কাপড়ের কল, দিয়াশলাইয় কারখানা, অপর বিবিধ 'স্বদেশী' শিল্পশালা ও স্বদেশী প্রচারাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এতগুলি দেশহিতকর অনুষ্ঠানের উপযোগী বিপুল অর্থের অনাগম ও অপব্যয় কেবল এই দেশের অপাত্রে দান-প্রথার ফলেই সংঘটিত হইতেছে; ইহা আমাদের চিন্তাকরা ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

আমাদের হিন্দুর পক্ষে দানধর্ম্ম সাধারণতঃ চতুর্বিভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ—অন্ধ-আতুর প্রভৃতি স্বত অশক্ত এবং যথাশক্তি খাটিয়াও স্বীয় অবশ্য-পোষ্য পোষণে অসমর্থ দীন-গণকে দান। দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্ররক্ষক—ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গুরু-পুরোহিতকে দান। তৃতীয়তঃ ঈশ্বরোপাসনার্থ সংসারত্যাগী যথার্থ সাধু সন্ন্যাসীকে দান এবং চতুর্থতঃ সাধারণ দেশহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে দান। পূর্ব্বোক্ত কোনরূপ রাজস-তামস লক্ষণশূন্য এইরূপ দানই সাত্বিক দান এবং তাহাই যথার্থ দানধর্ম্ম। এই চতুর্বিভাগের অতীত স্থলে দান কচিৎ ধর্ম্ম্য হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত অপাত্র—ঐ পেশাদারী ভিক্ষুক-মাত্রকে দান উক্ত চতুর্বিভাগ-বহির্ভূত বিধায়, উহা দানধর্ম্ম নহে; পরন্তু উহা শাস্ত্র-যুক্তি-সিদ্ধ প্রকৃত দানধর্ম্মের ব্যভিচার রূপ পাপাচার মাত্র।

প্রথমোক্ত দান সর্ব্বজাতিসম্মত; কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্র ধর্ম্মরক্ষক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃতিকে দান করিতে অবশ্য অন্যধর্ম্মী ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহে। কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্র যেরূপ সমুদ্র সদৃশ, ধর্ম্ম যেরূপ বিপুল বিস্তৃত, তাহাতে সংসার-চিন্তায় নিষ্পিষ্ট ও জীবন-সংগ্রামে সংক্লিষ্ট জন দ্বারা তাহার যথাযথ সেবা অসম্ভব। এইজন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃতিকে নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব রাখিবার জন্য তাঁহাদের সংসার-পালন-ভার সমাজেরই গ্রহণ করা উচিত। একদিন সে ঔচিত্য সমাজে সুপালিত হইত। হিন্দুর সেই যথার্থ দানধর্ম্ম আজ অবহেলিত, তাই হিন্দুসমাজের মস্তকস্বরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের আজ এই বিকৃতি ও দুর্গতি; এবং অনেকের প্রায় সাধারণ ভিক্ষুক-বৃত্তিতে অবনতি! তারপর যথার্থ ধর্ম্মার্থী, ভগবদ্ভজনার্থী, ঈশ্বরে সম্যক্রূপে সমস্ত ন্যস্তকারী—'সন্ন্যাসী' সংজ্ঞার যথার্থ অধিকারিগণের পালনার্থে—অর্থাৎ সাধু-সেবার্থে যে দান, তাহা দান-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা। চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই—ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই অপর ত্রি-আশ্রমের প্রতিপালনার্থে ধর্ম্মতঃ দায়ী। এই জন্য দানধর্ম্মই গৃহস্থাশ্রমের নিত্য সম্পাদ্য সাধারণ ধর্ম্ম। অতিথিরূপী সর্ব্বআশ্রমীকেই গৃহস্থাশ্রমী যথাশক্তি অন্নদান করিতে বাধ্য। অন্ততঃ আসন, উদক ও আদরবাক্য মাত্রে আতিথ্য প্রায় সবারই সাধ্য।* শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রকৃত-অতিথির পক্ষে, জাতি, আশ্রম ও দেশ-কাল-পাত্র-বিচার নাই; কিন্তু

* "তৃণানিভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥"

সৎলোকদের ঘরে আসন, স্থান ও জল এবং প্রিয় সত্যকথা, এই চারিটি বস্তুর কখনও অভাব হয় না। (লেখক)

বর্ত্তমানে দেশ-কাল-পাত্রানুসারে সেরূপ অতিথিও বিরল—আতিথ্যও অচল। পূর্ব্বোক্ত 'পেশাদারী ভিখারী'র দল আপনাদিগকে "অতিথি" বলিয়া, ইদানীং গৃহীকে দানধর্ম্মে বাধ্য করার ইঙ্গিত করিলেও, গৃহী সর্ব্বতঃ তাহাতে বাধ্য নহে, এবং সেরূপ ব্যবসায়ী অতিথি-প্রত্যাখ্যানে গৃহীর কোনও প্রত্যবায়েরই সম্ভাবনা নাই ; বরঞ্চ সেই সব অপাত্র-চূড়ামণিগণকে দান দ্বারা আতিথ্য-ধর্ম্মের অপব্যবহারই প্রকৃত প্রত্যবায়ের কারণ।

প্রাচীনতম বৈদিক স্মৃতি "গৃহ্যসূত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় বচন-প্রমাণাদি প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার বেদৈতিহাসিক সন্দর্ভে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বিড়ালতপস্বী বকব্রতী ভিখারী ব্রাহ্মণকেও ভিক্ষাদানাদি দ্বারা পোষণ করা দূরে থাক্, তাহাকে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। পরে সে যদি অনুতাপপূর্ব্বক নিজের ঐ কুব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্তাদি করে, তবে তাহাকে পুনরায় সমাজে ও স্বদেশে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে সময়ে ভারত-ভাগ্য-গগনে গৌরবের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড-জ্যোতি, সেই সময়েরই এই রীতি। এখন সে রবি অস্তাচলগত, ভারত মোহ-তিমিরাবৃত, সুতরাং অন্ধকারে যে যা করে, কে তার কৈফিয়ৎ লয়?—কেবা তার প্রতীকার করিতে প্রস্তুত হয়? একটা ভাল জিনিস দীর্ঘকাল যাবত্ সংস্কারাভাবে কলঙ্কিত বা আবর্জ্জনাযুক্ত হইয়া পড়ে। তদোষরাশি হইতে সযত্নে বিযুক্ত রাখিয়া হিতপদার্থের ব্যবহার বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়।

দানধর্ম্ম ভারতে চিরপ্রতিষ্ঠিত। বিবাহে দান, শ্রাদ্ধে দান,* সর্ব্ব সৎকার্য্যে দান ; ব্রত-পূজাদিতে ভূরি দক্ষিণা, যজ্ঞাদিতে ভূরি ভূরি দক্ষিণা এবং সাধারণতঃ নিত্য নৈমিত্তিক বিবিধ-দান-দাক্ষিণ্য ভারত-সমাজে চির-প্রচলিত। প্রাচীন ভারতের "সন্তোষক্ষেত্র" ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এক অসাধারণ দান-ব্যাপার। কল্পতরু বা 'কল্পতরু' হওয়াও ভারত-প্রচলিত যাচকাভিপ্রেত দান মাত্র। এরূপ 'কল্পতরু' হওয়া ও যথাসর্ব্বস্ব লুটাইয়া দেওয়া বোধ হয় পৃথিবীর আর কুত্রাপি কদাপি হয় নাই। দানধর্ম্মের দাতৃত্ব-বশ্যতার বা তন্মূলক ত্যাগস্বীকার-বাধ্যতায় হরিশ্চন্দ্র শ্মশান চণ্ডালের দাস, শিবি রাজার স্বকায়কর্ত্তনে উল্লাস, রামবপাণ্ডবের নির্ব্বাসন, বিপশ্চিতের 'রৌরব' নরক দর্শন, ভীষ্মদেবের রাজ্যধন-দারগ্রহণ বিবর্জ্জন, দধিচির অস্থিদানার্থ আত্মজীবন বিসর্জ্জন। পরার্থে ত্যাগমাত্রই দানধর্ম্ম-তত্ত্বের অন্তর্গত। ভারতের পুরাণেতিহাস তাহার বহু উজ্জ্বল উদাহরণে অলঙ্কৃত। শাস্ত্রের শতমুখে দানধর্ম্ম কীর্ত্তিত। "দীনেভ্যো দ্রবিণং দত্তাৎ" "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ" "দানংহি পরমং পুণ্যং—"ত্যাগোহি পরমংতপঃ" "সর্ব্বাণি পুণ্যানি বসন্তি দানে" —"ভরষ্টং যন্দীয়তে"—"দাতা ধ্রুবঃ পুনঃ পুনঃ"।—"দানংবিত্তাদৃতং বাচয়সারাৎ সারমাহরেৎ।"—"সত্যং শৌচং দয়া দানং

* পূর্ব্বাক্ত শ্রাদ্ধের নামই "দানসাগর।" তদ্ব্যতীত 'যাড়শ' 'বৃষোৎসর্গ' 'চন্দনধেনু' 'তিলকণা' প্রভৃতি সমস্তই কেবল দানেরই ব্যাপার।

ধর্ম্মপাদচতুষ্টয়ম্।" অধিক উদ্ধৃতি বাহুল্য। দানধর্ম্ম-মহিমা বহু শাস্ত্রের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যত্র তত্র বিকীর্ণ। পারত্রিক স্বর্গ-সুখ ও ঐহিক আয়ুবৃদ্ধি প্রভৃতিও প্রবৃত্তি-মার্গে দানধর্ম্মের উদ্দীপক। "দাতা শতং জীবতু।" এই বেদবাক্যে সকাম দানধর্ম্মের বিশেষ উত্তেজনা-বীজ নিহিত। লোকের হাজার দুঃখ-কষ্ট হউক, কিন্তু দীর্ঘজীবন সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত। এই জন্যই বুঝি দুঃখী কাঠুরিয়া দুঃখের জ্বালায় মৃত্যু-প্রার্থনায় যমকে ডাকিয়া, অবশেষে তাঁহাকে কাঠের বোঝাটা তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিল! যে জীবন সুখী-দুঃখী-নির্ব্বিশেষে সবারই প্রিয়, সবারই বাঞ্ছনীয়, সেই জীবন দানধর্ম্মের দ্বারাই শতবর্ষস্থায়ী হয়, এই পুরাপ্রচলিত বেদবাক্য-প্রভাবে হিন্দুর দানশীলতা সকাম মার্গেও সুবিস্তৃত হইয়াছিল। পরে সাধক-পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ অধ্যাত্মলক্ষ্যে উহা নিষ্কাম পরমধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। এহেন ঐহিক, পারত্রিক, ভৌতিক, আধ্যাত্মিক, সর্ব্ববিধ শুভসাধক দান-ধর্ম্ম যাহাতে শাস্ত্র-যুক্তি-সমার্জ্জিত, নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ ও সুদেশ-কাল-পাত্র-বিহিত হয়, তদ্বিষয়ে সম্যক্ সচেষ্ট ও সতর্ক থাকা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

দান-সম্বন্ধে দেশ-কালের একটু ব্যত্যয় হইয়াও যদি পাত্র ঠিক রয়, তবু সে দান 'মন্দের ভাল' রূপেও গণ্য হয়; কিন্তু অপাত্রে বা কুপাত্রে যে দান (দেশ-কালগত অনুকূলতা সত্ত্বেও)—সে দানই নহে, অশুভের বিলাস। দান-বিষয়ে পাত্র-দোষ এ দেশে অনেক দিন হইতেই ঘটিয়াছে। ইদানীং যেমন 'বৈষ্ণব' ধর্ম্মধ্বজাধারী ব্যভিচারী পেশাদারী ভিখারীর সংখ্যা অধিক, আবার অর্দ্ধ সহস্রাব্দ পূর্ব্বে এদেশে তদ্রূপ আগমোক্ত তান্ত্রিক শাক্ত সাধনধ্বজী মদ্য মাংস-ভোজী 'পঞ্চমকারে' অত্যুৎসুক ভণ্ড ভিক্ষুকের সংখ্যাধিক্য ছিল। প্রাচীন উদ্ভট পদ্য প্রভৃতিতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

"ভিক্ষো! মাংস-নিষেবণং প্রকুরুষে?
কিন্তত্র মদ্যং বিনা।
মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ং? প্রিয়মহো!
বারাঙ্গনাভিঃ সহ॥
বেশ্যাপ্যর্থরুচিঃ, কুতস্তব ধনং?
দ্যূতেন চৌর্য্যেণবা।
চৌর্য্যে দ্যূতে পরিগ্রহোঽস্তি ভবতো?
নষ্টস্য কান্যা গতিঃ॥"

অর্থাৎ—

ও হে ভিক্ষু! তোমার কি মাংস-সেবা হয়?
(হয় বটে,) কিন্তু তাহা মদ্য ছাড়া নয়।
মদ্যটিও তোমার কি প্রিয় তবে বটে?
প্রিয়—আহা! যদি তাহা বেশ্যা-সঙ্গে ঘটে।
বেশ্যায় ত টাকা চায়, টাকা কোথা পাবে?
জুয়াখেলা—কিম্বা চুরী বিদ্যার প্রভাবে।
জুয়াখেলা—চুরীটাও চলে কি তোমার?
তা বিনে নষ্ট লোকের উপায় কি আর?

এ সব প্রাচীন চতুর্থাশ্রম 'সন্ন্যাস' ভেকধারী ভিখারীর নমুনা। আধুনিক আদর্শ আমাদের পূর্ব্বোক্ত সেই "রণ্ডাযৌবন-ভঞ্জনবীর," ইত্যাদি উদ্ভট পদ্যে প্রকাশিত। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শুভাবির্ভাব ও পরম প্রেম-লীলা-প্রভাবের দু-এক শতাব্দী পরে, ক্রমে সে সুভাব কমিয়াছে। ক্রমে অবহেলায়—

অমার্জ্জনে সুপাত্রে আবর্জ্জনা জমিয়াছে। সুক্ষেত্রে আগাছা উঠিয়াছে। আসলে নকল ঘটিয়াছে। ভাল জিনিস হলেই ক্রমে তার 'ভেল' হয়। সাচ্চা হলেই ঝুটা হয়। সোনা হলেই গিল্টি হয়। সংসারের রীতিই এই। তাই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পদ-রজ-পূত বঙ্গ-বক্ষে আজ ভণ্ড 'বৈষ্ণব' 'ভেকধারী'র অকাণ্ড তাণ্ডবলীলা! ফলে অবাধ ভিক্ষা-দানাদি দ্বারা ইহাদের—এবং এতত্তুল্য অন্যান্য পেশাদারী ভিখারীদলের পোষণ-প্রথা অধুনা আর অব্যাহত থাকা অতীব অবাঞ্ছনীয়।

সাধারণতঃ ভিক্ষুকমাত্রেই নিন্দিত ও সমাজের অবজ্ঞাত অধস্তন অংশ।

"তৃণাদপি লঘুস্তূলস্তূলাদপি চ যাচকঃ।
ন নীত বায়ুনা কস্মাৎ কিঞ্চিৎ প্রার্থনশঙ্কয়া॥"

তৃণ স্বভাবতঃ লঘু বস্তু; তা হতেও লঘু তুলা; আবার তুলা হতেও লঘু ভিক্ষুক। তবে যে বাতাস তাকে উড়াইয়া লয় না, সেটা কেবল কিছু চাওয়ার ভয়ে! এই সব উদ্ভট পদ্য, "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"— "ধিক্ পরাপেক্ষিণং দীনং যাচকং পুরুষাধমং" "মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচনে" "যাচনং তামসং স্মৃতং" ইত্যাদি বহুতর বচনাদিতে ভিক্ষুকত্ব স্বভাবতই নিন্দিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে আবার সেই ভিক্ষুকত্ব যদি ভণ্ডতা, খলতা, আলস্য ও অনৈতিকতায় পূর্ণ অপাত্রত্বে পরিণত হয়, তবে দেশের প্রভূত ধনহানিজনিত বহুবিধ অনিষ্টের কারণ ঘটাইয়া, তাহার পোষণ-বিধান ও প্রশ্রয়দান 'মনু' প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রামাণ্য শাস্ত্রের অণুমাত্র অনুমোদিত নহে।

দানধর্ম্ম অভাবগ্রস্তের অভাব মোচনো-দ্দেশেই অনুষ্ঠেয়। উহা অক্ষমের পালনার্থেই সক্ষমের সৎকর্ত্তব্য। দানে দৈন্য-মোচন-গুণই বদান্যতা। অদৈন্য, অনশক্তি কদাচ দয়া-দাক্ষিণ্যের লক্ষীভূত নহে। "দীনেভ্যো দ্রবিণং দদ্যাদার্ত্তং প্রতি দয়াং কুরু।" দরিদ্রকেই ধনদান করিবে; আর্ত্ত আতুরের প্রতিই দয়া কর্ত্তব্য।

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥"

অর্থাৎ—

হে কৌন্তেয়! পোষ দীনগণে;
সমর্থকে সেবিওনা ধনে।
ঔষধ রুগ্নেরি হিত সাধে;
নীরোগের কি কাজ ঔষধে?

যথার্থ অভাবমোচনই যে স্থলে নিঃস্বার্থ দানের মর্ম্ম, তাহাই শাস্ত্রাভিনন্দিত সার্থক দানধর্ম্ম। প্রাচীনকালে তাহার যে কিছু ব্যভিচার বা অপব্যবহার হইত, তাহা তাৎ-কালিক জীবিকা-স্বচ্ছল সমাজে কতক সহিত, কিন্তু এখন আর সহেনা। তখন একদিন 'টাকায় আটমন চাউল' ছিল, আর এখন আট টাকায় একমন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন তণ্ডুল ও টাকা পরস্পর স্থান-বিনিময় করিয়া বসিয়াছে। চাউলের স্থানে টাকা ও টাকার স্থানে চাউল আসিয়াছে। তাতে আবার অপর বিবিধ বিপত্তি বিপ্লবে দেশের এখন বিকট সঙ্কটাবস্থা। এ অবস্থায় আমাদের দান-ধর্ম্মের সময়ানুরূপ সংস্কার-ব্যবস্থা অবিলম্বে অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার বলি, এই জন্যে অগৌণে আন্দোলন-আলোচনা,

বক্তৃতা-রচনা, সভা-সমিতি, পুস্তক পত্রিকাদি ও প্রচার-বিচারাদি আরম্ভ হউক। দানধর্মে চিরপ্রসিদ্ধ ভারতবর্ষ স্বদেশ-কাল-পাত্র-বিচারিত বিশুদ্ধ দানধর্ম সাধনে সুসিদ্ধ হউক, পরমেশ চরণে ইহাই প্রার্থনা।

শ্রী শঃ———

প্রাচীন ভারতে তস্কর।

অতীত ও বর্ত্তমানের তুলনায় মানব আপনার মুক্তিমন্ত্র লাভ করে। অতীত, বর্ত্তমানের অঙ্কুরে জলসেচন করিয়াছিল, তজ্জন্য বর্ত্তমান অতীতের কাছে কৃতজ্ঞ, সুতরাংই বর্ত্তমানের জীবনে অতীতের প্রভাব-বিভব অনন্যমাত্রায় পরিস্ফুট। অন্যদিকে বর্ত্তমান, অতীতের মহত্ত্বগুরুত্বের একমাত্র আশ্রয়। বর্ত্তমান, রাজপূজার প্রশস্ত পুষ্পপাত্র লইয়া ভক্তিভরে অতীতের চরণ উদ্দেশে অর্পণ করিতে প্রস্তুত। এই প্রবীণ-নবীনের সমালোচনা—মানব-জীবনে যুগান্তর আনয়ন করে। হেয় বর্জ্জন ও উপাদেয় গ্রহণের মহামন্ত্র ঐ তুলনার মাতৃকা-রন্ধ্রেই বিদ্যমান; তাহার উদ্ধারে কৃত-কার্য্যতা আগমন করে, ইহা ধ্রুব।

বর্ত্তমান সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। একশ্রেণী অতীতের গৌরব-সৌরভে বিমুগ্ধ, অপর দল বর্ত্তমানের মোহন মুরলীরবে মাতোয়ারা। একের দূরবিসর্পিত-দৃষ্টি পারিপার্শ্বিক পদার্থের প্রতি উদাসীন, অন্যের তীব্রচক্ষুঃ পার্শ্বস্থ বস্তুতেই নিবদ্ধ; পশ্চাত্তরে দূরদর্শনে অনিচ্ছু। এই ভাবদ্বয়ের সংঘর্ষে তৃতীয় পন্থা আবিষ্কৃত হয়। এই সম্প্রদায় যেমন পুরাতন পিশাচের পূজায় পরাঙ্মুখ, তেমনি নব দানবের সেবায়ও অনিচ্ছুক। ইঁহাদের ধারণা, প্রাচীন-জগতের বক্ষেও প্রেত-পদচিহ্ন পাওয়া যাইত, পৈশাচিক অট্টহাসির অস্তিত্ব ছিল; অধুনাতন সংসারেও দেবতার পদাঙ্ক দৃষ্টিগোচর হয় সুরসঙ্গীতের মৃদুল স্রোত শ্রুত হয়।

প্রাচীন সময়ে, ভারতীয়গণ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই উক্তির সহিত অসত্যের সংস্রব নাই। সত্য সত্যই, তেজঃপুঞ্জ তপস্বীর পদতলে বসিয়া, ভারতীয় সমাজ জগতের বহু উচ্চজ্ঞানরত্ন সংগ্রহ করিয়া ছিল। কিন্তু, সে আদর্শ সমুন্নত সুসভ্য সমাজে, অসত্যের—অন্যায়ের—অনাচারের—ব্যভিচারের লেশমাত্রও ছিল না, এরূপ বিশ্বাস—কেবল শ্রদ্ধাজাড্যের পরিচয় প্রদান করে। আলোক, অন্ধকারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। জগৎপ্রাজ্য বিশ্বস্রষ্টার এমন সুকৌশলপূর্ণ স্থান, যে, এখানে পুণ্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি পাপের মলীমস চিত্রকে অপেক্ষা করে; অধমের কঠোর কশা, উচ্চ-জনতার উন্মুক্তগতির প্রমাণ করে। মধুর মলয় মারুতের প্রাণস্নিগ্ধকর মন্দ স্পর্শ, ভীম গ্রীষ্মের সূচনা করে। মনোমদ মিলন, অনন্য মর্ম্মান্তিক বিয়োগের সংযোগসূত্র ধরিয়া আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ এ জগৎ দ্বন্দ্বময়, নিদ্বন্দ্ববিহীন শান্তভাব এ রাজ্যে কখনও আতিথ্য গ্রহণ করে নাই।

প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি আর্য্য সভ্যতার অভ্রভেদিনাদের অভ্যন্তরেও

তস্করগণের ঘৃণিত স্বর শুনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্যবহারশাস্ত্র দেশ-কাল ও সমাজোপযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত;—ঐ শাস্ত্রের সমস্ত নিষেধ এবং অনুজ্ঞা কোনও সময়ে কোনও সমাজের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সিদ্ধি করিত। শাস্ত্রজ্ঞবর্গ অবগত আছেন, ব্যবহার শাস্ত্র (আইন্) লৌকিক প্রয়োজন নিষ্পন্ন করে। পারলৌকিক প্রয়োজন এখানে নিতান্ত গৌণভাবে আপন সত্তার প্রমাণ দেয়।

আর্য্য ব্যবহারশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তস্কর দ্বিবিধ, প্রকাশ-তস্কর ও অপ্রকাশ-তস্কর বা প্রচ্ছন্ন তস্কর। মহর্ষি বৃহস্পতি বলিতেছেন,—

প্রকাশাশ্চাপ্রকাশাশ্চ তস্করাঃ দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
প্রজ্ঞাসামর্থ্যমায়াভিঃ প্রভিন্নাস্তে সহস্রধা।
নৈগমাঃ বৈদ্যকিতবাঃ সভ্যোৎকোচক-বঞ্চকাঃ।
দৈবোৎপাতবিদো ভদ্রাঃ শিল্পজ্ঞাঃ প্রতিরূপকাঃ।
অক্রিয়াকারিণশ্চৈব মধ্যস্থাঃ কূটসাক্ষিণঃ।
প্রকাশতস্করাঃ হ্যেতে তথা কুহকজীবিনঃ।

উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য্য এই যে, তস্কর দুই প্রকার, প্রকাশ-তস্কর ও অপ্রকাশ-তস্কর। জ্ঞান-শক্তি ও চাতুরীর ন্যূনাধিক্য ও পার্থক্য বশতঃ, এই দুই শ্রেণী তস্কর সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। এতদুভয়ের মধ্যে নৈগম, বৈদ্যকিতব, সভ্য, উৎকোচ-গ্রাহী, বঞ্চক, দৈবোৎপাত-কথয়িতা, শিল্পজ্ঞ, প্রতিরূপনির্ম্মাতা, অকার্য্যকারিগণ, মধ্যস্থ, কূটসাক্ষী ও কুহকজীবিগণ প্রকাশ-তস্কর। ইহাদের চৌর্য্য গোপন নাই; ইহারা জনসমাজে প্রকাশ্যভাবে বিচরণ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করে। অজ্ঞাতদেশে জন-নয়নের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া কার্য্য করে না। 'নৈগম' অর্থে—দাক্ষিণাত্যের নরপতি বুক্করায়ের মন্ত্রী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহামতি মাধবাচার্য্য বুঝিয়াছেন—

"নৈগমাঃ সার্থিকাঃ বণিক্ প্রভৃতয়ঃ"

বণিক্‌সম্প্রদায় দ্রব্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি-সংবাদ গোপন করিয়া, সকলে সম্মিলিত হইয়া অধিকতর মূল্য নির্দ্ধারণ দ্বারা, তুলা-যন্ত্র ও মানের (বাঁটখারার) কূটতার দ্বারা অর্থাৎ 'ফের্'ওয়ালা দাঁড়ী ও 'কম্' বাঁটখারা ব্যবহার—কিম্বা 'পাকী'র নামে 'কাঁচী' দেওয়া প্রভৃতির দ্বারা, প্রকাশ্যভাবে তস্করতা সাধন করে। যে ব্যক্তি চিকিৎসা-শাস্ত্র, অস্ত্রপ্রয়োগ ও ভৈষজ্যপ্রণয়ন সম্যক্ অবগত না হইয়া, চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহার নাম "বৈদ্যকিতব।" কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে—'বৈদ্য' অর্থ—দুশ্চিকিৎসক ও 'কিতব' অর্থ "বহুরূপী" দল। ইহাদের কার্য্য ও সাধারণ্যে তস্করতা। 'সভ্য' বলিতে বিচারসভার সদস্য বুঝায়; সভ্যগণ বর্ত্তমান-কালের 'জুরী'দের সদৃশ ছিলেন। সভ্যেরা গোপনে একতর পক্ষের হিতার্থে কৃতসংকল্প হইয়া, প্রকাশ্যভাবে বিচারালয়ে ন্যায়, ধর্ম্ম ও বিধানশাস্ত্রের দোহাই দিয়া তস্করবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন। উৎকোচক

অর্থ 'ঘুষ্‌খোর্'। রাজকর্ম্মাধিকৃত ব্যক্তিগণের, অপরাধিসম্প্রদায়ের নিকট হইতে অপ্রকাশ্যভাবে অর্থগ্রহণের নাম উৎকোচ-গ্রহণ। 'বঞ্চক' অর্থে জুয়াচোর বুঝিতে হইবে। কোনও মতে "সভ্যোৎকোচকবঞ্চকাঃ"র অর্থ—উৎকোচক ও বঞ্চক সভ্যগণ। যে সভ্য উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বীকৃত কার্য্যসম্পাদন করেন, তিনি 'উৎকোচক' সভ্য, আর যে সভ্য উৎকোচ গ্রহণ করিয়াও স্বীকৃত কার্য্য করেন না, বঞ্চনা করেন, তিনি 'বঞ্চক' সভ্য। এই ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে বিচারের ভার বিজ্ঞ পাঠকবর্গের উপর বিন্যস্ত রহিল। প্রকৃত প্রস্তাবে—এই সকল কার্য্য প্রকাশ্য চৌর্য্য, তাহাতে সংশয় নাই। যাহারা দৈবোৎপাতের সংবাদ ও প্রতীকারের প্রচার দ্বারা সামাজিক নিরীহ ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করে, অথচ জ্যোতির্বিদ্যাকুশল নহে, তাহারা 'দৈবোৎপাতবিৎ'। ভবিষ্যৎ অনিষ্টপাতের বর্ণনা ও অযাচিতভাবে স্বয়ং তদুপশমার্থে স্বস্ত্যয়নাদি ব্যপদেশে যাহারা শান্তিপ্রিয় সমাজে প্রতারণার জাল বিস্তার করিয়া স্বার্থ-মীন করায়ত্ত করে, তাহাদের কার্য্য যে চৌর্য্য, তাহাতে সন্দেহের কণিকামাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না। শিল্পজ্ঞ ব্যক্তি পিত্তলাদি পদার্থে রাগোৎকর্ষ সাধন দ্বারা তাহাকে 'স্বর্ণ' নামে বিক্রয় করিয়া, অনভিজ্ঞের নিকট হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করে, সুতরাং শিল্পজ্ঞ প্রকাশতস্কর। 'প্রতিরূপক'——প্রতিরূপ-নির্ম্মাতা—অর্থাৎ জালিয়াৎ। মুদ্রা বা লেখ্যাদির প্রতিরূপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই কৃত্রিম প্রতিরূপ প্রকৃত পদার্থরূপে সাধারণ্যে প্রচার করিয়া, তদ্দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়াদি নিষ্পাদন—চৌর্য্য ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অকার্য্যকারিগণ প্রকাশ্য চোর। মধ্যস্থ ('সালিশ') পক্ষপাত দ্বারা প্রকাশ্যরূপে চৌর্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন। মিথ্যাসাক্ষীর নাম 'কূটসাক্ষী'। কুহকজীবী—ইন্দ্রজালবিৎ 'ভেল্কীওয়ালা' বাজীকর। এই সমস্ত ব্যক্তি যে তস্কর, তাহা সর্ব্বসম্মত।

প্রকাশতস্কর বিষয়ে দেবর্ষি নারদের উক্তিও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইতেছে।—

"প্রকাশবঞ্চকাস্তত্র কূটমানতুলা-
শ্রিতাঃ।
উৎকোচকাঃ সোপধিকাঃ কিতবাঃ
পণ্যযোষিতঃ।
প্রতিরূপকরাশ্চৈব মঙ্গলাদেশবৃত্তয়ঃ।
ইত্যেবমাদয়ো জ্ঞেয়াঃ প্রকাশাঃ
তস্করাঃ ভুবি।"

কূটমান (কম্‌বাট্‌খারা) ও কূটতুলা (ফের্‌ওয়ালা দাঁড়ী) দ্বারা যাহারা ক্রয় বিক্রয় করে—তাহারা, উৎকোচগ্রাহিগণ, সোপধিক ও কিতবগণ বারবনিতাবৃন্দ, প্রতিরূপনির্ম্মাতৃদল, মঙ্গলাদেশবৃত্তি সম্প্রদায় ইত্যাদি প্রকাশ-তস্কর জানিবে। নারদের 'মঙ্গলাদেশবৃত্তি' ও বৃহস্পতির "দৈবোৎপাতবিৎ" অভিন্ন। নারদ-বর্ণিত "সোপধিক" বর্ত্তমানযুগের "জালদারোগা" "জাল এসেসর্" ইত্যাদি। নিজে ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারী সাজিয়া, তৎছলে অনুচিত অর্থগ্রহণ ইহাদের বৃত্তি। নারদের সময়ে, সমাজের

ইন্দ্রিয়পরতার বিশেষ নিদর্শনস্বরূপ পণ্যনারী, প্রকাশ্যস্বৈরতা লাভ করিয়াছে। বৃহস্পতির সময়ে সে সংবাদ দুর্লভ। আদর্শ-ভেদে এই নূতন গণনার উদ্ভব। বৃহস্পতির যুগে আদর্শ ছিল, "কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ" বৃহস্পতির কামসূত্রে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, সমাজ তখন পণ্যস্ত্রীর প্রতি নিতান্ত সহানুভূতিহীন ছিল না। যে সমাজে কাম, মোক্ষের আসনে উপবিষ্ট, সে দেশের বিধান-শাস্ত্র মনে ২ পণ্যস্ত্রীর প্রতি অরুপা প্রকাশ করেন না।

অপ্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন তস্করের পরিচয়ে মহর্ষি বৃহস্পতি বলিতেছেন —

সন্ধিচ্ছিদঃ প্রান্তমুষো দ্বিচতুষ্পদ-
হারিণঃ।
উৎক্ষেপকাঃ শস্যহরাঃ জ্ঞেয়াঃ
প্রচ্ছন্নতস্করাঃ।

সন্ধিচ্ছেদী, প্রান্তমুট্, মনুষ্যপশুচোর, উৎক্ষেপক, শস্যহর—ইহারা প্রচ্ছন্নতস্কর। সন্ধিচ্ছিৎ সিঁদচোর্। যাহারা রজনীর অন্ধকারে জনচক্ষুর অগোচরে গৃহের ভিত্তিতে সন্ধি (সিঁদ) খনন করিয়া, সন্ধিমার্গে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অপহরণ করে, তাহাদিগকে সন্ধিচ্ছিৎ কহে। প্রান্তমুষ— যাহারা বস্ত্রাদির প্রান্তে গ্রথিত সুবর্ণাদি দ্রব্য প্রান্তচ্ছেদন পূর্ব্বক অপহরণ করে। এই সম্প্রদায় 'গাঁট্‌কাটা' 'পকেট্‌কাটা' 'খুঁটকাটা' ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাদেশিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পশু-মানুষ-চোর তীব্রাকাঙ্ক্ষা রজনীতে জনগণ নিদ্রার নিভৃতক্রোড়ে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় শয়ন করিলে, নীরবে নিঃশব্দপদে বালক, রমণী বা পশু লইয়া দূরে—অতিদূরে প্রস্থান করে। উৎক্ষেপকগণ গৃহস্থের অনবধান অনুসন্ধান করিয়া, সেই সময়ে সহসা প্রাচীরাদি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া পলায়ন করে। শস্যহর তস্কর যামিনীর অন্ধকারে আপন অঙ্গ লুকাইয়া শস্যাগারের (গোলা, মরাই প্রভৃতির) তলদেশে ছিদ্র করিয়া নিম্নে ধান্যপাত্র স্থাপন করে, ছিদ্রপথে স্বতই শস্যরাজী ঐ ধান্যপাত্রে পতিত হয়;— অচিরে শস্যহর তস্করকুল ঐ ধান্যাধার লইয়া অভিলষিতস্থানে প্রস্থান করে।

মহর্ষি ব্যাস এই সকল চোরের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"সাধনাসাশ্রিতাঃ রাত্রৌ বিচরন্ত্যা-
বিভাবিতাঃ।
অবিজ্ঞাতনিবাসাশ্চ জ্ঞেয়াঃ প্রচ্ছন্ন-
তস্করাঃ।
উৎক্ষেপকঃ সন্ধিভেত্তা পান্থউদ্-
গ্রন্থিকাদয়ঃ।
স্ত্রীপুংসয়োঃ পশুস্তেয়ী চোরাঃ
নববিধাঃ স্মৃতাঃ।"

উদ্ধৃত শ্লোকরাজীর তাৎপর্য্য এই যে, প্রচ্ছন্ন-তস্করগণ রজনীযোগে চৌর্য্যকার্য্যোপকরণ সমূহ গ্রহণ করিয়া, জনগণের অজ্ঞাতসারে বিচরণ করে। প্রচ্ছন্নতস্করের বাসস্থান সাধারণের অজ্ঞাত। তাহারা উৎক্ষেপক, সন্ধিভেত্তা, পান্থ, উদগ্রন্থিক, স্ত্রীহারী, পুরুষহারী, পশুচোর ও (পূর্ব্বোক্ত) রজনীচর এবং অবিজ্ঞাতনিবাস—এই নববিধ। এই

শ্লোকে, ব্যাস মহোদয়—যে নববিধ প্রচ্ছন্ন-চোরের কথা বলিতেছেন, ইহার মধ্যে 'পান্থ তস্কর' ও 'উদ্গ্রন্থিক চোর' ব্যতীত অপর সকলেই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত। পান্থ তস্কর, অরণ্য-প্রান্তরাদির সমীপবর্ত্তি মার্গে অসহায় পান্থকুলের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করে। উদ্-গ্রন্থিক অর্থ যাহারা গ্রন্থিমোচনপূর্ব্বক চৌর্য্যনিষ্পাদন করে;—ইহাদিগকে বৃহস্পতি 'গ্রান্থমুখঃ' বলিয়াছেন। প্রথমে যে দুই প্রকার চোরের কথা কথিত হইল, অর্থাৎ রাত্রিতে চৌর্য্যোপকরণ লইয়া অজ্ঞাতে বিচরণ করে, সুযোগ মত অপহরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং যাহাদের বাসস্থান অবগত হওয়া যায় না, এই দুই দল—ইহাদের কার্য্যের পরিধি পরিজ্ঞাত নহে।

মহান বৃহস্পতি প্রকাশ তস্করগণের যে শাস্তি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও এখানে প্রয়োজনীয় বোধে উদ্ধৃত হইতেছে।—

সংসর্গ চিহ্নরূপৈশ্চ বিজ্ঞাতাঃ রাজ-
পুরুষৈঃ।
প্রদাপ্যাপহৃতং দণ্ড্যাঃ দমৈঃ শাস্ত্র-
প্রচোদিতৈঃ।
প্রচ্ছাদ্য দোষং ব্যামিশ্রং পুনঃ
সংস্কৃত্য বিক্রয়ী।
পণ্যং তদ্দ্বিগুণং দাপ্যঃ বণিগ্
দণ্ড্যশ্চ তৎসমম্।
অজ্ঞাতৌষধিমন্ত্রস্তু যশ্চ ব্যাধেরতত্ত্ব-
বিৎ।
রোগিণোঽর্থং সমাদত্তে স দণ্ড্য-
শ্চোরবদ্ ভিষক্।

কূটাক্ষদেবিনঃ ক্ষুদ্রাঃ রাজভার্য্যা-
হরাশ্চ যে।
গণকাবঞ্চকাশ্চৈব দণ্ড্যাস্তে কিতবাঃ
স্মৃতাঃ।
অন্যায়বাদিনঃ সভ্যাঃ তথৈবোৎ-
কোচজীবিনঃ।
বিশ্বস্তবঞ্চকাশ্চৈব নির্ব্বাস্যাঃ সর্ব্ব-
এবতে।
জ্যোতির্জ্ঞানং তথোৎপাতং অবি-
দিত্বা তু যো নৃণাং।
ভাবয়ন্ত্যর্থলোভেন বিনেয়াস্তে
প্রযত্নতঃ।
দণ্ডাজিনাদিভি র্যুক্তমাত্মানং দর্শ-
য়ন্তি যে।
হিংসন্তঃ ছদ্মনা নৃণাং বধ্যাস্তে
রাজপুরুষৈঃ।
অল্পমূল্যন্তু সংস্কৃত্য নয়ন্তি বহু-
মূল্যতাং।
স্ত্রীবালকান্ বঞ্চয়ন্তি দণ্ড্যাস্তেঽর্থা-
নুসারতঃ।
হেমরত্নপ্রবালাদ্যান্ কৃত্রিমান্
কুর্ব্বতে তু যে।
ক্রেতুর্ম্মূল্যং প্রদাপ্যাস্তে রাজ্ঞা
তদ্দ্বিগুণং দমম্।
মধ্যস্থাঃ বঞ্চয়ন্ত্যেকং স্নেহলোভা-
দিনা যদা।
সাক্ষিণশ্চান্যথাক্রয়ুঃ দাপ্যাস্তে
দ্বিগুণং দমম্।"

বৃহস্পতির উক্তির মর্ম এইরূপ—

রাজপুরুষগণ সংসর্গ, চিহ্ন ও রূপের দ্বারা এই তস্করগণকে চিনিবেন। অপহৃত ধন ধনস্বামীকে প্রদত্ত হইবে। রাজা তস্করগণের যথাশাস্ত্র দণ্ডবিধান করিবেন। যে বণিক্ সংস্কার দ্বারা সদোষ দ্রব্যের দোষ ঢাকিয়া, ঐ সমস্ত দ্রব্যকে নির্দ্দোষ দ্রব্য সমূহের সঙ্গে মিশাইয়া বিক্রয় করে, রাজা ঐ বণিকের নিকট হইতে ক্রেতৃপ্রদত্ত পণ্যমূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড গ্রহণ করিবেন। আর ক্রেতা যে পরিমাণ মূল্য দিয়া দোষবৎ দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে, তাহার দ্বিগুণ মূল্যের পণ্যদ্রব্য বণিক্ ক্রেতাকে প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। যে ব্যক্তি ঔষধি ব্যবহার ও মন্ত্রপ্রয়োগে অনভিজ্ঞ, ব্যাধির নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সংপ্রাপ্তি সম্যক্ অবগত নয়, সে ('হাতুড়ে' চিকিৎসক) রোগীর অর্থ গ্রহণ করিলে, চোরবৎ দণ্ডার্হ হইবে। গৃহীত দ্রব্যের ন্যূনাধিক্যবশে প্রথম সাহস, মধ্যম সাহস ও উত্তম সাহস চোরদণ্ড।(১) কূটাক্ষদেবী (পাশা খেলায় যে সকল ব্যক্তি 'ধরা' খেলে, তাহারা কূটাক্ষদেবী; এখানে তাৎপর্য্যতঃ সমস্ত 'জুয়া'খেলার অভিনয়ই বোঝাই মনে হয়) ও রাজভার্য্যাহর, বঞ্চক, গণক, কিতব, মিথ্যাবাদী সভ্য, উৎকোচগ্রাহিগণ, বিশ্বাসঘাতকবৃন্দ, ইহাদের সকলকেই রাজা নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রদান করিবেন। যাহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অভিজ্ঞ নহে, অথচ উৎপাত বৃত্তান্ত খ্যাপন দ্বারা অর্থ গ্রহণ করে, রাজা যত্নসহকারে তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন। যাহারা ব্রহ্মচারিবেশ বা ভিক্ষুবেশ গ্রহণ করিয়া ছলে অর্থ গ্রহণ করে, তাহারা রাজপুরুষগণের বধ্য হইবে। ব্যবহারশাস্ত্রে 'বধ' শব্দের অর্থ সর্ব্বত্রই প্রাণবিনাশ ব্যাপার নয়। তাড়ন, অঙ্গচ্ছেদ, নগ্নীকরণ, গৃহভঙ্গ, সর্ব্বস্বাদান, নির্ব্বাসন, মস্তকমুণ্ডন, প্রাণহরণ ইত্যাদি ব্যবহারশাস্ত্রের 'বধ' শব্দের প্রতিপাদ্য। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে ইহার যে কোনওটী বা অবস্থাবিশেষে একাধিকটী দণ্ডরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। যাহারা অল্পমূল্যদ্রব্য সংস্কার করিয়া স্ত্রীবালকাদিকে বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহারা অর্থগ্রহণের পরিমাণ অনুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম সাহসাদি দণ্ডার্হ। কৃত্রিম স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্য যাহারা বিক্রয় করে, অথচ প্রকৃত স্বর্ণাদির অনুরূপ মূল্য গ্রহণ করে, তাহাদের নিকট হইতে রাজা ক্রেতার মূল্য প্রত্যর্পণ করাইবেন, এবং বিক্রেতাকে দ্রব্যমূল্যের দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড করিবেন। মধ্যস্থগণ যদি স্বজন-স্নেহ ও অর্থ-লোভে একতর পক্ষকে বঞ্চনা করে, আর সাক্ষিগণ যদি স্নেহ-লোভাদি কারণে অন্যথা (অসত্য) বলে, তবে তাহারা (ঐ সভ্য ও সাক্ষিগণ) দ্বিগুণ দণ্ডভাগী হইবে।

(১) সাশীতিপণসাহস্রঃ দণ্ড উত্তমসাহসঃ।
তদর্দ্ধং মধ্যমঃ প্রোক্ত স্তদর্দ্ধমধমঃ স্মৃতঃ।

অশীত্যধিক সহস্রপণ উত্তমসাহসদণ্ডের পরিমাণ, তদর্দ্ধ (চত্বারিংশদধিক পণপঞ্চশত) মধ্যমসাহস দণ্ডের ও তদর্দ্ধ (সপ্তত্যধিক দ্বিশতপণ) প্রথম বা অধম সাহস দণ্ডের পরিমাণ। মতান্তরে "উত্তমেসাহসে-দণ্ডঃ সহস্রপণমীরিতঃ। তদর্দ্ধং মধ্যমঃ প্রোক্তঃ তদর্দ্ধমধমো মতঃ। সহস্রপণ উত্তমসাহস, পঞ্চশতপণ মধ্যম ও সার্দ্ধদ্বিশতপণ প্রথম বা অধম সাহস।

অপ্রকাশ-তস্করগণের দণ্ডবিধান প্রসঙ্গে আচার্য্য বৃহস্পতি বলিতেছেন—

সন্ধিচ্ছেদকৃতো জ্ঞাত্বা শূলমারোপয়েৎ প্রভুঃ।
তথা পন্থামুষো বৃক্ষে গলং বদ্ধাবলম্বয়েৎ।
মনুষ্যহারিণো রাজ্ঞা দগ্ধব্যাস্তে কটাগ্নিনা।
গোহর্ত্তুর্নাসিকাং ছিন্দ্যাৎ বধ্বাম্ভসি মজ্জয়েৎ।
উৎক্ষেপকস্তু সন্দংশৈর্ভেত্তব্যো রাজপুরুষৈঃ।
ধান্যহর্ত্তা দশগুণংদাপ্যঃ স্যাৎ দ্বিগুণং দমম্।

সন্ধিচ্ছেদক তস্করসমূহকে রাজা শূলে আরোপণ করিবেন। যাহারা পান্থগণের সর্ব্বস্ব হরণ করে, সেই সকল চোরকে (গলায় দড়ি বাঁধিয়া) বৃক্ষে অবলম্বিত করিবে, (অর্থাৎ ফাঁস গাছে লট্‌কাইয়া মারিবে।) মনুষ্যহরণকারিগণের সর্ব্বাঙ্গ বীরণ-পত্রের (বেণার পাতা) দ্বারা আবৃত করিয়া তাহাদিগকে অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিবে। গো-চোরের নাসিকাচ্ছেদন করিবে। অথবা বন্ধন করিয়া জলে নিমজ্জিত করিয়া দণ্ডিত করিবে। উৎক্ষেপক তস্করকে রাজপুরুষগণ সন্দংশ (সাঁড়াশী) দ্বারা অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিবে। ধান্যচোর ধান্যস্বামীকে গৃহীত ধান্যের দশগুণ ধান্য প্রদান করিতে, বাধ্য হইবে। রাজা তাহার নিকট হইতে দ্বিগুণ দণ্ড গ্রহণ করিবেন।

কেবল যে তস্করকুল দণ্ডার্হ তাহা নয়, চোরগণের যাহারা সহায়, তাহারাও দণ্ডযোগ্য। এ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় উক্তি এই—

ভক্তাবকাশাগ্ন্যুদকমন্ত্রোপকরণব্যয়ন্।
চৌরস্য দদতো হর্ত্তুঃ জানতো দম উত্তমঃ।

যাহারা চৌরকে 'চোর' বলিয়া অবগত হইয়াও, তাহাকে অন্ন, বাসস্থান, অগ্নি, জল, পরামর্শ ও অস্ত্রাদি উপকরণ দ্বারা সাহায্য করে, তাহাদেরও দণ্ড উত্তমসাহস অর্থাৎ ১০৮০ পণ।

মহর্ষি কাত্যায়নও বলিতেছেন,

চৌরাণাম্ভক্তদাঃ যেস্যুস্তথাপ্যুদকদায়কাঃ।
ভেত্তাতত্রৈব ভাণ্ডানাং প্রতিগ্রহণ এবচ।
সমদণ্ডা স্মৃতাঃ হ্যেতে যে চ প্রচ্ছাদয়ন্তি তান্।

অর্থাৎ যাহারা চৌরগণকে অন্ন ও জল প্রদান করে, অপহৃতভাণ্ড ভেদকরে, অথবা চোরের নিকট হইতে অপহৃতদ্রব্য গ্রহণ বা ক্রয় করে (ইহাদিগকে স্থলবিশেষে "থলেৎ" "পেলোৎ" ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।) তাহারা তস্করের সমানদণ্ডভাগী হইবে। আর যাহারা চোর-প্রচ্ছাদক, অর্থাৎ চোরকে লুকাইয়া রাখে, তাৎপর্য্যতঃ চোরকে সাধুরূপে প্রমাণ করিয়া চৌর্য্যের প্রশ্রয় প্রদান করে,তাহারাও চৌরদণ্ডভাগী।

চোরের সহায়তাকারী চোরবৎ দণ্ডার্হ। যাহারা চোরের প্রতি উদাসীন, শক্তি সত্বেও চোরকে উপেক্ষা করে, তাহারাও চোর সদৃশ দণ্ডনীয়। দেবর্ষি নারদের উক্তি—

শক্তাশ্চ য উপেক্ষ্যন্তেতেঽপিত-
দ্দোষভাগিনঃ।
উৎক্রোশতাং জনানাস্তু হ্রিয়মাণে
ধনে তথা।
শ্রুত্বা যে নাভিধাবন্তি তেঽপি
তদ্দোষভাগিনঃ।

যাহারা চোর ধরিতে সক্ষম হইয়াও চোরকে উপেক্ষা করে, তাহারা চোরদণ্ডার্হ। তস্করগণ গৃহস্থের সর্ব্বস্বহরণ করিয়া দ্রুতপদে রজনীর সান্দ্রান্ধকারে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, গৃহস্থ আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, এমন সময়ে এই উচ্চ চীৎকারধ্বনি কর্ণগোচর করিয়াও যাহারা সেইদিকে ধাবিত হয় না, তাহারাও দোষী, অপিচ চোরবৎ দণ্ডনীয়।

যখন চোরের সন্ধান পাওয়া যায় না, তখন নিরীহ প্রজার সর্ব্বস্বহরণের প্রতীকার কোথায়? এই সমস্যার সমাধানে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

ঘাতিতেঽপহৃতে দোষো গ্রাম-
ভর্ত্তুরনির্গতে।
বিবীতভর্ত্তুস্তু পথি চৌরোদ্ধর্ত্তুর-
বীতকে।
স্বসীম্নি দদ্যাদ্ গ্রামস্তু পদং বা যত্র
গচ্ছতি।
পঞ্চ গ্রামোবহিঃ ক্রোশাৎ দশ-
গ্রাম্যথবা পুনঃ।

উক্ত ভাংশের তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম মধ্যে (বধ বা) অপহরণ সংঘটিত হইলে, যদি চোর-পদচিহ্ন গ্রামের বাহিরে চৌরো-পেক্ষাজনিত দোষের ভাগী দৃষ্ট না হয়, তবে গ্রামপতি (মোড়ল) হয় চোর ধরিয়া রাজসমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন, নয় স্বয়ং অপহৃত দ্রব্য গৃহস্থকে প্রদান করিবেন। যদি বিবীত দেশে অপহার সংঘটিত হয় বা অপহরণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে বিবীত-স্বামী চোর ধরিতে অথবা চোরিত দ্রব্য প্রদান করিতে বাধ্য। বিবীত দেশ প্রচুর তৃণ-কাষ্ঠপূর্ণ প্রদেশ।—বর্ত্তমানকালের বন বিভাগ। প্রাচীন সময়ে বন-বিভাগের অধিকারীকে বিবীত-স্বামী কহিত। যদি বিবীতদেশ ব্যতীত অন্যত্র পথে চৌর্য্য সংঘটিত হয়, তবে চৌরোদ্ধর্ত্তা দোষভাগী। চোরোদ্ধরণের জন্য যে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন, তাঁহার নাম চৌরোদ্ধর্ত্তা। পথে পথে তাঁহাদের অনুচরবর্গ ভ্রমণ করিত। পথপার্শ্বে দূরে দূরে তাঁহাদের স্থান (থানা) নির্দ্দিষ্ট ছিল, সুতরাং পথে বা তৎসন্নিহিত চৌর্য্যের জন্য মার্গপাল বা দিক্‌পালই চৌরোদ্ধরণ দোষী। গ্রামের বাহিরে গ্রাম-পতির আধিপত্য নাই, গ্রাম্য শান্তিরক্ষকগণ সুতরাং সেখানে কার্য্যসাধনে অক্ষম। যদি গ্রামসীমায় চৌর্য্য হয়, চৌর্য্য-চিহ্ন গ্রামা-ভিমুখে দৃষ্ট হয়, গ্রাম-বহির্ভাগে কোনও চৌর্য্যলিঙ্গ অবগত না হওয়া যায়, সেখানে গ্রামবাসিগণ চোর ধরিয়া দিতে বাধ্য, অথবা অপহৃত দ্রব্য প্রদান করিতে প্রস্তুত হইবে। সীমাস্থানে গ্রামপতির অধিকার অল্প, গ্রামান্তরেও চোর-চিহ্ন পাওয়া যায় না, এরূপ

স্থলে গ্রামবাসিগণ দোষী। যদি গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া চোর-চিহ্ন অন্য গ্রামে গমন করে, তবে সেই গ্রাম চোর অর্পণ করিতে বা চৌরহৃত প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। যদি চোর-চিহ্ন অবগত হওয়া না যায়, আর বহু গ্রাম মধ্যে গ্রাম হইতে ক্রোশান্তরে চৌর্য্যাদি সংঘটন হয়, তবে পঞ্চ গ্রাম দোষী। অবস্থাবিশেষে সান্নিহিত দশ গ্রাম অপরাধী।

প্রাচীন সময়ে গ্রামে গ্রামে গ্রামাধিপতি, প্রতি পঞ্চ গ্রামে পঞ্চ-গ্রামপতি, প্রতি দশ গ্রামে দশ-গ্রামপতি, এইরূপ শত গ্রামপতি, সহস্র গ্রামপতি নিযুক্ত হইতেন। ইঁহাদের বৃত্তি ব্যবস্থা ছিল, ইঁহারা রাজদণ্ড অধিকার ও ক্ষমতা পরিচালনের সহায় সৈন্য-শস্ত্রাদি রাজকুল হইতে পাইতেন; অবস্থাবিশেষে নিজেরাও ঐ সকল সংগ্রহ করিতেন। প্রত্যেকে স্ব স্ব অধিকারে শান্তি স্থাপন, কর, শুল্ক প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া উচিত অংশ রাজকুলে প্রেরণ করিতেন; অবধারিত অংশ রাজানুমতিমতে গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের অধীন শান্তিরক্ষকেরা গ্রামের চৌর্য্যাদির প্রতীকার করিত। গ্রামপতি প্রতীকারে অসমর্থ হইলে, উচ্চতর অধিকারীর সাহায্য পাইতেন। প্রাদেশিক শান্তিরক্ষকগণ সর্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মার্গপাল পথের শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। স্বীয় মণ্ডলে সামন্তরাজা অশান্তি নিবারণ করিতেন। ইঁহারা সকলে অশান্তিনিবারণে অক্ষম হইলে, স্বয়ং নৃপতি স্ব-শক্তির দ্বারা তস্করাদির গ্রহণের চেষ্টা করিতেন। গ্রামপতি, দিক্‌পাল, মার্গপাল, সামন্ত, যে কেহ স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম হউন্ না কেন, রাজশাসনে সকলেই প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতে (স্ব স্ব অধিকার ক্ষেত্রে) বাধ্য ছিলেন। কোনও মতে নিরীহ প্রজার অপচয় না হয়, শান্তিরক্ষকেরা অমনোযোগ, ঔদাসীন্য, উপেক্ষা প্রভৃতি না করেন, এজন্য তাঁহাদেরও দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা! কোথায় হৃতসর্ব্বস্ব নিরপরাধ প্রজা শান্তিরক্ষকের পূজা-পরিচর্য্যা জন্য ঋণ করিতেছে, আর কোথায় বা শান্তিরক্ষক প্রজার তস্কর সন্ধান করিয়া অপহৃত দ্রব্য আনয়নে অক্ষম হইয়া, স্বীয় সঞ্চিত অর্থ দ্বারা প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতেছেন! প্রাচীনে ও নবীনে এই পার্থক্য। *

শান্তিরক্ষকের অধিকার ক্ষেত্রে যদি চৌর্য্যাদি উপস্থিত না হয়, তবে তিনি রাজকুলে পুরস্কারভাগী হইতেন। ইহাই প্রাচীন আর্য্য-প্রথা। শুনিয়াছি, পাশ্চাত্য দেশের কোনও সুসভ্য রাজ্যে প্রথা আছে, যে বৎসর রাষ্ট্রে পীড়ার অল্পতা থাকে, সে বর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিধানকর্ত্তাগণ পুরস্কৃত হন। এরূপ হইলে, অধিকারের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। শান্তিরক্ষক স্বীয় অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চৌরহৃত দ্রব্য গৃহস্থকে প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন, ইহা কত উচ্চতর সভ্য সমাজের ধরণ, তাহা আধুনিক শিক্ষিতগণ চিন্তা করিয়াছেন কি?

শুধু এই পর্য্যন্ত নয়, যদি রাজা স্বয়ং চোর সংগ্রহে অকৃতকার্য্য হন, তবে তিনি নিজ কোষ হইতে প্রজাকে অর্থ দিতে বাধ্য। কি সুন্দর সদ্ব্যবহার প্রথা! গৌতমের ধর্ম্ম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—

চৌরহৃতমবজিত্য যথাস্থানং গময়েৎ স্বকোষাদ্বা দদ্যাৎ।

রাজা হৃত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া যথাস্থানে পাঠাইবেন। যদি চৌরোদ্ধারে অশক্ত হন, নিজ কোষ হইতে প্রজাকে প্রদান করিবেন। এরূপ রাজা কি মানব না দেবতা? এরূপ রাজতন্ত্রে কি প্রজা সুখী না অসুখী? এরূপ রাজশক্তির আশ্রয়-ছায়ায় নিহিলিষ্ট এনার্কিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, টোরোরিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন নামধারী বিপ্লবকারীদের আবির্ভাবের সম্ভাবনা কোথায়? এরূপ রাজাকে যে প্রজা পরমেশ্বরের প্রতিনিধি মনে করে না, সে সত্য সত্যই হৃদয়হীন।

চৌর-সংগ্রহের চোরিত দ্রব্য লাভের এরূপ ব্যবস্থা থাকায়, চৌর্য্যবৃত্তি সমাজে অল্পই আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিল; তাই প্রাচীনকালের একজন হিন্দু নৃপতি গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন—

ন মে স্তেনোজনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ।
ন নাস্তিকঃ নানৃতীচ ন স্বৈরী নাপি স্বৈরিণী।

আমার জনপদে চোর নাই, কদর্য্য নাই (১) মদ্যপ নাই, নাস্তিক, মিথ্যাবাদী নাই, স্বৈরী (যথেচ্ছাচারী) নাই, স্বৈরিণী বা ভ্রষ্টা নারী নাই। "ন নাস্তিকঃ নানৃতীচ" স্থানে অনেকে "নানাহিতাগ্নির্নায়জ্বা" পাঠ করেন, তাহার অর্থ এই যে, যাহারা অগ্ন্যাধান করে নাই বা যজ্ঞ করে নাই, এরূপ ব্যক্তি আমার জনপদে নাই। এরূপ রাজ্য কি ভূতলে নন্দন-কাননের পারিজাত-পরিমল বিস্তার করে না? জ্ঞান, শিক্ষা, মনুষ্যত্বের বিকাশ বা ধর্ম্মবুদ্ধি সমাজে কুকার্য্যের সংখ্যা হ্রাস করে। প্রখর শাসন, প্রবল পীড়ন, কঠোর দণ্ড, তীব্র তিরস্কার, ভীতিপ্রদর্শন সমাজে নৈতিকতা আনয়নে সম্যক্ কৃতকার্য্য হয়না। জ্ঞানের বিস্তার, ত্যাগের—মহত্বের শিক্ষা, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সমাজে পবিত্রতায় পুষ্পবৃষ্টি আনয়ন করে।

বৈদেশিক পর্য্যটক সেই আর্য্য সভ্যতার সমাধি শ্মশানে দণ্ডায়মান হইয়া যে দিন বলিয়া ছিলেন, ঋষির শিক্ষায় ভারতীয়গণ মনুষ্যত্বের উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছেন। সমাজে চৌর্য্য নাই গৃহদ্বার অর্গলে উন্মুক্ত, গৃহস্থ শান্তিতে নিঃশঙ্কভাবে নিদ্রা যাইতেছে। প্রশস্ত রাজপথে স্বর্ণালঙ্কার পতিত থাকিলেও কেহ তাহা গ্রহণ করেনা। কেবল রাজপুরুষগণ দ্রব্য-স্বামীকে জানাইবার উদ্দেশ্যে পটহ যোগে জনপদে সংবাদ ঘোষণা করে। বিবাদ-বিসম্বাদের সংবাদ পাওয়া যায় না। প্রবঞ্চনায় পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। দেশের সর্ব্বত্র শান্তির সুবর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। এ বর্ণনা কি আনন্দের মঙ্গলবার্ত্তা আনয়ন করে না? এরূপ সমাজ কে না প্রার্থনা করে?

(১) আত্মানং ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ পুত্রদারাংশ্চ পীড়য়েৎ। লোভাদ যঃ পিতরৌ ভৃত্যান্ স কদর্য্য ইতি স্মৃতঃ। যে পাপী ব্যক্তি নিজেকে, ধর্ম্ম-কর্ম্মকে, পুত্র, দারা, পিতা, মাতা, ভৃত্য প্রভৃতিকে লোভ বশতঃ পীড়ন করে, সে "কদর্য্য" নামে অভিহিত হয়। যে ধর্ম্মপীড়ক, সে যে পক্ষান্তরে আত্মপীড়ক, তাহাতে সুধীগণের সংশয় হয় না।

সমাজ এত উন্নত, এত শিক্ষিত, এত সংযত যে, বৈদেশিক পর্য্যাটকের চক্ষুঃ বিরলতম চৌর্য্য প্রবঞ্চনাদির নিভৃতকক্ষে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সে সমাজে তস্কর ছিল, কিন্তু এত বিরল যে সমাজ-দর্শকের—দেশপর্য্যটকের অনুসন্ধান সে পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। প্রাচীন ও নূতনের তুলনায়—অতীত ও বর্ত্তমানের আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, আমরা কি চাই, আমাদের অভাব কোথায়? জাতীয় জীবনের এই অভাব মোচন প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শ্রী—ভারতী।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যদি বিশ্ব কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়, যদি কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ অপরিবর্ত্তনীয় হয়, তাহা হইলে ভক্তির স্থান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, ভক্তি জিনিষটা কি, তাহা সর্ব্ব প্রথমে আলোচনা করা উচিত। পরা অনুরক্তিকেই ভক্তি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, রাজভক্তি ইত্যাদি স্থলে আমরা ভক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া থাকি। স্থলবিশেষে অনুরক্তি অন্য প্রকার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুত্রের প্রতি যে অনুরক্তি, সেই অনুরক্তিকে আমরা বাৎসল্য আখ্যা দিয়া থাকি। ঐ প্রকার পাত্র-ভেদে এক অনুরক্তি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে আমার চেয়ে বড়, তাঁর প্রতি অনুরক্তি সাধারণতঃ ভক্তি শব্দের দ্বারা, যে আমার সমান, তার প্রতি অনুরক্তি প্রেম শব্দের দ্বারা, যে আমার ছোট, তার প্রতি অনুরক্তি স্নেহ শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। গুরুজনের প্রতি যে অনুরক্তি, তাহা ভক্তি শব্দের দ্বারা সূচিত হইলেও, শাস্ত্রকারেরা ভক্তি শব্দের দ্বারা কেবল ঈশ্বরানুরক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—"সা পরা অনুরক্তি ঈশ্বরে" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি যে পরা অনুরক্তি; তাহাই ভক্তি। পরা অনুরক্তি কাহাকে বলে? যে অনুরক্তি অবিচলিত—অর্থাৎ সহজে টলিবার নহে, তাহাকেই পরা অনুরক্তি বলা যাইতে পারে। তুমি সত্যবাদী, সত্যের প্রতি তোমার অনুরক্তি পরা। সম্পদে বিপদে তুমি কখনও সত্য হইতে ভ্রষ্ট হওনা, সত্যই তোমার অভীষ্ট দেবতা, বন্ধু ও নেতা; সত্যই তোমার ঈশ্বর। সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তুমি কখনও সত্যের আশ্রয় ত্যাগ করিবে না; সহস্র বিপদেও সত্যই তোমার একমাত্র শান্তিদাতা। সত্যের কোন তৈলচিত্র নাই, আলোক-চিত্র নাই, কোন প্রস্তর-মূর্ত্তি নাই, অথচ সত্যের সত্তা তুমি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পার। সত্য পুরুষবিশেষ না হইলেও, সত্যের নিকট তোমার মস্তক সর্ব্বদাই অবনত। যাহাকে আমরা দয়া বলি, তাহার কোন জড়মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইনা। অথচ দয়া কি, তাহা আমরা সকলেই বুঝি এবং দয়ালু হইতে চেষ্টাও করি। আর একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে

দেখিতে পারিবে যে, সত্য, দয়া প্রভৃতির যে কেবল সত্তা আছে, তাহা নহে, তাহাদের বাহ্য মূর্ত্তিও আছে। এক ব্যক্তি নৃশংস, আর এক ব্যক্তি দয়ালু; নৃশংস ব্যক্তিকে দেখিলেই তুমি বলিতে পারিবে যে এ দয়ালু নহে। যদি দয়া ও নৃশংসতার বাহ্য বিকাশ না থাকিত, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি নৃশংস, কোন্ ব্যক্তি দয়ালু, তাহা তাহাদিগকে দেখিয়া বুঝা যাইত না। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না; দেখি কি? না তাঁহার নিয়ম। সেই নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়। সেই নিয়মই তাঁহার স্বরূপ। সেই নিয়মই তাঁহার বহির্বিকাশ। সেই নিয়ম আমি সর্ব্বত্র সব সময়ে দেখিতে পাই। সেই নিয়ম আমি সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে সেবা করিতে পারি। আপদে বিপদে আমি সর্ব্ব সময়েই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি। সেই নিয়মের প্রতি অচলা ভক্তিই নিয়ন্তার প্রতি অচলা ভক্তি। রাজার প্রচারিত নিয়ম প্রতিপালন করাই রাজভক্তি। পিতৃ, মাতৃ গুরুর আদেশ বা উপদেশ প্রতিপালন করাই পিতৃ, মাতৃ বা গুরুভক্তি। বৈষ্ণবেরা বলেন যে, নামে ও নামীতে কোন ভেদ নাই। যেই কৃষ্ণ—সেই কৃষ্ণনাম। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, গুণ ও গুণীতে—নিয়ম ও নিয়ন্তাতে কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ নাই—অথচ আছেন। আছেন কোথায়? গীতায়। খৃষ্ট নাই; আছেন কোথায়? বাইবেলে। বুদ্ধদেব নাই; আছেন কোথায়? ধম্মপদে। একজন যদি কেবল মুখে বলে যে, সে কৃষ্ণকে, খৃষ্টকে বা বুদ্ধকে ভক্তি করে, অথচ তাঁহাদের উপদেশ অমান্য করে, তাহা হইলে কি তাহাদিগকে কৃষ্ণ-খৃষ্ট বা বুদ্ধ-ভক্ত বলিবে? ঈশ্বরের সত্তা কোথায়? না তাঁহার নিয়মে। সেই নিয়ম বিশ্বজনীন এবং অপরিবর্ত্তনীয়। সেই নিয়ম অতএব হইয়া, তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্তিই ঈশ্বরানুরক্তি বা ভক্তি।

(ক্রমশঃ)

শাণ্ডিল্য সূত্র

বা

ভক্তিমীমাংসা।

—•:•:•—

অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা॥ ১

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে॥ ২

তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ॥ ৩

জ্ঞানমিতি চেন্ন দ্বিষতোঽপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতেঃ॥ ৪

তয়োপক্ষয়াচ্চ॥ ৫

দ্বেষ প্রতিপক্ষভাবাদ্রসশব্দাচ্চ রাগঃ॥ ৬

ন ক্রিয়াকৃত্যনপেক্ষণাজ্জ্ঞানবৎ॥ ৭

অতএব ফলানন্ত্যম্॥ ৮

তদ্বতঃ প্রপত্তিশব্দাচ্চ ন জ্ঞানমিতরপ্রপত্তিবৎ॥ ৯

সামুখ্যোভয়াপেক্ষিত্বাৎ॥ ১০

প্রকরণাচ্চ॥ ১১

দর্শনফলমিতি চেন্ন তেন ব্যবধানাৎ॥ ১২

দৃষ্টত্বাচ্চ॥ ১৩

অতএব তদভাবাদ্বল্লবীনাম্॥ ১৪

ভক্ত্যা জানাতীতি চেন্নাভিজ্ঞপ্ত্যা সাহায্যাৎ॥ ১৫

প্রাগুক্তং চ॥ ১৬

এতেন বিকল্পোঽপি প্রত্যুক্তঃ॥ ১৭

দেবভক্তিরিতরস্মিন্ সাহচর্য্যাৎ॥ ১৮

যোগস্ত্বয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রয়াজবৎ॥ ১৯

গৌণ্যা তু সমাধিসিদ্ধিঃ॥ ২০

হেয়া রাগত্বাদিতি চেন্নোত্তমাস্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ॥ ২১

তদেব কর্ম্মিজ্ঞানিযোগিভ্য আধিক্যশব্দাৎ॥ ২২

প্রশ্ননিরূপণাভ্যামাধিক্যসিদ্ধেঃ॥ ২৩

নৈব শ্রদ্ধা তু সাধারণ্যাৎ॥ ২৪

তস্যাং তত্ত্বে চানবস্থানাৎ॥ ২৫

ব্রহ্মকাণ্ডং তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞায় সামান্যাৎ॥ ২৬

বুদ্ধিহেতুপ্রবৃত্তিরাবিশুদ্ধেরবঘাতবৎ॥ ২৭

তদঙ্গানাং চ॥ ২৮

তামৈশ্বর্য্যপরাং কাশ্যপঃ পরত্বাৎ॥ ২৯

আত্মৈকপরাং বাদরায়ণঃ॥ ৩০

উভয়পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্॥৩১

বৈষম্যাদসিদ্ধমিতি চেন্নাভিজ্ঞানবদবৈশিষ্ট্যাৎ॥ ৩২

ন চ ক্লিষ্টঃ পরঃ স্যাদনন্তরং বিশেষাৎ॥ ৩৩

ঐশ্বর্য্যং তথেতি চেন্ন স্বাভাব্যাৎ॥ ৩৪

অপ্রতিষিদ্ধং পরৈশ্বর্য্যং তদ্ভাবাচ্চ নৈবমিতরেষাম্॥ ৩৫

সর্ব্বানৃতে কিমিতি চেন্নৈবম্বুদ্ধ্যানন্ত্যাৎ॥ ৩৬

প্রকৃত্যন্তরালাদবৈকার্য্যং চিৎসত্ত্বেনানুবর্ত্তমানাৎ॥ ৩৭

তৎপ্রতিষ্ঠা গৃহপীঠবৎ॥ ৩৮

মিথোঽপেক্ষণাদুভয়ম্॥ ৩৯

চেত্যা চিতোর্ন তৃতীয়ম্॥ ৪০

যুক্তৌ চ সম্পরায়াৎ॥ ৪১

শক্তিত্বান্নানৃতং বেদ্যম্॥ ৪২

তৎ পরিশুদ্ধিশ্চ গম্যা লোকবল্লিঙ্গেভ্যঃ॥ ৪৩

সম্মানবহুমানপ্রীতিবিরহেতরবিচিকিৎসামহিমখ্যাতি তদর্থপ্রাণস্থানতদীয়তা সর্বতদ্ভাবাপ্রাতিকূল্যাদীনি চ স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ॥ ৪৪

দ্বেষাদয়স্তু নৈবম্॥ ৪৫

তদ্বাক্যশেষাৎ প্রাদুর্ভাবেষ্বপি সা॥ ৪৬

জন্মকর্ম্মবিদশ্চাজন্মশব্দাৎ॥ ৪৭

তচ্চ দিব্যং স্বশক্তি মাত্রোদ্ভবাৎ॥ ৪৮

মুখ্যং তস্য হি কারুণ্যম্॥ ৪৯

প্রাণিত্বান্ন বিভূতিষু॥ ৫০

দ্যূতরাজসেবয়োঃ প্রতিষেধাচ্চ॥ ৫১

বাসুদেবেঽপীতি চেন্নাকারমাত্রত্বাৎ॥ ৫২

প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ॥ ৫৩

বৃষ্ণিষু শ্রৈষ্ঠ্যেন তৎ॥ ৫৪

এবং প্রসিদ্ধেষু চ॥ ৫৫

ভক্ত্যা ভজনোপসংহারাদ্গৌণ্যা পরা যৈতদ্ধেতুত্বাৎ॥ ৫৬

রাগার্থপ্রকীর্ত্তিসাহচর্য্যাচ্চেতরেষাম্॥ ৫৭

অন্তরালে তু শেষাঃ স্যুরুপাস্যাদৌ চ কাণ্ডত্বাৎ॥ ৫৮

তাভ্যঃ পাবিত্র্যমুপক্রমাৎ॥ ৫৯

তাসু প্রধানযোগাৎ ফলাধিক্যমেকে॥ ৬০

নাম্নেতি জৈমিনিঃ সম্ভবাৎ॥ ৬১

অত্রাঙ্গপ্রয়োগানাং যথাকালসম্ভবগৃহাদিবৎ॥ ৬২

ঈশ্বরতুষ্টেরেকোঽপি বলী॥ ৬৩

অবন্ধোঽর্পণস্য মুখম্॥ ৬৪

ধ্যাননিয়মস্তু দৃষ্টসৌকর্য্যাৎ॥ ৬৫

তদ্যজিঃ পূজায়ামিতরেষাং নৈবম্॥ ৬৬

পাদোদকং তু পাদ্যমব্যাপ্তেঃ॥ ৬৭

স্বয়মর্পিতং গ্রাহ্যমবিশেষাৎ ॥ ৬৮

নিমিত্তগুণাব্যপেক্ষণাদপরাধেষু ব্যবস্থা ॥ ৬৯

পত্রাদের্দানমন্যথা হি বৈশিষ্ট্যম্ ॥ ৭০

সুকৃতজত্বাৎ পরহেতুভাবাচ্চ ক্রিয়াসু শ্রেয়স্যঃ ॥ ৭১

গৌণং ত্রৈবিধ্যমিতরেণ স্তুত্যর্থত্বাৎ সাহচর্য্যম্ ॥ ৭২

বহিরন্তরস্থমুভয়মবেষ্টিসববৎ ॥ ৭৩

স্মৃতিকীর্ত্ত্যোঃ কথাদেশ্চার্ত্তৌ প্রায়শ্চিত্তাভাবাৎ ॥ ৭৪

ভূয়সামননুষ্ঠিতিরিতি চেদা প্রায়াণমুপসংহারান্মহৎস্বপি ॥ ৭৫

লঘ্বপি ভক্তাধিকারে মহৎক্ষেপকমপরসর্বহানাৎ ॥ ৭৬

তৎ স্থানত্বাদনন্যধর্ম্মঃ খলে বালীবৎ ॥ ৭৭

আনিন্দ্যয়োন্যধিক্রিয়তে পারম্পর্য্যাৎ সামান্যবৎ ॥ ৭৮

অতো হ্যবিপক্কভাবানামপি তল্লোকে ॥ ৭৯

ক্রমৈকগত্যুপপত্তেস্তু ॥ ৮০

উৎক্রান্তিস্মৃতিবাক্যশেষাচ্চ ॥ ৮১

মহাপাতকিনাং ত্বার্ত্তৌ ॥ ৮২

সৈকান্তভাবগীতার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥ ৮৩

পরাং কৃত্বৈব সর্বেষাং তথাহ্যাহ ॥ ৮৪

ভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ ॥ ৮৫

তচ্ছক্তির্মায়া জড় সামান্যাৎ ॥ ৮৬

ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্যানাম্ ॥ ৮৭

ন প্রাণিবুদ্ধিভ্যোঽসম্ভবাৎ ॥ ৮৮

নির্ম্মায়োচ্চাবচং শ্রুতীশ্চ নির্ম্মিমীতে পিতৃবৎ ॥ ৮৯

মিশ্রোপদেশান্নেতি চেন্ন স্বল্পত্বাৎ ॥ ৯০

ফলমস্মাদ্বাদরায়ণো দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৯১

ব্যুৎক্রমাদপ্যয়স্তথা দৃষ্টম্ ॥ ৯২

তদৈক্যং নানাত্বৈকত্বমুপাধিযোগহানাদাদিত্যবৎ ॥ ৯৩

পৃথগিতি চেন্ন পরেণাসম্বন্ধত্বাৎ প্রকাশানাম্ ॥ ৯৪

ন বিকারিণস্তু করণবিকারাৎ ॥ ৯৫

অনন্যভক্ত্যা তদ্বুদ্ধির্বুদ্ধিলয়াদত্যন্তম্ ॥ ৯৬

আয়ুশ্চিরমিতরেষাং তু হানিরনাস্পদত্বাৎ ॥ ৯৭

সংসৃতিরেষামভক্তিঃ স্যান্নাজ্ঞানাৎ কারণাসিদ্ধেঃ ॥ ৯৮

ত্রীণ্যেষাং নেত্রাণি শব্দলিঙ্গাক্ষভেদাদ্রুদ্রবৎ ॥ ৯৯

আবিস্তিরোভাবা বিকারাঃ স্যুঃ ক্রিয়াফলসংযোগাৎ ॥ ১০০

প্রথম সূত্র—অথ শব্দের সাধারণ অর্থ অনন্তর। বেদান্তসূত্রে অথ শব্দের অর্থ এই যে, 'শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি' প্রাপ্তির পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার জন্মে। ভক্তির পথে এ সবের কিছু প্রয়োজন নাই। মুক্তির জন্য ভক্তিপথে পাপী পুণ্যবান, জ্ঞানী অজ্ঞান, সকলেরই তুল্য অধিকার আছে। অথ শব্দের দ্বারা ভক্তিপথে যাইবার সাধারণ অধিকার সূচিত হইয়াছে।

অথ শব্দের দ্বারা যে কারণে ভক্তিজিজ্ঞাসা হইতেছে, সেই কারণ সূচিত হইতেছে। যদ্যপিও ভক্তি-পথ সুগম্য এবং উহা দিয়া সকলেরই মোক্ষরূপ গন্তব্য স্থানে যাইবার অধিকার আছে, তথাপি ভক্তিপথের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ থাকায়, ভগবান শাণ্ডিল্য ঋষি ভক্তিসূত্র রচনা করিয়াছেন।

জানিবার ইচ্ছাকে জিজ্ঞাসা বলে।

সম্পূর্ণ সূত্রের অর্থ—মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য সকলেরই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ থাকায়, আমি (অর্থাৎ গ্রন্থকার) ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

দ্বিতীয় সূত্র—দ্বিতীয় সূত্রে ভক্তি কি, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঈশ্বরে পরা—অর্থাৎ অত্যন্ত অনুরক্তিকেই ভক্তি বলে। বিবেক-বিহীন ব্যক্তিদিগের সাংসারিক বস্তুর প্রতি যেরূপ অত্যন্ত অনুরক্তি, ভগবানে যদি তদ্রূপ অনুরক্তি জন্মে, তাহা হইলে তাহাকে ভক্তি বলা যায়। কৃপণের যেরূপ ধনে আসক্তি, প্রেমিকের যেরূপ প্রেমাস্পদের প্রতি আসক্তি, ভক্তেরও ভগবানের প্রতি সেইরূপ আসক্তি। ইহাকেই পরা অনুরক্তি বা ভক্তি বলে। কৃপণ ধনের জন্যই ধনকে ভালবাসে, ধনের দ্বারা তাহার আর কিছুর প্রাপ্তির বাসনা থাকে না; ধনের প্রতি তার যে ভালবাসা, তাহা অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না। যথার্থ প্রেমিকেরও ঐরূপ। যথার্থ ভালবাসার নিকট স্বার্থ-গন্ধ নাই। ভগবানের প্রতি স্বার্থশূন্য বা নিষ্কাম পরা অনুরক্তিকেই ভক্তি বলে। ভোগৈশ্বর্য্য-বাসনায় ভগবানের যে ভজনা, তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে। অহৈতুকী ভক্তিই ভক্তি শব্দ বাচ্য।

তৃতীয় সূত্র—যে ব্যক্তি ভগবানে নির্ভর করেন (তৎসংস্থস্য উপদেশাৎ)—তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে। ভগবানের প্রতি যাঁহার সংস্থা বা নির্ভর; তিনি কোন ফল আকাঙ্ক্ষা করেন না; কিন্তু যে কার্য্যের যে ফল, তাহা অবশ্যম্ভাবী। শ্রুতি বলেন যে, ভগবানে নির্ভর করিলেই অমৃতত্বপ্রাপ্তি হইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে—"অমৃতত্ব' ফলমুপদিশ্যতে।" শাণ্ডিল্য ঋষি এই শ্রুতির স্মরণ করিয়াই তৃতীয় সূত্র রচনা করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সপ্তম সূত্রেও আছে—"তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ"।

প্রথম তিন সূত্রের বিষদ ব্যাখ্যা—মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, এই তিনটী পথ আছে। জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গ সুগম্য। এই পথ এতই সরল ও সমান যে, অন্ধ-খঞ্জ প্রভৃতিও ইহা ধরিয়া অনায়াসে অত্যুচ্চ মোক্ষরূপ গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারে। ইহাতে কোন কঠোর তপস্যা করিতে হয় না, সারা জীবন শাস্ত্র পড়িতে হয় না, কর্ম্ম-কাণ্ডোপদিষ্ট অসংখ্য যাগযজ্ঞাদি করিতে হয় না। ভক্তিস্রোতে একবার গা ঢালিয়া দিলে, মানব বিনা যত্নে, বিনা ক্লেশে ভবনদী পার হইয়া মোক্ষধামে উপস্থিত হয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া, ভগবানের ইচ্ছার অধীন হইতে পারিলে, জীব অমৃত হয়। তখন সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়, সংশয় দূরীভূত হয়, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং সর্ব্বাসক্তি এক ভগবানেই কেন্দ্রীভূত হইয়া দাঁড়ায়। সে সময় জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, ভগবানে তন্ময়ত্ব হয়। জগৎ তখন ব্রহ্মময় হয় এবং ভক্ত আপনা হইতেই বলিয়া উঠেন—"তৎ ত্বম্ অসি" অর্থাৎ হে জীব! তুমি সেই ব্রহ্ম।

চতুর্থ সূত্র—চতুর্থ সূত্রে জ্ঞানের সহিত ভক্তির পার্থক্য দেখান হইতেছে। "জ্ঞানমিতিচেন্ন", ভক্তি জ্ঞান নহে; কারণ 'দ্বিষতোঽপি' শত্রুরও—'জ্ঞানস্য তদসংস্থিতে, শত্রু জ্ঞানে ভক্তি পাওয়া যায় না। তুমি আমাকে জানিতে পার, তুমি জানিলেই যে ভালবাস, এমন নহে; আমাকে জেনে আমাকে ঘৃণাও করিতে পার; সুতরাং জ্ঞান এবং ভক্তি এক হইতে পারে না। ঈশ্বর যে সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালনকর্ত্তা, এ বিষয়ে অনেকের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, তাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি না করিতে পারেন। ভগবানের প্রতি আস্থা জ্ঞান হইতে উদ্ভূত নহে; উহার মূলে ভক্তি।

পঞ্চম সূত্র—জ্ঞান যে ভক্তি নহে, তাহা সমর্থনার্থ পঞ্চম সূত্রে আর একটি যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ভক্তির যত আধিক্য হয়, জ্ঞানের তত উপক্ষয় বা ক্ষয় হয়। ভক্তির পাত্রের সহিত যত তোমার সামীপ্য এবং সাযুজ্য হয়, ততই তাঁহার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান কমিয়া যায়। যখন তন্ময়ত্ব হয়, তখন তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায়, ভক্তির পাত্রের জ্ঞান বলিয়া তোমার আর কিছু থাকে না; তখন বিষয়ী ও বিষয়, কর্ত্তা ও কর্ম্ম এক হইয়া যায়। ভক্ত আপনাকে ভুলিয়া ভগবানে নিমজ্জিত হয়। ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে, "হে মৈত্রেয়ি! দ্বৈতজ্ঞান নষ্ট হইলে কে কাহাকে জানিবে?"

ষষ্ঠ সূত্র—জ্ঞান যে ভক্তি নহে, তাহার আর একটি যুক্তি দেওয়া যাইতেছে। জ্ঞান যে ভক্তি নহে, তাহাদের দ্বন্দ্ব দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হয়। সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি পরস্পর দ্বন্দ্ব; অর্থাৎ শীতের দ্বন্দ্ব উষ্ণ, সুখের দ্বন্দ্ব দুঃখ। জ্ঞানের দ্বন্দ্ব অজ্ঞান এবং অনুরাগের বা রাগের দ্বন্দ্ব দ্বেষ এবং ঐ রাগ বা অনুরাগ—যাহা 'রস' শব্দের দ্বারা শ্রুতিতে সূচিত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানাত্মক কোনও শব্দের দ্বারা সূচিত হয় নাই।

ভক্তি ও জ্ঞান এক নহে। পরানুরক্তির নাম ভক্তি। অনুরক্তি বা রাগের উল্টা শব্দ দ্বেষ, অজ্ঞান নহে। এক ব্যক্তি অন্যকে জানিতে পারে, অথচ তাহার প্রতি দ্বেষ করিতে পারে; কিন্তু একজন অন্য একজনকে ভালবাসিবে, অথচ ঘৃণা করিবে—ইহা হইতে পারে না। এই অনুরাগ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে 'রস' শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।"

সপ্তম সূত্র—জ্ঞান যে ভক্তি নহে, তাহা সপ্তম সূত্রে আর একটি যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। জ্ঞান ক্রিয়াকৃত্য-সাপেক্ষ। ভক্তি তোমার কার্য্যের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তি অর্জ্জনের উপায় স্বতন্ত্র। ভক্তির প্রকৃতি বিচিত্র। সর্ব্বদাই আমরা দেখিতে পাই, একজন একজনকে ভালবাসে, কিন্তু কেন যে ভালবাসে, সে তাহার কারণ বলিতে পারে না; ঐরূপ অনেক সময় আমরা অন্যকে যে ভালবাসি না, তাহার কারণও বলিতে পারি না। ভক্তির মূলে যে গূঢ় রহস্য রহিয়াছে, তাহা কেবল ভক্তরাই বুঝিতে পারেন।

অষ্টম সূত্র—অষ্টম সূত্রে বলা হইয়াছে—ভক্তির ফল অনন্ত বা অসীম। ভক্তির

স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে তুমি যে কোথায় যাবে, তাহা তুমি নিজেই জান না। প্রেমামৃত পান করিয়া ভক্তের যে দশা হয়, তাহা তাঁহার ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই। তিনি আপনাতেই আপনি ভোর হইয়া থাকেন। তখন সসীম কোন বস্তুই তাঁহাকে সুখী করিতে পারে না। যিনি একবার অসীম রাজ্যের সংস্রবে আসিয়াছেন, সসীম রাজ্য তাঁহাকে কি প্রকারে সন্তুষ্ট রাখিবে? শ্রুতি বলেন, 'যৎ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।' ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে সকলই অল্প, অল্প প্রাপ্তিতে সুখ নাই। সুখ নাই কেন? না তোমার মধ্যে যে অসীম বস্তু আছে, তাহা সসীমে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তুমি যদি অদ্য সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলের রাজা হও, তাহা হইলে চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক প্রভৃতির রাজত্বের জন্য কল্য তোমার লালসা হইবে। তোমার অভ্যন্তরে যে অসীম বস্তু আছে, উহা অসীম বস্তু প্রাপ্ত না হইলে কিছুতেই তৃপ্ত হইবে না। সুতরাং সসীম বস্তু দ্বারা সন্তোষের আশা নাই। হে জীব! সসীম ত্যাগ করিয়া অসীমের দিকে নেত্রপাত কর। ভক্তি-সুধা পান কর, ভক্তিই তোমাকে অনায়াসে পরমা স্থানে লইয়া যাইবে। জ্ঞান শুষ্ক; তুমি বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা হইতে পার, কিন্তু তোমার চির জীবন দুঃখে যাইতে পারে। ভক্তির রাজ্যে দুঃখ নাই।

নবম সূত্র—জ্ঞান যে ভক্তি নহে, তাহা নবম সূত্রে আর একটি যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে উনবিংশ শ্লোকে আছে—'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।' অনেক জন্মের অন্তে, জ্ঞানবান আমাকে প্রাপ্ত হয়। সকলই বাসুদেব, যিনি এই তত্ত্বজ্ঞানাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, এইরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ। শাণ্ডিল্য ঋষি বলেন যে, ভক্তিতেই মুক্তি, সুতরাং জ্ঞানে মুক্তি হয়, এরূপ সমুদায় তর্কের অযৌক্তিকতা তিনি দেখাইয়াছেন। গীতার শ্লোকে—জ্ঞান দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়, এরূপ যদি তর্ক হয়, নবম সূত্রে ঋষি তাহাই মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "প্রপত্তি" শব্দ জ্ঞান বিষয়ে ব্যবহার হয়, ভক্তি বিষয়ে হয় না। যথা—'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ' জ্ঞানের দ্বারা ক্রমে ভক্তি হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা মোক্ষ হয় না। গীতোক্ত প্রথম শ্লোকে বলা হইতেছে যে, বহু জন্মের পর জ্ঞানবান আমাকে পাইতে পারে, সুতরাং জ্ঞানের সাক্ষাৎ ফল মোক্ষ নহে। অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরে জ্ঞানী ভক্তি লাভ করিয়া মোক্ষ পাইতে পারে। ভক্তির সাক্ষাৎ ফল মোক্ষ। এই সমুদয় তর্ক ও তাহার খণ্ডন সংক্ষেপে সূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে। 'ইতর' অর্থাৎ মোক্ষের 'প্রপত্তি'র ন্যায় জ্ঞানের 'প্রপত্তি' হয়, উহাতে মোক্ষ-প্রপত্তি হয় না।" গীতায় যে জ্ঞানবান যাহা পায়, উক্ত হইয়াছে, উহা মোক্ষ নহে; কারণ বহু জন্মের আবশ্যক; কিন্তু 'সর্ব্বমিতি বাসুদেবঃ', ভাবাপন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ ভক্ত সুদুর্লভ। যে জিনিষ দ্বারা মোক্ষের বস্তুর প্রপত্তি হয়, তাহা ভক্তি হইতে পারে

না। আর প্রপত্তি শব্দের ব্যবহার মোক্ষ-বিষয়ক বস্তু ভিন্ন অন্য স্থানেও ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রপত্তি শব্দ ব্যবহারেও জ্ঞান যে ভক্তি নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

দশম সূত্র—ভক্তিই মুখ্য বা অন্যান্য পথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা অন্যান্য সকল পথের যাত্রীরই ভক্তি-পথ দিয়া মোক্ষ-ধামে যাইতে হইবে। প্রেমশূন্য জ্ঞানী কেবল স্বকৃত তর্কের দাস হইয়া সারা জীবন দুঃখে যাপন করেন। যোগী প্রেমশূন্য হইলে কেবল শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিয়া জীবন-লীলা শেষ করেন। জ্ঞানীই হও আর যোগীই হও, ভক্তি চাই। যদি কর্ম্মের দ্বারা জগতের উপকার করিয়া মোক্ষধামে যাইতে চাও, তাহা হইলে 'সর্ব্বমিতি বাসুদেব' জ্ঞান চাই; তাহা না হইলে বিশ্বের প্রতি প্রেম হইবে না, এবং প্রেম না হইলে, নিষ্কাম কর্ম্ম হইবে না। ফলকথা—ভক্তি চাইই চাই।

একাদশ সূত্র—একাদশ সূত্রে বলা হই-তেছে যে—'প্রকরণ' হইতেও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। এস্থানে যে প্রকরণের কথা বলা হইয়াছে, উহা ছান্দোগ্য শ্রুতির সুপ্রসিদ্ধ শ্রুতি, যথা—

"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবম্মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মা-নন্দ স স্বরাড় ভবতি।"

অর্থাৎ যিনি এইরূপ দৃষ্টি করেন, এইরূপ মনন করেন, এইরূপ জানেন, তিনি আত্ম-রতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্বরাট হয়েন। আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে রতি হইলে মোক্ষ হয় না। আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ এ সমুদায়ই ভক্তিবাচক "পশ্যন্, মন্বান, বিজানন্" এইরূপ দেখে, মনন করে, জানে, তবে আত্মরতি হলে, "স্বরাট্" হওয়া যায়। স্বরাট্ কে? না—স্বয়ং রাজতে ইতি স্বরাট্। যিনি স্বয়ং প্রকাশমান—অর্থাৎ প্রকাশের জন্য অন্যের অপেক্ষা করেন না। বিশ্বস্থ ভাবং বস্তুই ভগবানের প্রকাশে প্রকাশিত হয়, ভগবান স্বপ্রকাশ। সুতরাং স্বপ্রকাশ হইতে হইলে, অর্থাৎ "তত্ত্বমসির" অধি-কারী হইতে হইলে, রতি বা ভক্তি চাই। জ্ঞানের স্থান নিম্নে। জ্ঞানে ক্রমে রতি জন্মিতে পারে, কিন্তু "সর্ব্বমিতি বাসুদেব" ভাবাপন্ন হইতে হইলে, রতিই চাই, অতএব ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বাদশ সূত্র—দ্বাদশ সূত্রে একাদশ সূত্রের অর্থ আর একটু প্রস্ফুটিত করা হইয়াছে। "পশ্যন" "মন্বান" এবং "বিজানন" শব্দ একা-দশ সূত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা যাইতে পারে, দর্শন, মনন এবং জ্ঞান দ্বারাই "স্বরাট্" হওয়া যায়, কিন্তু তাহা নহে; "দর্শন" আদির ফলে তাহা হয় না, ইহাই শ্রুতির আদেশ; কারণ "স্বরাট" শব্দ হইতে উহাদের অনেক ব্যবধান হইয়াছে। ভক্তি-বাচক শব্দের মধ্যে এবং স্বরাট শব্দের মধ্যে ব্যবধান না থাকায়, স্বারাজ্য-প্রাপ্তি ভক্তি দ্বারাই হয়, শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন।

ত্রয়োদশ সূত্র—মোক্ষাদি বিষয়ে শ্রুতির উপর আর কোন কথা চলে না, তথাপি ঋষি বলিতেছেন—মানবজীবনে ইহা দৃষ্ট হয় যে, জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান ভক্তিপ্রাপ্তির একটি উপকরণ

মাত্র। কাহারও সহিত তোমার পরিচয় হইল, তুমি তাহাকে জানিলে, তাহাকে শেষে তুমি তাহাকে ভালবাসিলে। এস্থলে "ভালবাসা" হইল তোমার বাঞ্ছিত বস্তু, আর জ্ঞান হইল উপায় মাত্র। তুমি যাহাকে ভালবাসিবে, তাহাকে অল্পবিস্তর জানা চাইই চাই; একেবারে যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, তাহাকে তুমি কখনও ভালবাসিতে পার না। কিন্তু জ্ঞানের পরিণাম যে ভালবাসা হইবে, তাহা নাও হইতে পারে। উহার পরিণাম দ্বেষ বা ঘৃণাও হইতে পারে।

চতুর্দ্দশ সূত্র—জ্ঞান ভিন্নও যে মোক্ষ হয়, তাহা চতুর্দ্দশ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পল্লবী বা ব্রজগোপীদের জ্ঞান ছিল না, কিন্তু তাঁহারা ভক্তিরাজ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ব্রজগোপীদের কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বজনবিদিত। অজ্ঞানবশতঃ ব্রজগোপীদের কৃষ্ণপ্রেমের বিবিধ প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রন্থাদির সম্যগর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া গোপী-প্রেমের নানাবিধ কাল্পনিক অর্থ করা হইয়াছে। ভক্তিরাজ্যে গোপীদের স্থান অত্যুচ্চ। স্বয়ং চৈতন্যদেব গোপীদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গোপী-প্রেমে কাম-গন্ধ নাই। উহাতে কাম-গন্ধ থাকিলে, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ গোপীদের প্রদর্শিত পথ কখনও অনুসরণ করিতেন না। ভগবানকে বিবিধভাবে আরাধনা করা যায়। "পিতেব পুত্রস্য সখে-ব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্" তাঁহাকে পিতা বলিয়া, সখা বলিয়া, প্রিয় বলিয়া উপাসনা করা যায়। নন্দ-যশোদা ভগবানের প্রতি পুত্র-বাৎসল্য দেখাইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন; অর্জ্জুন সখারূপে তাঁহাকে ভজনা করিয়া সংসার-বন্ধন ছিন্ন করেন; উদ্ধব, বিদুর প্রভৃতি তাঁহাকে প্রভু জ্ঞানে দাসস্বরূপ সেবা করিয়া অমৃতত্বের অধিকারী হয়েন; নারদ, সনাতন প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহাকে শুদ্ধ চৈতন্য জ্ঞানে উপাসনা করিয়া অমর হইয়াছেন। গোপীগণ পতি-রূপে ভগবানের ভজনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা এই ভাবকে 'মধুরভাব' বলেন। মধুর ভাবের অপব্যবহার দেখিয়া উহাকে দোষী করা যায় না। সকল ভাবেরই অপব্যবহার জগতে দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব ভাবের মধ্যে সার কথা এই যে, তোমার জীবত্বের ক্ষুদ্রত্ব, তাঁহার অসীমত্বের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া, তাঁহার সহিত আপনাকে মিশাইয়া দেও। গোপীরা কৃষ্ণময়ী ছিলেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বোধ ছিল না। ইহা ভক্তির পরাকাষ্ঠা।

পঞ্চদশ সূত্র—ভক্তির দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অর্থাৎ ভক্তি যে উপায় এবং জ্ঞান যে উদ্দেশ্য নহে, তাহা দেখাই-বার জন্য পঞ্চদশ সূত্র। 'ভক্ত্যা মামভি-জানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।' গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোক স্মরণ রাখিয়া পঞ্চদশ সূত্র রচিত হইয়াছে। গীতার ঐ শ্লোকে 'অভিজানাতি' শব্দ আছে। উহার অর্থ এই যে, যিনি ভক্তি দ্বারা আমাকে, (আমি কি এবং আমার তত্ত্ব কি, তাহা) ভাল করিয়া জানেন, তিনি আমায়

তত্ত্ব অবগত হইয়া আমাতে প্রবেশ করেন। এ স্থলে অভিজ্ঞান শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এক বস্তু পূর্ব্বে জানিয়া তাহাকে যে পুনর্ব্বার জানা, তাহাকেই অভিজ্ঞান বলে। প্রথমে ধান্য হইতে তুষ বাহির করিয়া ফেলা হয়, পরে ঐ ধান্য আবার কুটিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। ভক্তিও এই প্রকার। জ্ঞান যাহা আরম্ভ করে, ভক্তি তাহা শেষ করে। সুতরাং ভক্তির দ্বারা পুনর্ব্বার ভাল করিয়া জানা হয়। জ্ঞান যাহা মোটামুটি জানে, ভক্তি তাহা ভাল করিয়া জানিয়া আত্মসাৎ করে, এই জন্যেই সূত্রেতে বলা হইতেছে যে, ভক্তির দ্বারা যে জানে—অর্থাৎ ভক্তি যে জ্ঞানের উপায়, তাহা নহে; কেননা জ্ঞা ধাতু—পূর্ব্বে 'অভি' উপসর্গ-প্রয়োগ রহিয়াছে এবং উহার অর্থ জ্ঞাত বস্তু পুনর্ব্বার জানা।

ষোড়শ সূত্র—ষোড়শ সূত্রে বলা হইতেছে যে, ভক্তিই যে উদ্দেশ্য এবং জ্ঞান যে উপায়, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে অর্থাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ৫৪ শ্লোকে যথা "ব্রহ্মভূতঃ—প্রসন্নাত্মা নশোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা কখন শোকও করেন না, কখন আকাঙ্ক্ষাও করেন না; তিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিমান্ হইয়া ভক্তি লাভ করেন। অতএব ভক্তি মুখ্য এবং শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান ভক্তির একটী উপায় মাত্র।

সপ্তদশ সূত্র—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকের দ্বারায় জ্ঞান এবং ভক্তির মধ্যে যে বিকল্প অর্থাৎ সন্দেহ ছিল, তাহা দূরীভূত হইল, অর্থাৎ জ্ঞান যে ভক্তি নহে, ভক্তির একটী উপায় মাত্র, তাহাই স্থিরীকৃত হইল।

অষ্টাদশ সূত্র—দেবভক্তি ঈশ্বরভক্তি নহে। অন্যান্য প্রকারের ভক্তির সহিত দেবভক্তির উল্লেখ থাকায়—দেবভক্তি এবং ঈশ্বরভক্তি যে এক নহে, তাহা এই সূত্রে বলা হইতেছে। 'শ্বেত অশ্বতর' শ্রুতিতে আছে—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাঃ হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥'

অর্থাৎ যাঁহার দেবে পরা ভক্তি এবং যিনি গুরুতেও ঐ প্রকার ভক্ত, মহাত্মাদের মতে তিনি এই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়েন। এই স্থানে দেবভক্তি, গুরুভক্তির সহিত একত্রে উল্লিখিত হওয়ায়, উহা ঈশ্বরভক্তি বুঝায় না।

ঊনবিংশ সূত্র—ঊনবিংশ সূত্রে বলা হইতেছে যে, যোগ প্রযাজের ন্যায় জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়কেই সাহায্য করে। প্রযাজক নিজে একটী স্বতন্ত্র যাগ নহে। ইহা বাজপেয় যাগাদির সাহায্য করে মাত্র, সুতরাং কেবল প্রযাজের দ্বারা কেহ কোন ফল পায় না; সাহায্যকারী বলিয়া প্রযাজের প্রয়োজন। শাণ্ডিল্য বলেন যে, যোগও ঐ প্রকার, ইহা জ্ঞান এবং ভক্তির সাহায্য করে মাত্র। চিত্তের একাগ্রতা জ্ঞান ও ভক্তি, উভয়েরই জন্য প্রয়োজন।

বিংশ সূত্র—বিংশ সূত্রে বলা হইতেছে যে, সমাধিসিদ্ধি মুখ্য নহে, ভক্তিই মুখ্য, সমাধিসিদ্ধি গৌণ। পাতঞ্জল সূত্রে আছে যে, ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা সমাধিসিদ্ধি হয়। সুতরাং ঈশ্বরপ্রণিধান যদি ভক্তি

হয়, তাহা হইলে ভক্তি গৌণ এবং সমাধি-সিদ্ধি মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই সূত্রের দ্বারা শাণ্ডিল্য দেখাইয়াছেন যে, ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহা ভক্তি নহে, ইহা কেবল চিত্তস্থৈর্য্যের একটী উপায় মাত্র। প্রণিধান যে ভক্তি নহে, তাহা পাতঞ্জল-সূত্র হইতেও প্রমাণিত হয়। উহার পঞ্চবিংশ সূত্রে দৃষ্ট হয়—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" তৎপরে ছাব্বিশ এবং সাতাইশ সূত্রে উক্ত হইতেছে—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ বীজম্॥ স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥" তৎপরে বলা হইতেছে—"তস্য বাচক প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনং॥" অর্থাৎ ক্লেশ কর্ম্ম আদি দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলা যায়। তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞবীজ নিরতিশয় ভাবে রহিয়াছে এবং তিনি কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হওয়ায় সকলেরই গুরু। প্রণব অর্থাৎ—ওঙ্কার তাঁহার বাচক এবং সমাধি প্রাপ্তির জন্য ঐ প্রণব পুনঃ পুনঃ জপ এবং পুনঃ পুনঃ ভাবনা করিতে হইবে। সমাধি বা চিত্তের স্থিরতার দ্বারা ভক্তির সাহায্য হয় বটে, কিন্তু ভক্তির অপেক্ষা ইহার স্থান নিম্নে রহিয়াছে।

একবিংশ সূত্র—একবিংশ সূত্রে বলা হইতেছে যে, ভক্তি রাগ বা অনুরাগাত্মিকা হওয়ায় হেয় নহে—কেননা ইচ্ছার আস্পদ বা পাত্র উত্তম। যেমন সঙ্গ মাত্রই দূষণীয় নহে; অসৎসঙ্গই দূষণীয়, তদ্রূপ উত্তম পাত্রে অনুরাগ হওয়া দূষণীয় নহে। যোগশাস্ত্রে অনুরাগাদির দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। অবিদ্যা, (অজ্ঞান) অস্মিতা (আমি আছি, এই জ্ঞান) রাগ বা অনুরাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, ইহারা সমুদায় ক্লেশ, এ সমুদয় পরিত্যাজ্য, কিন্তু শাণ্ডিল্য বলেন যে, ভক্তি অনুরাগাত্মিকা বলিয়া, উহা পরিত্যাজ্য নহে। যেমন অসৎসঙ্গ আছে বলিয়া সৎসঙ্গ পরিত্যাজ্য নহে; পাপের প্রতি অনুরাগই পরিত্যাজ্য এবং যোগশাস্ত্রে তাহাকেই পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

দ্বাবিংশ সূত্র—দ্বাবিংশ সূত্রে বলা হইতেছে, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী সকলের অপেক্ষা ভক্ত শ্রেষ্ঠ। 'শব্দাৎ' কেননা শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ আছে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি
মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী
ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

অর্থাৎ যোগী, তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও। যোগীদিগের মধ্যেও যিনি অন্তরাত্মার সহিত সংগত হয়েন এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভক্তি করেন, তিনি যুক্ততম। অতএব দৃষ্ট হইল যে, ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান, সকলেই তোমাকে গন্তব্য পথের দিকে লইয়া যাইবে বটে, কিন্তু সকল পথই ভক্তির প্রশস্ত পথে যাইয়া মিশিয়াছে এবং ঐ পথ দিয়া যাইতেই হইবে। জ্ঞানী অনেক সময় তর্কজালে জড়িত হইয়া পড়েন, তপস্বীরা শারীরিক কষ্ট সাধনকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য করিয়া লন, কর্ম্মীরা কর্ম্মফল প্রাপ্ত না হইয়া অনেক সময় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন, ভক্তির শক্তি অনির্ব্বচনীয়; এ স্রোতে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিলে, ইহা আপনা হইতেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া দেয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিঃ

(১৮৬৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। চৈত্র। ১৩১৪ সাল, ১৮২৯ শকাব্দা

শাণ্ডিল্য সূত্র

বা

ভক্তিমীমাংসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ত্রয়োবিংশ সূত্র—ত্রয়োবিংশ সূত্রে বলা হইতেছে যে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রশ্নোত্তরের দ্বারাও সাব্যস্ত হইয়াছে। গীতার নিম্ন লিখিত প্রশ্নোত্তরের স্মরণ করিয়া সূত্রকার এ সূত্র রচনা করিয়াছেন।

প্রশ্ন—এবং সততযুক্তা যে ভক্ত্যাস্ত্বাং পর্য্যু-
পাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগ
বিত্তমাঃ॥

উত্তর—ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা
উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা
মতাঃ।

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে
সর্ব্বগমচিন্ত্যং চ কুটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্য ইন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে
রতাঃ॥
ক্লেশোধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেত-
সাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভির-
বাপ্যতে॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য
মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত
উপাসতে॥

[illegible] সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
[illegible] চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত-
চেতষাম্॥

প্রশ্ন—যে সততযুক্ত ভক্তেরা তোমাকে উপাসনা করে এবং যাহারা অব্যক্ত এবং অক্ষর ইহাদের মধ্যে অধিক যোগবিৎ কে?

উত্তর—যাঁহারা আমাতে মন আবেশ করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরা শ্রদ্ধার সহিত আমাকে উপাসনা করেন তাহারাই আমার মতে অধিক যোগবিৎ।

যাঁহারা নির্দ্দেশবিহীন অব্যক্ত সর্ব্বগম অচিন্ত্য কুটস্থ অচল এবং ধ্রুব অক্ষরকে উপাসনা করেন, তাহারাও ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযম পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া এবং সর্ব্ব ভূতের হিতে রত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। অব্যক্তে যাহাদের চিত্ত আসক্ত তাহাদের অধিকতর ক্লেশ হয় কারণ দেহী-দিগের অব্যক্ত পথ প্রাপ্ত হওয়া বড়ই দুঃখজনক। যাহারা আমাতে সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়া মৎপর হয়েন এবং অন্যান্য সর্ব্ব যোগ পরিত্যাগ করিয়া আমারই ধ্যান এবং উপাসনা করেন আমি সেই সকল আমাতে আবিষ্ট চিত্তদিগকে মৃত্যু সংসার সাগর হইতে অচিরাৎ উদ্ধার করিয়া থাকি।

চতুর্বিংশ সূত্র—ভক্তি শ্রদ্ধা নহে কারণ শ্রদ্ধার প্রয়োগ সাধারণ ভাবে হইয়া থাকে। কর্ম্মে শ্রদ্ধা গুরুতে শ্রদ্ধা ইত্যাদি শ্রদ্ধা শব্দের বহু প্রয়োগ দেখা যায়। শ্রদ্ধা ভক্তি নহে; শ্রদ্ধা ভক্তির সাহায্য করে মাত্র।

পঞ্চবিংশ সূত্র—শ্রদ্ধা ও ভক্তি এক হইলে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। অনবস্থা কাহাকে বলে? কার্য্য ও কারণের অবি-শ্রান্তিকে অনবস্থা বলে। "উপপাদ্যো পপাদকয়োরবিশ্রান্তিঃ"। গীতা বলেন "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সমে যুক্ত তমো মতঃ"। যিনি শ্রদ্ধাবান হইয়া আমাকে ভজনা করেন অর্থাৎ আমাকে ভক্তি করেন তিনিই আমার মতে যুক্ততম। এ স্থলে শ্রদ্ধা ভক্তির একটী উপায় মাত্র সুতরাং ইহা ভক্তি হইতে পারে না।

ষড়বিংশ সূত্র—ব্রহ্মকাণ্ড ভক্তিতে প্রযুজ্য কারণ উভয়ই কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞান কাণ্ডের পর বিবৃত হওয়ায় তাহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ব্রহ্মকাণ্ড ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। সর্ব্বকাণ্ডের শেষেই ব্রহ্ম-কাণ্ডের বিবৃতি হইয়া থাকে। শাণ্ডিল্য বলে যে ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তের—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। ব্রহ্মকে জানিবার জন্য ইহা হইতে পারে না। সকলেই ব্রহ্মকে জানেন। সকলেরই আত্ম জ্ঞান রহিয়াছে, আমি কে ইহা সকলেই জানেন এবং ইহা কেহই মনে করেন না যে আমি নাই, যদি আত্মজ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে সকলেই মনে করিত আমি নাই।

আত্মাই ব্রহ্ম—"সর্ব্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্ব-প্রসিদ্ধিঃ। সর্ব্বো হি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি, ন নাহমস্মীতি। যদি হি নাত্মাস্তিত্ব প্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বোলোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ। আত্মাচ ব্রহ্ম"—শারীরকভাষ্যম্। অতএব এই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বস্তুতই ভক্তি জিজ্ঞাসা উহা ব্রহ্ম জানিবার জন্য নহে। ব্রহ্ম-কাণ্ড এবং ভক্তিকাণ্ড উভয়ই কর্ম্ম-কাণ্ডের পর বিবৃত হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশ সূত্র—যেমন তণ্ডুল পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া বিশুদ্ধ করিতে হয় তদ্রূপ ভক্তি ও বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে উহাতে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মান চাই। শ্রবণ কীর্ত্তন মনন এবং ধ্যানাদির দ্বারাই পুনঃ পুনঃ তন্ময় হইবার চেষ্টা করা চাই এইরূপ করিতে করিতে ভক্তি বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়।

অষ্টবিংশ সূত্র—ভক্তির অঙ্গ সমূহেরও অনুষ্ঠান আবশ্যক। সম দম, গুরু এবং শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ইত্যাদি ভক্তির অঙ্গ। এ সমুদয়েরও প্রয়োজন।

উনত্রিংশ, ত্রিংশ এবং একত্রিংশ সূত্র—কাশ্যপ বলেন যে মুক্তির জন্য ভগবানের ঐশ্বর্য্য ধ্যান করিতে হইবে অর্থাৎ ভক্তি ঐশ্বর্য্যপরা। বাদরায়ণ বলেন যে ভক্তি আত্মৈকপরা অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মা যে ভেদজ্ঞান তাহা নষ্ট করিয়া আত্মচিন্তা করিতে হইবে। শাণ্ডিল্য শব্দ এবং শ্রুতির অনুশাসনে বলেন যে ভক্তি উভয়পরা অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্তির জন্য আত্মচিন্তাও যেরূপ আবশ্যক সেইরূপ ভগবানের ঐশ্বর্য্য চিন্তাও আবশ্যক।

কাশ্যপ দ্বৈতবাদী অর্থাৎ তাঁহার মতে ব্রহ্ম ও জীব স্বতন্ত্র। বাদরায়ণ অদ্বৈতবাদী, তাঁহার মতে সকলই ব্রহ্মময় সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। কাশ্যপ বলেন যে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য চিন্তা আবশ্যক। এই সংসার অর্ণবে জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর দ্বারা বিতাড়িত হইতেছে, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। দীনহীনভাবে তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া থাক। তাঁহার গুণ কীর্ত্তন কর সর্ব্বদা তাঁহাকে ধ্যান কর—তিনি তোমার পাপ বিধৌত করিয়া অমর ধামে লইয়া যাইবেন। তাঁহার কৃপাই তোমার একমাত্র সম্বল। তাঁহার কৃপা ভিন্ন তুমি নিজে কি করিতে পার? তোমার কর্ত্তৃত্বে এ জগতে কোন কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে। অদ্য তুমি পৃথিবীর অধিপতি হইতে পার কিন্তু এক মূহুর্ত্ত মধ্যে তোমার শত চেষ্টা সত্বেও তুমি পথের ভিখারী হইয়া যাইতে পার। অদ্য যে ভিখারী আগামী কল্য সে নৃপতি। রোগে, শোকে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, বা প্রকৃতি বিপ্লবে, রণে, বনে কোন স্থানেই তুমি কেবল আত্মনির্ভর করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পার না। ভগবানের কৃপাই তোমার একমাত্র আশ্রয়। তাহাতে নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাক। তোমার গত্যন্তর নাই। এই হইল কাশ্যপের কথা।

বাদরায়ণ বলেন যে সকলই ব্রহ্ম—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। অজ্ঞান বা অবিদ্যা বশতঃই আমরা এই সত্যের উপলব্ধি করিতে পারি না। আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নাই। আত্মাই যদি ব্রহ্ম হইল তাহা হইলে আত্মচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা অনাবশ্যক। অতএব অবিদ্যা শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেল এবং স্বাধীনতার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া মুক্তি রাজ্যে উপস্থিত হও।

মুক্তিই উভয়ের লক্ষ্য। কিন্তু একজন বলেন ভগবানচিন্তা আর একজন বলেন আত্মচিন্তা মুক্তির জন্য প্রয়োজন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে এই

মতভেদ কেবল কথার মারপেচ। ভগবানই যদি তোমার লক্ষ্য হয় এবং তিনিই যদি তোমার জীবনের আদর্শ হন এবং যদি তুমি তোমাকে তাঁহার অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে কালে তোমার তন্ময়ত্ব উপস্থিত হয়। তোমার অস্তিত্ব তখন বিশ্বজনীন অস্তিত্বে নিমজ্জিত হইয়া যায়। তখন উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকে না। জীবাত্মা তখন ব্রহ্ম রসে ডুবিয়া যায়। বাদরায়ণ আত্ম চিন্তার পক্ষপাতী, জ্ঞানের দ্বারা আত্মা বিশুদ্ধ করিতে হয়, মোহাবরণ ফেলিয়া দিতে হয়। অবিদ্যা তিরোহিত হইলে জীবের দ্বৈতজ্ঞান নষ্ট হয়। জীব তখন পরম ধামে উপস্থিত হয়।

শাণ্ডিল্য ঋষি এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। তিনি বলেন জীব ব্রহ্মে যে ভেদ তাহাও সত্য এবং জীব ব্রহ্মে যে অভেদ তাহাও সত্য। কথাটা হঠাৎ কেমন লাগে, কিন্তু একটু বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলে ইহা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হইবে। প্রত্যেক বিষয়ে একটি চির বা নিত্য সত্য আছে, কিন্তু সে সত্য কি তাহা আমাদের জানিবার অধিকার নাই। দেশকাল দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে সত্য সে সত্যের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই কারণ আমরা দেশ কালের দ্বারা বাধিত।

আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে এটী আমাদের পক্ষে সত্য। সমুদয় মতেরই একটা কার্য্যকরী ভাব আছে। তুমি বলিলে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, সকলেই ব্রহ্ম। কেন বলিলে? যদি ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তু স্বীকার কর, তাহা হইলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকেনা। অসীমত্বের মধ্যে আর কিছু থাকিতে পারে না, সুতরাং সকলেই যদি ব্রহ্ম হইল তাহা হইলে তোমার আত্মাও ব্রহ্ম। তাহা হইলে জীবের নৈতিক দায়িত্ব থাকিল না। চোর বলিল যে তাহার কোন দায়িত্ব নাই, ব্রহ্মই চোর। তর্কে বেশ শুনায় কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে চলে না। চুরি করিলেই রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, কারাগারে যাইতে হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে তোমার কার্য্যের জন্য তুমি দায়ী, ব্রহ্মের দোহাই দিলে চলিবে না। সুতরাং সে স্থলে জীব ও ব্রহ্মে পার্থক্য বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। জ্যামিতির যে সত্যগুলি আমরা বলি তাহাও ঠিক সত্য নহে, কারণ একেবারে সমতল ক্ষেত্র কুত্রাপি পাওয়া যায় না, আর একেবারে সমতল ক্ষেত্র না পাওয়া গেলে ত্রিভুজের তিনটী কোন দুইটী সমকোণের সমান হইবে না এবং একেবারে সমতল ক্ষেত্র না পাওয়া গেলে দুইটী সমান্তরাল রেখা বর্দ্ধিত হইলে কোন স্থলে মিলিত হইতে পারে না একরূপ হইতে পারে না। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করিতেন যে পৃথিবী এই বিশ্বের কেন্দ্রে এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। আধুনিকেরা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী সৌর মণ্ডলের একটি গ্রহ মাত্র এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। প্রাচীনদিগের নিকট তাহাদিগের মত অভ্রান্ত সত্য ছিল, আমাদিগের নিকট আমাদিগের মত অভ্রান্ত সত্য। কিছু দিন পরে মতান্তর উপস্থিত হইয়া আমাদিগের মত ভ্রান্ত স্থির করিতে

পারে। সুতরাং কোন সত্যই যে চিরকালের জন্য সত্য তাহা চিরকালের জন্য বলা যাইতে পারে না। তৎকালীন জ্ঞানের দ্বারাই তৎকালীন সত্যের বিচার হয়। আমার জ্ঞানে যাহা সত্য তাহা আমার নিকট সত্য। তোমার জ্ঞানে যাহা সত্য তাহা তোমার নিকট সত্য। কিছুকাল পরে তুমি আমার মতে আসিতে পার, আমি তোমার মতে আসিতে পারি। তুমি আমার ভুল দেখাইতে পার কিংবা আমি তোমার ভুল দেখাইতে পারি। কিন্তু অধিকার ভেদে জ্ঞানের তারতম্য এবং জ্ঞানের ভেদ অনুসারে সত্যের ভেদ চিরকালই থাকিবে। সুতরাং এ কথা বলা যাইতে পারে যে ব্যবহারিক জগতে জীবের অসীম উন্নতি পথে তত্তৎ অবস্থার জ্ঞানে যাহা সত্য তাহাকেই সত্য বলা যায় এবং ক্রমোন্নতি ক্রমে যাহারা ঊর্দ্ধে অবস্থিত তাহারাই কেবল নিম্নস্থিতদিগের ভ্রম দেখিতে পারেন কিন্তু নিম্নস্থিতদিগের জ্ঞানের বাহিরে কোন কার্য্য করিবার উপায় নাই। এতদ্দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে জ্ঞানানুসারেই সত্যের নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে।

বেদান্তের মায়াবাদ চিন্তা করিয়া দেখ। মায়াবাদে কি বলে? মায়াবাদে বলে—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। জগৎ মিথ্যা হইলে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জ্ঞাতি, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী সবই মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা হইলে গৃহ, দ্বার, ধন, সম্পত্তি, গো, অশ্ব, হস্তি প্রভৃতি সকলই মিথ্যা। কিন্তু আজ পুত্রটী মরিল অমনি তুমি শোকে বিহ্বল হইলে। মায়াবাদ কেবল কথায় রহিয়া গেল। আজ একটী সম্পত্তি নষ্ট হইল, অমনি তুমি দুঃখে নিমগ্ন হইলে, মায়াবাদ সেই সময় মনে স্থানও পাইল না। সুতরাং ব্যবহারিক জগতে মায়াবাদ টিকে না। তবে কি মায়াবাদ যথার্থই একটী ভুল, তাহাও নহে। অধিকার ভেদে ইহা সত্য এবং অধিকার ভেদে ইহা মিথ্যা।

ব্যবহারিক জগতে আমরা কি দেখিতে পাই? আজ যে জিনিষটী জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বিবেচনা করি, আগামী কল্যই তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি। যাহারা দবা ও পাশা খেলিয়াছেন তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে পার্থিব কোন বস্তুই উহাদের ন্যায় প্রিয় নহে। এরূপও দেখা গিয়াছে যে পুত্র মৃত্যু শয্যায়, কিন্তু পিতা দবাতে সমাধিস্থ রহিয়াছেন। বালিকা পুতুল নিয়া খেলিতে খেলিতে তন্ময় হয়। পুতুলকে নাওয়াচ্ছে, খাওয়াচ্ছে ঘুমপাড়াচ্ছে ইত্যাদি—বালিকা যাহা পুতুল নিয়া করে যুবতী গৃহিনী তাহা নিজের পুত্র কন্যা লইয়া করেন, পুত্র কন্যারা তখন পুতুলের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। যুবতী এখন বৃদ্ধা। পুত্র কন্যারূপ পুতুলেরা এখন তাঁহাকে আনন্দ দিতে পারে না, তিনি পরকাল চিন্তায় মগ্ন। নিম্নস্তরে যাহা সত্য তাহার ঊর্দ্ধস্তরে তাহা মিথ্যা-মায়া। বালিকার নিকট পুত্তলিকা ক্রীড়া জীবনের একটী প্রধান কাজ ছিল কিন্তু বালিকা মাতৃ পদে আরূঢ়া হইয়াই বালিকার পুতুল ক্রীড়াকে মিছা কাজ মনে করিতে লাগিল। সুতরাং যে যে স্তরে আছে সেই স্তরের জ্ঞানের দ্বারাই

তাহাকে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হয় এবং উর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিলে নিম্নস্তরের যে সত্য তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হয়। সুতরাং প্রত্যেক অবস্থার জ্ঞানই এক হিসাবে মিথ্যা এবং এক হিসাবে সত্য। বিকাশোন্মুখ আত্মা ব্যাবহারিক জগতে কর্ম্ম দ্বারা যখন জ্ঞান লাভ করেন এবং উর্দ্ধ আরোহণ করেন, তখন তিনি কল্যকার সত্যগুলি পশ্চাতে রাখিয়া অদ্যকার সত্যগুলি নিরূপণ করেন এবং আগামী কল্যই হয়ত অদ্যকার সত্যগুলি মিথ্যা জানিয়া নূতন সত্যে উপনীত হইবেন। এরূপ যাইতে যাইতে যখন তিনি পরমে যাইয়া উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি পশ্চাৎস্থিত সমুদয় সত্যগুলিকে মিথ্যা বলিতে পারেন। যে পর্য্যন্ত ঐ পরম স্থানে উপস্থিত না হন, সেই পর্য্যন্ত তাহার নিজের বিকাশের জন্য তিনি সাময়িক সত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং ঐ সত্য তাহার পক্ষে তৎকালে সত্য। আমরা স্বীয় স্বীয় জীবনে অনুভব করিয়া থাকি যে এক সময়ে আমাদের যে সত্যগুলি জীবনের উপযোগী ছিল তাহা আমরা পরিত্যাগ করিয়া নূতন সত্যের দ্বারা জীবন পরিচালিত করিতেছি। কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া গৃহী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। উপবীত শিখা পরিত্যাগ করিলেন, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ আদি সমুদায় যজ্ঞ পরিত্যাগ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "সোঽহং সোঽহং"। এই বাক্য যদি কেবল মৌখিক হয় তাহা হইলে সোঽহং বাক্য মিথ্যা, কিন্তু জীব যে অবস্থায় সোঽহং-এর অধিকারী হন সে অবস্থা তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে সোঽহং বাক্য সত্য।

জীব ও ব্রহ্ম যে ভেদ ইহাও সত্য এবং জীব ও ব্রহ্ম যে এক ইহাও সত্য। কিন্তু অধিকার ভেদে সত্য। যে অবস্থায় জীব ব্রহ্ম এক সেই অবস্থায় উপনীত হইলে জীব ব্রহ্ম যে স্বতন্ত্র তাহা মিথ্যা কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নহে। যদি জীব ব্রহ্মের অভেদ তুমি উপলব্ধি করিতে পারিয়া থাক তাহা হইলে তত্ত্বমসি জ্ঞান সত্য। কেবল মুখে তত্ত্বমসি বলিলে তোমার ব্রহ্ম জ্ঞান হইবে না তোমার স্বীয় জীবনে উহার অনুভূতি চাই। সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন—"এষ তু অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি সোঽহং" যিনি সত্যের সহিত বলিতে পারেন সোঽহং তিনি যথার্থ অতিবাদী। অন্যকে আত্মকে যে ভেদ নাই এ কথা সত্য কিন্তু তাহার পক্ষে সত্য যিনি জগৎ ব্রহ্ম ইহা স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহার পক্ষে সত্য জীব যত দিন তদবস্থা প্রাপ্ত না হয় ততদিন ভূমাকে আদর্শ করিয়া স্বীয় স্বীয় অধিকার অনুসারে স্বীয় স্বীয় প্রীতিকর উপায়ের দ্বারা তাঁহার সন্নিধানে অগ্রসর হইতে হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি শান্ত, উপাসীত। অত্র খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ যথা ক্রতুরস্মিলোঁকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি সক্রতুঃকুর্ব্বীত।" সত্য সত্যই সকলই ব্রহ্ম। কারণ সকলেরই উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে, ব্রহ্মের দ্বারা স্থিতি এবং ব্রহ্মেতেই লয়। অতএব তাঁহাকে শান্ত এবং সংযত চিত্ত হইয়া উপাসনা

করিতে হইবে। জীব ক্রতুময় অর্থাৎ ইহজীবনে তিনি যে বিষয়ে মন নিবিষ্ট করেন পরকালেও তিনি তদ্রূপ হয়েন। অতএব ব্রহ্মকেই চিন্তা করা উচিত। সুতরাং শাণ্ডিল্য বলেন যে শ্রুতি এবং যুক্তির দ্বারা ভক্তি যে উভয় পরা তাহা সাব্যস্ত হইল। অর্থাৎ যেমন তাঁহার ঐশর্য্য চিন্তা-করা আবশ্যক সেইরূপ আত্মজ্ঞানের সাধন করা কর্ত্তব্য।

দ্বাত্রিংশ সূত্র—উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে যে কোন বিরোধ নাই দ্বাত্রিংশ সূত্রে তাহাই বলা হইতেছে। একবার বল জীব ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই আর একবার বল জীবব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এ কিরূপ কথা? ইহাতে এক বৈষম্য উপস্থিত হইল সুতরাং তুমি যে মৎসংস্থাপন করিতে চাও তাহা অসিদ্ধ হইল। জীব ব্রহ্মে ভেদ আছে স্বীকার কর, জীব ব্রহ্মের উপাসনা করিবে এ কথা মানিতে পারি। কিন্তু জীব ব্রহ্মে ভেদ নাই অথচ জীব ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে এ যে বিষম কথা। তদুত্তরে শাণ্ডিল্য বলিতেছেন যে ইহাতে কোন বৈষম্য হয় না যেমন অভিজ্ঞানে জ্ঞানের বিষয় দুইটী নয় একটী এবং পূর্ব্বজ্ঞাত বস্তু এবং পরজ্ঞাত বস্তুর মধ্যে কোন বিষিষ্টত্ব থাকে না। তদ্রূপ জীব ব্রহ্মকে জানিলেই তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকে না। দেবদত্ত নামে এক ব্যক্তিকে তুমি অনেক দিন পূর্ব্বে দেখিয়াছিলে তারপর তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছ তৎপরে হঠাৎ একদিন তাহাকে দেখিলে, হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইল কিন্তু এ ব্যক্তি ভাল করিয়া দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল কোথায় ইহাকে দেখিয়াছি তখন পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত হইল এবং তুমি বলিয়া উঠিলে যে এ সেই দেবদত্ত যাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। এখানে জ্ঞানের বিষয় দুইটী দেবদত্ত নহে একটী দেবদত্ত। যখন দেবদত্তকে প্রথম দেখিলাম তখন পূর্ব্বে যে দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম তাহা আমার মনেই ছিল না, যখন মনে হইল তখন পূর্ব্বকার দেবদত্ত এবং এখনকার দেবদত্ত একই দেবদত্ত দুই দেবদত্ত হইল না। সুতরাং অভিজ্ঞানের যে বিষয় তাহা এক দুই নহে। অতীত বর্ত্তমানের সহিত মিলিয়া যায়। জীব যতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থাতে থাকে তখন সে যে ব্রহ্ম এ জ্ঞান তাহার হয় না। রাজপুত্র রাখালের ছেলের সঙ্গে খেলা করে, রাখালের স্ত্রীকে মা বলে রাখালকে বাবা বলে, সে মনে করে আমি রাখালের ছেলে। পররাজা যখন জানিতে পারিল যে রাখালের ঘরে রাজপুত্র আছে তখন তাহাকে সিংহাসনে বসাইল এবং রাজপুত্র জানিতে পারিল যে সে রাজারই ছেলে তখন সে জানিল যে আমিও রাখালের ছেলে নয় আমি রাজারই ছেলে।

জীব ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই কিন্তু অজ্ঞান বশতঃ সে মনে করে আমি স্বতন্ত্র, আমি হিন্দু খ্রীষ্টান কি মুসলমান কিন্তু সেই তাহার জ্ঞান হইল যে আমি ব্রহ্ম তখনই সে বলিয়া উঠিল 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিছুই নহি, আমি ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞান হইলেই জীব

ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান নষ্ট হয়। যতক্ষণ ভেদ-জ্ঞান, ততক্ষণ ভেদ, যখন ভেদজ্ঞান নাই, তখন ভেদও নাই।

ত্রয়ত্রিংশ সূত্র—জীবে ঈশ্বরে যদি কোন ভেদ না থাকিল, তাহা হইলে, জীবের ন্যায় ঈশ্বরও ক্লেশাদির অধীন হইতে পারেনা—এইরূপ তর্কের প্রত্যুত্তরে এই সূত্র দ্বারা শাণ্ডিল্য বলিতেছেন যে তাহা হইতে পারে না, যেহেতু জীব উপাধিমুক্ত হইলেই ঈশ্বরের সহিত তাহার অভেদ সংঘটিত হয়। উপাধিমুক্ত জীবে ক্লেশাদি থাকে না, এবং তখন জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ হইলে ক্লেশাদি ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে না।

চতুস্ত্রিংশ সূত্র—যদি বল জীব ক্লেশা-ধীন নহে, তবে আমি বলি ঈশ্বরেরও ঐশ্বর্য্য নাই। এইরূপ তর্কের উত্তরে শাণ্ডিল্য বলিতেছেন যে না তাহা হইতে পারে না, কারণ ঐশ্বর্য্য তাঁহার স্বভাব। সুতরাং কোন সময়েতে ঈশ্বর ঐশ্বর্য্য বিহীন হইতে পারেন না।

পঞ্চত্রিংশ সূত্র—যদ্যপি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অস্বীকার করা যায় না, কারণ ঐশ্বর্য্য তাহার স্বভাব, কিন্তু তাই বলিয়া জীবের পক্ষে ঐশ্বর্য্য স্বীকার করা যায় না। জীব মুক্ত হইলেই ঈশ্বরের সহিত তাহার অভেদ হয়, কিন্তু জীবের সাধারণ অবস্থা উপাধি জড়িত; ঐশ্বর্য্য তাহার স্বাভাবিক অবস্থা নহে।

ষড়ত্রিংশ সূত্র—জীব যদি ঈশ্বর হইয়া গেল, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন কোথায় এই তর্কের উত্তরে শাণ্ডিল্য বলিতেছেন যে মানবের অনন্ত বুদ্ধি। এমন একদিন কখনও হইতে পারে না, যেদিন সব মানুষ মুক্ত হইবে। সকল সময়েই অনেক অমুক্ত জীব থাকিবে তাহাদিগের পক্ষে ভগবানের ঐশ্বর্য্য চিন্তা অতীব প্রয়োজনীয়।

সপ্তত্রিংশ সূত্র—ঈশ্বর প্রকৃতির অন্তরাল হইতে কার্য্য করেন, এবং কেবল চিৎ সত্ত দ্বারা বর্ত্তমান থাকেন, সুতরাং প্রকৃতির বিকার ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রকৃতি বা মায়া এই বিশ্বের উপাদান কারণ। এই প্রকৃতি আবার অব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের শক্তি স্বরূপ ব্রহ্মে লীন থাকে। ব্রহ্মের সত্ত্বা চিন্মাত্র। সুতরাং ব্রহ্ম প্রকৃতির ন্যায় বিকারাধীন নহে। যখন প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা হয়, তখন ব্যবহারিক জগতের সৃষ্টি হয়। যাদুকর যেরূপ তাহার যাদুশক্তি দ্বারা নানাবিধ অবাস্তব পদার্থের সৃষ্টি করে, ব্রহ্মও তদ্রূপ প্রকৃতি-রূপ শক্তির সাহায্যে এই ব্যবহারিক জগতের সৃষ্টি করেন। বিকার বা পরিণাম কেবল প্রকৃতিতেই প্রযোজ্য। যখন ব্রহ্ম প্রকৃতিকে ব্যক্ত করেন, তখনই তিনি ঈশ্বর পদ বাচ্য হয়েন। প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তিমাত্র বলিয়া ব্রহ্মই জগতের যেমন নিমিত্ত কারণ, তদ্রূপ উপাদান কারণও বটে, কিন্তু স্থূলভাবে প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ। শাণ্ডিল্য এ স্থলে বিবর্ত্ত-বাদ ও পরিণাম বাদের—সামঞ্জস্য করিয়া গেলেন। বিকার বা পরিণাম প্রকৃতির কিন্তু প্রকৃতির প্রথম বিকাশ বিবর্ত্তন হেতু।

অষ্টত্রিংশ সূত্র—একজন মানুষ গৃহের মধ্যে পীঠাসনে বসিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি বলা যাইতে পারে—সে গৃহে বসিয়া আছে; সেইরূপ প্রকৃতি ব্যবহারিক জগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ হইলে, ভগবানকেই জগতের প্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে। যেরূপ পীঠাসন গৃহের মধ্যেই আছে, সেইরূপ প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি মাত্র।

ঊনচত্বারিংশ সূত্র—প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি-স্বরূপ হইলেও, প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিয়া লইয়া—ব্রহ্ম ও প্রকৃতি উভয়কেই বিশ্বের কারণ বলা যাইতে পারে।

চত্বারিংশ সূত্র—ব্রহ্ম চিৎ এবং প্রকৃতি চেত্যা। এই চিৎ ও চেত্যা ব্যতীত আর তৃতীয় পদার্থ কিছুই নাই। ব্যবহারিক জগৎ বিশ্লেষণ করিলে, কেবল বিষয়ী ও বিষয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞাত ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। বিষয়ীই চিৎ, প্রকৃতিই বিষয় বা চেত্যা। জগতে চিৎ ও চেত্যা এমনই ওতঃপ্রোতভাবে বিমিশ্রিত রহিয়াছে যে—বিশুদ্ধ চিৎ বা বিশুদ্ধ চেত্যা দৃষ্ট হয় না। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট প্রকৃতির মধ্যদিয়া চিতের বিশুদ্ধ বিকাশ হয়। প্রকৃতি রাজসিক হইলেও, চিতের বিকাশ হয়, কিন্তু রঞ্জিত ভাবে। তামসিক প্রকৃতির মধ্য দিয়া চিতের আদৌ বিকাশ হয় না। চিৎকে যদি একটি আলোক বলিয়া কল্পনা করা যায় এবং উহার আচ্ছাদককে যদি প্রকৃতি বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ শ্বেতকাচকে সাত্ত্বিক, রঞ্জিত নীল-লোহিত প্রভৃতি আবরণকে রাজসিক ও কৃষ্ণবর্ণ আবরণকে তামসিক প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। বিমল শ্বেতাবরণের ভিতরদিয়া বিশুদ্ধ আলোক বাহির হইবে, রঞ্জিতাবরণের ভিতর দিয়া নীল-লোহিতাদি রঞ্জিত আলোক বাহির হইবে, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ আবরণ দিয়া আদৌ আলোক নির্গত হইবে না। চিৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির তারতম্যানুসারে উহার বিকাশের ভেদ হইবে। গায়ত্রী মন্ত্রের উপাস্য ভর্গ এই চিৎ। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে—চিৎ "বৃক্ষৌষধি তৃণাদ্যেষু রসরূপেণ তিষ্ঠতি", "পাষাণমণিধাতূনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতঃ" "হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানাং চেতো দ্যোতয়তে হ্যসৌ" অর্থাৎ ইহা বৃক্ষ, ওষধি, তৃণাদির রসরূপে, পাষাণ মণি ধাতুদিগের তেজরূপে অবস্থিতি করে; ইহা সর্ব্বভূতের হৃদিস্থ থাকিয়া দীপ্তি প্রকাশ করে।

একচত্বারিংশ সূত্র—প্রকৃতি ও চিৎ অনন্ত কাল হইতে যুক্ত রহিয়াছে। প্রকৃতি ব্রহ্মের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি। অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। গীতা বলেন—'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি॥" প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও।

দ্বিচত্বারিংশ সূত্র—প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি, কিন্তু উহা অনৃত বা মিথ্যা নহে। প্রকৃতিকে ব্যবহারিক জগতের কারণ স্বরূপ দেখিলে, উহা সৎ। কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি স্বরূপ দেখিলে, উহা অসৎ। উহা "সদসদাত্মিকা"। কার্য্য অসৎ, কারণ সৎ। ঘট অসৎ, ঘট ভাঙ্গিলে উহা মাটিতে মিশাইয়া যায়। মৃত্তিকা ঘটের পক্ষে সৎ, কিন্তু মৃত্তিকার কারণের পক্ষে অসৎ।। সেইরূপ জগতের মূল কারণ

সৎ, অন্যান্য পদার্থ তাহার নিকট অসৎ। প্রত্যেক পদার্থই উহার কারণের নিকট অসৎ, কার্য্যের নিকট সৎ। প্রকৃতিও ব্যবহারিক জগতের পক্ষে সৎ।

ত্রিচত্বারিংশ সূত্র—অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিয়া, শাণ্ডিল্য এইক্ষণ পুনর্ব্বার মূল বিষয় অর্থাৎ ভক্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মানুষের ভালবাসা যে সব চিহ্ন দ্বারা, ভক্তির পরিশুদ্ধিও ঐ সব চিহ্নদ্বারা বুঝিতে হইবে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার নিকটে থাকিতে চায়, তাহার গুণকীর্ত্তন শুনিতে চায়, তাহার সেবা করিতে চায়, তাহা হইতে দূরে থাকিলে অত্যন্ত কষ্ট পায়। ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালবাসাও ঐরূপ।

চতুশ্চত্বারিংশ সূত্র—সম্মান, বহুমান, প্রীতি, বিরহ, (ইতর-বিচিকিৎসা) মহিমাখ্যাতি, তদর্থপ্রাণস্থান, তদীয়তা, সর্ব্বতদ্ভাব, অপ্রতিকূলতা এবং অন্যান্য লক্ষণ, যাহা বাহুল্য আশঙ্কায় বর্ণিত হইল না, ইহারাই ভক্তির লক্ষণ।

ঈশ্বরকে সম্মান করা, তাঁহার সহিত যাঁহাদিগের কতকাংশে সাদৃশ্য আছে, তাঁহাদিগকে মান্য করা; তাঁহার সামীপ্যে প্রীতি-অনুভব ও তাঁহার অভাবে বিরহ-দুঃখ; ঈশ্বরাতিরিক্ত পদার্থে ঔদাসীন্য, তাঁহার মহিমাঘোষণা, তাঁহার নিমিত্তই প্রাণধারণ ও স্থিতি; সকলই তাঁহার এবং তিনিই সমস্ত এবং তাঁহার প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ বা শত্রুভাবের অভাব এবং এই প্রকার অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ভগবানের প্রতি ভক্তি জানিতে পারা যায়।

ভক্তির যে সমস্ত লক্ষণ বলা গেল, তাহা ভক্তমাত্রেই লক্ষিত হয়। চৈতন্যদেব 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া অনেক সময় কাঁদিতেন। অজ্ঞ লোকেরা তাঁহাকে বাতুল বলিয়া বিবেচনা করিত। সাংসারিক লোক যেরূপ স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্ত, ভক্তেরাও ভগবানের প্রতি তদ্রূপ আসক্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ সূত্র—দ্বেষাদি ভক্তির লক্ষণ নহে। দ্বেষ, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি ভক্তির লক্ষণ নহে, এই সূত্রে তাহাই বলা হইতেছে।

ষট্‌চত্বারিংশ সূত্র—ভক্তি যে কেবল ঈশ্বরে প্রযুজ্য হয়, তাহা নহে; যাঁহারা ঈশ্বরের অবতার, তাঁহাদিগের পক্ষেও প্রযুজ্য। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর। আবার ইহাও বলিয়াছেন—

"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি"

অর্থাৎ দেবতাদিগের উপাসকেরা দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হন, আমার ভক্তেরা আমাকে প্রাপ্ত হন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইলেও, তাঁহাতেও ভক্তি প্রযোজ্য। 'মদ্ভক্ত' শব্দের দ্বারা তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

সপ্তচত্বারিংশ সূত্র—যাঁহারা ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম অবগত আছেন, তাঁহাদের আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না,—'শ্রুতি' অর্থাৎ শ্রুতি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। গীতাও 'উপনিষৎ'রূপে শ্রুতির মধ্যে গণনীয়। গীতায় উক্ত আছে—

'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।।

যে ব্যক্তি তত্ত্বতঃ আমার জন্ম ও কর্ম্ম

অবগত হইয়াছেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন না; হে অর্জ্জুন! তিনি আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। সূত্রকার বলিতেছেন যে, ভগবানের জন্মগ্রহণ স্থূল ভাবে বুঝিতে হইবে না। ভগবানের জন্ম স্থূলশরীরে নয়। কোন স্থূলদেহে ঐশী শক্তির প্রাদুর্ভাব হইলে অবতার বলিয়া কথিত হয়।

অষ্টচত্বারিংশ সূত্র—ভগবানের যে অবতার, উহা দিব্য এবং উহা ভগবানের শক্তি হইতে উদ্ভূত হয়। জগৎপ্রপঞ্চ ভগবানের শক্তি হইতে উদ্ভূত হয়; কিন্তু কি প্রকারে উহা উদ্ভূত, তাহা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। অবতারও ঐরূপ ভগবানের শক্তি হইতে উদ্ভূত এবং উহাও মানুষের বুদ্ধির অগম্য। জীবের পুনর্জন্ম যেরূপ জীবের কর্ম্মোদ্ভূত, ভগবানের সেইরূপ নহে। গীতা বলেন—

'অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥'

যদিও আমি অজ, অব্যয়াত্মা ও সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, তথাপি প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া আমি আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি।

উনপঞ্চাশৎ সূত্র—ভগবান যে জন্ম গ্রহণ করেন, সে কেবল তাঁহার করুণা বশতঃ। জীবের যে জন্ম, তাহা পূর্ব্বকর্ম্ম বশতঃ, কিন্তু কর্ম্ম ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে না। জীবের উপকারের জন্য করুণাবশতঃ তিনি সময় সময় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। গীতা বলেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি জন্ম গ্রহণ করি। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্কৃতদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।

পঞ্চাশৎ সূত্র—ভক্তি কিন্তু সাধারণতঃ ভগবানের বিভূতি পক্ষে প্রযোজ্য নহে; কারণ উহার অধিকাংশই প্রাণী।

ভগবানের বিভূতি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্যক্ত প্রকৃতির দোষসমূহ তাহাতে বর্ত্তমান থাকে। উপাস্য অত্যুচ্চ আদর্শের হওয়া চাই।

একপঞ্চাশৎ সূত্র—দ্যূত ও রাজাও ভগবানের বিভূতির মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু উহাদের প্রতি ভগবান জ্ঞানে ভক্তি নিষিদ্ধ। সুতরাং অন্যান্য বিভূতিও তজ্জাতীয় বলিয়া তাহাদিগের প্রতিও ভগবানের তুল্য ভক্তি নিষিদ্ধ। গীতায় দশম অধ্যায়ে বিভূতির বর্ণনাই রহিয়াছে, যথা—

"হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥
আদিত্যানামহংবিষ্ণুর্জ্যোতিষাংরবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মিবাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥
যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥"

দ্বিপঞ্চাশৎ সূত্র—বাসুদেবও ভগবানের বিভূতি বলিয়া গীতায় উল্লিখিত হইয়াছেন; সুতরাং বিভূতির পক্ষে যদি ভক্তি প্রযোজ্য নহে, তাহা হইলে বাসুদেবের পক্ষেও ভক্তি প্রযোজ্য নহে। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে—তাহা নহে। বাসুদেব যদিও বিভূতির মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব ছিল। বাসুদেব মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া থাকিলেও, তাঁহার ঈশ্বরত্বের জন্য তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে। তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব ব্যতীত কর্ম্মজ দেহমূলক সাধারণ প্রাণীত্ব নাই।

ত্রয়োপঞ্চাশৎ সূত্র—বাসুদেব যে ঈশ্বর, তাহা প্রত্যভিজ্ঞানের দ্বারাও জানা যায়। ব্রহ্মবিদ্ ঋষিরা বাসুদেব জন্মিবামাত্র তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া অবগত আছেন। ঈশ্বর কি পদার্থ, তাহা ঋষিরা জানিতেন এবং বাসুদেব জন্মিবামাত্র ঋষিরা তাঁহাকে দেখিয়াই জানিলেন যে—এই ত সেই ঈশ্বর।

চতুঃপঞ্চাশৎ সূত্র—বাসুদেবকে যে বিভূতির মধ্যে বর্ণন করা হইয়াছে, তাহার কারণ—তিনি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশৎ সূত্র—বাসুদেবের পক্ষে যেমন ভক্তি প্রযুক্ত, সেইরূপ অন্যান্য অবতারদিগের পক্ষেও প্রযুক্ত। শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া ত্রেতাযুগাবতার রামচন্দ্রও 'বিভূতি' মধ্যে বর্ণিত হইয়াছেন।

ষট্‌পঞ্চাশৎ সূত্র—ভক্তির দ্বারা উদ্ধার করিবে, এইরূপ উক্তি থাকাতে, অথবা যে

ভক্তি শব্দ, তাহা গৌণ বুঝিতে হইবে এবং উহা দ্বিতীয় ভক্তির হেতু মাত্র। গীতার কয়েকটী শ্লোক স্মরণ করিয়া সূত্রকার ঐ সূত্র রচনা করিয়াছেন। গীতার নবম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ সূত্রে দৃষ্ট হয় ;—

'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥'

অর্থাৎ হে পার্থ! মহাত্মারা আমার দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আমাকে ভূতাদি অব্যয় জানিয়া অনন্যমনা হইয়া আমার ভজনা করেন। এস্থলে যে ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা মুখ্য। কিন্তু চতুর্দ্দশ এবং ষড়বিংশ শ্লোকে যে ভক্তির উল্লেখ হইয়াছে, উহা গৌণ।

চতুর্দ্দশ শ্লোক—

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥"

অর্থাৎ আমার মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে এবং দৃঢ়ব্রত ও যত্নী হইয়া এবং আমাকে নমস্কার করিতে করিতে নিত্যযুক্ত হইয়া ভক্তির সহিত আমার উপাসনা করেন।

ষড়বিংশ সূত্র—

"পত্রংপুষ্পংফলংতোয়ংযোমেভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥"

যিনি ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল প্রদান করেন, আমি উহা— ভক্তির সহিত দেওয়া হয় বলিয়া, সেই প্রযতাত্মার নিকট হইতে গ্রহণ করি। তৎপরে ঊনত্রিংশ সূত্রে বলা হইতেছে :—

"সমোঽহংসর্ব্বভূতেষুনমেদ্বেষ্যোঽস্তি নপ্রিয়ঃ।
যেভজন্তিতুমাংভক্ত্যা ময়ি তে তেষুচাপ্যহম্ ॥"

আমি সর্ব্বভূতেই সমভাবাপন্ন; আমার কেহ দ্বেষ্য-প্রিয় নাই। যাহারা আমাকে ভক্তির সহিত ভজনা করে, তাহারা আমাতে রহিয়াছে এবং আমি তাহাদিগেতে রহিয়াছি।

সপ্তপঞ্চাশৎ সূত্র—ভক্তি যে স্থলে অনু-রক্তি—কীর্ত্তনাদি দ্বারা সাধনীয়া উল্লিখিত হয়, ঐ ভক্তির দ্বারা মুখ্যা ভক্তি বুঝায় না।

গীতা ২। ৩৬ বলেন—

"স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা।
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ॥"

হে হৃষীকেশ, জগৎ তোমার মহিমা কীর্ত্তনে প্রহৃষ্ট হয় এবং তোমাতে অনুরক্ত হয়। এস্থলে মহিমা-কীর্ত্তন উপায় মাত্র।

গীতার সেই শ্লোক আবার স্মরণ করুন—

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥"

আমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, যত্নী এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া এবং আমাকে নমস্কার করিতে করিতে আমাকে ভক্তির সহিত উপাসনা করে।

এস্থলে ভক্তি কীর্ত্তনাদির সহিত উল্লিখিত হওয়ায় উহা মুখ্যা ভক্তি নহে।

অষ্টপঞ্চাশৎ সূত্র গীতার ৯ম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ এবং ঊনত্রিংশ শ্লোকের মধ্যে ভক্তিপ্রাপ্তির বিভিন্ন উপায় বর্ণিত হইয়াছে, কারণ ভগবানের উপাসনায় ভিন্ন ভিন্ন অংশ রহিয়াছে।

ত্রয়োদশ ও ঊনত্রিংশ শ্লোকেই মুখ্যা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পুনরুক্ত করিতেছি, যথা—

গীতা ৯। ১৩ বলেন—

'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বাভূতাদিমব্যয়ম্ ॥'

গীতা ৯।২৯ বলেন—

'সমোহহংসর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

হে পার্থ, মহাত্মারা আমার দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া এবং আমাকে ভূতাদি অব্যয় জানিয়া অনন্যমনা হইয়া আমার ভজনা করেন।

আমি সর্ব্বভূতেই সমান, আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই, যাহারা ভক্তির সহিত আমার ভজনা করে, তাহারা আমাতে আছে, আমি তাহাদিগেতে আছি।

এই দুই শ্লোকেই মুখ্যা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, আর এই দুই শ্লোকের মধ্যে অর্থাৎ ১৪। ১৫। ২২। ২৬। ২৭। ২৮ শ্লোকে যে ভক্তির উল্লেখ হইয়াছে, উহারা মুখ্যা ভক্তি নহে; মুখ্যা ভক্তি প্রাপ্তির উপায় মাত্র।

ঊনষষ্ঠি সূত্র—এই সমুদায় উপায় অবলম্বন করিলে আত্মার বিশুদ্ধি জন্মে এবং তাহা হইতে মুখ্যা ভক্তির উদয় হয়।

ষষ্ঠি সূত্র—কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, এই সমুদায় উপায়ের সহিত ভক্তি শব্দ সংযুক্ত থাকায়, তাহাতে ফলাধিক্য হয়।" যেমন 'ভক্তির সহিত আমাকে নমস্কার করে' ইত্যাদি স্থলের ভক্তি মুখ্যা ভক্তি নহে, কিন্তু ভক্তি শব্দের উল্লেখ থাকায় কোন কোন আচার্য্যের মতে উহাতে অধিক ফল হয়।

একষষ্ঠি সূত্র—জৈমিনি বলেন যে, ঐ সমুদায় ভক্তি প্রাপ্তির উপায়ের সহিত ভক্তি শব্দ উল্লিখিত হওয়ায়, ঐ ঐ স্থলে ভক্তি শব্দ দ্বারা ঐ ঐ উপায়ই বুঝিতে হইবে।

ত্রয়োদশ হইতে অষ্টবিংশতি সূত্রে মুখ্যা ভক্তি লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সমুদয় স্থলে 'ভক্তি' শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। শাণ্ডিল্য বলেন যে, ঐ সমুদায় ভক্তি মুখ্যা ভক্তি নহে, উহারা গৌণী ভক্তি।

অনেক আচার্য্যেরা বলেন যে, উহারাও মুখ্যা ভক্তি, এবং ভক্তি লাভের উপায়ের সহিত উহারা যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, উহা দ্বারা উপাসকদিগের প্রবৃত্তি জন্মে। স্বমত পোষণ করিবার জন্য শাণ্ডিল্য আচার্য্য জৈমিনির মত এস্থলে উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন যে, জৈমিনিও উহাদিগকে গৌণী ভক্তি বলিয়াছেন। যেমন যে স্থলে ভক্তির সহিত নমস্কার করা বলা হইয়াছে, সেস্থলে ভক্তি আর নমস্কার একই জিনিষ। যেমন যেস্থলে ভক্তির সহিত পত্র পুষ্প-ফল প্রদানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ স্থলে ভক্তি ঐ পত্র-পুষ্পাদি প্রদান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দ্বিষষ্ঠি সূত্র—একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে, গৃহী যেমন যথাকালসম্ভব তাহার উপকরণাদি সংগ্রহ করেন, ভক্তির সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিতে হয়। সমুদায় দ্রব্য এক সময়ে সংগ্রহ হয় না, তথাপি গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতে পারে; ভক্তির সম্বন্ধেও ঐরূপ।

ত্রয়ঃষষ্ঠি সূত্র—ভক্তিলাভের বহুবিধ উপায় আছে। কেহবা সকলগুলি, কেহবা অনেকগুলি, কেহবা উহার একটি মাত্র উপায় সম্বল করিয়াও ভক্তি লাভ করিতে পারেন। ভগবান তুষ্ট হইলে, উহার একটির দ্বারাও কার্য্য হয়।

দরিদ্রের দুঃখ মোচনের জন্য ধনী যত উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, কোন নিঃস্ব ব্যক্তি তাহা পারে না, কিন্তু সে যদি তাহার সাধ্যানুসারে দরিদ্র-দুঃখ মোচনের চেষ্টা করে, তাহা হইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ধনী শত মুদ্রা দান করিয়া যে ফল পান, দরিদ্র ব্যক্তি এক কপর্দ্দক দানেও তদধিক ফল পাইতে পারে। কেহবা শত শত ফুল দিয়া পূজা করে, কেহবা অন্দভাবে কেবল জলধারা পূজা সমাপন করে। সার কথা এই যে, ভগবানকে লক্ষ্য করা চাই। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥'

হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হবন কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, তাহা সকলই আমাকে অর্পণ করিও।

চতুঃষষ্ঠি সূত্র—সকল কার্য্যই ভগবানের উদ্দেশ্যে করিলে, অবন্ধ বা অনাসক্তি জন্মে। মানব যখন তাহার ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া যাইয়া বিশ্বাত্মার সহিত আপনাকে সম্মিলিত করিতে পারে, তখনই সে আসক্তি-শূন্য হয়। গায়ক যেমন বেহালা-তম্বুরা প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে সংগীত আরম্ভ করে; স্বীয় কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ যন্ত্রের স্বরের সহিত মিলায়, সাধকও সেইরূপ ক্রমশঃ বিশ্বাত্মার সহিত স্বীয়াত্মার মিলন সংঘটন করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে স্বার্থ ত্যাগ করিতে করিতে বৃহৎ বৃহৎ বিষয়েও স্বার্থ ত্যাগ করা যায়। একেবারেই অনাসক্তি হয় না; কিন্তু ভগবানের সত্তা সর্ব্বভূতে উপলব্ধি করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব বিষয় 'ব্রহ্মার্পণং' করিতে হয়।

পঞ্চষষ্ঠি সূত্র—ধ্যানের যে নিয়ম হইয়াছে, সে কেবল চিত্তবিক্ষেপ নিবারণের জন্য।

ভগবানের ধ্যান করিতে হইবে। ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধ্যান করা যায়। যে ভাবটি যাঁহার প্রীতিকর, তিনি সেই ভাবটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার ধ্যান করিবেন। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে; তাহা হইতে ক্রমে সমাধি লাভ হয়। সমাধি হইতে আত্মার শক্তিবৃদ্ধি হয়।

ষড়ষষ্ঠি সূত্র—গীতায় যে 'মদ্যাজি' শব্দ আছে, তাহাদ্বারা ভগবানের উপাসনাই বুঝায়; উহা দ্বারা ছাগাদি বধ বুঝায় না। গীতা বলেন—'যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্' অর্থাৎ আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হন। এই স্থলে জীবহিংসাদির কোন উপদেশ নাই।

সপ্তষষ্ঠি সূত্র—'পাদোদক' বলিতে কেবল পাদস্পৃষ্ট জল বুঝিতে হইবেনা, কারণ তাহাতে অব্যাপ্তি দোষ হয়। উহা 'লক্ষ্যৈকদেশে লক্ষণস্যাবর্ত্তমানম্'—ন্যায়শাস্ত্রে ইহাকে অব্যাপ্তি বলে। আমি যদি বলি যে—বঙ্গদেশে যে বাস করে, সেই বাঙ্গালী; কিন্তু এই লক্ষণ দ্বারা বঙ্গদেশে বাস করে না, এমন বাঙ্গালী বাদ পড়িয়া যায়, সুতরাং উহাতে অব্যাপ্তি দোষ হইল। শালগ্রাম শিলার পাদ নাই, সুতরাং শালগ্রাম শিলা-স্পৃষ্ট জল কেমন করিয়া পাদোদক হইবে? অতএব 'পাদোদক' বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, উহা পাদের ব্যবহার জন্যই সমর্পণ করা হইয়াছিল।

অষ্টষষ্ঠী সূত্র দেবতাদিগকে যাহা অর্পণ করা হয়, তাহা গ্রহণ করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, তাহা গ্রহণ করা যায়। ইহাতে কোন পাপ নাই। যখন ভগবানকে কিছু দেওয়া হইল, তখন উহাতে তোমার স্বামিত্ব নাই; তখন তাঁহার প্রসাদ স্বরূপ উহা গ্রহণ করা যায়।

ঊনসপ্ততি সূত্র—দেবার্চ্চনাদিতে যে সমস্ত বিধি আছে, তাহা প্রতিপালন না করিলে অপরাধ হয়। ঐ পাপ দুই প্রকার। এক হচ্ছে স্বীয় কার্য্যজনিত, আর একটী হচ্ছে অর্চ্চনার উপকরণের দোষজনিত। অর্চ্চনার বিধি পালন করা উচিত, কারণ উহাতে মনের সংযম হয়।

সপ্ততি সূত্র—পত্রাদি বলাতে সমুদয় অর্চ্চনার উপকরণই বুঝা যাইতেছে।

একসপ্ততি সূত্র—এই সমুদয় কার্য্যের দ্বারা ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মে, তজ্জন্য ইহা অন্যান্য কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল ফুল-জল দিয়া পূজা করিলে যে কোন ফল হয়, তাহা নহে; পূজার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক প্রবৃত্তিও চাই। কপোতাদি মন্দিরে বাস করে এবং মৎস্যরা গঙ্গাজলে থাকে, কিন্তু তাহাদের কোন ফল হয় না। কেবল উপাসনার নিয়মাদি পালন করা যথেষ্ট নহে; উপাস্য দেবতার আদর্শ আত্মসাৎ করা আবশ্যক। সংসারে আমরা যে সমস্ত কার্য্য করি, তাহা কর্ত্তব্য জ্ঞানে করিলে ভগবানের উপাসনা করা হয়। কিন্তু যে কার্য্য কেবল ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া করা যায়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বিসপ্ততি সূত্র—গীতায় চার প্রকার উপাসকের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে চতুর্থ প্রকার উপাসক প্রথম তিন প্রকার উপাসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদিগের প্রশংসা হেতু প্রথম তিন প্রকার উপাসক চতুর্থ প্রকার উপাসকের সহিত একত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

গীতা বলেন—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

হে অর্জ্জুন! চার প্রকার সুকৃতিমান লোকেরা আমাকে ভজনা করে, যথা—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। এই চার প্রকার উপাসকের মধ্যে জ্ঞানীরাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানীরা কখনও ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না; তাঁহারা সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় ভক্তির জন্য ভগবানের উপাসনা করেন। এই জন্য গীতায় উক্ত হইয়াছে—"জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।" জ্ঞানীকে আমি আমার নিজের আত্মার ন্যায় জ্ঞান করি।

ত্রয়ঃসপ্ততি সূত্র—সর্ব্বেষ্টি এবং যজ্ঞের ন্যায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কার্য্য ভক্তির বাহিরে এবং ভক্তির অন্তরে, উভয় স্থানেই রহিয়াছে। পাপবিমোচনের জন্য যে যজ্ঞ করা হয়, তাহাকে সর্ব্বেষ্টি বলে এবং সোমরস বাহির করিবার জন্য যে যজ্ঞ করা হয়, তাহাকে সব বা বৃহস্পতি সব বলা হয়। সর্ব্বেষ্টি যজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞের সহিত একত্রও সম্পাদিত হয়, অথবা স্বতন্ত্রও সম্পাদিত হয় এবং সব বাজপেয় যজ্ঞের সহিত একত্রও সম্পাদিত হয় অথবা পৃথক্ভাবেও সম্পাদিত হয়।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

এই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা ভগবানে ভক্তিও হইতে পারে কিম্বা ঐহিক ফলও পাওয়া যায়।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

অর্থাৎ যে ভাবে যে আমার নিকট আসে, আমি তাহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করি।

চতুরধিকসপ্তি সূত্র—পূর্ব্বে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির কথা বলা হইয়াছে। উহারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বীয় স্বীয় কার্য্যজনিত যে পাপ, তাহার জন্ম দায়ী; অতএব তোমার পাপের জন্ম তুমি দায়ী। শাস্ত্রে পাপের বহুবিধ প্রায়শ্চিত্ত লিখিত হইয়াছে।

শাণ্ডিল্য বলেন—ভগবানের নাম-কীর্ত্তনাদি করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

"পাপে গুরূণি গুরূণি লঘূনি চ লঘূন্যপি।
প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ॥
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃ কর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥"

মন্বাদি গুরু পাপে গুরু দণ্ড এবং লঘু পাপে লঘু দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমুদায় প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করাই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।

বর্ষাকালে নদীর জল আবিল হয়, কিন্তু বর্ষা-অন্তে উহার আবিলতা আর থাকে না। সেই সময় কাদা নীচে পড়িয়া যায় এবং জলের নীচ পর্য্যন্ত দেখা যায়। মনও ঐরূপ। মন শান্ত হইলে, বালু-কণার ন্যায় পাপ সকল নীচে পড়িয়া যায়। অন্তঃকরণ বিভিন্ন প্রকারে শান্ত করা যায়। ভগবানের নামকীর্ত্তন করা উহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

পঞ্চসপ্তি সূত্র—যদি বল যে, ভগবানের নামকীর্ত্তন করিলে পাপ নষ্ট হয়, তাহা হইলে গুরুতর পাপ করিয়া কঠোর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইল না এবং তাহা হইলে পাপের বৃদ্ধি হইতে পারে। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, ভগবানের নাম করা যে কঠোর নহে, তাহা নহে, কারণ প্রায়শ্চিত্ত একবার করিতে হয়, কিন্তু ভগবানের নাম আমরণ করিতে হয়।

ষট্সপ্তি সূত্র—ভক্ত্যাদিকারে অল্পতেই অধিক কার্য্য হয় এবং অন্যান্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ঘটে না। গীতা বলেন—

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥'

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর; আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে পরিত্রাণ করিব। অতএব যদি ভগবানের উপর নির্ভর করিলে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন না হয়, তাহাতেও কোন ক্ষতি দেখা যায় না; কারণ উহাতেও পাপ নষ্ট হইয়া যায়।

সপ্তসপ্তি সূত্র—খলে—অর্থাৎ খলিয়ানে যে বাণী—অর্থাৎ যে কাষ্ঠখণ্ড থাকে, তাহাও যূপকাষ্ঠের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত-স্থানে ভগবানের নাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

'কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তং তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্॥'

পাপ করিয়া যাহার অনুতাপ হয়, তাহার পক্ষে ভগবানের নাম করাই একমাত্র ব্যবস্থা।

অষ্টসপ্ততি সূত্র—শাস্ত্র অনুসারে তমোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার নাই; কিন্তু অন্যান্য সর্ব্বকার্য্যে তাহাদের অধিকার আছে। ভক্তিপথে ঐরূপ অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়ের ন্যায় নিম্ন শ্রেণীস্থদিগেরও অধিকার আছে।

ঊনাশীতি সূত্র—যাহারা ভক্তি বিষয়ে ইহকালে একেবারে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদেরও পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না; তাঁহারা পরলোকে ঈশ্বরের সমীপে গিয়া ভক্তি বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করেন।

অশীতি সূত্র—যাঁহারা ভক্তিমার্গ অবলম্বন না করিয়া অন্যমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহ জগতে মোক্ষপ্রাপ্তির ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু এই ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা ভক্তিমার্গ-অবলম্বীদিগের পক্ষে নহে। ভক্তিমার্গ অবলম্বীরা ইহকালে মোক্ষ প্রাপ্ত না হইলেও, তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না।

একাশীতি, দ্ব্যশীতি সূত্র—স্মৃতিতেও এই ক্রমোন্নতির কথা বিবৃত হইয়াছে। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে, ২৪ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। মহাপাতকীদিগের পক্ষে ব্যবস্থা আর্ত্তদিগের ব্যবস্থার ন্যায়। গীতা বলেন—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥"

যদি কেহ অত্যন্ত দুরাচার হয়, সেও যদি অন্য কাহাকে উপাসনা না করিয়া, কেবল মাত্র আমাকে উপাসনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধু জ্ঞান করিতে হইবে; কারণ তিনি সম্যক্ ব্যবসিত। তিনি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হন এবং শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হন না। যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, হে পার্থ! তাহারা পাপযোনি, স্ত্রী, বৈশ্য কিংবা শূদ্র হইলেও পরাগতি প্রাপ্ত হয়।

ত্রয়োঽশীতি সূত্র—গীতার মর্ম্ম গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, ভগবানে একান্ত নির্ভরভাবই ভক্তি। তাই ভগবদুক্তি—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, মামেকং শরণং ব্রজ।"

চতুরশীতি সূত্র—ভক্তি হইতেই সকলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। গীতা বলেন—

"ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্।"

প্রত্যেকেই আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া আমাকে লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

পঞ্চাশীতি, ষড়শীতি, সপ্তাশীতি সূত্র—এই বিশ্বজগৎ ভগবান্ হইতে পৃথক্ নয়, সকলই তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার শক্তিকে মায়া বলা যায়, কারণ জড়ের সহিতও সম্বন্ধ আছে। ব্যাপক সত্য বলিয়া ব্যাপ্যও সত্য।

সকলই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। যাহা আছে, তাহা চিরকালই আছে। যাহা নাই, তাহা কখনও ছিলও না, এখনও নাই, কখনও হইবেও না। গীতোক্তি—"না সতো বিদ্যতেঽভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" সুতরাং সকলই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া

তাঁহার সহিত অদ্বিতীয়। ব্রহ্মের যে শক্তি আছে, তাহাকে মায়া বলে। এই জগৎ-প্রপঞ্চ মায়া হইতে উদ্ভূত। মায়া যখন ব্রহ্মে অব্যক্ত অবস্থাতে থাকেন, তখন জগৎ নাই। অব্যক্ত ব্যক্ত হইলেই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়। এই মায়ার অস্তিত্ব আছেও বলা যায়, নাইও বলা যায়। যখন ব্রহ্মে লীন থাকে, তখন ইহার অস্তিত্ব নাই, যখন ব্যক্ত হয়, তখন ইহার অস্তিত্ব আছে। এই জন্য বেদে মায়ার নাম 'সদসদাত্মিকা'। মায়ার ব্যক্ত অবস্থায় জগৎ-প্রপঞ্চ এবং ব্যক্ত অবস্থারই নাম-রূপাদি দৃষ্ট হয়। তখন একই সৎ পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়। এই জগৎ-প্রপঞ্চ ব্যক্ত, ব্রহ্ম স্বয়ং ব্যাপক। ব্যাপক—অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ বলিয়া ব্যাপ্য—অর্থাৎ জগৎ প্রপঞ্চ সৎ। সাধারণতঃ ব্রহ্মকে নিমিত্ত-কারণ এবং মায়াকে জগতের উপাদান-কারণ বলা হয়; কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয় কারণ। ব্রহ্মের কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু মায়ার সদাসর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হইতেছে।

অষ্টাশীতি, উননবতি সূত্র—এই বিশ্ব কোন প্রাণি-বুদ্ধি-উদ্ভূত হয় নাই; কারণ উহা অসম্ভব যে—জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তিনি পিতার ন্যায় শ্রুতি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মনুষ্য-বুদ্ধি অতি সীমাবদ্ধ। এই বিশ্ব সৃষ্টি করা দূরে থাক্, অতিশয় জ্ঞানী ব্যক্তিরাও একটী সামান্য বালুকণার তত্ত্ব অবগত নহেন। সুতরাং যে বুদ্ধি-বলে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা মহান্ এবং অসীম। পিতা যেমন পুত্রের কল্যাণার্থে সর্ব্বদা ব্যস্ত, ভগবানও সেইরূপ এই বিশ্বের কল্যাণার্থে সর্ব্বদা ব্যস্ত।

নবতি সূত্র—জীবহিংসাদি করা যাইতে পারে, এরূপ উপদেশ অনেক স্থলে আছে, কিন্তু সে সকল উপদেশ স্বয়। জীবন ধারণ করিতে হইলে, মনুষ্যের অন্ততঃ জল পান করিতে হয় ও বায়ু গ্রহণ করিতে হয় ও কিছু না কিছু খাইতে হয়, তাহাতে জীবহিংসা অনিবার্য্য। তাহাতে যে পাপ হয়, তন্নিবারণার্থে গৃহস্থের "পঞ্চসূনা যজ্ঞ" করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বেদে যে প্রাণিহিংসার উপদেশ রহিয়াছে, একথা ঠিক নহে। বেদার্থ সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়াই ঐরূপ বিবেচনা করা হয়।

একনবতি সূত্র—বাদরায়ণ বলেন, সর্ব্ব-ফলই তাঁহা হইতে উদ্ভূত হয়। বেদান্ত সূত্রের প্রথম পাদে ২য় সূত্রে আছে—"জন্মাদ্যস্য যতঃ ইতি"—উহার বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, যে সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ কারণ হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইয়া থাকে এবং যে বিশ্ব নাম ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত ভাব ধারণ করে এবং যাহাতে বহুবিধ কর্ত্তা ও ভোক্তা আছে এবং যাহা কর্ম্মফলের আধার স্বরূপ, যে কর্ম্মফল সমূহের ভিন্ন ভিন্ন দেশ, কাল ও কারণ রহিয়াছে এবং যে দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবস্থা মনের অগম্য, সেই কারণই ব্রহ্ম। সুতরাং ভগবানই সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, মানবের কর্ম্মেই অধিকার আছে, ফলে অধিকার নাই।

দ্বিনবতি সূত্র—সৃষ্টি যে ক্রম-অনুসারে হয়, তাহার বিপরীত ক্রমে তাহার লয়। সৃষ্টির ক্রম যথা—ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি

হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথ্বী; এবং লয়ের ক্রম, পৃথ্বী জলেতে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশেতে, আকাশ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়।

ত্রয়োনবতি সূত্র—উপাধিযোগে বা হানিতে সূর্য্যের ন্যায় একই বস্তু দেখায়। জগতে একমাত্র পদার্থ, কিন্তু উপাধির ভিন্নতা বশতঃ বহু প্রতীয়মান হয়। একই চন্দ্র প্রকম্পিত সলিল মধ্যে যেমন বহু দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চঞ্চলচিত্তে একই ব্রহ্মবস্তু বিবিধ প্রতীয়মান হয়।

চতুর্ণবতি সূত্র—ব্রহ্ম যদি বিশ্ব হইতে ভিন্নই হ'ন, তাহা হইলে বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ থাকে? অতএব তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন নহেন। দ্বৈতবাদীরা বলেন যে, বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র; অর্থাৎ স্রষ্টা সৃষ্টি-ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র। যদি বিশ্বের মূল কারণের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টি-প্রারম্ভে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ, এই দুই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে ব্রহ্ম সসীম হইয়া পড়েন অথবা ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না। অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই নাই এবং তিনিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, ইহাই স্বীকার করিতে হয়।

পঞ্চনবতি সূত্র—ব্রহ্ম বিকারের অধীন নহেন। সুতরাং ব্রহ্মপদার্থের বিকার হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে না। জগৎ ব্রহ্মের অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়া হইতে উদ্ভূত।

ষণ্ণবতি সূত্র—অত্যন্ত ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মেতে বুদ্ধি-লয় হেতু তাঁহারও একত্ব সংঘটিত হয়। গীতা বলেন—

"পুরুষঃ সপরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥"

হে পার্থ! সেই পরপুরুষকে ভক্তি দ্বারাই পাওয়া যায়। তাঁহাতেই সকল ভূত বিদ্যমান আছে ও তাঁহা দ্বারাই সর্ব্ব প্রাণী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

সপ্তনবতি সূত্র—ভক্তেরা দীর্ঘায়ু হইতে পারেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের কোন কামনা থাকে না। সকল বাসনাই ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, অন্য কোন বাসনা থাকে না।

অষ্টনবতি সূত্র—ভক্তির অভাবেই জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে, জ্ঞানের অভাবে নহে। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, ভক্তি ও জ্ঞান এক নহে এবং ভক্তি হইতে মুক্ত হয়। সুতরাং জ্ঞানীগণের ভক্তির অভাবে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়।

নবনবতি সূত্র—কর্ম্মের ন্যায় মানবেরও ত্রিনেত্র; যথা, বেদ, শ্রুতি বা শব্দ, দ্বিতীয় অনুমান, তৃতীয় বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

শততম সূত্র—আবির্ভাব ও তিরোভাব কার্য্য-কারণের সংযোগ হইতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু আপাততঃ তাহারা ব্রহ্মের বিকার বলিয়া বোধ হয়। একটী মৃণ্ময় ঘট লও; কুম্ভকার ইহাকে ঘট করিবার পূর্ব্বে ইহার যে অস্তিত্ব ছিল না, একথা বলা যায় না; কারণ ইহা তখন মৃত্তিকায় ছিল, মৃত্তিকা সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকা মৃত্তিকার কারণে ছিল; এইরূপে ঘট যে কোন সময়ে ছিল না,

তাহা বলা যায় না। ভবিষ্যতে সে ঘট থাকিবে না, ইহাও বলা যায় না। ভাঙ্গিয়া গেলে, উহা ধূলি-পরিণাম বা অন্য কোন রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ভাঙ্গা-হচ্ছে গড়া হচ্ছে এইরূপ কার্য্য-কারণের যোগে একই পদার্থ বহুবিধ প্রতীয়মান হয় † (ক্রমশঃ)

ধ্যান

—•—

মানব-মনের পাঁচ প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। উহারা যথাক্রমে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। সাধারণতঃ মন কখন চঞ্চল, কখন আচ্ছন্ন, কখন পাশাপাশি রূপে স্থিরভাব ও চঞ্চলভাব—এইরূপ ভাবেই থাকে। এই সমস্ত ভাবের নাম ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত। আর মনের একতান অবস্থা বা একভাবে নিমগ্ন থাকিয়া অবস্থিতিকে একাগ্রভাব বলে। একাগ্র ভাব লাভ হইলে, ধ্যান নামে সপ্তম যোগাঙ্গের আবির্ভাবসাধন সহজ হইয়া আসে। এই 'একাগ্র' ও 'নিরুদ্ধ' নামক অবস্থাদ্বয়ই যোগপথের অনুকূল।

"তত্র প্রত্যৈকতানতা ধ্যানম্"

(সংক্ষিপ্তসূত্রাণি:)

ভাষ্যম্—'নাভিচক্রে, নাসাগ্রে, হৃদয়-পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধ্নি জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্যৈকতানতা-সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণ অপরামৃষ্টো ধ্যানম্।' (ভোজবৃত্ত্যাদিনী চ); —

'যত্র চিত্তং ধৃতং তত্র যা প্রত্যয়ানাং জ্ঞানবৃত্তীনাং একতানতা সত্ত্বনাপেক্ষা বিসদৃশতা তৎ ধ্যানম্ যদেব ধারণায়ামবলম্বনী-কৃতং তদাকারাকারিতশ্চিত্তবৃত্তিশ্চেৎ অনন্তরিতা প্রবহতি তৎধ্যানম্।'

'নাভিচক্রনাসাগ্রে দেশে যত্র চিত্তং ধৃতং তত্র প্রত্যয়স্য জ্ঞানস্য যা একতানতা বিসদৃশপরিণামপরিহারদ্বারেণ যদেব ধারণায়া অবলম্বনীকৃতং তদবলম্বনতয়ৈব নিরন্তরমুৎপত্তিঃ সা ধ্যানম্ উচ্যতে।'

"তচ্চ ধ্যেয়ধ্যানধ্যাতৃস্ফূর্ত্তিমৎ।"

নাভিচক্র, হৃদয়-পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধ্নি-জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে কিম্বা অন্য কোন বাহ্য বিষয়—ইহাদের মধ্যে কোন এক দেশ বা বিষয়ে চিত্তবৃত্তির একতানতা, (কোন রূপ প্রত্যয় ব্যতিরেকে যে এক বিষয়তা), তাহাকে ধ্যান বলে। চিত্ত যাহা অবলম্বন করিয়া ধারণা অভ্যাস করিতে রত হয়, সেই ধ্যেয় পদার্থ চিত্তে বিসদৃশ পরিণাম পরিহারপূর্ব্বক যখন নিরন্তর উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন তাহাকে ধ্যান বলে। ধ্যান-কালে অন্য কোন প্রত্যয় বা জ্ঞান থাকে না। ধ্যান-কালে চিত্তবৃত্তির সদৃশ পরিণাম থাকে বটে কিন্তু বিসদৃশ পরিণামের একেবারেই পরিহার হয়। ধ্যান-কালে চিত্তবৃত্তির একটী মাত্র সদৃশ প্রবাহ চলমান থাকে ও তখন চিত্তবৃত্তি কোন এক বিষয়ে ধৃত হইলে, একাকারিত ও অনন্তরিতরূপে প্রবাহিত হয়।"

† সূত্রগুলির স্থূল মর্ম্ম দেওয়া হইল। বারান্তরে সূত্রগুলির পদপাঠ ও প্রত্যেক সূত্রের অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং সমগ্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

পুরাণতত্ত্বদর্শী গারুড়ে বলিয়াছেন,

'প্রাণায়ামৈর্দ্বাদশভির্যাবৎ কালঃ কৃতো ভবেৎ। স তাবৎ কালপর্য্যন্তঃ মনো ব্রহ্মণ্যধারয়েৎ॥'

অর্থাৎ দ্বাদশবার প্রাণায়ামে এক ধারণা হয়। দ্বাদশবার ধারণায় একবার ধ্যান হয়। অবশ্য ইহাকে ধ্যানের সামান্যলক্ষণ বলিতে হইবে। বিশেষ লক্ষণ সূত্রে উক্ত হইয়াছে। ধ্যানের লক্ষণ সম্বন্ধে অপর কেহ কেহ বলেন,

যাহা হইতে আত্মপ্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাকেই ধ্যান বলে।

'ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।'

মনে মনে আত্মার স্বরূপচিন্তাকেও ধ্যান বলে।

"ধ্যানমাত্মস্বরূপস্য বেদনং মনসা খলু"

স্থূল, সূক্ষ্ম ভেদে ধ্যান দ্বিবিধ। সগুণ ও নির্গুণ ভেদেও ধ্যান দ্বিবিধ। আবার স্থূলধ্যান, জ্যোতির্ধ্যান ও সূক্ষ্মধ্যান, এই ত্রিধা ধ্যানপ্রণালী আছে। যথা,

"সগুণং নির্গুণং তচ্চ সগুণং বহুশঃ স্মৃতং"

"স্থূলং জ্যোতিস্তথা সূক্ষ্মংধ্যানস্য ত্রিবিধং বিদুঃ। স্থূলং মূর্ত্তিময়ং প্রোক্তং জ্যোতিস্তেজোময়ন্তথা। সূক্ষ্মং বিন্দুময়ং ব্রহ্ম কুণ্ডলী পরদেবতা।"

যাহাতে মূর্ত্তিময় ইষ্ট দেবতাকে বা পরম গুরুকে ভাবনা করা যায়, তাহার নাম স্থূলধ্যান, যাহাদ্বারা তেজোময় ব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে চিন্তা করা যায়, তাহাকে জ্যোতির্ধ্যান বলে এবং যাহা হইতে বিন্দুময় ব্রহ্ম বা কুণ্ডলিনী শক্তির দর্শন করিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাকে সূক্ষ্মধ্যান বলে। তাহা হইলে সূক্ষ্মধ্যান বুঝিতে হইলে 'বিন্দু ও কুণ্ডলী' পদার্থ কি, তাহা অগ্রে বুঝা উচিত।

বিন্দুই পরমব্রহ্ম। যাহার দৈর্ঘ্য নাই প্রস্থ নাই, উচ্চতা নাই, এবংবিধ সূক্ষ্মতম পদার্থের নাম বিন্দু। এই বিন্দু ভিদ্যমান হইয়া অব্যক্তস্বরূপ অপরব্রহ্ম উৎপন্ন হইয়াছেন এবং এই অপর ব্রহ্মই 'শব্দব্রহ্ম' নামে অভিহিত হ'ন।

'ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মারবোঽভবৎ। শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ॥ শব্দব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে জগুঃ। ন হি তেষাং তয়োঃ সিদ্ধির্জ্জড়ত্বাদুভয়োরপি। চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতিমেমতিঃ"।

পরমবিন্দু ভিদ্যমান হইয়া অব্যক্তস্বরূপ অপরব্রহ্ম উৎপন্ন হইলেন। আগমবিশারদ মহাত্মাগণ ইহাকেই 'শব্দব্রহ্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শব্দস্ফোটবাদীরা শব্দকে এবং অর্থস্ফোটবাদীরা অর্থকে শব্দব্রহ্ম বলেন; কিন্তু তাহাদের কোনটাতেই তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে দেখা যায় না। কারণ শব্দ ও শব্দার্থ, উভয়ই জড় পদার্থ। তন্ত্ররাজ 'সারদাতিলকে' বলিয়াছেন, যিনি সর্ব্বভূতের চৈতন্যস্বরূপ, তিনিই শব্দব্রহ্ম।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ ও শব্দার্থ যদ্দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, তিনিই শব্দব্রহ্ম। পরন্তু শব্দ ও শব্দের অর্থ শব্দব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তির অন্তর্গত। সুতরাং শব্দ বা শব্দার্থকে শব্দব্রহ্ম বলাতে তাদৃশ দোষ হয় নাই। কারণ অর্থ ও চৈতন্য সমবেত শব্দ এবং শব্দ ও চৈতন্য সমবেত অর্থ অবশ্যই শব্দব্রহ্ম হইতে পারেন। জগতে শব্দব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন শব্দ নাই ও কোন পদার্থও নাই। ব্রহ্ম যখন অনুপহিত ও নিষ্ক্রিয় থাকেন, তখন তাঁহাকে পরমব্রহ্ম বা পরপ্রণব

বলা যায়। ব্রহ্ম যখন প্রকৃতিতে উপহিত অথবা প্রকৃতিস্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করিতে থাকেন, তখন প্রকৃতি-পুরুষ, মহত্তত্ব, অহ-ঙ্কারতত্ত্ব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অবধি এই স্থূল জগৎ পর্য্যন্ত সমুদায়ই অপরব্রহ্ম; শব্দব্রহ্মও অপর প্রণব শব্দে অভিহিত হন। অনুপহিত চৈতন্য ও উপহিত চৈতন্য অর্থাৎ পরপ্রণব বা পরমব্রহ্ম এবং অপর প্রণব বা শব্দব্রহ্ম এতদুভয়ের সমষ্টিকে মহাপ্রণব বলা যায়।

বিন্দুই ব্রহ্ম স্বরূপ; ইহাই জগৎসাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী ও মহেশ্বর। তন্ত্রজ্ঞমহারাজ 'সারদাতিলকে' একস্থানে বলিয়াছেন,

'অথ বিন্দ্বাত্মনঃ শম্ভোঃ কালবন্ধোঃ কলাত্মনঃ।
বভূব চ জগৎ সাক্ষী সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ॥
মহেশ্বরাত্তবেদীশস্ততো রুদ্রস্য সম্ভবঃ।
ততোবিষ্ণুস্ততো ব্রহ্মা তেষামেব সমুদ্ভবঃ॥

কালের সহায়তায় শক্তির সহিত একী-ভূত বিন্দুরূপ পরম শিব (ব্রহ্ম) হইতে জগৎ-সাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী, মহেশ্বর উৎপন্ন হইলেন। মহেশ্বর হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে বিষ্ণু বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উৎ-পন্ন হইয়াছেন।

প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তির গুণ-ক্ষোভ উপস্থিত হইলে (তৎপ্রসূত মহাকাল সহকারে) তাহা হইতে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিতত্ত্ব বা নাদ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণভেদে নাদ আবার ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ নাদ হইতে সাত্ত্বিক বিন্দু, রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু, এই ত্রিবিধ বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে। আচার্য্যেরা এই ত্রিবিধ বিন্দুকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন। কথিত আছে,

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দু সমুদ্ভবঃ॥
পরাশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতেপুনঃ।
বিন্দুর্নাদোবীজমিতি তস্য ভেদাসমীরিতাঃ॥
বিন্দুশিবাত্মকং বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥
রৌদ্রীবিন্দোস্ততো নাদাৎ জ্যেষ্ঠা বীজাদ-জায়ত।
বামা তাভাঃ সমুৎপন্না রুদ্রব্রহ্মরমাধিপাঃ।
তে জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মনো বহ্নীন্দ্বর্কস্বরূপিনঃ॥"

সচ্চিদানন্দময়ী আদ্যাশক্তি হইতে নাদ বা মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। সেই নাদ হইতে বিন্দু বা অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। সাত্ত্বিক বিন্দু বিন্দু, রাজসিক বিন্দু বীজ এবং তামসিক বিন্দু নাদ নামে অভিহিত হন। এই বিন্দু, বীজ ও নাদের মধ্যে বিন্দুই শিবস্বরূপ চিন্ময়; বীজ শক্তি স্বরূপ প্রকৃতি এবং নাদ উভয়াত্মক শিব-শক্তির সমবায় স্বরূপ।

বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা শক্তি এবং বীজ হইতে বামা শক্তি উৎপন্ন হইলেন। এই রৌদ্রী শক্তি হইতে রুদ্র, জ্যেষ্ঠা শক্তি হইতে ব্রহ্মা এবং বামা শক্তি হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব এবং ত্রিবিধ বিন্দু-ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের বীজ মাত্র।

এই রুদ্র জ্ঞানশক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছা-শক্তিস্বরূপ এবং বিষ্ণু ক্রিয়াস্বরূপ। রুদ্র-বহ্নি-মূর্ত্তি ও সংহারকর্ত্তা, ব্রহ্মা চন্দ্রমূর্ত্তি ও সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু সূর্য্য-মূর্ত্তি ও পালনকর্ত্তা —

তজ্জন্য মহারাজ 'ক্রিয়াসারে' বলিয়াছেন—
'বিন্দু শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতা ত্রিশক্তয়ঃ॥'

বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাদ শিবশক্ত্যাত্মক। এই বিন্দু, বীজ এবং নাদ হইতে ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্রিয়া নামক শক্তিত্রয়ের উদ্ভব হইয়াছে। এখানে রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উল্লেখ না থাকিলেও, তাঁহারা যে ঐ শক্তিত্রয় হইতে অভিন্ন, ইহা বুঝা যায়। মূল প্রকৃতির সহিত সচ্চিদানন্দব্রহ্মের যেরূপ কোন ভেদ নাই এবং উভয়ে যেরূপ তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিতি করেন, সেইরূপ জ্ঞানশক্তির সহিত রুদ্র, ইচ্ছাশক্তির সহিত ব্রহ্মা এবং ক্রিয়াশক্তির সহিত বিষ্ণু তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। যোগীমহারাজ গোরক্ষদেব রুদ্র ব্রহ্মা-বিষ্ণুর উল্লেখ না করিয়া শক্তিত্রয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন,—

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥"

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী নামে অভিহিত হ'ন। এই ত্রিধা শক্তি হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

এই ত্রিধাশক্তিই পরমজ্যোতি ও প্রণব। যোগী মহারাজও বলিয়াছেন,
"নমঃ শিবায় গুরবে নাদবিন্দুকলাত্মনে।
নিরঞ্জনং পদং যাতি নিত্যং যত্র পরায়ণঃ॥"
"নাদবিন্দুকলাত্মনে গুরবে নমঃ"

নাদবিন্দুকলা যাঁহার স্বরূপ এবংবিধ গুরুকে প্রণাম। কাংস্য-ঘণ্টার শব্দকে অনুরাগযুক্ত করিয়া যে শব্দ, তাহার নাম নাদ ("কাংস্যঘণ্টানির্হ্রাদবদনুরণং নাদঃ)। ইহা কখন মত্তভৃঙ্গের ন্যায় শব্দ অনুকরণ করে, কখন বা বেণু-বীণারবের ন্যায় বোধ হয়। কখন মেঘ-ধ্বনি, কখন বা ঘণ্টা-ধ্বনবৎ শব্দকম্প উপস্থিত করে। এই নাদ ও বিন্দু চিন্তা করিলে সংসারান্ধকার নাশ হয়।
মত্তভৃঙ্গবেণুবীণা সদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ।
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনং॥
ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেঘরবোপমঃ॥
ধ্বনৌ তস্মিন্ মনো দত্বা যদা তিষ্ঠতি নির্ভরম্॥
অনুস্বারের উত্তরভাবী ধ্বনিকে বিন্দু বলে। 'কলা পাদৈকদেশঃ' নাদের অংশবিশেষের নামই কলা। গুরু নাদ, বিন্দু ও কলাত্মক অর্থাৎ নাদ-বিন্দু-কলাই তাঁহার স্বরূপ। এই নাদ ও বিন্দু ইহারা শক্তি স্বরূপ; ও মূর্ত্তিমতী, ইহাদের মূর্ত্তি, বীজ, চক্র ও গ্রন্থিভেদের প্রণালী গুরুর নিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়।

মহর্ষিও বলিয়াছেন, "স পূর্ব্বেষামপি গুরুকালেনাবচ্ছেদাৎ" গুরুই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ। কাল সকল পদার্থেরই অবচ্ছেদক, কিন্তু সেই অব্যয় মহাপুরুষের কোন অবচ্ছেদ নাই বলিয়া তিনি সকলের গুরু।

বিন্দু ও নাদকে স্থির করিতে পারিলে পরমানন্দ লাভ করিতে পারা যায়। তজ্জন্য প্রাণায়ামপরায়ণ যোগী ও সাধকগণ বিন্দু স্থির করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। যোগীমহারাজ স্বাত্মারাম বলেন,

"মনঃস্থৈর্য্যে স্থিরো বায়ুস্ততো বিন্দুঃ স্থিরো ভবেৎ।
বিন্দুস্থৈর্য্যাৎ সদাসত্ত্বং পিণ্ডস্থৈর্য্যং প্রজায়তে॥
ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো মনোনাথস্তু মারুতঃ।
মারুতস্য লয়ো নাথঃ স লয়ো নাদমাশ্রিতঃ।"

চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদিত হইলে, স্থিরীভূত প্রাণবায়ু বিন্দুস্থিরীকরণে আনুকূল্য প্রদান করিয়া থাকে। যখন বিন্দু স্থিরীভূত হয়, তখনই দেহ স্থির হয়। দেহ স্থির থাকিলে জীবন্মুক্তি লাভ ঘটে। মনের লয় হইলে প্রাণ স্থিরভাবে থাকে; আর প্রাণ স্থির হইলেই দেহ স্থিরভাবে থাকে। মনের লয়প্রাপ্ত অবস্থাকেই নাদ বলে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে নাদাবস্থা লাভ ঘটিলে বা প্রাণবায়ু স্থির হইলে অথবা সমাধি লাভ করিলে, বিশ্বপরিপালিকা শক্তি শুদ্ধ সত্ত্বময়ী দেবী জগদ্ধাত্রী এক কল্যাণময় শব্দ সমুত্থিত করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যকে আনন্দে পরিপ্লুত রাখিতেছেন ইহা অনুভূত হইবে।

তন্ত্রপারদর্শী মহাশয় তাঁহার সংহিতাগ্রন্থে বলিয়াছেন,

বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্ম্মেলনাৎ স্বয়ম্।
স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যাজড়রূপয়া॥

বিন্দু শিব এবং রজঃ শক্তিস্বরূপ। এই প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে অথবা পরমাত্মা স্বয়ং স্বকীয়া শক্তিকে স্বীকার করিয়া, বহুরূপে প্রকাশ পাইলেন।

'শাম্ভবীং মুদ্রিকাং কৃত্বা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়েৎ।
বিন্দুব্রহ্ম সকৃদ্দৃষ্ট্বা মনস্তত্র নিয়োজয়েৎ॥'

আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে হইলে শাম্ভবী মুদ্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। তৎপরে বিন্দুময় ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিয়া বিন্দুময় ব্রহ্মে মনকে নিয়োজিত করিতে হয়।

যোগী মহারাজ সংহিতাগ্রন্থে "আত্মসাক্ষাৎকার ও নাদানুসন্ধানের" উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে শ্রোত্রে তর্জ্জনীভ্যাং দ্বিলোচনে।
নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যাম্ অন্ত্যাভ্যাং বদনে দৃঢ়ং॥
নিরুধ্য মারুতং যোগী যদৈবং কুরুতেভৃশম্।
তদা লক্ষণমাত্মানং জ্যোতীরূপং প্রপশ্যতি॥
তত্তেজো দৃশ্যতে যেন ক্ষণমাত্রং নিরাবিলম্।
নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যাসতশ্চ বৈ॥
মত্তভৃঙ্গবেণুবীণাসদৃশ + + নির্ভরম্।
তদা সংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে॥
তস্মিন্ নাদে যদা চিত্তং রমতে যোগিনোভৃশম্।
বিস্মৃতা সকলং বাহ্যং নাদেন সহ শাম্যতি॥
এতদভ্যাসযোগেন জিত্বা সম্যক্ গুণান্ বহূন্।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী চিদাকাশে বিলীয়তে॥
নাসনং সিদ্ধসদৃশং ন কুম্ভ সদৃশং বলম্।
ন খেচরী সমা মুদ্রা ন নাদসদৃশো লয়ঃ॥

"স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বধ্য"
"বামভাগেঽপি তদ্বিন্দুংনীত্বা"

"বিন্দুর্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময়স্তথা।
উভয়োর্ম্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ॥
অহং বিন্দুরজঃ শক্তিরুভয়োর্ম্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনবতাং ভবেদ্দিব্যংবপুস্তদা॥
মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম্॥
জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্রসংশয়।
এতজ্ জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ॥
সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যে তাদৃশী ভবেৎ॥

বিন্দুঃ করোতি সর্ব্বেষাং সুখং দুঃখঞ্চ সংস্থিতম্ ॥"
... প্রকারেণ বিন্দুং যোগী প্রধারয়েৎ।"
"গতং বিন্দুং স্বকং যোগী বন্ধয়েৎ যোনিমুদ্রয়াঃ।"
"গুরূপদিষ্টমার্গেন প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
বিন্দুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহাসিদ্ধি প্রদায়িকা ॥"

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।

বিন্দুরূপং মহাদেবং ব্যোমাকারং সদাশিবং।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং বালেন্দুধৃতমৌলিনং ॥
পঞ্চবক্ত্রযুতং সৌম্যং দশবাহুং ত্রিলোচনং।
সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরং সর্ব্বাভরণভূষিতং ॥

* * * *

প্রণবেনৈব কার্য্যাণি স্বে স্বে সংহৃত্য কারণে
প্রণবস্য তু নাদান্তে পরমানন্দবিগ্রহং ॥

* * * *

স্বং তস্মাৎ প্রণবেনৈব প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
ব্রহ্মাদিকার্য্যরূপাণি স্বে স্বে সংহৃত্য কারণে ॥
বিশুদ্ধচেতসা পশ্য নাদান্তে পরমাত্মনি।
তস্মিন্নর্থে বদন্ত্যন্যে যোগিনো ব্রহ্মবিদ্বরাঃ ॥"

অর্দ্ধরাত্রিগতে যোগী জন্তূনাং শব্দবর্জ্জিতে।
কর্ণৌপিধায় হস্তাভ্যাং কুর্য্যাৎ পূরককুম্ভকং ॥
শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভং।
প্রথমং ঝিঞ্ঝীনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃপরম্ ॥
মেঘঝর্ঝর ভ্রমরীঘণ্টাকাংস্যস্ততঃপরং।
তুরীভেরীমৃদঙ্গাদিনি নাদানকদুন্দুভিঃ ॥
এবং নানাবিধং নাদং জায়তে নিত্যমভ্যাসাৎ।
অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ ॥
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতেরন্তর্গতঃ মনঃ ॥
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।"
"প্রাণাপানৌ নাদবিন্দুজীবাত্মপরমাত্মনৌ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে ॥"

কুণ্ডলী।

পরমা প্রকৃতি কুলকুণ্ডলিনীকে কুণ্ডলী-শক্তি বলে। ইনিই চিচ্ছক্তি মহামায়া। এই কুণ্ডলীশক্তি মেরুদণ্ডস্থ অষ্টচক্রে অষ্টধা অবস্থিতি করিতেছেন।

"তস্যোর্দ্ধে বিষতন্তুসোদরলসৎসূক্ষ্মা-জগন্মোহিনী, ব্রহ্মদ্বারমুখং মুখেন মধুরং সাচ্ছাদয়ন্তী স্বয়ং। শঙ্খাবর্ত্তনিভা নবীনা চপলামালা বিলাসাস্পদাসুপ্তা সর্পসমা শিরোপরিলসৎসার্দ্ধত্রিবৃত্তাকৃতিঃ ॥"

স্বয়ম্ভু শিবের উপরিভাগে মৃণালতন্তুসদৃশী অতি সূক্ষ্মা ও জগন্মোহিনী মহামায়া আছেন; যিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বদন বিস্তার পূর্ব্বক অমৃতক্ষরণ রন্ধ্রদ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং তন্মধুরামৃত পান করিতেছেন এবং শঙ্খগহ্বর বেষ্টনবৎ মহাকালকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছেন ও নবীন বিদ্যুন্মালার ন্যায় বিলাসমানা হইয়া তিনি সর্পের ন্যায় নিদ্রিতা আছেন ও মস্তকের উপরে প্রকাশমান যে সার্দ্ধত্রিবেষ্টন তাহার ন্যায় আকার ধারণ করিয়া আছেন।

"কূজন্তী কুলকুণ্ডলী চ মধুরং মত্তালিমালাস্ফুটং, বাচঃ কোমলকাব্যবন্ধরচনাভেদাতিভেদক্রমৈঃ। শ্বাসোচ্ছ্বাসবিবর্ত্তনেন জগতাং জীবো যথা ধার্য্যতে, সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপ্তাবলী ॥

কমনীয় কাব্যকলাপের প্রবন্ধ রচনা কালে যেমন তাহাদের ভেদ ও অভিভেদ দৃষ্ট হয় ও তদ্রূপ মত্ত অলিসমূহ যেরূপ এক অব্যক্ত ধ্বনি করে সেইরূপ কুলকুণ্ডলিনী দেবী মূলাম্বুজ মধ্যে এক অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিতেছেন। কুলকুণ্ডলিনী দেবীর শ্বাস ও উচ্ছ্বাসের বিবর্ত্তন বা গমনাগমন হেতু সংসারের জীব সমূহ প্রাণ ধারণে সমর্থ হইতেছে। সেই দেবী মূলাম্বুজে প্রবৃষ্ট ও উত্তুঙ্গ দীপ্তি শ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

"তন্মধ্যে পরমা কলাতিকুশলা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরা, নিত্যানন্দপরম্পরাতি চপলামালা লসদ্দীধিতিঃ। ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহমেব সকলং যদ্ভাসয়া ভাসতে সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধোদয়া॥"

এই কুণ্ডলিনী শক্তিই পরমা কলা; ইনি অতিশয় বা চাম জ্ঞানদায়িকা ও স্বয়ং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপা; ইনি পরা ও নিত্যানন্দসমূহরূপা; চপলার ন্যায় প্রকাশমানা কুলকুণ্ডলিনী দেবী নিজের দেহপ্রভায় ব্রহ্মাণ্ড কটাহ উদ্ভাসিত করিতেছেন; সেই নিত্যজ্ঞান-প্রকাশিনী কুলকুণ্ডলিনী দেবী বিশেষ রূপে জয়যুক্ত হউন।

হুঙ্কারেণৈব দেবীং যমনিয়মসমাভ্যাসশীলঃ সুশীলো, জ্ঞাত্বা শ্রীনাথবক্ত্রাৎ ক্রমমপিচ মহামোক্ষবর্ত্মপ্রকাশং। ব্রহ্মদ্বারস্য মধ্যে বিরচয়তু করাং শুদ্ধবুদ্ধিস্বভাবো, ভিত্ত্বা তল্লিঙ্গরূপং পবনদহনয়োরাক্রমেণৈবগুপ্তাং'।

ষট্চক্রের ক্রমাবগতি মোক্ষবর্ত্মপ্রকাশক। গুরুমুখ হইতে উহা জানিয়া লইয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে সার্দ্ধত্রিবৃত্ত বেষ্টনে সবদ্ধ করিয়া স্থিতা এবং বায়ু ও অগ্নি দ্বারা প্রবুদ্ধা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে শুদ্ধবুদ্ধিস্বভাব, যমনিয়মসমাভ্যাসশীল সাধক হুঙ্কার পূর্ব্বক মূলাধার পদ্ম হইতে সহস্রদল পদ্মে নীত করিবে।

'ভিত্ত্বা লিঙ্গত্রয়ং তৎ পরমরসশিবে সূক্ষ্মধাম্নি প্রদীপ্তে, সা দেবী শুদ্ধসত্ত্বা তড়িদিব বিলসৎ তন্তুরূপস্বরূপা। ব্রহ্মাখ্যায়াঃ শিরায়াঃ সকলসরসিজং প্রাপ্য দেদীপ্যতে তৎ, মোক্ষানন্দস্বরূপং ঘটয়তি সহসা সূক্ষ্মতাং লক্ষণেন।'

সেই কুণ্ডলিনী দেবী ষট্চক্রভেদকালে মূলাধার পদ্মস্থ স্বয়ম্ভু, অনাহত পদ্মস্থ বাণাখ্য লিঙ্গ ও ভ্রূমধ্যস্থ ইতরাখ্য শিবত্রয়কে ভেদ করিয়া ব্রহ্মনাড়ীস্থিত সহস্রদল পদ্মে গমাগমন করতঃ পরমরসময় শিবের সহিত বিশেষরূপে শোভা পান। তিনি শুদ্ধসত্ত্বা, তন্তুরূপস্বরূপা ও তড়িতের ন্যায় শোভমানা এবং সেই দেবী মূলাধারাদিপদ্মে ক্ষণকাল মাত্র অবস্থান করিয়া সহস্রদল পদ্মেতেই নিরন্তর দীপ্যমানা থাকেন।

'নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলীং নবরসাং জীবেন সার্দ্ধং সুধী, মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্মসদনে শৈবে পরে স্বামিনি। ধ্যায়েদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্যরূপাং পরাং, যোগীশো গুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী সমাধৌ যুতঃ।'

যিনি চৈতন্যরূপিণী ও সাধকের ইষ্টফলদায়িনী সেই কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে, গুরুপাদপদ্মে ধ্যানপরায়ণ যোগীশ্রেষ্ঠ সুধী সাধক, জীবের সহিত শিবসন্নিধি মোক্ষধামে লীলা করত সহস্রদল পদ্মে ধ্যান করিবেন।

লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্বা ততঃ কুণ্ডলী, পূর্ণানন্দমহোদয়াৎ কুলপথ-মূলে বিশেৎ সুন্দরী। তদ্দিব্যামৃতধারয়া স্থিরমতিঃ সন্তর্পয়েদ্দৈবতং যোগী যোগ-পরম্পরাবিদিতয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্থিতং।"

তদনন্তর সুন্দরী কুণ্ডলিনী দেবী পরম-হংস হইতে অলক্তাভ পরমামৃত পান করিয়া পূর্ণানন্দের উৎপত্তিদায়ক কুলপথ বা গুপ্ত-মার্গ দ্বারা পুনরায় মূলাধারে প্রবেশ করেন। পরে স্থিরমতি যোগী যোগপরম্পরাক্রমে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্থিত দিব্য অমৃতধারা দ্বারা দেবতাসমূহ সন্তর্পিত করেন।

অস্যোর্দ্ধে কুণ্ডলীস্থানং নাভেস্তির্য্যগধোর্দ্ধতঃ।
অষ্টপ্রকৃতিরূপা সা অষ্টধা কুণ্ডলাকৃতিঃ॥

এই মূলচক্রের ঊর্দ্ধদিকে এবং নাভির তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ ও নিম্নদিকে কুণ্ডলীরস্থান। উহা অষ্ট প্রকৃতিরূপা ও অষ্টকুণ্ডলাকৃতি।

"তত্র কন্দং সমাখ্যাতং তত্রাস্তে কুণ্ডলী সদা। সংবেষ্ট্য সকলা নাড়ীঃ সার্দ্ধত্রিকুটিলা-কৃতিঃ। মুখে নিবেশ্য তৎ পুচ্ছং সুষুম্না-বিবরে স্থিতা। সুপ্তা নাগোপমা হ্যেষা-স্ফুরন্তী প্রভয়া স্বয়া॥ অহিবৎ সন্ধিসংস্থানা-বাগ্দেবী বীজসংজ্ঞকা। জ্ঞেয়া শক্তি-রিয়ং বিষ্ণোর্নির্ভরা স্বর্ণভাস্বরা সত্ত্বং-রজস্তমশ্চেতি গুণত্রয়বিকস্বরা॥"

কন্দের ন্যায় চতুরঙ্গুল মূলগ্রন্থি মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী দেবী নিয়ত অবস্থান করি-তেছেন; এই কুণ্ডলীদেবী এক মূর্ত্তি দ্বারা অষ্টচক্রে অষ্টধা কুটিলা হইয়া সুষুম্না নাড়ীর সকল অংশ বেষ্টন করিয়া রহি-য়াছেন, এবং অপরা মূর্ত্তি দ্বারা নিজবদনে নিজপুচ্ছ প্রদান পূর্ব্বক সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা হইয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন সহকারে ব্রহ্মদ্বার রোধ পূর্ব্বক সুষুম্নামুখে অবস্থিতি করিতে-ছেন। দেবী কুলকুণ্ডলিনী প্রসুপ্ত সর্পের আকার ধারণ করিয়া নিজ প্রভায় দেদীপ্য-মান হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। ইঁহার অবয়ব সংস্থান সকল অবিকল সর্পের অনু-রূপ; ইনিই বাক্যাধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবী; ইঁহা হইতেই সকলের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়। ইনি বর্ণময়ী ও সমগ্র বীজমন্ত্রস্বরূপা। ইঁহার বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় ভাস্বর। ইনি সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই গুণত্রয়ের মূল এবং ইনিই সর্ব্বলোকে বিষ্ণুশক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

"কুলাখ্যং স্বর্ণাভং স্বয়ম্ভুলিঙ্গসঙ্গতম্।
দ্বিরণ্ডো যত্র সিদ্ধোঽস্তি ডাকিনী যত্র দেবতা।
তৎ পদ্মমধ্যগা যোনিস্তত্র কুণ্ডলিনী স্থিতা॥"

এই মূলাধার পদ্মই সাধারণতঃ কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ ও ইহার স্বর্ণতুল্য বর্ণ, ইহাতে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। এই স্থানে দ্বিরণ্ড নামে এক সিদ্ধলিঙ্গ ও দেবতা ডাকিনী শক্তি আছেন। এই পদ্মমধ্যে চতুষ্কোণ ধরামণ্ডল তন্মধ্যে ত্রিকোণ যোনিমণ্ডল বিদ্যমান আছে। ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের অভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী দেবী স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টন করত অবস্থান করিতেছেন।

"তত্র প্রসাখিলা নাড়ী নিরুদ্ধা চাষ্ট-বেষ্টনম্। ইয়ং কুণ্ডলিনীশক্তী রন্ধ্রং ত্যজতি নাগুপা॥ যদা পূর্ণাসু সর্ব্বাসু সংনিরুদ্ধোঽনিলস্তদা বন্ধত্যাগে কুণ্ডলিন্যা মুখং রন্ধ্রাদ্বিবর্ত্তয়েৎ॥"

"চিত্তবৃত্তির্যদা লীনা কুলাখ্যে পরমেশ্বরে। তদা সমাধিসাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ॥"

নিরন্তর কৃতধ্যানার্জ্জিতস্মরণং ভবেৎ।
তদা বিচিত্রসামর্থ্যং যোগিনো ভবতি ধ্রুবম্ ॥
তস্মাদ্‌গলিতপীযূষং পিবেদ্‌যোগী নিরন্তরম্।
মৃত্যোর্মৃত্যুং বিধায় সঃ কুলং জিত্বা সরোরুহে ॥
অত্র কুণ্ডলিনী শক্তির্লয়ং যাতি কুলাভিধা ॥"
ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্নায়াং মৃণালান্তরবর্ত্তিনং।
নাদোৎপত্তিস্থলেনৈব শুভ্রস্ফটিকসন্নিভা ॥
আমূর্দ্ধো বর্ত্ততে নাদো বীণাদণ্ডবদ্‌ থতঃ।
শঙ্খধ্বনিনিভস্ত্বাদৌ মধ্যে মেঘধ্বনির্যথা ॥
ব্যোমরন্ধ্রগতে নাদে গিরিপ্রস্রবণং যথা।
ব্যোমরন্ধ্রগতে বায়ৌ চিত্তে চাত্মনি সংস্থিতে ॥
যোগিনস্তৎপরে হ্যত্র বদন্তি শমচেতসঃ।
তদানন্দী ভবেদ্‌যোগী বায়ুস্তেন জিতো ভবেৎ ॥"
'পীঠত্রয়ং ততশ্চার্দ্ধং নিরুক্তং যোগচিন্তকৈঃ।
তদ্বিন্দুনাদ শক্ত্যাখ্যা ভালপদ্মে ব্যবস্থিতঃ ॥"
"কুণ্ডলীতাপনং বায়োর্ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশনম্।"
"কুণ্ডল্যপি মহামায়া কৈলাসে সা বিলীয়তে"

"ইয়ং কুণ্ডলিনী শক্তীরন্ধ্রং ত্যজতি নান্যথা।

"বিন্দুত্যাগে কুণ্ডলিন্যা সুপ্তং রন্ধ্রং দ্বিতীর্ভবেৎ।"

কুণ্ডলী ও বিন্দুর বিষয়ে সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিয়া এখন সগুণ ও নির্গুণ ধ্যানের বিষয় বলা যাইতেছে।

(নির্গুণ ও সগুণ ধ্যান।)

নির্গুণ ধ্যান এক প্রকার। ব্রহ্মকে নির্গুণ ভাবিয়া যখন চিন্তা অভ্যাস করা যায় তখন ইহাকে নির্গুণ ধ্যান বলা হইয়া থাকে। নির্গুণ ধ্যান অভ্যাস করিতে হইলে শরীরতত্ত্ব বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। মর্ম্মস্থানগুলি, নাড়ীদলের সংস্থান অর্থাৎ প্রধান প্রধান নাড়ীগুলি কোন ভাবে থাকিয়া কিরূপ ভাবে বায়ু পরিচালিত করে এবং প্রাণ অপানাদি বায়ু কোন্ কোন্ স্থানে থাকিয়া কিরূপ কার্য্য করে তাহা বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

'মর্ম্মস্থানানি নাড়ীনাং সংস্থানঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
বায়ূনাং স্থান কর্ম্মাণি জ্ঞাত্বা কর্ম্মা নিবেদনম্ ॥'

মর্ম্মস্থান, নাড়ী সমূহের পৃথক্ পৃথক্ সংস্থান, বায়ু সমূহের অবস্থিত স্থান ও কর্ম্ম প্রভৃতি আত্মবেদন বা আত্মজ্ঞান-মূলক ক্রিয়াযোগ প্রথমে অবগত হইবে। এবংবিধ ক্রিয়া সমূহ সগুণ ধ্যানকে আশ্রয় করিয়াই সম্পন্ন হয়। সাধক এইরূপ সগুণ ধ্যানে অভ্যস্ত হইলে পরে নির্গুণ ধ্যানে সমর্থ হন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,

'এবং জ্যোতির্ম্ময়ং শুদ্ধং সর্ব্বগং ব্যোমবদ্‌ দৃঢ়ং।
অত্যন্তমচলং নিত্যমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতং ॥
স্থূলং সূক্ষ্মমনাকাশমসংস্পৃশ্যমচক্ষুষং।
ন রসং ন চ গন্ধাখ্যমপ্রমেয়মনোপমং ॥
আনন্দমজরং সত্যং সদসৎ সর্ব্বকারণং।
সদাধারং জগদ্রূপমমূর্ত্তমজমব্যয়ম্ ॥
অদৃশ্যং দৃশ্যমন্তঃস্থং বহিস্থং সর্ব্বতোমুখম্ ॥
সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বতঃপাদং সর্ব্বস্পৃক্ সর্ব্বতঃ শিরঃ ॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মসদোঽহং স্যামিতি যদ্ বেদনং ভবেৎ।
তদেতৎ নির্গুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥

যিনি জ্যোতির্ম্ময়; নির্ম্মল; আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্রগামী; দৃঢ়; অত্যন্ত নিশ্চল; সনাতন; যাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই; যিনি ইচ্ছামাত্রেই স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ মূর্ত্তিই পরিগ্রহ করেন; যিনি অবকাশরহিত;

অসংস্পৃষ্ট ; চক্ষুর অগোচর ; যিনি রস ও গন্ধ তন্মাত্র হইতে ভিন্ন ; অপ্রমেয় ; অনুপম ; আনন্দময়, অক্ষর ও সত্তা স্বরূপ ; যিনি নিত্য অনিত্য সমস্ত পদার্থের কারণ, সর্ব্বাধার, জগদ্রূপ, অমূর্ত্ত, অজ ও অব্যয়, যিনি অদৃশ্য হইয়াও অন্তরে ও বাহিরে দৃশ্য হন ; যিনি সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বতো দৃষ্টি, সর্ব্বতঃপাদ, সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের স্বরূপ ; তাঁহাতে সমাহিত হইয়া [illegible] এইরূপ চিন্তন করা যায় এবং আমিই সেই পরব্রহ্ম এই প্রকার অনুভব করা যায়, ব্রহ্মজ্ঞানীগণ [illegible] তাহাকে নির্গুণ ধ্যান বলেন।

সগুণ ধ্যান বহুবিধ। পরম পুরুষ বাসুদেবকে গুরুপদেশ ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মূর্ত্ত কল্পনা করিয়া ধ্যান করাকে সগুণ ধ্যান বলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি উল্লেখ করা যাইতেছে।

(অথবা) পরমাত্মানং পরমানন্দবিগ্রহং।
গুরূপদেশাৎ বিজ্ঞায় পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং ॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মপুরে যস্মিন্ দেহনাম্নি সুমধ্যমে।
অভ্যাসাৎ সংপ্রপশ্যন্তি সন্তঃ সংসারভেষজং ॥

সাধুজনেরা গুরূপদেশ দ্বারা পরমানন্দমূর্ত্তি কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণ পরমপুরুষ পরমাত্মাকে ভব রোগের ঔষধ জানিয়া এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহে অভ্যাস যোগে তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন।

হৃৎপদ্মেঽষ্টদলোপেতে কন্দমধ্যাৎ সমুত্থিতে।
দ্বাদশাঙ্গুলনালেঽস্মিংশ্চতুরঙ্গুলমুন্মুখে ॥
প্রাণায়ামৈর্বিকসিতে কেসরান্বিতকর্ণিকে।
বাসুদেবং জগদ্যোনিং নারায়ণমজং বিভুং ॥
চতুর্ভুজমুদারাঙ্গং শঙ্খচক্রগদাধরং।
কিরীটকেয়ূরধরং পদ্মপত্রনিভেক্ষণং ॥
শ্রীবৎসবক্ষসং শ্রীশং পূর্ণচন্দ্রনিভাননং।
পদ্মোদরদলাভোষ্ঠং সুপ্রসন্নং শুচিস্মিতং ॥
শুদ্ধস্ফটিকসংকাশং পীতবাসসমচ্যুতং।
পদ্মচ্ছবিপদদ্বন্দ্বং পরমাত্মানমব্যয়ম্।
প্রভাভির্ভাসয়দ্রূপং পরিতঃ পুরুষোত্তমম্ ॥
মনসালোক্য দেবেশং সর্ব্বভূতহৃদিস্থিতং।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞানং সগুণং ধ্যানমুচ্যতে ॥

কন্দমধ্য হইতে সমুত্থিত, দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত নালবিশিষ্ট, চতুরাঙ্গুল পরিমিত ঊর্দ্ধমুখ, কেশরযুক্ত কর্ণিকা সমন্বিত, প্রাণায়াম দ্বারা বিকশিত, অষ্টদল হৃৎপদ্ম মধ্যে শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, কেয়ূর ও কিরীট দ্বারা অলঙ্কৃত, পদ্মপলাশলোচন, পূর্ণচন্দ্রানন, পদ্মের ন্যায় পদযুগলে শোভিত, চতুর্ভুজ শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষস্থল, মনোহর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট, প্রসন্ন মূর্ত্তি, নির্ম্মল হাস্য যুক্ত, বিশুদ্ধ স্ফটিক তুল্য দেহ, পীতবাস, পদ্মোদর সদৃশ শোভন ওষ্ঠ এবং স্বকীয় প্রভায় প্রদীপ্ত কান্তি বিশিষ্ট, সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়স্থিত, পুরুষশ্রেষ্ঠ, দেবপতি, অচ্যুত, অজ, অব্যয়, জগতের সৃষ্টি কারণ, বিভু, বাসুদেব, লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে সাধকগণ মানসে দর্শন করিয়া, সেই পরমাত্মাই আমি, ঈদৃশভাবে যে দর্শন করেন তাহাকে সগুণ ধ্যান বলে।

'হৃৎসরোরুহমধ্যেঽস্মিন্ প্রকৃত্যাত্মিককর্ণিকে
অষ্টৈশ্বর্য্যাদলোপেতে বিদ্যাকেসরসংযুতে ॥
জ্ঞাননালে বৃহৎকন্দে প্রাণায়ামপ্রবোধিতে।
বিশ্বার্চিষং মহাবহ্নিং জ্বলন্তং বিশ্বতোমুখং।
বৈশ্বানরং জগদ্যোনিং শিখাতন্বানমীশ্বরং ॥
তাপয়ন্তং স্বকং দেহমাপাদতলমস্তকং।
নির্ব্বাতদীপবৎ তস্মিন্ দীপয়ং হব্যবাহনং ॥

দৃষ্ট্বা তস্য শিখা মধ্যে পরমাত্মানমক্ষরং।
নীলতোয়দমধ্যস্থং বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরং॥
নীবারশূকবদ্রূপং পীতাভং সর্ব্বকারণং।
জ্ঞাত্বা বৈশ্বানরং দেবং সোঽহমস্মীতি যা মতিঃ॥
সগুণেষূত্তমং হ্যেতদ্ ধ্যানং বেদবিদো বিদুঃ।
বৈশ্বানরত্বং সংপ্রাপ্য মুক্তিং তেনৈবগচ্ছতি॥"

প্রকৃত্যাত্মক, কর্ণিকাযুক্ত, অষ্টৈশ্বর্য্য-দলোপেত, বিদ্যাকেসরসংযুক্ত, জ্ঞাননাল নামে হৃৎসরোবরের মধ্যে যে এক বৃহৎ কন্দ আছে এবং যে জ্ঞানপদ্ম প্রাণায়াম যোগে বিকশিত হইয়া উঠে সেই হৃদয়পদ্ম মধ্যে সর্ব্বত্র দীপ্যমান, বিশ্বতোমুখ, জগদ্-যোনি, শিখাতনু (অগ্নিশিখার ন্যায় শরীর) আপাদ-মস্তক দেহের সন্তাপরক্ষাকর্ত্তা, নির্ব্বাত দীপের ন্যায় নিশ্চল সেই বৈশ্বানর-রূপী প্রজ্বলিত মহাবহ্নি হব্যবাহনকে অবলোকন করিয়া, তদীয় শিখাভ্যন্তরে নীলজলদমধ্যগতা বিদ্যুল্লতার ন্যায় দীপ্তিমান, নীবার ও শূক সদৃশ পীত বর্ণ, চরাচরের কারণ, বৈশ্বানররূপী অক্ষর দেবতা-পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইয়া, সেই আত্মাই আমি, এইরূপ চিন্তা করাকেই ব্রহ্মবাদীগণ সগুণ ধ্যান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (এতদ্বারা অগ্নির সারূপ্য লাভ করিয়া মুক্ত হওয়া যায়)।

("অথবা) মণ্ডলং পশ্যেদাদিত্যস্য মহামতেঃ।
আত্মানং সর্ব্বজগতঃ পুরুষং হেমরূপিণং॥
হিরণ্যশ্মশ্রুকেশঞ্চ হিরণ্ময়নখং হরিং।
রথাসনং চতুর্বক্ত্রং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং॥
পদ্মাসনস্থিতং সৌম্যং প্রবুদ্ধাব্জনিভাননং।
পদ্মোদরললাটাভং সর্ব্বলোকাভয়প্রদং॥
জানন্তি সর্ব্বদা যস্য মুনয়ো ধর্ম্মধার্ম্মিকাঃ।
ভাসয়ন্তং জগৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা লোকৈকসাক্ষিকং॥
সোঽহমস্মীতি যা বুদ্ধিঃ সা চ ধ্যানে প্রশস্যতে।
এষ এব তু মোক্ষস্য মহামার্গস্তপোধনে॥
ধ্যানেনানেন সৌরেণ মুক্তিং যান্তি সূরয়ঃ॥

যিনি চরাচরের আত্মা, হিরণ্য বর্ণ পুরুষ, যাঁহার কেশ, শ্মশ্রু ও নখ সমূহ হিরণ্ময়, যিনি পাপঘ্ন, চতুর্ম্মুখ এবং রথোপরি আসীন, পদ্মাসনে সংস্থিত, যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু, যিনি সুন্দর, যাঁহার মুখ মণ্ডল প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায়, যাঁহার ললাটের আভা পদ্মগর্ভের আভা সদৃশ, যিনি সর্ব্বলোকে অভয় দান করিতেছেন, ধর্ম্মশীল মুনিরা সর্ব্বদা যাঁহাকে দেখিতে পান, যিনি সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করিতেছেন এবং সর্ব্ব লোকের অদ্বিতীয় সাক্ষী স্বরূপ, সাধক সেই পুরুষকে আদিত্য মণ্ডলে দর্শন করিবেন এবং দর্শন পূর্ব্বক সেই আদিত্য-ময়ই আমি এইরূপ অনুভব করিবেন। ইহাও সগুণ ধ্যান মধ্যে এক প্রশস্ত ধ্যান বলিয়া গণ্য হয় ও তাহা মুক্তির চরম হেতু বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়। অথবা

"ভ্রুবোর্ম্মধ্যেঽন্তরাত্মানং ভারূপং সর্ব্বকারণং।
স্থাণুবন্মূর্দ্ধ্নি পর্য্যন্তং মধ্যদেহাৎ সমুত্থিতং।
জগৎকারণমব্যক্তং জ্বলন্তমমিতৌজসং॥
মনসালোক্য সোঽহং স্যামিত্যেতদ্ ধ্যানমুত্তমম্॥"

যিনি দেহ মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত স্থাণুবৎ নিশ্চল ভাবে দীপ্তি পাইতেছেন—সর্ব্বকারণ, অব্যক্ত, অমিতৌজস, জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই অন্তরাত্মাকে জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানে ধ্যান

করিয়া পরে সেই পরমাত্মাই আমি ঈদৃশ অনুভব করিবেন। ইহাও উৎকৃষ্ট ধ্যানের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

অথবা বদ্ধপর্য্যঙ্কং শিথিলীকৃতবিগ্রহং।
শিব এব স্বয়ং ভূত্বা নাসাগ্রারোপিতেক্ষণঃ॥
নির্ব্বিকারং পরং শান্তং পরমাত্মানমচ্যুতং॥
জ্যোতীরূপমমৃতং ধ্যায়েদ্ ভ্রুবোর্মধ্যে বরাননে।
সোহহমাত্মেতি যা বুদ্ধিঃ সা চ ধ্যানে-প্রশস্যতে॥

শিথিলীকৃত শরীরে, বদ্ধ পদ্মাসনে, মহাদেবের ন্যায় নিজেকে শান্ত ও সমাহিত করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে নির্ব্বিকার, শান্ত, অচ্যুত পরমাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় ও অমৃত স্বরূপ মনে করিয়া ধ্যান করিবে এবং সেই পরমাত্মাই আমি এইরূপ জ্ঞান করিবে। ইহাও এক প্রকার প্রশস্ত ধ্যান।

অথবাষ্টদলোপেতে কর্ণিকাকেশরান্বিতে।
উদ্ভিন্নং হৃদয়াম্ভোজে সোমমণ্ডলমধ্যগে॥
আত্মানমর্কাকারং জ্যোতীরূপিণমক্ষরং।
সুধারসং বিমুঞ্চদ্ভিঃ শশিরশ্মিভিরাবৃতং॥
ষোড়শচ্ছদসংযুক্তশিরঃ পদ্মাদধোমুখাৎ।
নির্গতামৃতধারাভিঃ সহস্রাভিঃ সমন্ততঃ॥
প্লাবিতং পুরুষং তত্র কল্পয়িত্বা সমাহিতঃ।
তেনামৃতরসেনৈব সাঙ্গোপাঙ্গকলেবরে॥
অহমেব পরংব্রহ্ম পরমাত্মানমব্যয়ং।
এবং যদ্বেদনং তচ্চ সগুণং ধ্যানমুচ্যতে॥

কর্ণিকা ও কেশর সমন্বিত অষ্টদল হৃদ্পদ্মে চন্দ্রমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী অর্ককাকার, জ্যোতীরূপ, অক্ষর, আত্মাকে অমৃতস্রাবী চন্দ্র কিরণ দ্বারা প্লাবিত এবং শিরঃস্থিত অধোমুখীন ষোড়শদল পদ্ম হইতে বিগলিত অমৃত ধারা সমূহ দ্বারা সহস্র প্রকারে চতুর্দ্দিকে পরিপ্লুত ভাবিয়া আমিই সেই অব্যয় পরমাত্মা পরব্রহ্ম এইরূপ ধ্যান করিবে। সগুণ ধ্যানের মধ্যেও ইহাও এক প্রকার উৎকৃষ্ট ধ্যান। (প্রকারান্তরানি যথা)—

'স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগরমুত্তমম্।
তন্মধ্যে রত্নদ্বীপন্তু সুরত্নবালুকাময়ং॥
চতুর্দ্দিক্ষু নীপতরুর্বহুপুষ্প সমন্বিতঃ।
নীপোপবনস কুলে বেষ্টিতং পরিখাইব॥
মালতীমল্লিকাজাতীকেশরৈশ্চম্পকৈস্তথা।
পারিজাতৈস্তথান্যৈঃ পদ্মৈর্গন্ধামোদিত দিঙ্মুখৈঃ
তন্মধ্যে সংস্মরেদ্ যোগী কল্পবৃক্ষং মনোহরং।
চতুঃশাখং চতুর্ব্বেদং নিত্যপুষ্পফলান্বিতং॥
ভ্রমরাঃ কোকিলাস্তত্র গুঞ্জন্তি নিগদন্তি চ।
ধ্যায়েত্তত্র স্থিরো ভূত্বা মহামাণিক্যমণ্ডপং॥
তন্মধ্যে তু স্মরেদ্ যোগী পর্য্যঙ্কং সুমনোহরং।
তত্রেষ্টদেবতাং ধ্যায়েদ্ সন্ধ্যানং গুরুভাষিতং।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনং।'
'সংসারে মহাপদ্মে কর্ণিকায়াং বিচিন্তয়েৎ।
বিলগ্নসহিতং পদ্মং দ্বাদশৈর্দলসংযুতং॥
শুক্লবর্ণং মহাতেজা দ্বাদশৈর্বীজভাষিতঃ।
'হসক্ষমলবরয়ং হসখফ্রেং' যথাক্রমং॥
তন্মধ্যে কর্ণিকায়ান্তু অকথাদি রেখাত্রয়ং।
'হলক্ষ'কোণসংযুক্তং প্রণবং তত্রবর্ত্ততে॥
নাদবিন্দুময়ং পীঠং ধ্যায়েত্তত্রমনোহরং।
তত্রোপরি হংসযুগ্মং পাদুকা তত্রবর্ত্ততে॥
ধ্যায়েত্তত্র গুরুদেবং দ্বিভুজঞ্চ ত্রিলোচনং।
শ্বেতাম্বরধরং দেবং শুক্লগন্ধানুলেপনং।
শুক্লপুষ্পময়ং মাল্যং রক্তশক্তি সমন্বিতং।
এবম্বিধগুরু ধ্যানাৎ স্থূলধ্যানং প্রসিধ্যতি॥

(ক্রমশঃ)

শঙ্কর-সেবক ভারতী শর্ম্মা।